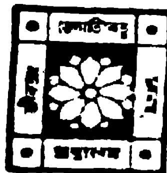


অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

কিশোর রচনাসংগ্রহ

নবম খণ্ড (এক)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত —



গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

Achintya Kumar Rachanavali Vol—IX(I)
(Collected writings of Achintya Kumar Sengupta)
Price : Rs. 16·00

প্রথম প্রকাশ :
২রা আশ্বিন, ১৩৮৬
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

সম্পাদনা
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলকাতা ৭৩

মুদ্রাকর
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
শৈলেন শীল
সমরেশ বসু

মূল্য : ষোল টাকা মাত্র

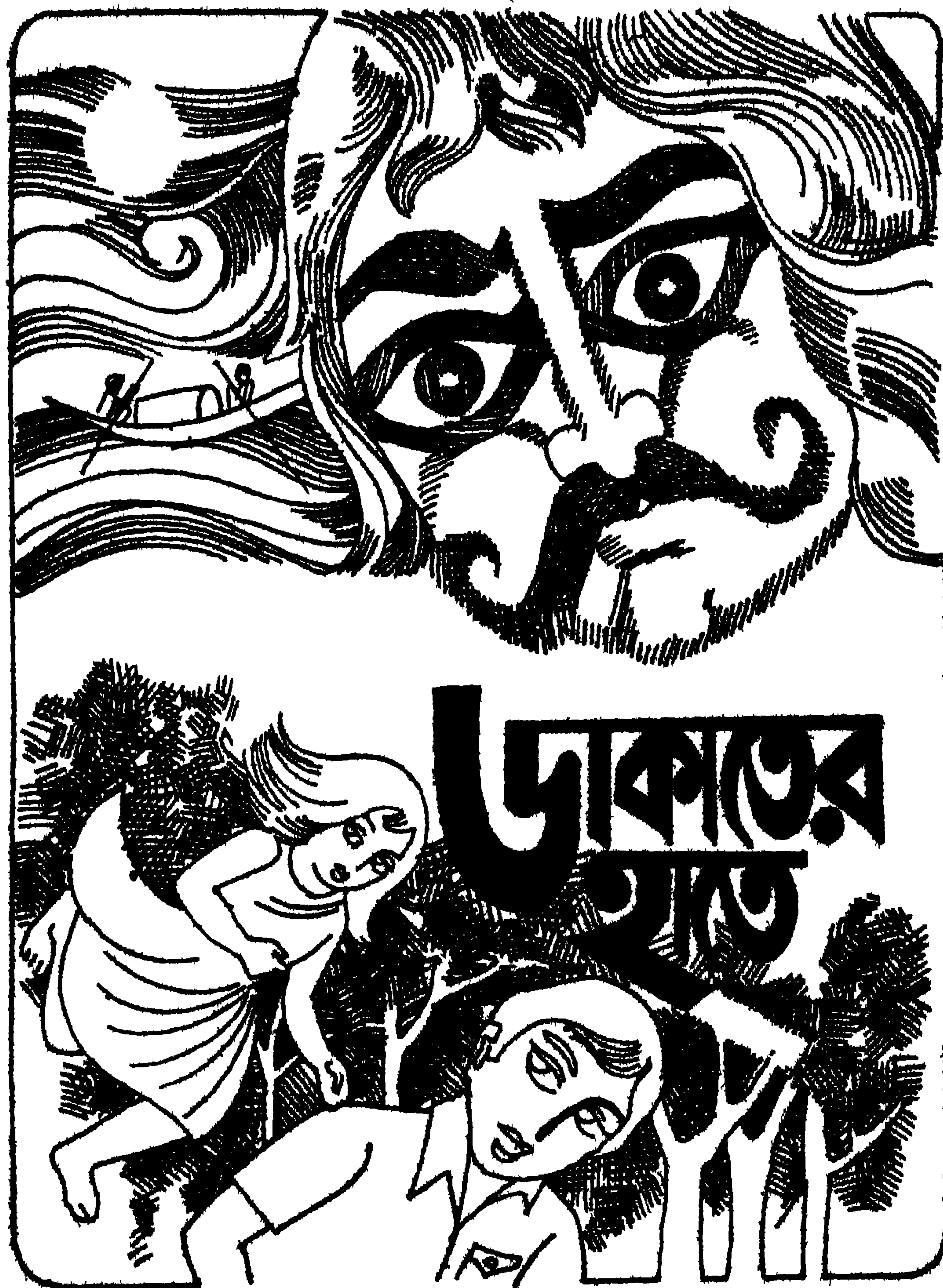
সূচীপত্র

উপন্যাস :

ডাকাতের হাতে ১
দুই ভাই ১১১
ঘোর প্যাঁচ ২০৭
ঝড়ের যাত্রী ২৬৭

জীবনী-সাহিত্য :

সকলের রামকৃষ্ণ ৩৫১


ডাকাতের
হাতে

এক

বৈশাখ মাস—প্রায় সন্ধ্যাকাল। ধলেশ্বরী নদীর উপর দিয়া একখানি নৌকা চলিতেছে।

নৌকা চলিয়াছে তালতলা হইতে কমলাঘাটায়। কমলাঘাটা হইতে ছোট-ছোট দুইটা খাল পার হইয়া, পাটক্ষেতের মধ্য দিয়া পথ ভাঙ্গিয়া, তিন-চারটে বাঁশের নড়বড়ে সাঁকোর উপর দুলিতে দুলিতে তবে মুন্সিগঞ্জে পৌঁছানো যাইবে। অনিল ইহারই মধ্যে ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বুলুর কিন্তু ভারি ফূর্তি। সে বাবার সঙ্গে ছইএর উপর বসিয়া নদীর জল দেখিতেছে। ঠিক মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক গাঙ-শালিক উড়িয়া গেল। কে যেন কতকগুলি শাদা সিল্ক্-এর পাৎলা রুমাল হাওয়ায় উড়াইয়া দিয়াছে। বুলু হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল,—বাঃ, কী সুন্দর বাবা। মাঝিকে বলে' ধরে দাও না কতগুলো। দাদা, তোর এয়ার-গান্‌টা ছোঁড়্‌না একবার।

নৌকার দোলানিতে অনিল অত্যন্ত কাবু হইয়া পড়িয়াছে। পেটের মধ্যে নাড়িভুঁড়িগুলি কেঁচোর মত পাক খাইতেছিল। সে নীচেই পাটাতনের উপর মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে। ডাঙায় পৌঁছিতে পারিলে সে বাঁচে।

তাহার চুলে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে মা কহিলেন,—এই সামান্য নদীতেই তুই এমন কাবু হ'য়ে পড়লি—তুই না বড় হ'য়ে বিলেত যাবি? সে ত' প্রকাণ্ড সমুদ্র—তিমি-মাছের হাঁ-র মত এক-একটা ঢেউ।

অনিল কহিল, আমি জাহাজে ক'রে যাবও না—আমি যাব এরোপ্লেন চড়ে'। ছোট্ট একটা তারা হ'য়ে হাওয়ায় ভেসে যাব। জল দেখলেই আমার গা-বমি করে।

বলিয়াই সে মাঝিকে হাঁক দিল,—আর কতক্ষণ, মাঝি?

লগি ঠেলিতে-ঠেলিতে মাঝি কহিল,—এই ঘণ্টাটাক্। মাইল দুয়েক আর আছে।

অনিল উঠিয়া বসিয়া কহিল,—ঘণ্টাটাক্‌? এরোপ্লেন চড়ে' এক ঘণ্টায় দুশো মাইল স্বচ্ছন্দে চলে' যেতে পারতাম, মা।

নদী বলিতে অনিল গোটা পাঁচ-ছয় গোলদীঘির যোগফল বুঝিত। কিন্তু তাহা যে আঁকিয়া-বাঁকিয়া ঢেউ তুলিয়া গর্জন করিয়া এত জায়গা ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বহিয়া চলিয়াছে তাহা সে কলিকাতার বাসার বন্দী কুঠুরিতে বসিয়া আন্দাজ করিতে পারে নাই। ধান-গাছকে সে তাহাদের বাড়ীর সামনেকার দেবদারু-গাছেরই সগোত্র ভাবিত, জলের উপর কচুরি-পানার স্তূপ দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল কে যেন সবুজ মখমলের বনাতে দিব্যি ফরাস বিছাইয়া রাখিয়াছে—নদীর পারের ছোট-ছোট খড়ের ঘর ছাড়িয়া যে সব ছেলে-মেয়ের দল পারে দাঁড়াইয়া। অকারণে বুলুও তাহাদের মুখ ভেঙচায় তাহাদের দেখিয়া অনিলের দুঃখের শেষ নাই—উহারা এমন নির্বোধ যে কী করিয়া ট্রাম-গাড়ী চলে, রাস্তার উপরে দোতালা বাড়ির মত বাস্‌ যাওয়া-আসা করে, কলের ফুটার মধ্যে একটা আনি ফেলিলে দেখিতে-দেখিতে কেমন করিয়া প্লাটফর্ম-টিকিট বাহির হইয়া আসে, তাহার পকেটের ঝর্ণা কলম দোয়াতে না ডুবাইয়াও কেমন অনর্গল লিখিয়া যাইতে পারে—এই সব বেচারীরা কিছুই জানে না। উহাদের দিকে তাকাইলে অনিলের মায়া হয়।

মা'র সঙ্গে সে মায়ের মামাবাড়ি চলিয়াছে। তালতলার বাজারের কাছে কোথায় নাকি তার ঠাকুরদার বাবার একখানা বাড়ি ছিল,—সে বাড়ি কবে উড়িয়া গিয়াছে তাহার হিসাব নাই। সেই শূন্য ভিটাটা দেখিবার জন্য বাবার হঠাৎ একদিন সখ হইল। অনিল ও বুলু এই সুযোগে গ্রাম দেখিতে বাহির হইয়াছে। তালতলায় দুইদিন কাটাইবার পর মা-ও ছাড়িলেন না—তাঁহাকে তাঁহার মামাবাড়ি মুন্সিগঞ্জ ঘুরাইয়া আনিতে হইবে। আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তাহারা নৌকা নিয়াছে। কিন্তু মুন্সিগঞ্জ আর আসে না।

যথেষ্ট হইয়াছে—এখন কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে তবে অনিলের ঘুম আসিবে, ক্ষুধা হইবে। এই তিন চার দিনে খালি ঘোলাটে জল আর

লম্বা-লম্বা পাটের ডাঁট দেখিয়া তাহার চক্ষু ক্ষয় হইয়া গেল। আবার পাটের ক্ষেতের মধ্যে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা দল বাঁধিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। ভাবিতে অনিলের গা ভয়ে ছমছম করিয়া উঠে। ক্ষেত ত' নয়—প্রকাণ্ড বন। উহার মধ্যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে এ জন্মেও সে বাহির হইতে পারিবে না। আর, কী বিশ্রী এই নদীটা—শেষ হইবার নাম নাই। নৌকাটাকে নিয়া লুফালুফি খেলিতেছে--একবার একটু বে-কায়দায় পাইলেই যেন গিলিয়া বসিবে।

অনিলের মনের ভাব টের পাইয়া রাক্ষুসী নদীটা যেন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দরকার নাই—গ্রাম দেখিবার সখ তাহার মিটিয়াছে। বাড়ি ফিরিয়া তাহার পড়ার ঘরের টেবিলের ধারে মাথা গুঁজিয়া আর আর দিনের মত লুকাইয়া একটু ঘুমাইতে পারিলে সে কত আরাম পাইত! বুলুটার জন্য নৌকোয় বেড়ানোর বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার জো নাই। বোকা মেয়েটার এত ফুর্তি হইয়াছে যে তাহার মুখ বন্ধ করে কাহার সাধ্য। নদী দেখিয়া তাহার ভয় করিতেছে শুনিলে বুলু মুখ বাঁকাইয়া নিশ্চয়ই তাহাকে ঠাট্টা করিবে। গা পাতিয়া সে-ঠাট্টা সে সহ্য করিতে পারিবে না। একে বুলু তার ছোট তায় কিনা মেয়ে। নৌকায় তাহার সঙ্গে মারামারি করিবারও উপায় নাই। পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেই সর্বনাশ। উহার যা ইচ্ছা তা বলুক।!

সব চেয়ে মজা হয় যদি খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া পরে চোখ মেলিয়াই সে দেখিতে পায় এই নদী মাঠ ক্ষেত বন—সমস্ত কখন থিয়েটারের 'সিন'-এর মত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে—সে তাহার পড়ার ঘরের টেবিলের উপর ম্যাপ বিছাইয়া মনে-মনে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সে-মন এরোপ্লেনের চেয়েও দ্রুতগামী। এক মিনিটে সে বিলেত হইতে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া আসিতে পারে। একটি আধ্‌লাও খরচ হইবে না।

কিন্তু মা বলিয়াছেন—তাঁর মামাবাড়িতে অনিলের সমবয়সী অনেক ছেলেপিলে আছে। একমাত্র সেই তাহার আকর্ষণ। কলিকাতার গল্প

বলিয়া তাহাদের তাক্ লাগাইয়া দিবে এই ভরসাই সে যা-একটু মজা পাইতেছিল। তাহার গ্রিপ্-ডাম্বেল, এয়ার-গান, ছবির বই, নতুন ফ্যাশানের বুক-খোলা কোট, ফাউণ্টেন্ পেন্, শুঁড়-তোলা নাগ্‌রা জুতা—সব দেখিয়াই তাহারা হাঁ হইয়া যাইবে। কিন্তু রাত করিয়া সেখানে পৌঁছিলে এত-সব তক্ষুনি-তক্ষুনি দেখানো যাইবে না। ছেলেগুলি ততক্ষণে নিশ্চয়ই বিছানায় লম্বা হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

অনিল আবার বলিল,—আর কত দূর মাঝি ? একটু জোরে বাও না।

উপর হইতে বুলু বলিল,—ওপরে উঠে আয় দাদা, কেমন সুন্দর হাওয়া দিয়েছে এখন।

প্রথমে ঝির-ঝির করিয়া হাওয়া দিয়াছিল, এখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ কালো করিয়া ঝড় উঠিয়া গেল। আসিবার আগে এতটুকু খবর পর্যন্ত দিল না। এতক্ষণ আকাশের কালো কালো বিকটাকার দৈত্যগুলি যেন লোহার শিকলে বাঁধা ছিল, হঠাৎ ছাড়া পাইয়া একত্রে হুড়মুড় করিয়া জেলভাঙা কয়েদির মত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সারা আকাশে তাহাদের তুমুল জয়ধ্বনি সুরু হইয়া গিয়াছে। নেকড়ে বাঘের মত ধারালো নখ ও দাঁত দিয়া তাহারা যেন এখুনি আকাশটাকে ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিয়া ফেলিবে।

বাবার হাত ধরিয়া ভয়ে মুখখানা এতটুকু করিয়া বুলু ছইয়ের তলায় নামিয়া আসিল।

দৈত্যগুলি জলেও দাপাদাপি সুরু করিয়াছে। নদীটা তাহাদের নাগরদোলা, চারদিকে ফুটন্ত ফেনা ছিটাইয়া তাহারা হোলি খেলিতেছে। শূন্য মাঠ ভরিয়া দুরন্ত ঝড় এঞ্জিনের বাঁশির মত দূর দূরান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে—কোথায় একটা-কি গাছের ঝুঁটি ধরিয়া দৈত্যরা তাহাকে সজোরে নাড়া দিতেই সেটা মড়মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গেই মেঘগর্জন। দৈত্যগুলি যেন ছুরির ফলার মত ঝকঝকে দাঁত বাহির করিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল। এখুনিই সমস্ত পৃথিবীকে তাহারা রসাতলে পাঠাইবে—তাহাদের হাতে কাহারো আজ নিস্তার নাই। ঘর-

বাড়ি উড়াইয়া গাছ-পাহাড় উলটাইয়া নৌকা-জাহাজ ডুবাইয়া সব তাহারা একাকার করিয়া দিবে—দেখি কে তাহাদের ধরিয়া রাখে।

নৌকাটা দৈত্যগুলির চড়-চাপড় খাইয়া ক্রমাগত ডিগবাজি খাইতেছে। অনিল ও বুলুর বাবা অমলেশবাবু অসহায় স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—শিগগির পারে নৌকা লাগাও মাঝি। এই ঝড় মাথায় করে' যেয়ে আর কাজ নেই।

মাঝিদের এতটুকুও ভয় নাই—একজন ত' গলুই-এর উপর বসিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে তামাক খাইতেছে। সর্দার-মাঝি বলিল,—কী ভয় বাবু। কত ঝড় মাথার উপর দিয়ে এল-গেল - এই নৌকোর সামান্য একখানি তক্তা পর্য্যন্ত খোয়া যায় নি। ঐ ত' কমলাঘাটা এসে পড়েছে। বলিয়া সে অন্য পারে একটা মিট্‌মিটে আলোর দিকে নির্দেশ করিল।

অমরেশবাবু বলিলেন,—এই ঝড়ের মধ্যে এখন আবার পাড়ি দেবে নাকি ?

সর্দার-মাঝি জোরে-জোরে বৈঠা টানিতে-টানিতে কহিল,—কতক্ষণ আর লাগবে ? ঐ আলো দেখছেন না ? এই এসে পড়লাম। কিচ্ছু ভয় করবেন না। এই করে' আমরা খাই—বৈঠা টেনে টেনে হাতে কড়া পড়ে' গেল—

বলিতে-বলিতে নৌকা কিনার ছাড়িয়া প্রায় মাঝ-নদীতে আসিয়া পড়িল।

সঙ্গে-সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হইয়া গেল—নদীর উপরে নদী। লক্ষ-লক্ষ ছিদ্রে আকাশের ট্যাঙ্কটা ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে—দৈত্যগুলি মহা আহ্লাদে অট্টহাস্য করিতে-করিতে স্নান করিতেছে। এইবার তাহারা নৌকাটাকে নিয়া 'রাগ্‌বি' খেলিতে সুরু করিল।

অনিল ও বুলুর মা চেঁচাইয়া উঠিলেন,—শিগগির নৌকো ভিড়াও, মাঝি। তুমি সব্বাইকে ডুবিয়ে মারবে নাকি ?

মাঝি আরো জোরে নৌকা চালাইতে-চালাইতে কহিল,—কোথায় নৌকো লাগাব ? দেখছেন না এখানটায় খালি কাশের জঙ্গল—তার ধারে মড়া পোড়াবার শ্মশান। ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় এখানে নামবেন শুনি ?

অনিল খাড়া হইয়া উঠিল। ভয়াবহ বিপদের সামনে পড়িয়া তাহার তুচ্ছ মাথা-ধরা কখন ছাড়িয়া গিয়াছে। সে মাঝির কথা শুনিয়া ধমক দিয়া উঠিল,—হোক্ শ্মশান। তুমি ওখানেই আমাদের নামিয়ে দেবে। চল শিগ্‌গির, ফেরাও নৌকো। ঝড় থামলে পর ফের রওনা হওয়া যাবে।

মাঝি তবুও কথা শুনিতেছে না দেখিয়া বুলু বলিল,—তোর এয়ার-গান্‌টা বার করে' ছোঁড় না লক্ষীছাড়ার কপালে—

মাঝি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দৈত্যের মতই চেহারা, স্ফীত পেশীগুলি বৃষ্টি পড়িয়া বিদ্যুতের আলোতে ঝিকমিক করিতেছে।

অনিলদের মা এইবার দস্তুরমত মিনতি করিয়া কহিলেন,—না-হয় কমলাঘাটা পৌছুতে দু'ঘণ্টা দেরি হ'বে মাঝি, তোমাকে বেশি করে' বক্‌শিস দেব—জলের ছাঁটে ভিজে সব একসা হ'য়ে গেল যে—

সর্দার-মাঝিও স্বর নামাইয়া কহিল,—কেন মিছে ভয় করছেন। এই পৌছে গেলাম বলে'। এ এমন কী ঝড়! ভেতরে সবাই জড়ো হ'য়ে বসুন না। ঐ ত, আলো এসে পড়লো।

কাকুতি-মিনতিতেও মাঝিদের নিরস্ত করা গেল না। অমরেশবাবু অস্থির হইয়া উঠিলেন। ঝড় সমানে গর্জন করিয়া চলিয়াছে। যতদূর চোখ যায় আগে-পিছে ভীষণ অন্ধকার। দূরে আলো একটা দেখা যায় বটে,—এই অন্ধকারে ঐ আলোটুকুই একমাত্র আশা—অসহায়ের সান্ত্বনা।

একটা ঢেউর বাড়ি খাইয়া নৌকাটা প্রায় উল্‌টাইয়া গিয়াছিল—বুলু আর অনিল একসঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল। অমরেশবাবু বৃষ্টির মধ্যেই বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন,—তোমার মৎলবখানা কী? কেন তুমি পারে না নিয়ে মাঝ-নদীতে নৌকো আনলে?

বুলু কহিল,—মারো না ব্যাটাকে। হাতের লাঠি গাছটা ব্যাটার মাথায় বসিয়ে দাও না আচ্ছা করে'।

অনিল বুলুর চুল টানিয়া দিয়া কহিল,—চুপ কর্ বুলু। সবতাতে তুই কেন আসিস কোঁপরদালালি করতে? মাঝিকে মারলে নৌকা কে বাইবে শুনি?

মাঝি আবার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কথার কোনো উত্তর না পাইয়া অমরেশবাবু খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রাগিয়াই বা তিনি কী করিতে পারেন? এই উদ্দাম ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে বিস্তীর্ণ নদীর উপর কে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে? চীৎকার করিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না। ধারে-পারে কোথাও কোনো জনপ্রাণীর আভাস নাই—এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর সম্মুখে তাহাদের মত সখ করিয়া কেহ কখনও ভাসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল না।

নৌকা হঠাৎ কাৎ হইয়া পড়িল। সর্দার-মাঝি মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল,—বোধ হয় আর বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না বাবু—

দুই

তুমুল কান্নার রোল পড়িয়া গেল। মা বুলুকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আর্তকণ্ঠে ঈশ্বরকে ডাকিতে বসিলেন। অমরেশবাবু হায়-হায় করিতে করিতে দুই হাতে চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন। আর অনিল জামার দুই পকেটে হাত দুইটা ডুবাইয়া দিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। এমন দৃশ্য জীবনে সে আর দেখে নাই। এমন উন্মুক্ত ঝড় এমন বিশাল জল এমন ভীষণ অন্ধকার—দুই চক্ষু মেলিয়া তাহাই সে দেখিতে লাগিল।

নৌকাটা খানিক পরেই আবার সামলাইয়া উঠিল। মাঝিরা বেশ ওস্তাদ, সহজে হাল ছাড়িবার পাত্র নয়। অমরেশবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—কোনো রকমে পারে নিয়ে ফেল মাঝি, যা আমাদের আছে সব তোমাদের দিয়ে দেব।

সর্দার-মাঝি চাপা গলায় কহিল,—নিশ্চয়।

কিন্তু জল আর ফুরায় না। পার যে কোথায় তাহার কোনো ঠিকানা নাই। কমলাঘাটা বলিয়া যে-আলোটা মাঝি আগে দেখাইয়া দিয়াছিল তাহা হঠাৎ অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িল। অনিল আনন্দে লাফাইয়া উঠিল,—কমলাঘাটা এসে গেছে, মা।

কিন্তু ভালো করিয়া ঠাহর করিয়া দেখা গেল না, কোথা হইতে একটা পাৎলা ছিপছিপে ডিঙি ঢেউ ঠেলিয়া কাছে আসিয়া ঠেকিয়াছে। কাঠের একটা বাক্সের মধ্যে একটা কুপি জ্বলিতেছে। দূর হইতে এতক্ষণ ঐ আলোটাই দেখা যাইতেছিল।

আরেকখানা নৌকা দেখিয়া অমরেশবাবুরা কিছু আশ্বস্ত হইলেন। বিপদ যতই ভয়ঙ্কর হোক্, সেই বিপদে সঙ্গী পাইলে মানুষের খানিকটা আরামবোধ হয়। তাহাদের সাহায্য করিতে ভগবান হয় ত' কাহাকেও পাঠাইয়া দিয়াছেন।

আশ্চর্য্য, দেখিতে-দেখিতে ঝড়টা পড়িয়া গেল। নদীও অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। বুলু কহিল,—এত করে' প্রার্থনা করলে ভগবান কি না শুনে পারেন ?

মা বলিলেন,—বলতে নেই ও-কথা। আরো ডাক তাঁকে।

—কিন্তু মা, সিল্ক্এর দামী ফ্রকটা একেবারে গেল। দেখ চুলের রিবনটার কী হয়েছে। ভারি শীত করছে যে। এখন একটাও শুকনো কাপড় পাব না। মুন্সিগঞ্জের ওরা সব কী ভাবছে ?

নৌকাটা থামিল। সদ্য-আগত ডিঙি হইতে কে-একজন এই নৌকার মাঝিকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল,—তামাক আছে ? এক ছিলিম দে না সেজে। শীতে কাঁপছি ঠক ঠক করে'—

সর্দার-মাঝি উত্তর দিল,—আছে বৈ কি ? কে, সনাতন না ? আয়।

সনাতন ডিঙি হইতে নৌকায় লাফাইয়া উঠিল। ছইয়ের ভিতরে চাহিয়া কহিল,—বা, বেশ ভালো সোয়ারিই পেয়েছিস দেখছি।

অমরেশবাবু অস্থির হইয়া কহিলেন,—এই বেলা ঝড়-বৃষ্টি একটু থেমেছে—শিগগির বেয়ে চল, মাঝি। কখন আবার আকাশ ভেঙে পড়ে ঠিক নেই।

সনাতন রুক্ষস্বরে কহিল,—দাঁড়ান বাবু, একটু সবুর করুন। বন্ধু-লোক এসে তামাক খেতে চাইছে, তাকে তামাক না দিয়ে নৌকো বাইতে হ'বে ? আব্দার! কল্‌কে বার কর্, সর্দার।

সর্দার-মাঝির নাম গণেশ। সে বুলুর মাকে বলিল,—দয়া করে' একটু গা তুলুন দিকি—পাটাতন সরিয়ে মাল-মশলাগুলি বা'র করিএকবার।

মা সরিয়া বসিলেন। এক ফালি তক্তা সরাইতেই তলায় কতগুলি ধারালো অস্ত্র অমরেশবাবুর চোখে পড়িল। ভয়ে তিনি আঁৎকাইয়া উঠিলেন। কোনো কথাই তাঁহার মুখে আসিল না।

বুলু ফ্রকটা চিপিতে-চিপিতে কহিল,—আমরা জলে ভিজছি আর ওঁরা তামাক ফুঁকে চাঙ্গা হচ্ছেন। পারে গিয়ে তামাক খাওয়া চলত না?

গণেশ সরাসরি বুলুর মার কাছে আসিয়া হাত পাতিয়া কহিল,—দিন্, —ঝড় থেমে গেছে—বক্‌শিস দিয়ে দিন্ এবার।

ভয়ে মা'র মুখ পাংশু হইয়া গেল। কহিলেন,—এখুনিই বকশিস্ কি? কমলাঘাটায় পৌঁছে দাও আগে।

গণেশ হাসিয়া বলিল,—আর কমলাঘাটা। সমস্ত রাত বাইলেও সেখানে আজ আর পৌঁছুনো যাবে না। অত হাঙ্গাম করে' কী হ'বে? সময় নেই আমাদের। দিন্,—গায়ের থেকে ভালয়-ভালয় গয়নাগুলো খুলতে থাকুন। খুকি, তোমার ঐ হার-ছড়াটা আমাকে বকশিস দেবে না?

নৌকার মধ্যে আবার একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। বুঝিতে আর কাহারও দেরি হইল না যে তাহারা ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে। নির্জন বিক্ষুব্ধ নদীতে—কোথায় কোন অপরিচিত জায়গায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে কে জানে—এই অন্ধকার রাত্রে শেষকালে তাহাদের ডাকাতের হাতেই প্রাণ হারাইতে হইবে।

গণেশ আবার কহিল,—দেরি করবার সময় নেই। দিয়ে দিন্ শিগগির। বাক্স-প্যাটরাগুলো ডিঙিটায় তুলতে থাক্, সনাতন। বিছানাটা? ওটা নদীতে ভাসিয়ে দে।

সনাতন অন্য একটা ছোকরার সাহায্যে ডিঙিটায় অমরেশবাবুদের সমস্ত মালপত্র তুলিয়া লইল। বিছানাটা দুই হাতে কাঁড়িয়া তাহার মধ্যে কিছু মূল্যবান্ জিনিস আছে কি না দেখিয়া লইয়া জলে ফেলিয়া দিল। বুলু চেঁচাইয়া উঠিল,—ওটার মধ্যে আমার যে স্কিপিং রোপ্‌টা ছিল, মা।

গণেশ বলিল,—মিছিমিছি কেন দেরি করছেন? শেষকালে যে গায়ে আমাদের হাত তুলতে হ'বে। বলিয়া গণেশ সত্য-সত্যই তাহার ডান হাতটা বুলুর মায়ের দিকে বাড়াইয়া দিল।

অমরেশবাবু তাঁহার লাঠিগাছটা তুলিয়া হাঁকিয়া উঠিলেন—খবরদার!

অমনি বজ্রের মত গণেশ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। কহিল,—ঐ একটা লাঠি নিয়ে কী আপনি ভয় দেখাচ্ছেন? আপনার একটা মাত্র লাঠি—আর আমাদের নৌকোর তলায় রাম-দা, কুড়ুল, খন্তা—এমন-কি একটা পিস্তল পর্য্যন্ত আছে। কাউকে সহজে খুন করতে আমরা চাই না, কিন্তু একটু-কিছু বাধা নিলেই দা তুলে ঘাড় বাড়িয়ে বেমালুম কোপ দিয়ে বসব। আর এক-কোপেই সাবাড়। বলিয়া আবার সে হাসিয়া উঠিল।

অমরেশবাবু চোখে-মুখে আর পথ দেখিলেন না। হাতের লাঠিটা নিস্পন্দ হইয়া রহিল। করুণ আর্তকণ্ঠে কহিলেন,—আমাদের তোমরা এমনি করেই মারবে নাকি?

গণেশ রাম-দাটা ততক্ষণে হাতে তুলিয়া লইয়াছে। মুখভঙ্গি করিয়া কহিল,—একেবারেই মারব না। গয়নাগুলো খুলে দিন, সামনের ঐ চরে আপনাদের পৌঁছে দেব। দেখতে পাচ্ছেন না ঐ চর? এমনি ঝড়ে ডুবলেও ত' জিনিস-পত্রগুলি আপনাদের যেত! আর, শুভেলাভে চরে যে পৌঁছে দেব তার জন্যে সামান্য ঐ গয়নাগুলো আমাদের বকশিস দেবেন না? তা কি হয়? দিন্। ঝড় পড়ে' গেছে—এখুনিই চার-দিক থেকে কাতারে-কাতারে নৌকো এসে পড়বে। দেরি করবেন না। বলিয়া গণেশ রাম-দাটা শূন্যে একবার চালনা করিল।

অগত্যা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মা গা হইতে গয়নাগুলি খুলিয়া দিতে লাগিলেন। কানের দুল দুইটি পর্যন্ত গণেশের চোখ এড়াইল না।

গয়নাগুলি কোঁচড় ভরিয়া তুলিয়া লইয়া গণেশ এইবার বুলুর দিকে অগ্রসর হইল। বুলু ভয় পাইয়া বাবাকে জড়াইয়া ধরিল। গণেশ কহিল,—কিচ্ছু ভয় নেই, খুকি। তোমাকে আমি মারব না, তোমার গলা থেকে হার ছড়াটা খুলে দিলেই আমি খুসি। বিয়ের সময় কত হার পাবে।

বুলু মাথা নাড়িয়া কহিল,—কক্‌খনো দেব না।

গণেশ কহিল,—না দিলেই ত' বিপদ। তোমার বাবার মুণ্ডুটা আলাদা হ'য়ে যাবে।

মা বললেন,—দিয়ে দে, বুলু।

সনাতন বলিল,—তোমার বাবা প্রাণে বাঁচলে কত হার গড়িয়ে দিতে পারবেন। তোমার মা দেখ ত' কত ভালো—চাওয়া-মাত্র দিয়ে দিলেন। কথা শোন খুকি, নইলে জলের মধ্যে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেব কিন্তু।

বুলু কিছুতেই হার দিবে না। সে মুখ ঝাম্‌টাইয়া বলিয়া উঠিল,—পথে আসতে এত করে' ওঁদের গুষ্টি-শুদ্ধ্‌ চিঁড়ের মোয়া, ডাবের জল খাওয়ানো হ'ল আর এখন কি না উলটে গয়না চাইতে এসেছেন!

গণেশ হাসিয়া বলিল,—সেই জন্মেই ত' নৌকোটা তখন নদীতে ডুবিয়ে দিই নি। পরের উপকার কিছু-কিছু আমরাও করতে জানি, খুকুমণি। এখন একবার এস ত' এদিকে।

বুলু বাবাকে আরো জোরে আঁকড়াইয়া ধরিল। গণেশ হঠাৎ বাঁ হাতে বুলুর গলা টিপিয়া ধরিল, নির্মম কণ্ঠে কহিল,—হার না ছাড়লে গলা টিপে মেরে ফেলব বলছি।

বুলু প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে মা-ও। অমরেশবাবু ধমক দিয়া উঠিলেন,—ছাড় গলা। হার খুলে দিচ্ছি।

গণেশ তবুও গলা ছাড়িল না, বুলুও সেই উদ্ধত হাতটাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া রক্তাক্ত করিয়া দিতেছে। মা গণেশের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছেন। গণেশ বলিতেছে,—হার না ছাড়লে এই দা তোমার মাথায় পড়বে।

মুহূর্তে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া অনিল বাবার হাত হইতে ছড়িটা তুলিয়া লইয়া তাহার মোটা মাথাটা দিয়া গণেশের মাথায় ভীষণ জোরে এক ঘা বসাইয়া দিল। অমনি চোখের পলকে সনাতন তাহাকে ঠেলা মারিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিল।

মা অবুঝের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বুলু এইবার অনায়াসে হার

ছাড়িয়া দিল। অমরেশবাবু ছেলেকে উদ্ধার করিবার জন্য জলে ঝাঁপাইতে যাইতেছিলেন, গণেশ বাধা দিয়া কহিল,—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। যা হরলাল, ছোঁড়াটাকে ডিঙিতে তুলে নে।

সনাতন বলিল,—যা বলেছিস। আসামের চা-বাগানে ছোঁড়াটাকে চালান দিয়েও ত' দু'পয়সা হ'তে পারে। বলিয়া কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সে-ও জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল!

—আর এই মেয়েটাকেই বা ছাড়ি কেন? বলিয়া সঙ্গের আরেকটা মাঝি—নাম হরলাল—সহসা বুলুকে পাঁজা কোলে করিয়া সামনের ডিঙিটার উপর লাফাইয়া পড়িল। বুলুকে সেই খানে রাখিয়া আবার আসিয়া সে নৌকার বৈঠা ধরিয়াছে।

বুলু অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া চিৎকার দিয়া উঠিল। সেই চীৎকারের প্রতিধ্বনি মিলিল মা ও বাবার সম্মিলিত আর্তকণ্ঠে। আর কোথাও কাহারো এতটুকু সাড়া মিলিল না।

নদী তখনো উত্তাল, শোঁ শোঁ করিয়া জোরে হাওয়া বহিতেছে—যেন কোন সন্তানহারা জননী তার হারানো সন্তানকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে—আকাশ পিচ্-এর মত আবার কালী করিয়া আসিল। আর দেখিতে দেখিতে অমরেশবাবু ও তাঁর স্ত্রীর চোখের সমুখ দিয়া পাৎলা ছিপছিপে ডিঙিটা তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি লইয়া উধাও হইয়া গেল।

শুধু বাক্স-প্যাট্‌রা নয়—তাঁহাদের দুইটি মাত্র সন্তান—অনিল আর বুলু। টাকা-কড়ি গয়না-পত্র সমস্ত উজাড় করিয়া দিয়াও তাহাদের ফিরিয়া পাওয়া গেল না।

—মাঝি, ওদের নিয়ে গিয়ে তুমি কী করবে? ওরা তোমার কাছে কী দোষ করেছে? দুই হাতে কপালে আঘাত করিতে-করিতে মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অমরেশবাবুর শোক করিবার সময় নাই। তিনি আঁজলা ভরিয়া জল তুলিয়া স্ত্রীর কপালে-মুখে ছিটাইতে লাগিলেন।

গণেশ খুব জোরে বৈঠা টানিতে লাগিল। সামনেই নতুন একটা চর

জাগিয়াছে, দেখিতে-দেখিতে নৌকা আসিয়া সেখানে ঠেকিল। গণেশ বলিল,—নামুন এবার নৌকো থেকে। ডাঙায় উঠে যত পারেন স্ত্রীকে সেবা করুন বসে' বসে'।

অমরেশবাবু মিনতি করিয়া কহিলেন,—ছেলেমেয়ের শোকে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন – কী করে' নামাবো?

গণেশ কহিল,– বেশ, আমি পায়ের দিকটা ধরছি, আপনি মাথার দিকটা ধরুন। এখুনি চোখ চাইলেন বলে'।

ধরাধরি করিয়া বুলুর মাকে নামানো হইল।

গণেশ কহিল,—এই লণ্ঠনটা রাখুন। পকেটে দেশলাই আছে আপনার? নেই? তবে নিন্ আমারটা। বৃষ্টিতে কিছু আর ওর আছে নাকি? বলিয়া অনেক কষ্টে সে একটা কাঠি ধরাইল।

অমরেশবাবু বলিলেন,—কী করব দেশলাই নিয়ে?

কী করব দেশ্‌লাই নিয়ে! গণেশ মুখভঙ্গি করিয়া উঠিল, তাও আমাকে বলে' দিতে হ'বে নাকি? কী বুদ্ধি আপনার! নইলে কি কমলাঘাটা আসতে আউটসাহি আসেন? নতুন মানুষ, সঙ্গে একটা চেনা লোক নিয়ে আসতে নেই? যাক্, লণ্ঠনটা জ্বালুন। না, তাও আমাকে জ্বেলে দিতে হ'বে?

অমরেশবাবু ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

গণেশ বলিল,—লণ্ঠনটা জ্বেলে হাতে করে' শূন্যে নাড়তে থাকুন। ঐ রকম নাড়তে থাকলে নৌকোর মাঝি কেউ বুঝতে পারবে যে ভীষণ কোনো বিপদে পড়েছেন। সাহায্য করতে আসতে পারে। নিন্, আমার সময় নেই। ডিঙিটা গিয়ে ধরতে হ'বে।

অমরেশবাবু লণ্ঠনটা হাতে লইয়া মিনতি করিয়া কহিলেন,—কিন্তু ওদের ওরা নিয়ে গেল কেন? ওদের তুমি ফিরিয়ে দিয়ে যাও, তোমাকে আরো অনেক টাকা দেব—যা তুমি চাও।

গণেশ ততক্ষণে তার নৌকাতে গিয়ে বসিয়াছে। বৈঠায় টান মারিয়া কহিল,—টাকার কথা বলবেন না, হয়ত রাত বেশি হ'লে আবার একবার ডাকাতি করতে আসবো। এখন স্ত্রীকে কোনোরকমে ভালো করে' তুলুন।

মূর্চ্ছার মধ্যেই মা গোঙাইয়া উঠিলেন,—ওদের তুমি ফিরিয়ে দিয়ে যাও, মাঝি।

গণেশ বৈঠা টানিতে-টানিতে কহিল,—বাড়ি ফিরে যদি পুলিশে না খবর দেন ত' ছেলে-মেয়ে আপনাদের একদিন ফিরে আসতেও পারে। আর যদি দেখি পেছনে আমাদের পুলিশ লেগেছে তা হ'লে ওদের কাটামুণ্ডু দুটো একদিন আপনাদের বাড়িতে গিয়ে উপহার দিয়ে আসবো। মনে থাকে যেন—বলিয়া নৌকা লইয়া সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

আকাশে আবার দুর্য্যোগের নূতন আয়োজন সুরু হইয়াছে। অমরেশবাবু লণ্ঠন তুলিয়া শূন্যে দুলাইতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও কোথাও দেখা গেল না।

শুধু নদী ও মাঠ ভেদ করিয়া দুইটি অসহায় শিশুর ক্ষীণ স্বর তাঁহার কানে বাজিতে লাগিল।

তিন

সাঁ সাঁ করিয়া নোকা চালাইয়া গণেশ ডিঙিটা ধরিয়া ফেলিল। বলিল,—আটকাজুরির খালের মধ্যে দিয়ে পালাতে হ'বে। খোলা নদীতে বেশিক্ষণ আর থাকা নয় এখন। কোথা দিয়ে কে এসে পড়ে কিছু ঠিক নেই।

খালের মুখে ডিঙি ঠেলিয়া সনাতন কহিল,—প্রকাণ্ড দাঁও মারা গেছে আজ।

হরলাল কহিল,—ট্রাঙ্ক-বাক্স ত' সমস্তই—এমন কি দুটো জ্যান্ত প্রাণী পর্য্যন্ত শিকার করা গেছে। বলিয়া সে একবার অনিলের দিকে তাকাইল, কহিল,—কি বাছাধন, আর আসবে ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করতে?

পাল টাঙাইবার মোটা একটা কাছি দিয়া সনাতন অনিলের হাত-পা কোমর-গলা খুব আঁট করিয়া কসিয়া বাঁধিয়া তাহাকে এক কোণে ফেলিয়া রাখিয়াছে। পরণের জামা-কাপড় ছেঁড়া, খোলা নদীর উপর শীতে হি-হি

করিতে করিতে সে হাঁটু দুইটাকে বুকের মধ্যে গুটাইয়া একটা পুঁটলির মত গোল হইয়া পড়িয়া রহিল। একটা কথা বলিতে যাইবে কি অমনি মাথার উপর ডাণ্ডার বাড়ি মারিয়া মাথাটা তাহার গুঁড়া করিয়া দিবে বলিয়া সনাতন শাসাইয়াছে। চীৎকার করিয়া কোন লাভ নাই।

গণেশ বলিল,—কিন্তু ঐ মেয়েটাকে শুধু-শুধু তুলে আনলি কেন? ওকে আবার কোন কাজে লাগবে? তোদের যেমন সব বুদ্ধি!

সনাতন বলিল,—ছোঁড়াটা কাজে লাগলে ও-ই বা এমন ফ্যালনা হ'বে? ফৈজু-পেশোয়ারির কাছে বিক্রি করে' দিলে মোটা পয়সা পাওয়া যাবে। তালতলার হাটে ফজলকে সেই মনে নেই তোর? ঝুলির মধ্যে দেখি তার পাঁচ মাসের একটা মেয়ে। কোথা থেকে হাত সাফাই করে এনেছে। বললে, দাম পাবে নাকি পঁচিশ টাকা।

হরলাল বলিল,—পাঁচ মাসের মেয়ের দাম পঁচিশ টাকা হ'লে আট বছরের মেয়ের দাম কম করে' দুশো টাকা হ'বে। ফজলকে বললেই সে রাজি হ'য়ে যাবে। সে আমাকে তা বলছিলও সেদিন,—দু' একটা জ্যান্ত জিনিস আনতে পারিস না আমার জন্য? এই ব্যবসাই বা মন্দ কি গণেশ?

বুলুর হাত-পা খোলা, ডিঙিটার উপর বসিয়া এতক্ষণ সে মা মা বলিয়া তারস্বরে চেঁচাইতেছিল, কিন্তু হরলালের এক প্রচণ্ড চড় খাইয়া তাহাকে কান্না থামাইতে হইয়াছে। ভয়ার্ত চক্ষু মেলিয়া সে মাঝিদের বিশাল চেহারার দিকে একবার তাকায়, আর মা'র কথা মনে করিয়া এক-এক বার ফুঁপাইয়া উঠে। কোথায় তাহারা চলিয়াছে,—মা-বাবা কোথায় তাহারা পড়িয়া রহিলেন, কী কুক্ষণেই তাহারা গ্রাম দেখিতে কলিকাতা ছাড়িয়াছিল! ভগবানকে ডাকিবার কথা বুলুর আর এক বারও মনে হইল না। এত ডাকিবার পর তিনি কি না ডাকাত হইয়া তাহাদের সমস্ত কিছু লুট করিয়া নিলেন!

গণেশ বুলুর দিকে তাকাইল—অন্ধকারে সে-মুখের আভাসে কি একটা অস্পষ্ট স্মৃতি তাহার বুকের মধ্যে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বছর পাঁচেক আগে এ-অঞ্চলে যে ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছিল তাহাতে তাহার ঘর-বাড়ি

গোয়াল-গরু সমস্ত কিছু জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও বুকে তাহার তিন বছরের কচি মেয়ে টগর। জোয়ান গণেশ ভাসিতে ভাসিতে একটা গাছের উপর আশ্রয় পাইয়া রক্ষা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু বিশাল জলরাশির মধ্যে তাহার স্ত্রী ও মেয়ের চিহ্নটুকুও কোথাও আর খুঁজিয়া পায় নাই। ভাগ্য তাহাকে যে নির্মম আঘাত দিয়া পথে বসাইয়াছে গণেশ ঠিক তাহার প্রতিশোধ নিতেই হাতে খড়্গ বল্লম সড়কি পিস্তল বর্শা নিয়া ডাকাত সাজিয়াছে। চোখে তাহার জল নাই, মনে মমতার এতটুকু বাষ্প নাই—সে বজ্রের মত কঠিন। কিন্তু মাতৃহারা বুলুর মলিন মুখখানির দিকে চাহিয়া এতদিন বাদে বুকটা তার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। হাতের বৈঠা হঠাৎ শিথিল হইয়া পড়িল।

গণেশ কহিল,—না, হাতে ধরে' মেয়ে আমি কাউকে বেচতে পারবো না ককৃখনো।

সনাতন বলিল,—তবে কী করবি এ মেয়ে নিয়ে?

গণেশ গম্ভীর হইয়া বলিল,—তাই ত' ভাবছি। কেন যে শুধু-শুধু এই হাঙ্গামা বাধালি?

বুলু কখন নদীর জলে পা ডুবাইয়া বসিয়াছে। অন্ধকারে তার বড়ো বড়ো চক্ষু দুইটি মণির প্রদীপের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল,— আমাকে তার চেয়ে মা'র কাছে রেখে এস না। হার ত' আমার কেড়েই রেখেছ, আমাকে ধরে' নিয়ে গিয়ে কী করবে?

হরলাল দাঁত বাহির করিয়া বলিল,—তোমাকে কেটে-কুটে কালিয়া রেঁধে খাব।

পা দিয়া জল ছিটাইতে ছিটাইতে বুলু কহিল,—সে ত' অনেক দেরি। তার আগে আমাকে কিছু খেতে দাও না। সেই কোন দুপুরে চারটি ভাত খেয়ে বেরিয়েছিলাম। চিঁড়ের মোয়াগুলো ত' তোমরাই সব সাবাড় করলে। এখন কি না আমার মাংস খেতে চাও! আর আমার বুঝি খিদে পায় নি?

বুলুর কথা শুনিয়া মাঝিরা হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। নদী ছাড়িয়া নৌকা

দুইটা তখন আটকাজুরির খালে পড়িয়াছে। খালটা সঙ্কীর্ণ বটে, কিন্তু শানানো ছুরির ফলার মত ধারালো স্রোত। দুই পারে ঘন বন—অন্ধকার আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া আছে। এই বিশাল অরণ্যের কারগার হইতে হাওয়া যেন বাহিরে আসিবার পথ পাইতেছে না, দিকে-দিকে অন্ধ আর্তনাদ করিতেছে। বুলুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ডাকিল, দাদা!

অনিল সাড়া দিল না। মড়ার মত পড়িয়া রহিল।

বুলু কহিল,—দাদাকেও খেতে দিয়ো চারটি। আমাদের এত সব জিনিস নিয়ে গেলে আর দু'টি ভাত খেতে দেবে না? এ ও কি হয়?

গণেশ বাঁ হাতে তার কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল। মন তাহার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। যতই সে ভাবে শিশুর এই প্রলাপে সে কান পাতিবে না, ততই তার মন উদাস হইয়া উঠিতে থাকে। কি যে করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারে না।

হরলাল বলিল—সোনার থালায় করে' তোমাদের দু'জনকে রাজভোগ খেতে দেব, চলো না।

হরলাল বলিল যে ঠাট্টা করিতেছে তা বুলু বুঝিল,—তবে আমাদের দু'জনকে উপোস করিয়ে রাখবে? তোমরা সবাই মিলে ফুর্তি করে' খাবে-দাবে, আর আমাদের দেখে তোমাদের মায়া হবে না?

সনাতন হুঁকা সাজাইয়া টান দিতেছিল। মুখ তুলিয়া কহিল,—মায়া না হাতী! বল্লাম না দু'জনকে কেটে-কুটে কালিয়া বানাবো। বুলু কহিল,—মানুষের মাংস বুঝি মানুষে কখনো খায়? এমন কথা বইয়ে ত' কোনদিন পড়ি নি।

গণেশ আগ্রহের সঙ্গে কহিল,—তুমি আবার বই পড়তে পারো নাকি খুকি?

কথার সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড়ের উপর হইতে বব্‌ড্‌-করা চুল দুলাইয়া বুলু কহিল,—আজ্ঞে হাঁ, দস্তুরমতো সেভেন্‌থ্‌ ক্লাশ—বাবা মিছিমিছি এক ক্লাশ নীচে ভর্তি করে' দিলেন। তা, তোমরা যদি আমাকে ছেড়ে দাও—আমি এবার ঠিক ডবল প্রমোশন্‌ নেব।

মাঝিদের কাহারো মুখে কোন কথা আসিল না।

বুলু ঘাড় হেলাইয়া কহিল,—শুধু বই পড়া-ই নয়—আমি আবার এস্রাজ বাজাতে পারি। জান না বুঝি? রোজ শুক্রবার আমাদের গানের ক্লাশ। ঐ যে কাঠের বাক্সটা নিয়ে যাচ্ছ ওটার মধ্যেই ত' আমার এস্রাজ—দাদার এয়ার-গান—সব আছে। চাবি ত' আর মা'র আচল থেকে বুদ্ধি করে' নিয়ে আসো নি—নইলে বাক্সটা খুলে দু'টো তোমাদের গৎ শুনিয়ে দিতাম।

গণেশ অনেক ডাকাতি করিয়াছে, খুন জখম করিতে কোনদিনই তার হাত কাঁপে নাই, দাঙ্গা-লড়াইয়ে সে একজন সেরা ডাকসাঁইটে গুণ্ডা—দস্যু-জীবনে এমন উৎপাত জুটে নাই কখনো। আজ তাহার নিজেকে তাহার কেমন যেন অবসন্ন বোধ হইল। চোখ দুইটা ছলছল করিয়া উঠিল। সে হঠাৎ হাতের বৈঠাটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল,—চাড় দিয়ে বাক্সের ডালাটা খুলে-ফেলতে কতক্ষণ? এস্রাজ তুমি বাজাবে খুকি?

বুলু মুখ বাঁকাইয়া কহিল,—আহা, কী আব্দার তোমার! মা-বাবাকে এই জল-কাদার মধ্যে কোথায় কোন্ জঙ্গলে রেখে এলে, দড়ি দিয়ে দাদার হাত, পা বেঁধে রেখেছে, আমাকে কিছু খেতে দিচ্ছ না—আর আমি কি না বসে'-বসে' তোমাদের এস্রাজ বাজিয়ে শোনাব!

সনাতন হুঁকায় টান মারিয়া কহিল,—কথায় দেখছি ধুরন্ধর! সহরের মেয়ে কি না।

বুলু জল নিয়া খেলা করিতে করিতে বলিল,—তোমাদের বাড়ি আর কতদূর?

গণেশ বলিল,—আরো মাইল দুয়েক। জলে পা ডুবিয়ে বোস না, খুকি পড়ে যাবে।

বুলু কহিল,—বাড়ি নিয়ে গিয়ে মাংস কেটে কালিয়া করে' খাবে, তার আবার অত দরদ কিসের? হোক না অসুখ। অসুখ করলে দেখব কেমন কেটে ফেলতে পারো। তখন নিজেরাই ডাক্তার আনতে ছুটোছুটি করবে। মাকে কাছে না পেলে আমি ভালোও হ'ব না। দেখবে তখন মজা! ঠিক হ'বে। থাকবোই ত' পা ডুবিয়ে।

গণেশ হাত বাড়াইয়া বলিল,—আমার কাছে এসে বোস।

বুলু চোখ বড়ো করিয়া বলিল,—ও বাবা, তোমার যেমন গোল-গোল চোখ, খ্যাংরার মত গোঁফ, কেলেকুষ্ঠি চেহারা—সামনে গিয়ে বসি, আর তুমি আমাকে মুখে পুরে আস্তো গিলে ফেল আর কি!

গণেশ হাসিয়া বলিল, না, না, তোমার কিছু ভয় নেই। আমাদের, বাড়ি চলো, তোমাকে কত জিনিস খেতে দেব দেখো। জামরুল, বাতাবি নেবু, ছানা, সরভাজা—কত কি!

—ছাই! ওতে পেট ভরবে নাকি? ভাত দেবে না? ইলিশমাছ ভাজা দেবে না?

—তাও দেব।

ঠোঁট উল্‌টাইয়া বুলু কহিল—ভারি দেবেন! সমস্ত টাকা-কড়ি গয়না-গাঁটি কেড়ে নিয়ে একখানা ইলিশ মাছ ভাজা দেবেন। দাদাকেও দেবে ত'? ঠিক?

গণেশ ঘাড় হেলাইয়া বলিল,—দাদাকেও।

বুলু জোর গলায় কহিল,—তবে ওকে অমনি বেঁধে রেখেছ কেন? ওর লাগে না বুঝি? তোমাকে যদি পুলিশে অমনি বেঁধে রাখে?

গণেশ বলিল,—ও তবে শুধু শুধু আমার মাথায় লাঠির বাড়ি মারলে কেন? দেখ দিকি এখানটা আমার কেমন ফুলে আছে।

বুলু মুখ ভ্যাঙচাইয়া কহিল,—শুধু-শুধু বই কি। উনি আমার গলার গলা টিপে ধরে' হার ছিনিয়ে নিতে চাইবেন, আর ও তোমাকে রসগোল্লা খেতে দেবে! তোমার মাথা ত' একটা লোহার কড়া, ওটায় লাঠি মারলে লাঠিই ভাঙবে। আর দেখ দিকি গলাটা আমার কেমন খিম্‌ছে দিয়েছ! কি ভীষণ জ্বালা করছে দেখ ত'! দুষ্টুমি করলে মাষ্টাররা পর্যন্ত গায়ে হাত তোলে না, আর তুমি কি না নোখ দিয়ে রক্ত বার করে' দিলে!

গণেশ বলিল,—তুমি তবে হার ছেড়ে দিলে না কেন?

—দিয়েছি ত'। তবে এখন আবার আমার হার ফিরিয়ে দাও।

আমাকেই ত' ধরে' নিয়ে যাচ্ছ, গলায় আমার হার থাকলে এখন ক্ষতি কি ? আমি ত' আর পালাচ্ছিনে।

ট্যাঁক হইতে সোনার সরু হার-ছড়া বাহির করিয়া হাসিমুখে গণেশ বলিল,—এস এস খুকুমণি, কাছে সরে' এস। পরিয়ে দি।

এক মুহূর্ত বুলু চুপ করিয়া কি ভাবিল। কহিল,—আগে তবে দাদার বাঁধন খুলে দাও, তবে হার পরবো।

গণেশ হুকুম করিল,—দড়িটা খুলে দে, হরলাল।

হরলাল দড়ির গিঁট খুলিতে খুলিতে কহিল,—মেয়েটার কথায় মন যে তোর ভিজে গেল, গন্‌শা। কি করবি তুই ওদের নিয়ে ?

গণেশের হঠাৎ যেন চেতনা হইল। সে এতক্ষণ আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধের মত মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করিয়া যাইতেছিল। হরলালের কথা শুনিয়া সে খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল। সত্যিই উহাদের নিয়া সে কী করিবে ? ছেলেটাকে অনায়াসে সে চা-বাগানে চালান দিতে পারিবে, কিন্তু মেয়েটাকে সে কোথায় পার করিবে শুনি ? বলা কহা নাই, হরলাল যে মেয়েটাকেও আনিয়া নৌকায় তুলিবে গণেশ তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। এমন মেয়েকে বেচিবার মতলব হরলালের মনে কি করিয়া আসিল ? ঘাড় পাতিয়া মিছিমিছি এই ঝক্কি সে নিতে গেল কেন ?

তাহা ভাবিয়া এখন ফল হইবে না। যা হোক একটা ব্যবস্থা কিছু করিতেই হইবে। গণেশ বুলুর মুখের দিকে আরেকবার তাকাইল। কিন্তু বুলুর সরল নির্ভয় ও বিশ্বাসপরায়ণ চোখ দুইটির পানে তাকাইয়া তাহার বুদ্ধি ঘুলাইয়া উঠিল। এই মেয়েকে সে কোথায় লইয়া যাইবে, কাহার কাছে আশ্রয় দিবে, মেয়েটি কোনোদিন বিদায় লইয়া যাইতে চাহিলে সহজে সে তাহাকে ছাড়িয়াই বা দিতে পারিবে কি না।

অনিল বাঁধন ছাড়া পাইয়া তক্তার উপর উঠিয়া বসিল। শরীরের মাংসপেশীগুলিতে নিদারুণ ব্যথা করিতেছে, পিপাসায় গলা কাঠ হইয়া আছে, কিন্তু ভয়ে সে একটা কথাও বলিতে পারিল না। এতক্ষণ সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, বুলু যে ইহার মধ্যে ডাকতদের সঙ্গে ভাব করিয়া

ফেলিয়াছে তা সে টের পায় নাই। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া বুলু তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া সহজ স্বরে কহিল,—তোর খুব লেগেছে দাদা? কোথায়? বল্ না, আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

পাছে ডাকাতরা এই অসৌজন্যের জন্য হুঙ্কার দিয়া উঠে সেই ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া অনিল সরিয়া গেল। বুলু বলিল,—বল্ না, কোথায় লেগেছে, হাত বুলিয়ে দিলে ডাকাতরা কিছু বলবে না, দাদা। বলবে নাকি তোমরা? দাদা এখানে শু'ক্, আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দি। বৃষ্টি ত' এখন থেমে গেছে—ঐ মাদুরটা পেতে দাও না।

গণেশ তক্ষুনি মাদুর পাতিয়া দিল। বলিল,—শোও খোকা।

বুলু কহিল,—দেখলি কেমন ওরা ভালো লোক। বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমাদের পেট ভরে' কত খেতে দেবে বলেছে, গদির ওপর নরম বিছানা করে' দেবে, পড়বার জন্যে আলো দেবে,—দেবে না মাঝি? মাকে চিঠি লিখবার জন্যে টিকিট কিনে দেবে ত'?—দেখলি, সব দেবে। খুব ভালো ওরা। এবার শো। সেই বমির ভাবটা সেরে গেছে ত' এখন?

অনিল তবুও বিমূঢ়ের মত শূন্যে চাহিয়া রহিল। বুলুর এই অনর্গল কথায় ডাকাতরা একটুও প্রতিবাদ করিতেছে না, বরং তাহাকে যেন প্রশ্রয় দিতেছে। উহাদের মুখে আগেকার সেই নিষ্ঠুর কাঠিন্য নাই, কেমন যেন একটা প্রসন্নভাব। বুলুর কথা শুনিয়া মুচকি-মুচকি হাসিতেছে, এমন একটা পরিবর্তন কি করিয়া ঘটিতে পারে অনিল ভাবিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। হয়ত এই কৃত্রিম ভালোমানুষির পিছনে কোন ক্রুর মতলব আছে। নিশ্চয়ই। উহারা ত' ছেলেখেলা করিবার জন্য উহাদের ধরিয়া আনে নাই।

বুলু গলা উঁচু করিয়া কহিল,—দাদাকে যে ধরে' নিয়ে যাচ্ছ তোমাদের ওখানে ইস্কুল আছে? কোথায় তবে ওকে পড়াবে শুনি? আমি মেয়ে—না হয় বাড়িতে বসে' পড়লাম, কিন্তু দাদা নতুন য়্যালজেব্রা শিখছে—তোমরা শেখাতে পারবে না হাতী! আট-আষ্টে কত হয় বলো দিকি? বলিয়া বুলু খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গণেশ আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে হঠাৎ চঞ্চল হইয়া কহিল,—তোরা ছেলেটাকে নিয়ে এগো, আমি খুকিকে তার মায়ের কাছে রেখে আসছি। ওরা নিশ্চয়ই এখনো সেইখান থেকে নড়ে নি। ডাকাতে-নৌকো ছাড়া ও-তল্লাট কেউ মাড়ায় না—

সনাতন অবাক হইয়া কহিল,—তুই পাগল নাকি, গণেশ ?

হরলাল বলিল,—এখন আস্তে-আস্তে অনেক নৌকো বেরুচ্ছে—কে জানে খবর পেয়ে রিভার-পুলিশের দল হানা দিতে বেরিয়ে পড়েছে চার দিকে·—ধরা পড়ে' তুই ত ডুববিই, দল-কে-দল লোপাট হ'য়ে যাবে। ঐ মেয়েটার জন্যে ভাবিস কেন ? সামনের অমাবস্যা-রাত্রে চণ্ডীর মন্দিরে যে একটা নরবলি দিতে হ'বে মনে নেই ?

চুল হইতে পায়ের নখের ডগা পর্যন্ত গণেশের কাঁটা দিয়া উঠিল। উহাদের কথা উপেক্ষা করিয়া সে বুলুকে কহিল,—যাবে খুকি মায়ের কাছে ফিরে ?

বুলু খুসিতে লাফাইয়া উঠিল,—দাদা ? দাদাকেও সঙ্গে নেবে আমাদের ?

গণেশ বলিল,—না। ওসব কেন ? ও নয়—তুমি একলা চলো। তোমাকে আমাদের দরকার নেই। তোমাকে কোথায় রাখব, কে তোমাকে দেখবে ?

বুলু বলিল,—দাদাকেই বা কে দেখবে শুনি ? মা সঙ্গে না থাকলে কে ওর জামায় বোতাম, জুতোয় কালি লাগিয়ে দেবে শুনি ? দাদাকে না নিলে কক্‌খনো আমি যাবো না—না, কক্‌খনো না। আমি কাছে না থাকলে কে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে ? আমি চলে' গেলে ও কাঁদবে না একা-একা ?

বুলু অনিলের গা ঘেঁসিয়া সরিয়া বসিল, ফের কহিল,—আমাদের দু' জনকেই মা-বাবার কাছে রেখে এস। হার আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

তোমার ঠিকানা দাও মাঝি, বড়ো হ'য়ে আমি যখন লেডি-ডাক্তার হ'ব

তখন তোমাকে আরো দু'ছড়া হার পাঠিয়ে দেব। মুক্তোর নেক্‌লেস। তোমার মেয়েকে পরতে দিয়ো। কেমন?

গণেশ দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া ডাকিল,—এস, তোমাদের দু'জনকেই ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

সনাতন গর্জিয়া উঠিল,—তুই ক্ষেপ্‌লি নাকি? আবার য়্যাদ্দুর পাড়ি দেওয়া? মায়া যে আর ধরে না দেখছি।

গণেশ বলিল,—কী করব তবে ওদের নিয়ে?

হরলাল কহিল,—তার চেয়ে ছুঁড়িটাকে জলের মধ্যে ফেলে দে না। মাক ভেসে যেখানে খুসি। ছোঁড়াটার জন্যে ভাবনা কি? কচি মুণ্ডুর রক্ত পেলে মা-কালী খুসি হ'বেন।

ঠিক—মেয়েটাকে সে জলের মধ্যেই ছুঁড়িয়া দিবে। তাহা হইলেই এক নিমিষে সমস্ত চিন্তা-ভাবনার সমাধান হইয়া যাইবে। একটা এক-ফোঁটা পুচকে মেয়ের মিষ্টি কথা শুনিয়া সে গলিয়া যাইতে বসিয়াছে। ইহার চেয়ে কত নৃশংস কাজ সে করিয়াছে—সেবার ট্রেনে ডাকাতি করিতে যাইয়া কোন মা'র কোল হইতে ঘুমন্ত ছেলে ছিনাইয়া লইয়া জান্‌লা দিয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া দিয়াছিল, বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া কত বাড়ি সে পুড়াইয়া দিয়াছে—ভিতরে মিলিত শিশুকণ্ঠের কাতর আর্তনাদেও সে বিচলিত হয় নাই—আর আজ কোথাকার কে একটা একরত্তি মেয়েকে জলে ঠেলিয়া ফেলিতে তার হাত উঠিবে না।

মেয়েটাকে দূর করিয়া না দিলেও বা তার পথ কোথায়? উহাকে সারা জীবন তাহার ঘাড়ে করিয়া বেড়াইতে হইবে নাকি? মায়ায় পড়িয়া শেষকালে ডাকাতি ছাড়িয়া সে সন্ন্যাসী সাজুক আর কি! একটা তুচ্ছ মেয়ের কাছে কখনই গণেশ হার মানিবে না।

একবার করুণ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবে, হয় তো ঢেউয়ের উপর কচি-কচি দুইটি কোমল মুঠি তুলিয়া একবার মাকে আহ্বান করিবে—কিন্তু অতল জল ছাড়া কেহই তাহাকে আশ্রয় দিতে আসিবে না—তার পর সব চুপচাপ, আকাশ ভরিয়া মেঘের তেমনি গুরুগুরু, বন কাঁপাইয়া

হাওয়ার তেমনি সোঁ সোঁ আওয়াজ। এক মুহূর্তে সব শেষ হইয়া যাইবে।

গণেশ ভালো করিয়া কোমর বাঁধিল। বলিষ্ঠ দেহের পেশীগুলো স্ফীত হইয়া উঠিল, চক্ষু দুইটা আগুনের গোলার মত ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে।

বুলু তাড়াতাড়ি ডিঙির ধারে সরিয়া আসিয়া তেমনি পা দিয়া জল ছিটাইতে ছিটাইতে কহিল,—আমাকে জলে ফেলে দেবে, মাঝি? আর দাদা?

গণেশ ক্ষণেকের জন্য থামিল। অনিলও তাড়াতাড়ি ধারে সরিয়া আসিয়া কহিল,—আমিও তা হলে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

গণেশ গর্জিয়া উঠিল,—ধর ছোঁড়াকে। ওটাকে চণ্ডীর কাছে বলি দিতে হ'বে, আর মেয়েটাকে লাথি মেরে দেব জলে ঠেলে। জয় মা চণ্ডিকে। বলিয়া গণেশ নৌকা হইতে ডিঙিটার উপর বাঘের মত লাফাইয়া পড়িল।

হরলাল হাতের কাছে পাইয়া অনিলকে সাপটাইয়া ধরিল, কহিল,—কোথায় ঝাঁপ দেবে বাছাধন? জলে নয় চাঁদ্, মা-কালীর কাঠগড়ায়।

—রাখ ওটাকে শক্ত করে' ধরে'। গণেশ হুঙ্কার দিয়া উঠিল।

বুলু কাঁদ কাঁদ গলায় কহিল,—হ্যাঁ, দাদাকে ফেলে দিয়ো না। দাদা বড়ো হ'লে এরোপ্লেনে চড়ে' বিলেত যাবে—কতদেশ ঘুরে এসে মাকে গল্প শোনাবে—ওকে ফেলে দিয়ো না, মাঝি। পরে অশ্রু-ভরভর ব্যথিত চোখ দুইটি গণেশের মুখের পানে তুলিয়া সে আবার বলিল,—দাদা বড্ড কাঁদছে, ওকে আমি একটু বুঝিয়ে বলি। আর একটুখানি দাঁড়াও না,—একটুখানি তুমি এত ভালো। জল ত' আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

গণেশ বিশাল দেহ মেলিয়া পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আলগোছে সরিয়া দাঁড়াইল। বুলু অনিলের কাছে সরিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল,—তুই কাঁদছিস কেন দাদা? আমাকে জলে ফেলে দিলে ঠিক ভাসতে-ভাসতে আমি চরে গিয়ে ঠেকব—যেখানে মা-বাবা লণ্ঠন জ্বালিয়ে আমাদের জন্যে বসে' আছেন। তোকে ফেলে দেয়নি শুনে তাঁরা কত সুখী হবেন বল্ ত'?

হরলালের কর্কশ মুষ্টির থেকে ছাড়া পাইবার জন্য অনিল নিস্ফল চেষ্টা করিতেছে আর মর্মভেদী কাতর স্বরে বলিতেছে—না, আমাকে বুলুর সঙ্গে জলে ঠেলে দাও। ওর সঙ্গে ভাসতে-ভাসতে আমিও যাব মা'র কাছে। আমিও।

হরলাল তাহাকে শক্ত করিয়া তক্তার সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—থাম্ শূয়োর। একগুঁয়ে কোথাকার।

বুলু কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল,—দাদাকে মারছ কেন? আমি চলে' গেলে দাদাকে তোমরা মেরো না, মাঝি। ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে' দিয়ো। দেখো ঠিক ও ফার্স্ট হবে। বাড়ি নিয়ে গিয়ে ওকে খেতে দিতে ভুলো না যেন।

পরে গলার হার-ছড়া খুলিয়া ফের বুলু বলিল,—নাও। ও নিয়ে আর আমি কি করব?

সনাতন হাত বাড়াইয়া কাড়িয়া লইল। গণেশ গর্জিয়া উঠিল,—না, থাক্ গলার হার। খবরদার, ছুঁসনে সনাতন।

বুলু কহিল—তার চেয়ে ট্রাঙ্ক থেকে আমাকে শুকনো একটা ফ্রক বার করে' দাও না মাঝি। বৃষ্টিতে এটা একদম ভিজে গেছে। আমার ভারি শীত করছে যে। জল লাগলে আরো শীত করবে। কাঠের বাক্সটার মত ট্রাঙ্কটাও ভেঙে ফেল না।

গণেশ নিঝুমের মত দাঁড়াইয়া আছে।

—দাও না। ট্রাঙ্কে মা'র অনেক স্নো-পমেটমও দেখতে পাবে। যাবার আগে তা-ও একটু মেখে যাই না। কেন আর দেরি করছ? দাদা যে খালি কাঁদছে—

গণেশের কঠিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ক্রমে-ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, মূর্চ্ছিতের মত সে ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া দুই ব্যগ্র হাতে বুলুকে জড়াইয়া ধরিল, ধরা গলায় কহিল,—চল খুকুমণি, তোমাকে সুন্দর করে' সাজাব চল।

ঝাঁঝালো গলায় হরলাল কহিল,—আবার তুই গলে' গেলি নাকি?

সে কথায় কান না দিয়া গণেশ বুলুকে আরো কাছে আকর্ষণ করিয়া কহিল,—জল থেকে পা তোল—মার ট্রাঙ্কে তোমার জুতো নেই ?

বুলু ঘাড় ফিরাইয়া গণেশের চোখে জল চিকচিক করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। কহিল,—দাদাকে আগে ও ছাড়ুক, তবে পা তুলবো।

গণেশের কঠোর চাহনির ইঙ্গিত পাইয়া হরলাল অনিলকে ছাড়িয়া দিল।

সনাতন বলিল,—হ্যাঁ মিছিমিছি জলে ফেলে দিয়ে লাভ কি ? ফজলুর হাতে ছেড়ে দিলে বরং কিছু ঘরে আসবে।

গণেশ বুলুর চুলে হাত বুলাইতে-বুলাইতে সায় দিয়া কহিল,—হ্যাঁ, তাই ভালো। তাই ভালো, না খুকুমণি ?

বুলু হাসিয়া বলিল,—ফজলু ? কে সে ? খুব ফজলি আম খেতে দেবে বুঝি আমাদের ? বাঃ, তবে ত' ভালই হ'বে।

চার

অনেক খাল-নদী পার হইয়া কোথা দিয়া কোথায় আসিয়া যে নৌকা লাগিল অনিলের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। পাড় হইতেই জঙ্গল সুরু হইয়াছে—সে-অরণ্য যেমনি গভীর ও ঘন, অন্ধকারও তেমনি। দুই চোখের পাতা শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিয়া যদি ভাবা যায় ইহজীবনে চোখ আর খুলিবে না—এই অন্ধকারই চিরকালের জন্য অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে—তেমনি অসহায়ের মত অনিল সেই দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া হাঁপাইয়া উঠিল।

গণেশ আগে নামিল। কহিল,—এবার খানিকটা হাঁট্‌তে হ'বে খুকি।

বুলু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—এই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ? বল কি ? কুমীর ছেড়ে বাঘে এবার খেতে আসুক আর-কি।

গণেশ কহিল,—না, না, তোমাকে আমি কাঁধে করে' নিয়ে যাবো। এস।

গণেশের হাত ধরিয়া বুলু নামিয়া আসিল। কহিল,—আর দাদা?

—ও ওদের সঙ্গে আস্‌বে'খন। আমি এগোই, সনাতন। গিয়ে মাধব আর গুপীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোরা জিনিষগুলি তোল্—এর পর আজকে আর বেরুবার কাজ নেই।

বুলু মাথা নাড়িয়া কহিল,—না, দাদাকেও কাঁধে না নিলে আমি যাবো না তোমার সঙ্গে।

গণেশ কহিল,—হ্যাঁ, দাদাকেও নেবে বৈ কি। দাদাকেও কাঁধে তুলে নিস, সনাতন।

সনাতন মাল-পত্রগুলি গুছাইতে-গুছাইতে কহিল,—হ্যাঁ, হাওয়া-গাড়ি করে' নেবে! পরে অনিলের পিঠে পা দিয়া জোরে এক ঠোক্কর মারিয়া কহিল,—নে, ছোঁড়া, আমাদের সঙ্গে জিনিষগুলো নামা। আবার আরেকটা লাথি মারিয়া কহিল,—লাথি খেয়ে শিরদাঁড়া মজবুত কর, আমাদের সঙ্গে মোট বইতে হ'বে।

বুলু ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেই গণেশ তাহাকে এক ঝটকায় কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অনিল চেঁচাইয়া উঠিল,—বুলু!

নিস্তব্ধ অরণ্যে তাহার কোন প্রতিধ্বনি মিলিল না। চোখের সম্মুখে বিরাটকায় অচল পর্বতের মত কঠিন অন্ধকার প্রকাণ্ড একটা হাঁ মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কতক্ষণ পরেই দুইটি ছেলে আসিয়া হাজির হইল। সনাতন কহিল,—এসেছিস, মাধব? বাদলা পেয়ে একচোট ঘুমিয়ে নিচ্ছিল বুঝি? পাড়ে বসে' পাহারা দিতে পারিস না?

ছেলে দুইটি নৌকার কাছে আসিতেই অনিল দেখিল ইহাদের বয়স অপেক্ষাকৃত কিছু কম। ইহাদের দেখিয়া তত ভয় করে না। ডাকাতিতে পাকিয়া ইহারা এখনো তত ঝুনা হয় নাই, মুখের ভাবে কোথায় যেন একটু কমনীয়তা আছে।

উহারা আসিতেই অনিলের মনে হইল বুলু তাহা হইলে নির্বিঘ্নে গিয়া

পৌঁছিয়াছে। সর্দার-মাঝির কাছে খবর না পাইলে তাহারা আসিল কি করিয়া?

মোট-ঘাট সব নামানো হইল। হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল লইয়া সনাতন পথ দেখাইয়া আগে-আগে চলিয়াছে। অনিলের মাথায়ও একটা স্যুটকেস চাপানো হইয়াছে। তাহাদের জিনিস কি না তাহাকেই ডাকাতের বাড়িতে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

হরলাল বলিল,—সব চেয়ে হাল্‌কা বাক্সটা তোকে দিলাম, তাই কি না তুই বইতে পাচ্ছিস্ না? ঘাড়টা যে একেবারে দুম্‌ড়ে পড়েছে। সোজা কর্ মাথা। বলিয়া তাহার কাঁধের উপর এক রদ্দা বসাইয়া দিল। ফের কহিল,—এত ননীর দেহ করে' থাকলে চলবে না বাপধন, ঘাড়ের ওপর খাঁড়া চালিয়ে দেব বলছি।

দুই হাত তুলিয়া মাথার উপরে স্যুটকেসটার ডালাটা অনিল নাগাল পায় না, তবু হাঁপাইতে-হাঁপাইতে সবারই পিছে-পিছে অতিকষ্টে সে চলিয়াছে। দুই হাত তার জোড়া,—গাল বাহিয়া যে অজস্রধারে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে তাহা মুছিবার পর্যন্ত তাহার উপায় নাই।

চলিতে-চলিতে ইচ্ছা করিয়াই গুপী থামিয়া পড়িল। অনিল কাছে আসিতেই গুপী কহিল,—বইতে পাচ্ছিস না? এই নে, আমি নীচু হচ্ছি-আমার মাথায় ট্রাঙ্কটার উপর তুলে দিতে পারবি? দেখিস।

অনিল ইতস্তত করিতেছে, হঠাৎ মাধব তাহা দেখিতে পাইয়া কহিল,—বলে' দেব, গুপী। তুই ওকে ওর সাজা নিতে দিচ্ছিস না—

গুপীর মাথাটা আর নীচু করা হল না। কথাটা কর্তাদের কানে উঠিলে তাহার কী যে দুর্গতি হইবে তাহা কতকটা সে আন্দাজ করিতে পারে। কাহারও প্রতি দয়া দেখানোর মত পাপ ইহাদের কাছে কিছু নাই। একবার চৌমুনির মেলায় ডাকাতি করিতে গুপী ইহাদের সঙ্গে গিয়াছিল। মেলা তখন সেদিনের মত চুকিয়া গিয়াছে। একটা দোকানীর ঘরে ঢুকিয়া বাক্স ছিনাইয়া আনিবার সময় দোকানী দুই সবল হাতে হরলালের কোমরটা চাপিয়া ধরিয়াছিল,—কাছে ছিল গুপী। দোকানের মাচার উপর দোকানীর

ছোট রুগ্ন একটা ছেলে কাঁথা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিল,—প্রচণ্ড গোলমালে ঘুম ভাঙিয়া যাইতে সে তখন করুণ স্বরে মা মা বলিয়া কাঁদিতেছে। মা তাহার আগেই মরিয়া গিয়াছিল,—মা-হারা রোগা ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়াই দোকানী হাটে আসিয়াছে। তাহাকে বাড়ীতে সে কোথায়ই বা রাখিয়া আসিত! দোকানী হরলালকে এমন বে-কায়দায় ধরিয়া ফেলিয়াছিল যে হাতের বর্শাটা সে কিছুতেই চালাইতে পারিতেছিল না। যতই সে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করে, দোকানী ততই প্রাণপণে চীৎকার করে, শিশুর তারস্বরেরও আর বিরাম নাই। গণেশরা অন্যত্র ব্যস্ত,—হাতের কাছে গুপীই একমাত্র সম্বল। তখন সে ইহার চেয়ে আরো ছোট—এই সে দ্বিতীয়বার ডাকাতি করিতে আসিয়াছে। হরলাল বেগতিক দেখিয়া গুপীকে উদ্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—শিগগির ঐ ছেলেটার গলাটা টিপে ধর, গুপী। ছারপোকার মত টিপে মেরে ফ্যাল্ শিগগির।

হরলালের আশা ছিল দুর্বল ছেলেটাকে গুপীর নির্মম দুই হাতের তলায় মরিতে উদ্যত দেখিলে বাপের আক্রমণের ভঙ্গিটা কিছু শিথিল হইবে, এবং এই ফাঁকে সে একটু আলগা পাইলেই অতি সহজেই বর্শাটার চমৎকার প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু গুপী কিছুতেই সেই ছেলেটার বিছানার দিকে পা বাড়াইতে পারিল না।

রুদ্ধকণ্ঠে হরলাল আবার চেঁচাইয়া উঠিল,—ঐ ইটটা তুলে ছেলেটার মাথাটাতে বার কতক ঘা মার্ শিগগির। নইলে আমার সঙ্গে-সঙ্গে তোরও মুণ্ডুটা খসে' পড়বে, গুপী।

গুপী তবুও দ্বিধা করিতে লাগিল। ঝড়ো পাখীর মত অসহায় একটা ছেলে রোগশয্যায় পড়িয়া মা'র জন্য কাতরাইতেছে, ঐ ভারি ইটটা তুলিয়া তাহার মাথায় সে কি করিয়া মরিবে?

হরলাল অনুনয় করিতে লাগিল,—তোর পায়ে পড়ি, গুপী। সেই সোনার হাত-ঘড়িটা তোকে আমি দিয়ে দেব। উঃ, কামড়ে আমার ঘাড়ের মাংস ছিঁড়ে নিল—শিগগির মার ইট্‌টা, বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে' থেঁৎলে দে ব্যাটাকে—

যন্ত্রচালিতের মত গুপী ইটটা তুলিয়া লইল। চোখের পলক পড়িতে না পড়িতেই তুমুল কাণ্ড হইয়া গেল। সে-কথা মনে করিতে এখনো গুপীর মাথার চুল আতঙ্কে খাড়া হইয়া উঠে। পৃথিবীতে যা কিছু বলিতে দোকানীর ঐ একটি মাত্র সন্তান – মৃত্যু চোরের মত নিঃশব্দে নিতে না আসিয়া এমনি ভয়ঙ্কর উন্মত্ত দস্যুর বেশে কি না তাহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া যাইবে—কথাটা একবার আয়ত্ত করিতেই দোকানী ছেলেকে বাঁচাইবার জন্য বুঝি ভুল করিয়াই হোক গুপীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু গুপীর হাতের ইটটা হাত বাড়াইয়া কাড়িয়া নিবার আগেই হরলালের বর্শা আসিয়া তাহার পেটের মধ্যে সজোরে বিদ্ধ হইল। সে কী রক্তবন্যা! যেন তরল আগুনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। বর্শাটা দোকানীর পেটের মধ্যে ঢুকিয়া পিঠের কোণ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহা খুলিয়া আনিবার সময় হরলাল এক হেঁচকা টান মারিয়া পেটটাকে ফাঁড়িয়া ফেলিল। গলায় যত জোর ছিল মুমূর্ষু ছেলেটা চেঁচাইয়া উঠিল,—বাবা রে! সেই বীভৎস দৃশ্যের সামনে গুপী চক্ষু বুজিয়া কাঁপিতেছে—হরলাল সহসা তাহাকে কাঁধের উপর তুলিয়া নিয়াই খোলা মাঠের মধ্যে দিয়া চোঁচা দৌড় মারিল। কোন দিকে একবার চাহিয়া দেখিল না।

খালি শূন্য মাঠ ভরিয়া সেই মুমূর্ষু ছেলেটার কাতর আর্তনাদ বাজিতেছে। সে-আর্তনাদ গুপীর বুকের মধ্যে বর্শার বিষাক্ত ফলার মতই বিঁধিয়া রহিল।

কিন্তু বাড়ি আসিয়া হরলালের হাতে গুপীর লাঞ্ছনার আর শেষ রহিল না। সে কেন তাহার কথার অবাধ্য হইয়াছে, বলা-মাত্রই কেন সে হাতের ধারালো নখ দিয়া ছেলেটার টুঁটিটা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয় নাই, ইট তুলিতে কেন সে দুই মিনিট দেরি করিল, দেরি করিল ত' ছুঁড়িল না কেন, ছেলেটা রোগা ও মরমর বলিয়াই তাহার অন্যায় মায়া করিতে হইবে নাকি —এই অপরাধে হরলাল গুপীকে সমস্ত রাত্রি একটা শিরীষ গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। তার পরে চালাও বেত। তাহাতেও নিস্তার ছিল না। পায়ে বিছুটি ঘসিয়া দিল, কাঠ-পিঁপড়ার দঙ্গল

আনিয়া চুলের মধ্যে ছাড়িয়া দিল—চরিয়া খাইতে। সকাল বেলা তাহাকে যখন নামানো হইল তখন গুপী ফুলিয়া একটা ঢাক হইয়াছে—সেই টিমটিমে গুপীকে চিনিবে কাহার সাধ্য!

সেই শাস্তির কথা এখনো তার মনে আছে। না, পরের জন্য অকারণে মায়া দেখাইয়া লাভ নাই। গুপী মাধবের সঙ্গে বড় বড় পা ফেলিয়া আগাইয়া চলিল। থাকুক ও পিছে পড়িয়া। কামড়াক না সাপে, কি যায় উহাদের! এই পড়িল বুঝি হোঁচট খাইয়া। মরুক্ মুখ থুবড়াইয়া ইটের পাঁজার উপর—উহাদের কি? উহারা ফিরিয়াও তাকাইবে না।

গাছের শিকড়ে হোঁচট খাইয়া পড়ি-পড়ি করিয়াও অনিল মাথার মোটটা কোন রকমে সামলাইল। উহারা অনেক দূরে আগাইয়া গিয়াছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোথায় যে পথ, কিছুই তার ঠাহর হয় না। দূর হইতে মশালের আলোটা ক্ষীণ দেখা যায়, কিন্তু কোন পথে যে তাহাকে সঙ্কেত করিতেছে কে বলিবে! মাধব আর গুপী তাহার সঙ্গে রহিল না কেন?

ভাগ্যিস তাহারা সঙ্গে নাই। বিদ্যুতের মত একটা চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। স্যুটকেসটা মাটির উপর নামাইয়া রাখিয়া এই অন্ধকারে অন্য কোথাও সরিয়া পড়িলে কেমন হয়! কথাটা মনে করিতেই ভয়ে তাহার গায়ের স্নায়ুশিরা ঝিম-ঝিম করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় সে যাইবে—কোন দিকে পলাইবে? অজানা পথ ঘাট, সূচীভেদ্য অন্ধকার, পিছনে নদী, এখনো ঝড় গুমরাইতেছে—পলাইয়াই বা তাহার আশ্রয় মিলিবে কোথায়? হোক, তবু এমন সুযোগ সে ছাড়িবে না। কাছাকাছি লুকাইয়া থাকিয়া তাহার এই মনোভাব কেহ টের পাইল কি না দেখিবার জন্য অনিল চারিদিকে তাকাইতে লাগিল।

কিন্তু বুলু,—বুলুর কি হইবে? অনিলের প্রতি প্রতিশোধ নিবার জন্য যদি তাহাকে উহারা কাটিয়া ফেলে!

ছোট বোনটিকে ফেলিয়া একলা সে কী করিয়া পলাইবে?

যা থাকে অদৃষ্টে,—অনিল চেঁচাইয়া উঠিল,—'তোমরা দাঁড়াও। অন্ধকারে একা আমি চলব কী করে'?

গুপী দাঁড়াইয়া পড়িল।

মরিতে হয় দুই ভাইবোনে গলাগলি করিয়া একসঙ্গে মরিবে, কিন্তু কেহ কাহাকে ফেলিয়া পলাইয়া বাঁচিবে না।

গুপী বলিল,—স্যুটকেসটা এবার আমার মাথার উপর তুলে দে। মাধোটা অনেক এগিয়ে গেছে, জানতে পারবে না। কিছু ভয় নেই তোর।

মাথা হইতে ভারটা নামিয়া যাইতেই অনিল অনেকটা চাঙ্গা হইল। হাত-পা খোলা পাইয়া বনের মধ্য দিয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়া যাইতে আবার তাহার সাধ হইল—মাথায় প্রকাণ্ড ঐ বোঝা লইয়া গুপী তাহার পিছনে ছুটিতেও পারিবে না, বোঝাগুলি নামাইয়া রাখিতে-রাখিতে সে তখন কোন ঝোপের আড়ালে স্বচ্ছন্দে গা ঢাকা দিতে পারিবে—কিন্তু ছোট বোনটির দুর্দশার কথা মনে করিতেই গা তাহার আবার অবশ হইয়া আসিল।

পাঁচ

অনিল ভাবিয়াছিল ডাকাতরা না জানি কতো বড়ো বড়োলোক, কিন্তু আসিয়া দেখিল উঠানের দুই পাশে দুইখানি মাত্র খড়ের ঘর—কোণে একটা আটচালায় কতকগুলি গরু বাঁধা। উহারা দিনের বেলায় ক্ষেত চষে, সন্ধ্যা হইলে নৌকা লইয়া বাহির হয়—যাত্রী পারাপার করিবার অছিলায় তাহাদের পরপারে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করে।

বাহিরে এমনি নিরীহ হইয়া থাকিয়া তাহারা সবার চোখে ধুলা দেয়।

বাড়ি আসিয়া দেখে বুলু ফ্রক বদলাইয়া সদ্য-পাতা বিছানার এক ধারে বসিয়া আছে। গণেশ তাহার মুখের সামনে একথালা খাবার লইয়া মিনতি করিয়া তাহাকে খাইতে সাধিতেছে—আর দাদা না আসিলে কখনোই এই সব মুখে তুলিবে না বলিয়া সেই যে বুলু ঘাড় বাঁকাইয়াছে তাহা সোজা করে কাহার সাধ্য।

গণেশ বলিল—এই ত' তোমার দাদা এসেছে। নাও, খাও এবার।

দাদাকে সুস্থ দেহে ফিরিতে দেখিয়া খুসিতে বুলুর চোখ ছাপাইয়া উঠিল। কহিল,—আমার মত দাদারও তেমনি হাত-মুখ ধুইয়ে কাপড় ছাড়িয়ে দাও—তবে আমরা খাব।

এই সব আখ্‌খুটেপনা হরলালের সহিতেছিল না। বুলুর এক গোছা চুলে সে এক হেঁচকা টান মারিয়া কহিল,—খাবি নাকি? এখুনি খেতে হবে সব। নইলে এ—ক চড়ে দাঁত বত্রিশটা গুঁড়ো করে' ফেলব।

গণেশ খেপিয়া উঠিল,—খবরদার, ওর গায়ে হাত তুলতে পাবি না বলছি।

হরলালকে এই কথা বলিয়া নিরস্ত করিতে গিয়া গণেশের লজ্জার শেষ রহিল না। কোথাকার কে-একটা মেয়ের জন্য সে কি না দলের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে।

হরলাল রুখিয়া উঠিল,—চড় কি, দা দিয়ে ছুঁড়িকে টুকরো-টুকরো করে' ফেলবো না আমি—

গণেশ আর কোনো কথা না বলিয়া অনিলের হাত-পা ধুইবার জোগাড় করিতে বাহির হইয়া গেল। মেলাই ঝঞ্ঝাটে পড়া গেছে যা হোক্।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া দুই ভাই-বোনে শুইয়াছে। কিন্তু কাহারো চোখে ঘুম আসিতেছে না। দরজাটা পিছন হইতে তালা লাগানো। বাঁশের শিক দিয়া পশ্চিম দিকে জানালা একটা খোলা আছে বটে।

বাহিরে উঠানে লুট-করা রাজ্যের জিনিসপত্র টাল করিয়া ফেলিয়া ডাকাতদের মধ্যে ভাগ-বখরা চলিতেছিল। ঘরের ভিতরে উহাদের কথা কহিবার পর্য্যন্ত জো নাই—টু একটি শব্দ হইলেই হরলাল তাড়িয়া আসে—কথা কইবি ত' ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব বলছি।

কাহার কী অংশ, কোথায় কী বিক্রী করিতে হইবে—সব ঠিক হইয়া গেল। এখন ঐ দুইটা ছেলেমেয়ে নিয়া কী করা যায় তাহারই পরামর্শ।

সনাতন বলিল,—গুপীর মত ছেলেটাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দলে ভর্তি করে' নিলে কেমন হয়?

গণেশ বলিল,—শত হলেও ভদ্দর লোকের ছেলে ত', চট্ করে' ডাকাত সাজতে পারবে না, অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হ'বে।

হরলালও সায় দিল,—তত দিন ওটাকে পুষবে কে? আর এ দিকে পেছনে পুলিশ লেগে সব ভেস্তে দিক আর কি। ছোঁড়ার আত্মীয় স্বজনরাও য়্যাদ্দিন আর নাকে তেল দিয়ে ঘুম মারবে না। একটা পথ তারা দেখবেই।

গণেশ বলিল,—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্, ওতে বিপদ আছে। সোজাসুজি কিছু-একটা বিহিত করে' ফেলতে হ'বে। ওকে দলে ভিড়িয়ে নিলেও বা কী এমন সুবিধেটা হ'বে শুনি—লোকের অভাবে কোন্ কাজটাই বা আমাদের প'ড়ে আছে। নিশ্চিন্তে এই যে এত বড়ো একটা ডাকাতি করে' এলাম—ক'টা লোক লাগলো। হরলাল ত' সারাক্ষণ খালি তামাকই টান্‌লে।

সনাতন বলিল,—তবে অন্য কিছু উপায় ত' ঠিক করতে হ'বে। ধরে' যখন আনাই হ'ল, তখন মিছামিছি ত' আর ছেড়ে দেওয়া চলে না। কাজে একটা লাগাতেই হ'বে—

মুখের কথা লুফিয়া নিয়া হরলাল কহিল,—যে কাজে পয়সা আসে।

উঠানের কথা-বার্তা ঘরের ভিতর থেকে দুই ভাই-বোন স্পষ্ট শুনিতেছে। অচেনা বিছানায় শুইয়া কাহারও চোখে ঘুম আসিতেছে না,—অথচ কড়া হুকুম, একটিও টুঁ শব্দ করা যাইবে না। ভয়ে ঘনতর হইয়া দুই ভাই-বোন পাশাপাশি শুইয়া আছে, আর পরস্পরের নিশ্বাস শুনিতেছে। অনিলের হাতের মুঠার মধ্যে বুলুর একখানি হাত,—সে-হাতখানি পায়রার পাখার মত নরম, দুর্বলতায় ও ভয়ে সে হাত ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে চরম কী ব্যবস্থা হয় শুনিবার ভয়ে বুলু দাদার বুকের কাছে শামুকের মত গুটাইয়া আসিল।

অনিল পশ্চিম দিকের খোলা জানালাটা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল—ধু-ধু মাঠের উপর অন্ধকার আকাশ,—কোথায় তাহার শুরু, কোথায়ই বা তাহার শেষ—চক্ষু মেলিয়া অনিল তাহার কিছুই কুল-কিনারা করিতে পারিল না। বুলুর চুলে হাত বুলাইতে-বুলাইতে সে ভাবিতে লাগিল—ছোট বোনটিকে যদি বাঁচাইতেই না পারে, তবে সে দাদা হইয়াছিল কেন?

ডাকাতদের পরামর্শ চলিয়াছে।

গণেশ কহিল,—হ্যাঁ, নগ্‌দা কিছু লাভ না হ'লে চলবে কেন? আমি

বলি কি, ওটাকে আসামের চা-বাগানে চালিয়ে দিয়ে আসি। হাতে-হাতে রোজগার। শিলচরে কুলির সর্দার তান্‌কুর সঙ্গে ত' আমার সেই কথা। সেই ভেবেই ত' ছোঁড়াটাকে জলে পড়ে' মরতে দিলুম না।

সনাতন লাফাইয়া উঠিল। কহিল—তুই ত' সেখানে কতবার গেছিস্‌ও। দিয়ে আয় ওটাকে তান্‌কুর হাতে—পাবি কত শুনি?

গণেশ বলিল,—যা পাওয়া যায়। মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে তাই লাভ।

সনাতন খুসি হইয়া বলিল,—এদিকে ছুঁড়িটাকে আমরা কালীর মন্দিরে বলি দিই।

ঘরের মধ্যে বুলু দাদাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল।

কথা কওয়া বারণ, তবু বুলুর কানের কাছে মুখ আনিয়া মুমূর্ষুর মত ক্ষীণ কণ্ঠে অনিল কহিল,—তোর কিছু ভয় নেই, আমি আছি কি করতে! আমি তোর দাদা না? আমিই তোকে বাঁচাবো।

তবু, বুলু কি করিয়া আশ্বস্ত হয়? বুলুকে না-হয় দাদা বাঁচাইল, কিন্তু দাদাকে কে বাঁচায়? দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া সে ফুঁপাইয়া উঠিল।

অনিল বুলুর কানের কাছে আবার মুখ আনিয়া অসহায় অস্ফুটস্বরে কহিল,—বাঁচাতে যদি না-ই পারি, তবে একসঙ্গেই আমরা মরবো। একলা একজন বাড়ি ফিরে গেলে মা যখন আরেক জনের কথা জিগ্‌গেস করবেন, তখন—

কথা আর শেষ হইল না, অনিলও কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু কাঁদিলে পাছে বুলু আরো অস্থির হইয়া পড়ে সেই ভয়ে কান্না দমন করিয়া সে কহিল,—দু'জনে গলাগলি করে' মরলে আর কষ্ট কী! একজনকে চোখের সামনে মরতে দেখলেই ত' কষ্ট। মরার পর আমরা ঐ দুটি পাশাপাশি তারা হ'য়ে আকাশে জেগে থাকবো। চেয়ে ছাখ্‌, বুলু।

বুলু তার ছল্‌ছলে দুইটি চোখ তুলিয়া জান্‌লার বাহিরে প্রকাণ্ড আকাশের পানে তাকাইল। ম্লান কণ্ঠে কহিল,—কিন্তু ঐ তারা দুটো যে আমরা, তা মা কি করে' চিনতে পারবে? হাতছানি দিয়ে ডাকলে ত' ওরা আকাশ থেকে

নেমে আসবে না। ওরা অনেক দূরে দাদা, অত দূরে গিয়ে মাকে ছেড়ে থাকবো কি করে ?

বুলু আবার কাঁদিতে লাগিল।

অনিল বলিল,—চুপ কর্, বুলু। ওরা শুনতে পাবে। ততক্ষণ মনে-মনে মা কালীকে ডাকি আয়—মনে-মনে ডাকলেও ত' তিনি শুন্‌তে পান।

বুলু রাগ করিয়া কহিল,—ঐ পেত্নীকে আমি কিছুতেই ডাকতে পারবো না। যে-রাক্ষুসি ছোট-ছোট ছেলেপিলের রক্ত খেতে চায়, তাকে ডাকতে তোর লজ্জা করে না, দাদা ?

অনিল তবু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া অবুঝ বোনটির চুলে হাত বুলাইতে থাকে। প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া সে কালীকে ডাকিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কি বলিয়া যে ডাকিবে কিছুই বুঝিতে পারে না। কেবল মনে হয় বিপুল অন্ধকারের সমুদ্র তাহাদের গ্রাস করিবার জন্য দিকে দিকে রাশি-রাশি ঢেউ তুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

সনাতনের প্রস্তাব শুনিয়া ডাকাতরা অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিল না। এ-যাবত কালী-মন্দিরে কোন কিশোরীকে বলি দেওয়া হয় নাই। বলিটা অবশ্য বাৎসরিক নিত্যকর্ম ছিল—বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে একটা কচি নরমুণ্ড না পাইলে সিদ্ধিদায়িনী কালী রুষ্ট হইয়া প্রসাদদানে কুণ্ঠিত থাকিবেন—ডাকাতদের মনে এমনি একটা প্রবল বিশ্বাস ছিল। তাই অমাবস্যার আগের রাত্রে যেখান থেকে হোক্ তারা একটা শিশু মা'র কোল হইতে ছিনাইয়া আনিত,—কিন্তু তাই বলিয়া অমন সুন্দর একটি মেয়ে—সিল্ক্ এর মত পাৎলা চক্‌চকে যার চুল, ছেলেবেলার মা'র কথা, সদ্য-ফোঁটা যুঁইফুলটির উপর ভোর বেলার শিশির জমিয়া আছে এমন যার চোখের জলে ভেজা সুন্দর মুখখানি—তাহাকে খাঁড়া দিয়া মা-কালীর কাছে বধ করিতে হইবে এই কথাটা শুনিয়া প্রথমটা সবাই আতঙ্কে কেমন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মুখে কাহারো কথা সরিতেছে না।

সনাতন কথা কহিল। গোঁফের প্রান্তটা চুম্‌রাইয়া সে কহিল,—কথাটা শুনে তোরা এত ঘাব্‌ড়ে গেলি কেন বল্ দিকি। মা এবার মেয়ের মুণ্ডু চান

—আমাকে কাল রাতে স্পষ্ট স্বপ্ন দেখিয়েছেন। মেয়ের রক্ত নাকি বেশি নির্মল— মা এবারে একটু মুখ ফেরাবেন, বললেন। শেষকালে কোথায় মেয়ের খোঁজে নদী চষে' ফিরবো—হাতে যখন একটা এসে পড়েছে, তখন এটাকেই জিইয়ে রাখ্‌তে হ'বে।

মাধব মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল, কে জানে এ-ই হয় ত' মা-কালী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হরলাল কহিল,—তাই হ'বে।

কিন্তু গণেশের বুক কাঁপিয়া, হাতে-পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরিয়া, চোখেমুখে অন্ধকার করিয়া সহসা কেমন যে করিয়া উঠিল কে বুঝিবে। সে কথাটা শুনিয়া গোড়া হইতেই একেবারে পাথর হইয়া গিয়াছে, প্রস্তাবটা এখন প্রায় সাব্যস্ত হয় দেখিয়া সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—তোরা বলিস কি সনাতন? ঐ মেয়ের ঘাড়ে তোরা খাঁড়া বসাবি?

সনাতন জোর গলায় কহিল, হ্যাঁ, দোষটা কোথায়?

—না, খবরদার, ও-কথা তোরা মুখেও আনতে পারবি না।

সনাতনও উঠিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল,—তবে এই মেয়ে নিয়ে তুই করবি কি?

গণেশ কহিল,—বুলুকে আমি নিজের কাছে রেখে দেব। তার পর তন্ময় হইয়া আপন মনে কহিতে লাগিল,—ওকে আমি বড়ো করব, রাজার ঘরে বিয়ে দেব, হাতীর হাওদায় চড়ে' বাজনা বাজিয়ে রাজপুত্র আসবে—আমার ধন দৌলত সব কিছু দিয়ে ওর জন্যে প্রকাণ্ড এক দীঘি কাটিয়ে মাঝখানে শ্বেতপাথরের বাড়ি বানিয়ে দেব। দীঘির জলে ময়ূরপঙ্খী নৌকা চালিয়ে ও রাজপুত্রের সঙ্গে হওয়া খাবে।

কথা শুনিয়া সবাই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে-হাসি এমনি প্রচণ্ড যে, ঘরের ভিতর বুলুর মনে হইল যেন তাহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া হাজার-হাজার শেয়াল মহোল্লাসে কাড়াকাড়ি লাগাইয়াছে। সে দাদাকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—কী হ'বে দাদা?

অনিল চাপা গলায় কহিল,—কিছু ভয় নেই, বুলু। ওরা তোর বিয়ে দেবে।

বিয়েটা যে-এমন ভয়ঙ্কর একটা জিনিষ বুলু এই প্রথম শুনিল।

বাহিরে হাসি আর থামিতে চায় না। হরলাল মাটিতে প্রায় গড়াইয়া কহিল,—তুই পাগল হ'লি নাকি, গন্‌শা ? দীঘি কাটিয়ে বাড়ি করে' দিবি ? মানুষ করে' বিয়ে দিবি ওকে ? তবে ওর বাপ বেচারাই বা দোষ করলো কী ! বাবা, এত ঠাট্টাও জানিস তুই—পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে গেল ?

সত্যই, গণেশ ঠাট্টা করিতেছিল নাকি ! এমন কথা গাঁজায় দম না দিয়া সে বলিল কী করিয়া ? তাহার কথা শুনিয়া সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল দেখিয়া এখন তাহার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল। ইহার চেয়ে সে চিমটা ও কমণ্ডলু লইয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া গেলেই ত' পারে।

গণেশ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিল,—কিন্তু মা'র মন্দিরে ওকে বলি আমি কিছুতেই দিতে পারবো না।

সনাতন কহিল,—বল্‌লেই ত' হ'ল না—মা'র আদেশ যে !

—হোক্ মা'র আদেশ ! আমার ঘাড়ের ওপরই বরং খাঁড়া বসাস্, কিন্তু বুলুকে আমি কাউকে ছুঁতে দেব না।

সনাতন কহিল,—বলি যদি না-ই হয়, মেয়েটা ফৈজুর কাছে বেচে দিলেই ত' লেঠা চুকে যায়। মেয়ে আর একটা কেড়ে আন্‌তে কতক্ষণ ! মাধো আর গোপীই তা পারবে—কি রে, পারবি নে ?

মাধব প্যাট-প্যাট করিয়া চাহিয়া বলিল,—ক'টা চাই ?

তার কাঁধ চাপড়াইয়া সনাতন বলিল,—এই ত' মরদের মত কথা।

গণেশ বুলুদের ঘরের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। ফৈজুর কাছে বেচিয়া দিতে সে আর আপত্তি করিবে না ! কোথাকার কে মেয়ে—তাহার জন্য কিসের মায়া ! তাহার জন্য সে কিনা দলের লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইবার উপক্রম করিয়াছে ! ভাবিতে নিজেরই তাহার লজ্জা করে।

তবু মেয়েটা এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িল কি না জানিবার জন্য গণেশ আর কথা না কহিয়া উহাদের ঘরের দিকে আগাইতে লাগিল। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া গণেশ কহিল,—ঘুমিয়েছ খুকি ?

অন্ধকারে জানলার বাহিরে বীভৎস মুখটা প্রথমে বুলুরই চোখে পড়িল। সে ভয় পাইয়া দাদাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—ঐ দাদা, কে এলো ছাখ্—ঐ জান্‌লার ধারে—

গণেশ মোলায়েম গলায় কহিল,—আমি, আমি গণেশ—ভয় নেই তোমার। ঘুম আসছে না, বুলু?

বুলু ধমক দিয়া উঠিল,—খুব ঘুম আসছে। তুমি যাও এখান থেকে—নিজে গিয়ে ঘুমোও গে এবার।

কতক্ষণ পরে চোখ চাহিয়া গণেশকে আর জানালায় দেখা গেল না। ডাকাতদের গোলমাল তখন থামিয়া গিয়াছে। সমস্ত মাঠ ও আকাশ ভরিয়া অপরিসীম স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা ভাঙিয়া কথা কহিতে পর্য্যন্ত ভয় করে।

বুলুর কানের কাছে মুখ আনিয়া অনিল কহিল,—এখান থেকে পালাবি, বুলু?

গাছের উপর-ডালের পাতার মত বুলুর শরীর কাঁপিয়া উঠিল। অনিলের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কহিল,—পালাবি দাদা? কিন্তু কি করে' পালাবি? ভীষণ অন্ধকার যে।

অনিল কহিল,—অন্ধকারেই ত' সুবিধে—সহজে কেউ টের পাবে না।

আনন্দে বুলু বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। উচ্ছল কণ্ঠে কহিল,—তবে এখুনি চল্ দাদা, আর দেরি নয়।

অনিল তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—আস্তে। হয় ত' ওরা এখনো উঠোনে পাইচারি করছে। এই মতলোব একবার শুনতে পেলে ওরা আমাদের আর আস্ত রাখবে না।

বুলু নিস্তেজ হইয়া আসিল। ম্রিয়মাণের মত বালিশে মাথা রাখিয়া সে কহিল,—তবে কী করে' পালাবি? দরজাও ত' বন্ধ।

অনিল কহিল—পালাবো জান্‌লার মধ্যে দিয়ে। জানলাটা উঁচু—তাতে কি? আমি তোকে কাঁধে তুলে নিয়ে দাঁড়াবো, তুই আস্তে-আস্তে মাথা গলিয়ে দিয়ে ও-পারে লাফিয়ে পড়বি, পারবি নে?

বুলু জানলার দিকে চাহিয়া সামান্য একটু-কি হিসাব করিয়া কহিল,—খুব পারবো ; কিন্তু তুই ?

—আমার জন্যে ভাবিস নে—

বুলু মুখ ভার করিয়া কহিল,—না, ভাববে না ! আমাকে ও-পারে একা নামিয়ে দিয়ে তুই যদি আর নামতে না পারিস ? তখন কী হ'বে ?

অনিল উদাসীনের মত কহিল,—ও আর এমনি উঁচু কি ? বেড়া ধরে'ই ত' অনায়াসে উঠতে পারবো। জানালায় পা রাখবার জন্যে দস্তুরমতো ফাঁক আছে। পাইপ বেয়ে একবার তেতলার ছাতে উঠেছিলাম বল্ কুড়োতে—তোর মনে নেই ? ভুলে গেছিস্ ?

বুলুর উৎসাহ আর ধরে না, অনিলের গায়ে ঠেলা দিতে-দিতে কহিল,—তবে উঠে পড়্ শিগ্‌গির—এখুনি পালাই। কিন্তু তার পর কোন্ দিকে যাবি শুনি ? এই অন্ধকার মাঠের মধ্যে পথ খুঁজে পাবি ?

অনিল কহিল,—একবার কোনো রকমে বেরুই ত'।

দুই হাতে কপালের উপর হইতে চুলগুলি মাথার দুই দিকে ঠেলিয়া দিয়া বুলু কহিল,—আর তা হ'লে দেরি নয়, দাদা—

বুলু তক্তপোষ হইতে নামিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া অনিল কহিল,—আরো খানিকটা সময় যাক্, ওদের ঘুমটা আরো একটু পাকুক্। পালাবার আওয়াজ পেয়ে জেগে উঠলে আর আমাদের রক্ষে নেই।

বুলু শুইয়া পড়িল—দাদার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল,—ধরা যদি পড়ি, তা হ'লে কী হ'বে ? দু'জনকে জ্যান্ত পুঁতেই ফেল্‌বে হয় ত'।

অনিল শাসনের সুরে কহিল,—এখন চুপ করে' একটু ঘুমো দিকি।

—ঘুমোব কি দাদা ? পালাবি নে ?

—আরো ঘণ্টা দুই বাদে। মেঘ ডাকছে—খুব জোরে বৃষ্টি আসবে দেখছি। বৃষ্টি এলেই মজা হয় এবার।

বুলু আশ্চর্য হইয়া কহিল,—বৃষ্টি এলে পালাবি কি করে' ?

—বৃষ্টিতেই ত' পালাবার সুবিধে। একে অন্ধকার রাত তায় বৃষ্টি—ওরা

আমাদের খুঁজেই পাবে না। আমরা মাঠ ধরে' হাঁটতে-হাঁটতে কোথাও না কোথাও ট্রেন-লাইন্ একটা পেয়ে যাবো।

বুলুর সমস্ত শরীর নিমেষে প্রজাপতির পাখার মত হাল্কা হইয়া গেল। দাদার গলা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সে কহিল,—তবে আসুক বৃষ্টি—ঝড়ের সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও ছুটবো মাঠ-বন ডিঙিয়ে—ট্রেন-লাইন্ ধরে' সোজা কল্কাতা। ষ্টেশনে পৌঁছেই নেব একটা ট্যাক্সি, কী মজা!

শাসনের স্বরে অনিল কহিল,—অত চ্যাঁচাস্ নে, শুনতে পাবে। হয় ত' বেড়ায় ওরা কান পেতে আছে।

তাড়াতাড়ি জিভ কাটিয়া বুলু কহিল,—না, এই আমি চুপ করলাম, দাদা। কিন্তু ট্রেনে উঠতে গেলে আমাদের টিকিট লাগবে না? আচ্ছা—এই, এইবার আমি ঠিক চোখ বুজেছি—দু'ঘণ্টা পর আমাকে জাগিয়ে দিস্ কিন্তু। কী মজা, আবার বৃষ্টি আসছে।

চোখ বুজিয়া বুলু মনে-মনে চলন্ত ট্রেনের ছবি আঁকিতে লাগিল। ঝোলানো ঘণ্টার গায়ে কুলি বাড়ি দিতেছে—এক, দুই, তিন—এঞ্জিনটা এই ফুঁ দিল—গাড়িতে টান পড়িয়াছে। তারপর চোখের সামনে দিয়া অন্ধকার আকাশে অগণন তারার ফুলঝুরি! কোথাও এতটুকু মেঘ নাই—যেন মা শিয়রে বসিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছেন—সেই গানের এক-একটা শব্দ উপরে উঠিয়া তারা হইয়া যাইতেছে!

তারপর চারদিক ঠাণ্ডা করিয়া অনর্গল ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

দুই ঘণ্টা কখন কাটিয়া গিয়াছে। বুলুর ঘুম আর কেহ ভাঙাইল না। আকাশের মেঘ দেখিতে-দেখিতে মা'র কথা মনে করিয়া অনিলও কখন অজানতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—তাহাকেই বা কে জাগাইয়া দিবে?

স্বপ্নে বুলু তখন বাড়ির চায়ের টেবিলের ধারে বেতের চেয়ার টানিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া টোষ্ট খাইতেছে—মা কত সব খাবারের আয়োজন করিয়াছেন, সব সে দাদার দিকে ঠেলিয়া দিতেছে—খিদে মা, দাদারই বেশি পেয়েছে আমার চেয়ে, আমাকে পিঠে করে' কত নদী সাঁত্‌রে কত পাহাড় টপ্‌কে, কত বন-বাদাড় পেরিয়ে ও এলো—জানো না মা,

পথের সমুখে প্রকাণ্ড একটা বাঘ এসে পড়লো—কী তার চোখ, কী-বা তার থাবা—

চিড়িয়াখানার খাঁচা ভাঙিয়া বাঘ একটা সত্য-সত্যই যেন চায়ের টেবিলের উপর লাফাইয়া পড়িয়া সব কাপ্-প্লেট ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল।

বুলুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ চাহিয়া দেখিল বিছানার সামনে গণেশ চোখ বড় করিয়া তাহার পানে চাহিয়া মুচকি-মুচকি হাসিতেছে।

দাদা?—বুলু ধড়মড় করিয়া উঠিল। না, দাদা তাহার পাশে শুইয়াই ঘুমাইতেছে।

দাদা কি তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া একা চলিয়া যাইতে পারে?

ছয়

বুলু ও অনিলের চোখে সব কি-রকম অদ্ভুত লাগিতেছে। কলিকাতায় আকাশ কেমন সঙ্কীর্ণ, ধোঁয়ায় বিবর্ণ, ম্লান—আর এখানকার আকাশের সীমা দুই চোখে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পৃথিবীটা যে কতো বড়ো—এমনি একটা অস্পষ্ট অনুভূতি দুইটি কিশোর ভাই-বোনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যে করিয়াই হোক্, এই বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া অন্য কোথাও—অন্য কোনো পথের সন্ধানে যাত্রা করিতে হইবে এমনি একটা চেতনা সমস্তক্ষণ তাহাদের নাড়া দিতে লাগিল।

সকালবেলায়ই ডাকাতেরা মাঝি সাজিয়া ভাড়া খাটিতে বাহির হইয়াছে। গণেশ প্রথমটা যাইবে না ভাবিয়াছিল, কিন্তু সামান্য একটা মেয়ের জন্য সে তার দৈনন্দিন কাজে অবহেলা করিবে ভাবিতে তাহাকে কে যেন চাবুক মারিল। গুপী ও মাধবকে বলিয়া গেল উহাদের উপর কড়া নজর রাখিতে, আর বলিয়া গেল যেন বাড়ির উঠান হইতে উহারা এক পা না নড়ে।

উহারা চলিয়া গেলে অনিল গুপীকে জিজ্ঞাসা করিল,—অমাবস্যার আর কত দেরি?

গুপী কহিল,—পশু´ রাত।

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বুলু বলিল,—আমাকে সেদিন কালীর মন্দিরে বলি দেবে তোমরা?

মাধব আগাইয়া আসিয়া কহিল,—তাই ত' ঠিক হ'ল।

সজল চোখে বুলু কহিল,—তোমাদের একটু কষ্ট হ'বে না? তোমাদের ছোট বোন নেই?

গুপীর মনটা ছুলিয়া উঠিল, আশ্বাস দিয়া কহিল,—আমরা অন্য ব্যবস্থা করে' ফেলবো—তার জন্যে তোমায় ভাবতে হ'বে না।

অনিল কহিল,—সে ত' পশু´র কথা—তার দেরি আছে। আয় বুলু, এখন একটু বেড়াই। কেমন সুন্দর জায়গা! ওটা কী পাখী ভাই?

দাদার গলার স্বরে কেমন-একটা নিশ্চিন্ত ভাব, বুলু তাহাতে সাহসের আভাস পাইয়া মনে-মনে খুসি হইয়া উঠিল। মাধব কহিল,—কিন্তু উঠোনের থেকে পা বাড়াতে পারবে না—

অনিল কহিল,—কোথায়ই বা আমরা যাব। পালাবার ত' আমাদের পথ নেই—পথ-ঘাট কে দেখিয়ে দেবে বলো?

গুপী বলিল,—একটু এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে আনলে ক্ষতি কী!

মাধব চক্ষু পাকাইয়া বলিল,—সর্দারের কানে উঠলে তোর গায়ে আর চামড়া থাকবে না, গুপী।

বুলু কহিল,—আমরা যদি পালিয়ে যাই তবেই না গুপীর দোষ হ'বে। একটু বেড়িয়ে ফিরে এলেই ত' হ'ল! কলকাতার খাঁচায় থাকি আমরা, এমন মাঠ আর হাওয়া কোনোদিন দেখিও নি।

মাধব আবার শাসাইল,—এ কিন্তু ভাল হচ্ছে না, গুপী।

বুলু গুপীর হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে কহিল,—তুমি ওর কথায় ভয় পেয়ো না। আমরা ত ফিরেই আসছি। সর্দার তোমাকে কিচ্ছু বলবে না। আমিই বরং ওর নামে প'চিশ কথা লাগিয়ে দেব দেখো।

গুপীর সঙ্গে-সঙ্গে দুই ভাই-বোন উঠান ছাড়িয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। গাছে-গাছে অসংখ্য পাখী, লতায়-লতায় অসংখ্য ফুল—শব্দে ও

গন্ধে সমস্ত বন স্পন্দিত হইতেছে—দিনেও অন্ধকার এই বনে চারিদিক হইতে তরঙ্গ তুলিয়াছে—নদীর ঘাট হইতে এই বনের পথ ধরিয়াই তাহারা আসিয়াছিল বলিয়া তাহারই সন্ধান নিতে অনিল গুপীকে এইখানে টানিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু গুপী বেশি দূর আগাইতে চায় না,—বলিল,—চল, ঐ ফাঁকা মাঠে বেড়িয়ে আসি।

পশ্চিমে বন শূন্য মাঠে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে—তাহার উপর আসিয়া অনিলের মন ধাবমান পাখীর প্রসারিত ডানার মত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ গুপী ধারে-পারে এখান দিয়ে কোথাও ট্রেন চলে না?

—ট্রেন? গুপী বলিল,—চারিদিকে এর নদী, কোথা দিয়েও বেরুবার উপায় নাই—

অনিল গুপীর মুখের দিকে তাকাইল, হয়ত তাহার মনের কথা ইহার কাছে ধরা পড়িয়া গেছে, তাই সে ব্যস্ত হইয়া কহিল,—না, না, এ জায়গা মন্দ কী এমন! কাছে নদী থাকলে ত' লোকের স্বাস্থ্য ভালো হয় শুনেছি।

কিন্তু নদীর নাম শুনিয়া—গর্জমান তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদীর কল্পনা করিয়া অনিলের মন মুষড়িয়া পড়িল। দুই চোখ প্রসারিত করিয়া ধরিয়াও কোথাও তীরের সামান্যতম সঙ্কেত খুঁজিয়া পাইল না।

তবু সে সাহস করিয়া প্রশ্ন করিল,—এর চারিদিকেই নদী—তা কেমন করে' হ'তে পারে! এ ত' আর দ্বীপ নয়!

গুপী বলিল,—উত্তরের মাঠ দিয়ে নাক বরাবর মাইল পাঁচ-ছয় হাঁটলে একটি ভদ্দর লোকের গাঁ পাওয়া যায় বটে। ঐ যে তাল গাছ দেখছ—ঐ যে—

অনিল আর বুলু সতৃষ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেই উত্তরে মাঠের দিকের চাহিয়া রহিল। দূরে কয়েকটা বড়-বড় তাল গাছ দেখা যায় বটে—তাহার পিছন হইতে আকাশ উঁকি দিয়া যেন হাতছানি দিয়া উহাদের ডাকিতেছে!

এক জায়গা হইতে রওনা হইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আবার সেই জায়গাটিতেই পৌছানো যায়—মাইল পাঁচ ছয় আর এমন কী পথ! কিন্তু বুলু কি এতদূর হাঁটিতে পারিবে?

মাঠের মধ্যে এ-পাশে ও-পাশে দুয়েকটা লোক দেখা যাইতে লাগিল। গুপী ব্যস্ত হইয়া কহিল,—আর যায় না খোকাবাবু, এবার ফের।

একটা লোক একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ভয়ে গুপীর মুখ শুকাইয়া গেল—পুলিশের লোক হয়ত ছদ্মবেশে আসিয়া পড়িয়াছে! পলাইবারও পথ পাইবে না। কিন্তু না, লোকটা অন্যদিকে চলিয়া গেল। অনিল তাহাকে ডাকিতে গিয়া ডাকিতে পারিল না।

গুপী ধমক দিয়া উঠিল,—শিগ্‌গির ফের' বল্‌ছি—পা চালয়ে।

যাক্‌, বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। বুলু বলিল,—তোমার ঐ তালগাছের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না ভাই? এখানে কী করতে আছ? বাড়িতে তোমার মা নেই?

গুপী বুলুর স্নেহ-কোমল মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল,—কেউ নেই। তাই এখানে পড়ে' আছি।

উঠানে নামিয়াই গণেশ হাঁক দিল,—বুলু!

ডাক শুনিয়াই বুলু তাহার ঘাড়ের উপর ছোট-ছোট চুলগুলি দুলাইতে-দুলাইতে ছুটিয়া আসিল, গণেশকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—দেখবে এস আমরা ক্যারম খেলছি। ঘুঁটিগুলি একটাও হারায়নি—তুমি খেলবে আমাদের সঙ্গে? এস না, বেশ ত', তোমার ফাইন্‌ লাগবে না।

গণেশ বুলুর চুলগুলি কপালের উপর হইতে কানের পিঠের কাছে তুলিয়া দিতে দিতে কহিল,—তোমার জন্য কত কচি আম পেড়ে এনেছি, ফুটি তরমুজ—ইলিশমাছ, ভাজা খাবে না?

বুলু আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। কহিল—তোমাদের এখানে গোলাপ জামের গাছ নেই? কলকাতায় এক কুড়ির দাম দুই আনা। খাইনি কোনদিন।

—আছে বৈকি। সে ঠিক নদীর পারে। আগে বলোনি কেন?

—আমাকে নিয়ে যাও না সেখানে। আমি ঠিক গাছে উঠতে পারবো। আমি ত' কেমন হাল্কা, একেবারে উঁচু ডালে চড়বো দেখো। তুমি ত' পড়ে'ই যাবে।

বুলুর নিঃসন্দেহ ও নির্ভয় মুখখানির দিকে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে গণেশ কহিল,—বিকেলে তোমাকে ঠিক এনে দেব—এক ঝুড়ি। কত তুমি খেতে পারো!

—এখুনিই নিয়ে যাও না। বেশ ত' গুপীকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও —পথ দেখিয়ে দেবে। দাদাও কিন্তু গোলাপ-জাম খেতে ভালবাসে—ও-ও খাবে। গুপীকে তুমি একবার বলো না, সর্দার। আমরা ত' আর পালিয়ে যাচ্ছি না?

—আমাকে ছেড়ে কোথায় পালাবে? বলিয়া গণেশ দুই ব্যাকুল হাতে বুলুকে কোলে তুলিয়া লইল। খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর মত অসহায় করুণ চোখে বুলু চারিদিকে চাহিতে লাগিল—চারিদিকে এত বড়ো ফাঁকা, অথচ পাখা মেলিবার তাহার এতটুকু জায়গা নাই।

গণেশ বুলুকে কোলে তুলিয়া আদর করিতেছে দেখিয়া হরলাল আর সনাতন দুইজনে খুব হাসাহাসি করিতে লাগিল। হরলাল বলিল,—আর বেশি সময় নেই, গণেশ। মোটে পর্শু রাত। মনে থাকে যেন।

সেই কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া গণেশ বুলুকে পরিপাটি করিয়া ফল খাওয়াইতে বসিল। কিন্তু মেয়েটা এমন নাছোড়বান্দা যে দাদাকে না হইলে কোন কিছুতেই তাহার হাত উঠিবে না। অগত্যা অনিলকেও ডাকিতে হইল। অনিলের জন্য গণেশের এতটুকু মায়া নাই,—তাহার কেবলই মনে হয় ঐ ছেলেটা অত্যাচারীর মত বুলুর স্নেহে আসিয়া ভাগ বসাইতেছে।

সমস্ত দিনে দুই ভাই-বোন কোথাও এতটুকু ছাড়া পাইল না। বন্ধ ঘরের মধ্যে বসিয়া খোলা জান্‌লা দিয়া চারিটি সতৃষ্ণ চক্ষু বহু দূরে পাঠাইয়া দিল—সেই চক্ষু বন নদী পার হইয়া তাহাদের কলিকাতার বাসায় গিয়া বসিয়াছে। ছুটির দিনে সেই তাহাদের দোতলায় শ্বেতপাথরের ঠাণ্ডা বারান্দাটি, গলিতে কাঠি-বরফওয়ালা ফিরি করিয়া চলিয়াছে; স্কুলের টাস্ক ফেলিয়া তাহারা দুইজনে সিঁড়ি দিয়া তরতর করিয়া নামিয়া গেল। অনিলের বরফটা লাল, বুলুরটা সবুজ। সব তাহাদের চোখে ভাসিতেছে। বেলা পড়িয়া আসিলে মা নীচে নামিয়া ষ্টোভ ধরাইলেন,—চায়ের সঙ্গে পাঁপর-

ভাজা খাইতে-খাইতে তাহারা দুইজনে বায়স্কোপে যাইবার কথা তুলিল,—স্নাব্ পোলার্ডের গোঁফ দেখিয়া তাহারা সেদিন কী হাসিয়াছিল, এত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াও হ্যারল্ড্ লয়েড এর চশমা ভাঙে না, চার্লির আদৎ ফোটোতে কিন্তু এক ফোঁটা গোঁফ নাই!—কত সব কথা! মা তবু আপত্তি করিতেছিলেন। এমন সময় কোর্ট হইতে বাবা ফিরিলেন, পকেটে হাত রাখিয়া বলিলেন,—আজ কত পেয়েছি বল দেখি? অনিল আর বুলু লাফাইয়া উঠিল। অনিল বলিল,—দশ। বুলু বলিল,—পঁচিশ। বাবা হাসিমুখে বলিলেন,—কেউ পারলিনে—ছাব্বিশ টাকা। বুলু বাবার পকেট ধরিয়া মাতামাতি স্নুরু করিল: ঠিক হয়েছে—আমি ঠিক বলেছি, বাবা। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কী করে' ঠিক হ'ল? তুই ত' বললি পঁচিশ? বুলু বলিল,—বা, ও-টাকাটা দিয়ে যে আমি আর দাদা বায়স্কোপ দেখব। তা হ'লে পঁচিশ হ'ল না? এই করিয়া তাহাদের বায়স্কোপ যাওয়া মঞ্জুর হইয়া গেল। স্পষ্ট ছবির মত তাহাদের চোখে ভাসিতেছে।

কিন্তু এই দিগন্তবিস্তীর্ণ স্তব্ধতার কত দূরে সেই চলমান, মুখর, কোলাহল-চঞ্চল কলিকাতা কে তাহার হিসাব করিবে।

রাত্রিতে শুইবার সময় বুলু গণেশকে কহিল,—তুমিও আমাদের ঘরে শোও এসে, সর্দার।

গণেশ হাসিয়া বলিল,—কেন, ভয় করে বুঝি? কিসের ভয়?

বুলু কহিল,—না জোয়ান কেউ ঘরে না থাকলে যদি তোমাদের সেই ফৈজু মিঞা আমাকে চুরি করে' নেয়। দাদাটা ত' ভীষণ ভীতু। বলিয়া সে অনিলের পানে চাহিয়া হাসিল। অনিল মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। তাহার শিখানো কথা বুলু ঠিকমত বলিতে পারিতেছে না।

গণেশ বলিল,—আমি থাকতে কার সাধ্য তোমাকে চুরি করে' নেয়।

—সেই জন্যই ত' তোমাকে আমাদের ঘরে শুতে বলছি। দূরে থাকলে ত' আমার কান্নাও শুনতে পাবে না, তা ছাড়া মুখে কাপড় গুঁজে দিলেই ত' পরিষ্কার।

অগত্যা গণেশকে তাহাদের ঘরের মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া শুইতে

হইল। এবং ঘরে গণেশ নিজে শুইল বলিয়া দরজায় আর তালা লাগানো হইল না।

গণেশের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করিয়া বুলু ও অনিল ঘুমাইবার ভান করিয়া চুপ করিয়া গেল। গণেশের নাক রীতিমত গর্জন সুরু করিয়াছে। ভয় তাহাদের বরং বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দরজাটা যে বাহির হইতে বন্ধ করা হয় নাই তাহাতেই তাহাদের বুকের ভার নামিয়া গিয়াছিল। বুলু কখনই জান্‌লা টপকাইতে পারিত না। পা পিছলাইয়া একবার খোঁড়া হইলেই সব সাফ্ হইয়া যাইত।

দুই ভাই বোন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মুহূর্ত গুনিতে লাগিল। অনিল বুলুকে বুকের একান্ত কাছে টানিয়া আনিয়া খুব আস্তে-আস্তে কহিল,—তুই আগে উঠে দরজা খুলে বেরো। যদি শব্দ শুনে ও জেগে উঠে, হাসি-মুখে বলবি ঘরে ভীষণ গরম, ঘুম আসছে না, চল বাইরে একটু বেড়াই। গরমের রাতে কলকাতার ছাতেই আমাদের শোয়া অভ্যাস্—বুঝলি ?

বুলু বুঝিয়াছে। অমনিই সে উঠিয়া বসিল। অনিল আবার ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল,—হ্যাঁ, হাঁটু দিয়ে দরজার একটা পাল্লা চেপে ধরলেই খিলটা শব্দ না করে' উঠে আসবে। দিনের বেলায় আমি পরীক্ষা করে' দেখেছি। দরজাটা খোলা রেখেই বেরুবি, আমিও খানিক বাদে বেরিয়ে পড়বো। দূরে ঐ শিরিষ গাছটার তলায় দাঁড়াস্।

বুলু বিরক্ত হইয়া বলিল,—কতবার বলবি ?

অনিল কহিল—তবু আরেকবার তোকে মনে করিয়ে দিলাম। তুই যেমন চঞ্চল। আস্তে যাস্—মা-কালী!

অনিল চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল বটে, কিন্তু শরীরের প্রত্যেকটি রক্ত-বিন্দু সজাগ করিয়া সে বুলুর গতিবিধি দেখিতে লাগিল। পা টিপিয়া-টিপিয়া বুলু মাটিতে নামিয়াছে, ঘুমন্ত গণেশের দিকে বারে-বারে চাহিতে-চাহিতে সে দরজার কাছে আগাইল। গা পাতিয়া এই সে দরজার একটা ধার চাপিয়া ধরিয়াছে—সাবাস্ বুলু,—দেখিতে-দেখিতে অত্যন্ত আল্‌গোছে খিলটা আসিল। খিলটা আস্তে-আস্তে নামাইয়া রাখিয়া তার চেয়েও আস্তে-আস্তে

সে দরজা খুলিল। ঘরে-বাহিরে স্তব্ধতার সঙ্গে গভীর অন্ধকার আঠার মত আটকাইয়া রহিয়াছে। বুলুর পা কাঁপিল না, বাহিরের অন্ধকারে সে যেন স্পষ্ট তাহার মাকে দেখিতে পাইল। মা তাহার শিরিষ গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এই সেই শিরিষ গাছের তলা—দাদা তাহাকে আগেই দেখাইয়াছিল। সেইখানে আসিয়া মা'র আর চিহ্নটুকুও সে দেখিতে পাইল না। অন্ধকারে গা তাহার পাথরের মত ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। বনের মধ্যে দিয়া লতা পাতায় খস্ খস্ করিতে-করিতে একটা সাপ চলিয়া গেল হয় ত'—সারি-সারি গাছগুলি ভূতের মত এক ঠ্যাঙে দাঁড়াইয়া তাহাকে মুখ ভ্যাঙ-চাইতেছে। দাদা মা-কালীকে ডাকিতে বলিয়াছিল, কিন্তু যে-দেবী কচি শিশুর রক্ত খাইবার জন্য জিহ্বা মেলিয়াছেন তাঁহাকে সে মরিয়া গেলেও ডাকিতে পারিবে না।

কিন্তু দাদাটা এখনো আসিতেছে না কেন? তাড়াতাড়ি আসিতে গিয়া সর্দার-মাঝির গা মাড়াইয়া দিয়াছে বুঝি? সে ভয়ে চোখ বুঁজিয়া এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে? আবার শুক্‌নো পাতায় কাহার পায়ের শব্দ হইল! টের পাইয়া গণেশই বুঝি নিজে বাহির হইয়া পড়িয়াছে! বুলু চীৎকার কবিতে যাইতেছিল, কিন্তু চোখ চাহিয়া দেখিল—দাদা!

দীর্ঘ দিন-রাত্রির অকুল সমুদ্র-যাত্রার পর কলম্বাস্ যখন প্রথম তীররেখা দেখিয়াছিল, ঠিক তাহারই মত আনন্দে বুলু লাফাইয়া উঠিল!

অনিল তাহাকে ইসারায় বলিল,—পালা!

বুলু একটি মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা করিল, তারপর দাদা শিরিষ গাছটার কাছে আসিয়া পৌছিতেই দুইজনে বন ভেদ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল। গাছপালা তাহাদের বাধা হইল না, অন্ধকার অনায়াসে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিল। আকাশের তারাগুলি রুগ্ন সন্তানের শিয়রে মা'র নিষ্পলক চোখের মত তাহাদের ডাকিতে লাগিল– আয়, আয়, আয়!

সাত

কতক্ষণ যে তাহারা কোন্ পথে ছুটিয়াছে কিছুই খেয়াল নাই—কাঁটা লতায় আটকাইয়া পা দুইটা ছড়িয়া রক্ত বাহির হইয়া গেল, তবুও থামিলে তাহাদের চলিবে না। গুপী কোন্ দিকে যে নদীর পথ দেখাইয়া দিয়াছিল অন্ধকারে তাহার কোনই নির্দেশ পাওয়া গেল না—কেবল বনের সঙ্গে বন অন্ধকারের সঙ্গে অন্ধকার মিলিয়া-মিশিয়া সমস্ত পৃথিবী একাকার করিয়া দিয়াছে। তবু কেবলই বুলুর মনে হয় আর দু' কদম ছুটিয়া গেলেই সামনে কলিকাতার রাস্তা মিলিয়া যাইবে—এখনো রাস্তা ভরিয়া গ্যাস জ্বলিতেছে —ময়লা-গাড়িগুলি শব্দ করিতে-করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, দুই একটা বাসও যে না পাওয়া যাইবে এমন নয়। কিন্তু কোথায় কলিকাতা! কোথায় বা মা তাহাদের জন্য বিছানা করিয়া বসিয়া আছেন! খালি বনের পর বন, আর অন্ধকারের পর অন্ধকার! সেই অন্ধকার সমুদ্রের চেয়েও বিশাল, সেই বন মৃত্যুর চেয়েও অপরিচিত।

বুলু থামিয়া পড়িল; কাঁদিয়া কহিল,—আর চলতে পারছি না, দাদা।

অনিল ধমক দিয়া কহিল,—চলতে না পারলে হ'বে কেন? ঐ ওরা যে যে এসে পড়লো!

দিগ্বিদিক না তাকাইয়া বুলু আবার ছুটিল। সত্যিই, পেছনে যেন কাহারা আসিতেছে—এই তাহাদের ধরিয়া ফেলিল বুঝি। প্রাণপণে যত তাহারা ছোটে, সেই সব পদশব্দ ততই যেন আগাইয়া আসিতে থাকে। তাহারা সেই তালগাছের দিকে না গিয়া নদীতে আসিয়া নৌকা ধরিবার জন্য এই বনের পথ নিল কেন? কোথায় যাইতে এই কোথায় আসিয়া পড়িল! চারিদিক হইতে শিয়াল ডাকিয়া উঠিয়াছে—যদি দল বাঁধিয়া আক্রমণ করিতে আসে! আসিবার সময় গণেশের বালিশ হাতড়াইয়া দেশলাইয়ের বাক্সটা বুদ্ধি করিয়া নিয়া আসিল না কেন? গণেশ হয় ত' তাহা হইলে খপ্ করিয়া ঘাড়টা ধরিয়া ফেলিত! যা হোক, তবু ত' তাহারা বাহির হইতে পারিয়াছে—ডাকাতদের রক্তবর্ণ চক্ষু হইতে এই অন্ধকার বরং ভালো। এই

অন্ধকার কোনো সময় নিশ্চয় ফর্সা হইবে, কিন্তু ডাকাতদের মুঠি কখনো আল্‌গা হইত না।

অনিলও আর চলিতে পারিতেছিল না। গাছের একটা গুঁড়ি ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল, কহিল—আয় বুলু, একটু জিরোই।

বুলু বসিয়া পড়িয়া হাঁপ নিতে লাগিল। কহিল,—পায়ে প্রকাণ্ড একটা কাঁটা বিঁধে গেছে, দাদা।

অনিল কহিল,—আমারই কি বেঁধেনি নাকি? জুতো পায়ে ত' বেরুনো চলতো না। আর এখানে কে আমাদের জন্যে গাড়ি তৈরি রেখেছে?

বুলু ম্লানমুখে কহিল,—তা ত' জানি। কিন্তু কোথায় আমরা যাচ্ছি? কি উপায় হ'বে?

বুলুকে নিজের কোলে শোয়াইয়া দিয়া অনিল কহিল,—উপায় আর কী! প্রাণ ভরে' মা-কালীকে ডাক্ বুলু, তিনিই রক্ষা করবেন।

• নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বুলু দাদার কথামত মা-কালীকেই ডাকিতে লাগিল। পাছে প্রাণ ভরিয়া ডাকা না হয় সেই ভয়ে বুলু উচ্চস্বরে মা-কালীর নাম ধরিয়া আর্তনাদ সুরু করিল। অনিল ধমক দিয়া উঠিল,—চ্যাঁচাচ্ছিস্ কেন? মনে-মনে ডাকলেও তিনি শুনতে পান। পরে বুলুর পায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিল,—একটু ফর্সা হ'লেই আবার আমরা বেরুবো। পথ-ঘাটের তখন একটা কিনারা পাওয়া যাবে। নদী নিশ্চয়ই বেশি দূরে নয়। নৌকো ক'রে—

অনিল আর বলিতে পারে না—নৌকা করিয়া বুলুকে লইয়া সে মনে-মনে নদী পাড়ি দিয়া চলিল। রূপালি নদীতে সোনার রোদ ঝিকমিক করিতেছে। এবারের মাঝি বিনা-পয়সায় তাহাদের ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে!

চোখ বড় করিয়া বুলু বলিল,—নৌকো পেলে মাঝিকে আমার গলার হারটাই বকশিস দিয়ে দেব। •

হ্যাঁ, একবার ষ্টীমারে উঠতে পারিলে তাহাদের পায় কে!

কতক্ষণ পরে দেখা গেল লণ্ঠন-হাতে কে একজন বনের মধ্যে ঢুকিয়া

পড়িয়াছে। আলোটা তাহাদেরই দিকে আগাইয়া আসিতেছে দেখিয়া বুলু অনিলকে জড়াইয়া ধরিল, কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল,—ঐ ওরা এসে পড়লো, দাদা—কি হ'বে ?

শুকনো গলায় অনিল কহিল,—ওদের কেউ না ও হ'তে পারে। মা-কালী, ও যেন অন্য লোক হয়, ওকে তুমি অন্য লোক করে' দাও।

লোকটার একটা বাছুর হারাইয়াছে। সারারাত ধরিয়া গরুর ডাক শুনিয়া সে ঘুম হইতে উঠিয়া গোয়ালঘরে আসিয়া দেখে বাছুরটা কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। সেই বাছুর খোঁজ ক.রতেই সে লণ্ঠন নিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। দূরে গাছের তলায় কি-একটা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে সেই-দিকে পা চালাইল।

অনিল ও বুলু ততক্ষণে ভয়ে কাঠ হইয়া গিয়াছে।

লোকটা হাঁকিল,—কে ওখানে ? কে ?

স্বরটা ডাকাতদের কাহারও বলিয়া মনে হইল না। অনিল কহিল,—আমরা।

—আমরা কে রে ? লোকটা কাছে আসিয়া দেখিল দুইটি নিঃস্ব ছেলে-মেয়ে গাছের তলায় বসিয়া আছে। সে উহাদের মুখের কাছে লণ্ঠন তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে তোমরা ? কি করছ এখানে ?

অনিল কহিল,—আমরা নদীর ঘাটে যাবো—আমাদের পথ দেখিয়ে দিতে পারো ?

আসছ কোত্থেকে ?

—পথ ভুলে এইখানে এসে পড়েছিলাম—এবার ফিরে যেতে চাই আমাদের তুমি একটু উপকার করবে না ?

বুলু কথা কাড়িয়া কহিল,—তোমাকে বকশিস দেব।

অনিল তক্ষুনি তাহাকে গোপনে এক চিম্‌টি কাটিয়া দিল। বুলুর তখন হুঁস হইল সত্যই সে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া ভাল করে নাই। এই লোকটাকেই যদি সে সোনার হার বকশিস্ দিয়া দেয়, তবে মাঝি কিসের লোভে তাহাদের নৌকা করিয়া ষ্টীমার ধরাইয়া দিবে ?

কথা-বার্তা শুনিয়া লোকটার সন্দেহ আরো বাড়িয়া গেল! কহিল,—এখানে পথ ভুলেই বা কী করে' এলে? আমাকে সব কথা খুলে বলো, খোকা। আমাকে তোমাদের কিচ্ছু ভয় নেই।

বুলু নির্ভরশীল চক্ষু তুলিয়া দাদার দিকে তাকাইয়া রহিল। ঢোক গেলা ছাড়া অনিল কিছুই বলিতে পারিল না।

লোকটা আবার কহিল,—বিপদে যদি পড়ে' থাক, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের উপকার করবো। কিন্তু আগে আমাকে তোমাদের পরিচয় দাও। ভদ্দরলোকের ছেলে বলেই ত' মনে হচ্ছে। কোথায় বাড়ি? কী করে এখানে এলে?

অনিল আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল,—আমরা মুন্সিগঞ্জে দাদামশায়ের বাড়ি যাচ্ছিলাম। নদীতে ঝড় উঠ্‌লে মাঝিরা ডাকাতি করে' আমাদের দু'জনকে এখানে নিয়ে এসেছে। মা-বাবাকে কোন্ একটা চরে ফেলে রেখে এসেছে। আমরা দু'জনে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি—

লোকটা অবাক হইয়া কহিল,—বলো কী?

অনিল বলিল,—এখন আমরা ষ্টীমার ধরতে চাই,—কাঁটার খোঁচা খেয়ে গা আমাদের রক্তে ভেসে যাচ্ছে, আর আমরা চলতে পাচ্ছি না। আমাদের ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছে দিতে পারো? আজ রাত্রেই—এক্ষুনি?

বুলু কান্নায় গলিয়া গিয়া কহিল,—আর দেখেছ আমার এই পা-টা! কিছু আর নেই। তেষ্টায় গলা বুজে আস্‌ছে—আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারো?

জলের বদলে বুলু আবার একটা চিম্‌টি খাইল। আবার সে ভুল করিয়া বসিয়াছে। এখন জল খাইতে গেলে ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছিতে যে দেরি হইয়া যাইবে। ততক্ষণে তাহারা যদি আসিয়া পড়ে!

লোকটা কহিল,—এস আমার সঙ্গে। কাছেই আমার বাড়ি—জল খাওয়াবো চল। এমনি বনের মধ্যে কি পড়ে' থাকতে আছে? সাপখোপের ভয় আছে যে! ওঠ।

অনিল আপত্তি করিয়া কহিল,—না, জলতেষ্টা আমাদের সত্যিই তত

পায়নি। ওটুকু আমরা সইতে পারবো। আমাদের একবার তুমি ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছে দাও, দয়া করে'।

—দেব বৈ কি। নিশ্চয়ই দেব। আমার ওখানে গিয়ে জল-টল খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নাও—ওখানে যে আছ কারুর বাপের সাধ্য নেই টের পায়। যেখানে-যেখানে কেটেছে সব জায়গায় আমি ওষুধ লাগিয়ে বেঁধে দেব। আমার ওখানে ইচ্ছে করলে একটু ঘুমিয়েও নিতে পারবে। টাট্‌কা গরুর দুধ জ্বাল দিয়ে দেব—সরু চিঁড়ে আর অমৃত-সাগর কলাও ঘরে আছে। চল, খুকি।

বুলু আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। দাদা তাহার ব্যবহারে রাগ করিয়াই বুঝি মুখ ভার করিয়া তেমনি বসিয়া আছে।

লোকটা কহিল,—এইখানে বসে' থাকলে লাভ কী? ওরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। চুপ করে' বসে' থাকবার পাত্র ত' ওরা নয়। এই দিকেই বা কোন্ না কেউ এসে পড়বে। শিগ্‌গির চল, খোকা। আমিই বরং তোমাদের লুকিয়ে রাখতে পারবো। তারপর সুবিধে বুঝে ঠিক একসময় ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আসবো—সুড়্‌সুড়্‌ করে' বাড়ি চলে' যাবে।

এ একটা যুক্তির কথা বটে। দাদাকে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতে দেখিয়া বুলুর চোখ খুসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রাণ লইয়া পলাইবার সময় পা দুইটা বল্‌গাহীন ঘোড়ার মতই ছুটিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু এখন মনে হইল দুই পায়ে কে যেন প্রকাণ্ড বেড়ি বাঁধিয়া দিয়াছে—পা আর উঠিতে চায় না। অতি কষ্টে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে লণ্ঠনের আলো লক্ষ্য করিয়া দুইজন নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গহন অন্ধকারের কিনারে এতক্ষণে বুঝি ক্ষীণ একটি আলোর রেখা দেখা গেল।

বুলু দাদার গা ঘেঁষিয়া চলিতে চলিতে কহিল,—কালী বেশ ভালো দেবতা, না দাদা?

অনিল বলিল,—নিশ্চয়। প্রাণ ভরে' ডাকলে সব দেবতাই সাড়া দেন, শুনেছি।

—কী ডাকাটা ডাকলুম বল্ দিকি। সাড়া না দিয়ে পারে? তবে বোধহয় আমার রক্ত আর ও খাবে না, দাদা।

নিঃশব্দে বাকি পথটুকু পার হইয়া আলোর সঙ্গে-সঙ্গে উহারাও থামিল। ঘন গাছপালার মাঝখানে ছোট কয়েকখানি পাতার কুঁড়েঘর। রাত্রে গরম বলিয়া কে আরেকটা লোক উঠানে খাটিয়া পাতিয়া পরম আরামে ঘুমাইতেছে। বুলুদের পথ দেখাইয়া যে আনিতেছিল সে ডাকিল,—রতন!

ডাক শুনিয়া রতন ধড়মড় করিয়া উঠিল। চোখ কচ্‌লাইয়া কহিল—কে, বংশী-দাদা না? বাছুর পেলে?

বংশী হাসিয়া কহিল,—তার চেয়ে ভালো জিনিস পেয়েছি দ্যাখ্। আমাদের বাছুরটার মতই মা-হারা হ'য়ে পথে বেরিয়েছে। তুই এখন একবারটি যা ত' বাপু, এদের জন্যে গয়লা-বৌর থেকে কিছু পাটালিগুড় আর পাতক্ষীর নিয়ে আয় দিকি। ভদ্দরলোকের ছেলেপিলে সব—অভুক্ত হ'য়ে ঘরে অতিথি হ'য়েছে—কীই বা এই অসময়ে সাম্‌নে দিই বল্ ত'!

বলিয়া বংশী রতনকে কাছে ডাকিয়া কী-সব উপদেশ দিতে লাগিল। পরে বুলুদের দিকে তাকাইয়া কহিল,—এস আমার সঙ্গে এই ঘরে। একটু ঘুমিয়ে নেবে। বলিয়া রতনের উদ্দেশে হাঁক পাড়িল—আসবার সময় নৌকো একটা বায়না করে' আসিস—এদের আবার ইষ্টিশানে পৌঁছে দিতে হ'বে।

রতনের আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু বংশীর মিষ্টি ব্যবহারে দুই ভাইবোনের মন গলিয়া গেল। মা-কালী উহাদের পথ দেখাইয়া নিতে নিজের অনুচর পাঠাইয়া দিয়াছেন। অনিল কহিল,—এখানকার ষ্টীমার-ষ্টেশনের নাম কি? ষ্টীমার লাগে কখন?

—তা লাগতে এখনো ঘণ্টা চারেক বাকি। তোমরা স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে চারটি খেয়ে নিতে পারবে। কোথায় তোমাদের লেগেছে দেখি? বলিয়া আলো লইয়া বংশী উহাদের পায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

নিতান্ত লজ্জিত হইয়া অনিল কহিল,—ও আর এমন কী লেগেছে? তোমার ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। খেলতে গিয়ে এমন কত আমাদের কেটে যায়।

বুলু গলা তুলিয়া কহিল,—কত!

অনিল জিজ্ঞাসা করিল,—ষ্টীমার-ষ্টেশনের নাম কি নারায়ণগঞ্জ? না, এখানে চড়লে সেখানে আমাদের নামতে হ'বে? একেবারে এখান থেকেই বরাবর নৌকো করে' নারায়ণগঞ্জ যাওয়া যায় না?

বংশী বলিল,—সে তোমাদের ভাবতে হ'বে না। আমি ঠিক তোমাদের পৌঁছে দেব। একবার আমার হাতে যখন এসে পড়েছ, তখন আর তোমাদের ভয় নেই।

বুলু উৎফুল্ল হইয়া কহিল, —তবে যাবার সময় সেই চরটাও একবার ঘুরে যাবো, কেমন? যদি মা-বাবা সেখানে থাকেন তাদেরকেও তুলে নেব সঙ্গে। কী মজাটাই যে হ'বে।

অনিল তাহাকে ধমক দিয়া কহিল,—দূর বোকা! তাঁরা সেখানে এখনো বসে' আছেন নাকি? কখন্ বাড়ি চলে' গেছেন—

—বাড়ি চলে' গেলে বুঝি আমাদের খোঁজে লোক পাঠাতেন না?

—পাঠাননি তুই কী করে' বুঝলি? এখানে পথ চিনে একদিনে চ'লে আসা খুব বুঝি সোজা ভাবছিস?

—তবু চরটা একবার ঘুরে যেতে দোষ কী!

—সেই চর কে বা'র করবে? তুই পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবি আমাদের?

সত্যিই, সে-কথা বুলু ভাবিয়া দেখে নাই। তবু না দমিয়া সে কহিল,—বেশ ত', ওঁরা যদি সেই চরে না থাকেন, বাড়ি গিয়েই ত' দেখা হ'বে। বুঝলি দাদা, খুব হৈ-চৈ করে' বাড়ি ঢুকবো না, পেয়ারা গাছের ডাল ধরে' পেছনের দেয়াল টপকে দু'জনে আলগোছে নেমে পড়ে' রোয়াকটিতে চুপটি করে' বসে' থাকবো। গয়লা দুধ দিতে এসে যখন সদরের কড়া নাড়বে তখন দরজা খুলতে এসে মা'র চক্ষু স্থির। আমরা মাকে প্রথম চিনতেই পারবো না, না দাদা? হ্যাঁ, এদিককার ট্রেন খুব ভোরেই ত' শেয়ালদা পৌঁছোয়— না বংশী খুড়ো?

বংশী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল,—তুমি যখন বলবে সেই সময়ই ট্রেন তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বুলু কহিল,—তা কী করে হয়? ট্রেন তোমার কথা শোনবার জন্যে বসে' আছে।

অনিল বলিল,—হ্যাঁ ঢাকা-মেল খুব সকালে গিয়ে পৌঁছয়। কাল আমরা এমন সময় কী করছি বল্ ত'—

তক্তপোষের উপর বসিয়া বুলু জোরে জোরে পা দুলাইতে লাগিল,—কাল যে তাহারা এমন সময় ঠিক কী করিবে, কী করিলে যে ঠিক তাহাদের মানাইবে বুলু সহসা কিছু ভাবিয়া পাইল না।

বংশী তক্তপোষের উপর একটা ছেঁড়া সতরঞ্চি বিছাইতে-বিছাইতে কহিল,—আমি দুটো বালিশ এনে দিচ্ছি, তোমরা একটু ঘুমিয়ে নাও। রতন খাবার নিয়ে এলেই মুখ হাত ধুয়ে ততক্ষণে লেগে যাবে। আমিও কোমরে গামছা বেঁধে তৈরি হ'য়ে নেব। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গা ছড়াইবার এমন সুযোগ পাইয়া দুই ভাই বোন সতরঞ্চির উপর নিশ্চিন্ত আরামে এলাইয়া পড়িল এবং দেখিতে-দেখিতে বুলুর দুই চোখ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ঘুমাইলে অনিলের চলিবে না, কতক্ষণে ভোর হয় সেই জন্য তাহার প্রতীক্ষা করিতে হইবে—ভোর হইলেই ঝির-ঝিরে হাওয়ায় রঙচঙে পাল ফুলাইয়া নৌকা ভাসিয়া চলিবে!

খানিকক্ষণ বাদে ঘরের পিছনে অনেকগুলি চাপা গলার স্বর ও দ্রুত পায়ের শব্দ শুনিয়া অনিল খাড়া হইয়া উঠিল—বুলু কিন্তু তখনো পাতার আড়ালে কুঁড়িটির মত ঘুমাইতেছে। অনিল স্পষ্ট দেখিল কতকগুলি লোক সোজা এই বাড়িরই উঠানে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—জাঁদরেল, জোয়ান সবাইর চেহারা—সকলের আগে রতন, সে এইমাত্র তাহাদের জন্য পাতক্ষীর আনিতে গয়লা-বৌর বাড়ি যাইবার নাম করিয়া বাহির হইয়াছিল। প্রথমটায় অনিল কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ঠিক হরলালের গলা—অনিলের চিনিতে আর দেরি হইল না। কী যে করিবে, বুলুকে জাগাইবে কি না কিছুই আয়ত্ত করিতে না পারিয়া অনিল তক্তপোষের তলায় গিয়া লুকাইল। তক্তপোষের তলায় গিয়াই

তাহার মনে হইল কাজটা নিতান্তই কাপুরুষের, কিন্তু ঘরের মধ্যে ততক্ষণে হরলাল সদলবলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

হরলাল বংশীর কাঁধ চাপড়াইয়া কহিল,—ঠিক বন্ধুর কাজ করেছ ভাই—তোমাকে এর জন্য ঢের ইনাম দেওয়া যাবে। কৈ, ও ছুটো কোথায় ?

বংশী কহিল,—ঐ তক্তপোষের ওপরে। বলিয়া লণ্ঠনের আলোতে পথ দেখাইয়া উহাদের ভিতরে নিয়া আসিল।

বংশী ঠিক উপযুক্ত বন্ধুরই কাজ করিয়াছে বটে। দুইটি নিরাশ্রয় পলাতক শিশুকে ডাকাতের মুখে আবার তুলিয়া দিয়াছে। নদীর রাস্তা দেখাইয়া দিলে বুলু তাহাকে বকশিস দিবার লোভ দেখাইয়াছিল বংশী মনে-মনে তখন হাসিয়াছিল মাত্র। বকশিসের মাত্রাটা কোথায় গিয়া ঠেকিতে পারে তাহাই জানিবার জন্য সে রতনকে চুপি-চুপি ডাকাতের আড্ডায় পাঠাইয়া দিয়াছে ! ক্ষুধার্ত শিশু দুইটির জন্য সে এতক্ষণ বলকতোলা টাট্‌কা দুধ ও সরু চিঁড়ের সঙ্গে অমৃতভোগ কলারই ফলার জোগাড় করিতেছিল বৈ কি ! আর, দুইটি ভাই বোন এতক্ষণ মনের পাখা মেলিয়া প্রায় তাহাদের বাড়ি পৌঁছিয়া গিয়াছিল। পেয়ারা গাছের ডাল ধরিয়া দেয়াল টপকাইয়া তাহারা দুইজনে রোয়াকে বসিয়া দরজার কাছে মা'র আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

বন্ধু না হইলে কেহ কি আর এমন করিয়া বাড়িতে আশ্রয় দেয়, পায়ের ঔষধ লাগাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে !

সনাতন রুখিয়া আসিয়া কহিল,—মেয়েটা ত' শুয়ে আছে দেখছি—ছোঁড়াটা কোথায় গেল ?

বংশী স্তম্ভিত হইয়া কহিল,—এই ঘরেই ত' ছিল। যাবে কোথায় ? বলিয়া সে নীচু হইল। তক্তপোষের তলায় অন্ধকারে অনিল ঘুপটি মারিয়া বসিয়া আছে। বংশী একগাল হাসিয়া কহিল,—বাছাধন, একবার বেরিয়ে আসুন দয়া করে'।

হরলাল তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া বাহির করিল ও রাগে অন্ধ হইয়া দাঁতে মুখে মাথায় বুকে যেখানে যত পারিল বেদম ঘুষি মারিতে লাগিল। তাহার দেখাদেখি সনাতন ঘুমন্ত বুলুর উপর তাহার ঝাল ঝাড়িতে

উদ্যত হইল। গণেশ এতক্ষণে কথা কহিল,—খবরদার, ওর গায়ে হাত তুলতে পারবি নে। যত পারিস, ছোঁড়াটাকে পেট্, কিন্তু ওর কাছ থেকে সরে' দাঁড়া, সনাতন।

সনাতন সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—এমন বেয়াদবির পরেও তুই ওদের শাসন করতে দিবি নে?

গণেশ বলিল,—মারলেই বুঝি খুব শাসন হ'ল? ছেলেপুলের বাপ ত' কোনোদিনই হ'স নি?

সনাতন মুখ ভেঙ্‌চাইয়া কহিল,—আর শাসন হয় আদর করলে! ঠেসে আদর করেই ত' মেয়েটার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিস। দেব কালীর কাছে বলি দিয়ে—বলিয়া সনাতনও অনিলের পিঠে এক লাথি বসাইয়া দিল।

বংশীও সাহস পাইয়া তাহার কানটা মলিয়া দিয়া কহিল,—ছোঁড়াটা কি কম পাজী! বলে কি না ষ্টীমার-ষ্টেশনের নাম নারায়ণগঞ্জ।

চারিদিকের এই সমবেত প্রহারের ঝাপটায় হাড় ক'খানা একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল—আর সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার তীক্ষ্ণ চীৎকারে এতক্ষণে বুলুর ঘুম ভাঙিয়াছে। গণেশ তাড়াতাড়ি তাহার মুখের উপর নুইয়া পড়িয়া কহিল,—কিছু ভয় নেই বুলু, এই যে আমি এখানে।

বুলু অস্পষ্ট আলোতে গণেশকে ঠিক চিনিল, কিন্তু সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে চোখ মেলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে বুঝি। সে আর দাদা না এতক্ষণ বাড়ি পৌঁছিয়া মা'র হাতের চা খাইতেছিল? কোথা দিয়া এ আবার কি হইয়া গেল! পাগলা কুকুরের মত উহারা দাদাকে টুকরা-টুকরা করিয়া ফেলিল নাকি?

গণেশ কহিল,—বাড়ি গিয়ে ঘুমুবে চলো, বুলু।

হরলাল ক্ষেপিয়া কহিল,—মেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে ত' তুইই এই কাণ্ডটা বাধালি। আর আদরে কাজ নেই। হাটে গিয়ে ফৈজু মিয়াঁকে একটা খবর দিতে পারবি, বংশী? তার জন্যে মাল মজুত—খুব চড়া দামের জিনিস।

বংশী স্বচ্ছন্দে ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—আজই ত' হাট-বার। যাবো নিশ্চয়।

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল,—কোন জায়গায় ওদের তুই দেখা পেলি ?

—সেই পিপুল-গাছের গোড়ায়। বাছুর খুঁজতে বেরিয়েছিলাম—

—বলিস্ কি রে ? হরলাল সবিস্ময়ে কহিল,—আর একটু এগোলেই ত' নদী। নদী পেলেই ত' প্রায় সরে' পড়েছিলো আর কি। বলিয়া অনিলের গাল বাড়াইয়া সজোরে এক চড় বসাইয়া দিল।

বুলু কহিল,—দাদাকে আমিই ত' পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওকে একলা মারছ কেন ?

হরলাল চক্ষু পাকাইয়া কহিল,—তোমারো ব্যবস্থা হচ্ছে, চল না।

অনিলের চলিবার আর শক্তি ছিল না, অগত্যা সনাতন তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল। বুলু ত' গণেশেরই কাঁধে। কাঁধে উঠিয়াও অনিলের নিস্তার ছিল না—যাইবার আগে বংশী একবার মুখ ভেঙচাইয়া বলিল,—কি যাদু, কলা খেলে কেমন ?

আট

হরলাল একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল—অনিলের এই দুঃসাহসিক আচরণ সহজে সে হজম করিতে পারিবে না। একটা কিছু প্রতিবিধান আজই করিতে হইবে। স্বয়ং গণেশের চোখে ধূলা দিয়া ইহারা বাহির হইয়া গেল, আর ইহাতে কি না তাহার এক ফোঁটা রাগ নাই। বরং মেয়েটাকে যে ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে তাইতেই সে খুসি! মেয়ে নিয়া অত আবদার যেন সে আর না করে! দু'তিন দিনের মধ্যেই ফৈজু সাহেব আসিয়া পড়িবে।

গণেশকে ডাকিয়া লইয়া তিন জনে পরামর্শ করিতে লাগিল। ঠিক হইল যে, কাল রাত্রে অনিলকেই কালী-মন্দিরে বলি দেওয়া হইবে—গণেশের মুখের দিকে চাহিয়া বুলুর কথা আর কাহারো মুখেই আসিল না। তা ছাড়া ছেলেটাকে বেশি দিন কাছে রাখাও নিরাপদ নয়,—যেমন সাহসী তেমনি বুদ্ধিমান। ছুরির ধারালো ফলার মত চোখ দুইটা চক্ চক্ করিতেছে—

দৃষ্টির সারল্যের মাঝে কোথায় একটা তীক্ষ্ণ দীপ্তি ছিল,—না, উহাকে আর আস্কারা দিয়া লাভ নাই। 'বম্ ভোলানাথ' বলিয়া কাল রাত্রেই উহাকে সাবাড় করিয়া ফেলা হউক।

আর বুলুকে অবিশ্যি ফৈজুর কাছে বিক্রি করা হইবে—রতন হাটে যাইয়া তাহাকে আজ খবর দিয়া আসিবে। যেদিন সে আসে,—আর কথা নাই। কথাটা আগে হইতেই ঠিক হইয়া আছে বটে, তবু এইবার একেবারে পাকা করিয়া নেওয়া গেল। আর টাল-মাটাল চলিবে না। তাহা ছাড়া মেয়েটা দস্তুরমতো গণেশের মন ভিজাইয়া দিয়াছে—এই অস্বাস্থ্যকর মনোভাব থেকে সর্দারকে মুক্ত হইতে হইবে। অবশ্য মেয়েটাকে হরলাল নৌকার মধ্যে রাখিয়া আসিলেই পারিত, তবু আনিয়া যখন ফেলিয়াছে, তখন নিশ্চয় একটা গতি করিতে হইবে। দুর্দিনে যা দুই পয়সা হাতে আসে—তাই লাভ!

—কী বল্ গণেশ?

গণেশ রাজি না হইয়া আর কী করিবে? বুলুকে বেচিয়া যা দু' পয়সা হাতে আসে, পৃথিবীতে তাহারই দাম ত' এতদিন তাহারও কাছে বেশি ছিল। আজ আপত্তি করিলেই বা মানাইবে কেন? কিন্তু ফৈজু কত দাম দিবে—এই রত্নের দামই বা সে কষিবে কী করিয়া! অতশত বিচার করিয়া আর লাভ কি, দুর্দিনের বাজারে কাণাকড়ি যা পাওয়া যায় তাহাই লাভ! না, গণেশের মত আছে বৈ কি। একটা কচি মেয়ের মুখ দেখিয়া তাহাকে নরম হইলে কি চলে? কত অমন কচি মেয়ের মাথা সে দুই পায়ে মাড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে!

গণেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তাই হোক্। মিছিমিছি তবে ছেলেটাকে আর বেঁধে রেখেছিস্ কেন? কালই যখন ওর শেষ, তখন আজ অন্তত একটু হাত পা ছড়িয়ে ছুটোছুটি করুক। দুটো ভালো কিছু ওকে খেতে দে—এ-জন্মের লীলা-খেলা ত' ওর ফুরুল!

হরলাল কহিল,—তাতে আর আপত্তি কি? কী বল্ সনাতন? চন্দ্রবদন আজ আর পালাতে পাচ্ছেন না, সারাক্ষণ কাছে-কাছে রাখবো।

হরলাল সনাতনকে লইয়া ঘরের পিছনে বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। সেখানে মোটা একটা বাঁশের সঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়া অনিলকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা হইয়াছে। বাঁধনের জায়গাগুলির পাশে-পাশে শরীরের মাংসগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে—সর্বাঙ্গে দুঃসহ বেদনা, মাথা আর সে খাড়া রাখিতে পারিতেছে না। তবু এত দুঃখের মাঝেও এই ভাবিয়াই তাহার সব চেয়ে বেশি দুঃখ হয় যে, ঐ পিপুল-গাছের তলায় না বসিয়া সোজা আরো খানিকটা হাঁটিয়া গেলেই তাহারা নদী পাইত—হয় ত' এতক্ষণে তাহারা ষ্টীমারে উঠিয়া রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ঢেউয়ের শব্দ শুনিতেছে!

চোখের সামনে বিকটাকার হরলালকে দেখিয়া অনিলের সমস্ত শরীর ভয়ে ও বেদনায় হিম হইয়া গেল—হরলালের হাতে একটা ছুরি। হয় ত' তাহাকে এখন খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া মাংসের টুকরাগুলি তাহার পোষা কুকুরটাকে খাইতে দিবে। কিন্তু সে কাছে আসিয়া কি না ছুরি দিয়া দড়ির বাঁধনগুলি কাটিয়া দিতে লাগিল। অনিল যেন চোখের সামনে ম্যাজিক দেখিতেছে।

এদিকে গণেশ বুলুকে আসিয়া বলিল,—তোমার দাদার বাঁধন খুলবার হুকুম দিয়ে এলাম। আমাকে তুমি এখন কী দেবে বলো দিকি, খুকি?

বুলু খুসি হইয়া কহিল,—সত্যি ছেড়ে দিয়েছ দাদাকে? তুমি খুব ভালো, সর্দার। কী আর তোমাকে দেব? বড়ো হ'য়ে যখন ডাক্তার হ'ব তখন তোমাকে—যা তুমি চাও—পাঠিয়ে দেব। কী তুমি চাও বলো না?

বুলুর চুলে হাত বুলাইতে-বুলাইতে গণেশ বলিল,—বড়ো হ'য়ে তুমি ডাক্তার হ'বে বুঝি?

—হ্যাঁ, কিন্তু কী করেই বা হ'ব? তোমরাই ত' হ'তে দেবে না—কাল রাত্রে ত' আমাকে মা-কালীর কাছে বলি দেবে। মা-কালী একটুও ভালো নয়, সর্দার। এত করে' তাঁকে ডাকলাম, তবু তিনি হাত ধরে' আমাদের বাড়ি নিয়ে গেলেন না। আমি মরে' গেলে দাদাকে কিন্তু তুমি দেখো, এরোপ্লেনে চড়ে' বিলেত যাবার ওর ভারি সখ্। বিলেত থেকে ও প্রকাণ্ড

ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে আসবে। ও হরি,—তুমি বুঝি এরোপ্লেন কাকে বলে জানো না।

যতক্ষণ বুলু কথা বলে গণেশ মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে, বাধা দিতে মন উঠে না। বুলু থামিলে গণেশ বলিল,—আমি বেঁচে থাকতে কারুর সাধ্যি নেই তোমাকে বলি দেয়!

—বলো কী, সর্দার ? তুমি এত ভালো ? বলিয়া বুলু দুই হাতে গণেশকে জড়াইয়া ধরিল।

শিশুর সেই কোমল স্পর্শে কঠিন পাথর নিমেষে মাখন হইয়া গেল। গণেশ কহিল,—এইবার তবে তুমি খাও। আর কতক্ষণ উপোষ করে' থাকবে? ঐ যে তোমার দাদা এসে পড়েছে। দেখ আমার কথা সত্যি কি না।

অনিল বুলুর দিকে তাকাইতে পারিতেছে না, ছোট বোনটির কাছে সে যেন কত অপরাধী—কষ্ট করিয়া বনের মধ্য দিয়া আর একটু অগ্রসর হইলেই ত' সে বুলুকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারিত! বাবুগিরি করিয়া কেন সে তখন বিশ্রাম করিতে বসিল ? অথচ খানিক আগে বুলু থামিতে চাহিলে সে-ই গলা বড় করিয়া তাহাকে ধমক দিয়াছে। চোখ ঠেলিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছিল, অনিল প্রাণপণ শক্তিতে সে জলের স্রোত বন্ধ করিল। এখন কাঁদিলে বুলু আকারণে আরো অস্থির হইয়া পড়িবে। সে এখনো আশা হারায় নাই—নিশ্বাসের বাতাসের মত মা'র আশীর্বাদ তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে।

অনিলকে দেখিয়া বুলু কহিল,—আয় দাদা, খাবি আয়। আর ওরা তোকে মারবে না,—কেমন, ঠিক ত' সর্দার ? আমাকেও বলি দেবে না বলেছে। সর্দার খুব ভালো লোক, দাদা।

গণেশ মেঝের উপর খাবারের থালা সাজাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িবার আগে বুলু কহিল,—আমরা খাব না ত,—কক্‌খনো খাব না।

বুলুর কথা শুনিয়া অনিলও হটিয়া আসিল। গণেশ কহিল, কেন ? এ ত' খুব ভালো খাবার।

হোক্ ভালো খাবার। কিন্তু গুপীকে তোমরা বেঁধে রেখেছ কেন? ও কী দোষ করল? আমাদের জন্য কেন ও শুধু-শুধু কষ্ট পাবে?

অনিল জিজ্ঞাসা করিল,—কেন, গুপীকেও বেঁধে রেখেছে নাকি?

—হ্যাঁ। দেখেছিস্ দাদা, মাধোটা কেমন পাজী—ও ওদের বলেছে গুপীই দিনের বেলা আমাদের নদীর পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। তা না হ'লে আমরা যেন আর বেরুতে পারতাম না! সেই জন্য ওকেও ওরা দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। ওকে ফেলে আমাদের কি খাওয়া উচিত?

—কক্‌খনো না। ওরও বাঁধন খুলে দিতে হবে। দোষ ত' একলা আমাদেরই।

গণেশ কহিল,—তা কি হয়? তা করতে গেলে ওদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'য়ে যাবে যে।

বুলু ফন্দি বাহির করিল; বলিল,—বেশ ত' বাঁধন এখন ওর নাই বা খুললে, কিন্তু লুকিয়ে কিছু খাবার ওকে দিয়ে এলে ক্ষতি কী? ও খেলো কি না খেলো মাঝিরা ত' তা আর টের পাচ্ছে না।

অনিল কহিল,—হ্যাঁ, ওরা ত' আমাকে নামিয়ে দিয়ে ঐ দিকে কোথায় চলে' গেল—

বুলু তাড়াতাড়ি খাবারের থালা হইতে যত পারিল দুই হাত ভরিয়া তুলিয়া লইল—বাসি নিমকি আর গজা, টাট্‌কা গোলাপজাম আর লিচু। বলিল,—যদি দেখেই ফেলে, মারবে ত' আমাদেরই—তোমার সঙ্গে ঝগড়া হ'তে যাবে কেন? তুমি ত' আর ওর বাঁধন কেটে দিচ্ছ না। জলের গ্লাসটা নিয়ে তুই আয়, দাদা।

বাধা দিতে গণেশের হাত উঠিল না, খালি কহিল,—তোমাদের জন্য কিছুই যে আর রইলো না, বুলু।

বুলু ফিরিয়া দাঁড়াইল না, বলিল,—না ই থাক্। আমাদের জন্যে যে কষ্ট করলো তা'কে ত' আমাদেরই খেতে দেওয়া উচিত। আমরা ত' আর তেমন লোক নই যে খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে ডাকাতের হাতে ধরিয়ে দেব।

সেই শিরিষ গাছের ডালের সঙ্গে গুপীকে তেমনি বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

বুলু অনিলের কাঁধে চড়িয়া লম্বা হইয়া গেল ও কোনরকমে গুপীর নাগাল পাইল যা-হোক্। ফ্রকের কোঁচড় মেলিয়া কহিল,—তুমি এই খাবার নাও, গুপী। পরে আবার তোমাকে জলের গ্লাসটা তুলে দিচ্ছি। বাঁধনও তোমার শিগগির খুলে ফেলবার ব্যবস্থা করবো। ভয় নেই কিছু।

গুপী ছল-ছল চোখে বুলুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মেয়েটা যেন যাদুকরী, মিষ্টি কথায় সমস্ত নিষ্ঠুরতা শিথিল করিয়া আনিয়াছে।

বুলু আবার কহিল,—তোমার কিছু ভয় নেই—ওরা কেউ দেখতে পাবে না। টপাটপ মুখে তুলে নাও—দাদার কাঁধে নিশ্চয়ই লাগছে। ওকেও ওরা তোমার মত অমনি বেঁধে রেখেছিলো—বেচারার সমস্ত গায়ে ব্যথা।

নীচে হইতে অনিল কহিল,—ছাই ব্যথা। ও একদিনে সেরে যাবে। আমার মোটেও লাগছে না।—তুমি আস্তে আস্তে খাও, গুপী।

গুপী অতি কষ্টে হাতটা বাড়াইতে গেল, দড়ির বাঁধন একটুও আল্‌গা হইল না—বুলুই অতি কষ্টে একটা-একটা করিয়া তাহার শীর্ণ প্রসারিত আঙুলের মধ্যে খাবারগুলি তুলিয়া দিতে লাগিল। গুপীর চোখ বহিয়া তখন টসটস্ করিয়া জল গড়াইতেছে।

নয়

রাত্রে বুলুদের ঘরে সেদিন হরলাল আসিয়া শুইল—গণেশের আপত্তি টিকিল না। আর কথা বলে কাহার সাধ্য! একটা কোথাও অস্পষ্ট শব্দ হইয়াছে, হরলাল অমনি তাড়িয়া উঠে। দুই ভাই-বোন অতি নিঃশব্দে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল।

আবার তাহারা কী করিয়া পলাইবে এই বিরাট অন্ধকারে তাহার কোথাও ফাঁক তাহাদের চোখে পড়িতেছে না। তাহারা কেবল ভাবিতেছে—কেন তাহারা সেই গাছের তলায় থামিল, থামিল ত' আবার আশ্রয় পাইবার লোভে অজানা লোকের সঙ্গ লইল কেন? তাহা হইলে এতক্ষণে তাহারা বাড়ির বিছানায় আরাম করিয়া ঘুমাইতেছে—ঘরে তখন আর অমন

বিকট একটা দৈত্য শুইয়া থাকিত না—শিয়রে মা বসিয়া থাকিতেন—তাহাদের মা!

আর একবার যদি তাহারা পলাইবার সুযোগ পায়, তবে কখনই আর থামিবে না—কিছুতেই না। পা ছিঁড়িয়া পড়ুক, মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে মেঘ ডাকুক, বৃষ্টিতে চক্ষু ঝাপসা হইয়া যাক্—তবু তাহারা ছুটিবে—শেষ পর্যন্ত ছুটিবে।

মা-কালী, তবু তোমাকেই ডাকিতেছি—পলাইবার জন্য আর একবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে না? ছেলেমানুষ একবার ভুল করিয়াছি বলিয়াই কি এমনি করিয়া শাস্তি দিবে?

পরদিন বিকাল হইতেই সনাতন অনিলকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। হরলাল গণেশকে চুপি-চুপি ডাকিয়া বলিল,—তোর কথা মত সেই ব্যবস্থাই তা হ'লে ঠিক করলাম। রাত করে' ছেলেটাকে বোনের বিছানা থেকে তুলে নিতে গেলে হয়ত' কান্নাকাটি করবে—আর বোনটিও যেমন আখখুটে, হয়ত' দাদারই সঙ্গে যাবার জন্যে গোঁ ধরে' বসবে। তাই নৌকায় বেড়ানোর ছুতো করে' ওকে আমরা এখুনি সরাচ্ছি। তুই ত' মেয়েটাকে অনায়াসে আগলাতে পারবি।

গণেশ কহিল,—সে আর বলতে হ'বে না। কিন্তু আমাকে খবর পাঠাবি কখন?

হরলাল বলিয়া চলিল,—একেবারে এখন থেকেই নৌকায় গা ঢাকা দিয়ে থাকবো। রাত না পড়তেই অমাবস্যা লাগবে তার পর চারদিক বেশ নিঝুম হ'য়ে এলে কালী-মন্দিরে নিয়ে যাবো। আগে কিছুই ওকে জানতে দিই নি। সনাতন সেই যে বলেছিলো মা-কালী এবার মেয়ে চান্,—সেটা ভুয়ো কথা। তোকে খেপাবার জন্য।

গণেশ হাসিয়া কহিল,—তা আমি জানতাম। অমন মেয়ে কালীর খাবারের জন্যে তৈরি হয়নি।

হরলাল কহিল,—কিন্তু ফৈজু মিঞার জন্যে ত' হয়েছে। সে যাই হোক্,

তোড়জোড় সব হ'য়ে গেলে মাধোকে পাঠিয়ে দেব তোকে ডেকে আনবার জন্যে। কাপালিক ত' সন্ধ্যা থেকেই পুজোর আসবাব-পত্র নিয়ে হাজির থাকবে।

গণেশ কহিল,—আর আসবাবই বা কী? মড়ার কয়েকটা খুলি, আর হাড়—আর পাঁচ-সাত পাত্তর তাড়ি!

—যাই হোক্, মাধো এসে চুপি-চুপি ডাকলেই তুই বেরিয়ে পড়বি। তার আগে মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবি। গুপী আর মাধো দু'জনে পাহারা দেবে। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত কানে যাবে না। তুই ঠিক সময়ে না এসে পৌছুলে কিন্তু কিছুই হ'বে না। কোপ ত' তোকেই বসাতে হ'বে—

গণেশ উদাসীন কণ্ঠে কহিল,—আমি যে সর্দার। তোরা ত' খালি ভোগ করবার দলে। মাধোকে ঠিকঠাক্ পাঠিয়ে দিস্ তা হ'লে? আমি বুলুকে ঠিক ঘুম পাড়িয়ে রাখবো। গুপীকে তাড়া দেব'খন। এইবার একটুখানি এদিক-ওদিক করলে ওরই মাথা যাবে।

—নিশ্চয়। তবু কড়া না হ'লে কি চলে? তবে আমরা ওকে নিয়ে এগোই। মেয়েটাকে তুই ভুলিয়ে রাখ। গুপীকে আমি আগেই বলে রেখেছি। সব বন্দোবস্ত সারা হয়েছে। হরলাল দুই পা আগাইয়া আবার ফিরিল; কহিল,—একটা আপদ ত' ভালয়-ভালয় বিদেয় হ'ল—এখন মেয়েটাকে গছাতে পারলেই নিশ্চিন্ত। তা, রতন সকালবেলা এসে খবর দিয়ে গেল যে কাল রাত্রে ফৈজু আসছে। যা পাওয়া যায়—কী বলিস?

নিশ্চয়। গণেশ সায় দিল। কথা একবার আগেই পাকা হইয়া গিয়াছে, এখন আর নড়চড় হইবে না।

বুলুকে কাছে রাখিবার আর মাত্র একটি দিন—চব্বিশটি ঘণ্টা মোটে হাতে আছে। তাহার পর বুলুও তাহার টগরের মত অকুল জনতার সমুদ্রে কোথায় হারাইয়া যাইবে—আর তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইবে না।

হরলাল কহিল,—বলি দেবার লগ্ন কাপালিকই ঠিক করে' দেবে। অবশ্য তার অনেক আগেই মাধোকে পাঠিয়ে দেব। লগ্ন একবার ফসকালে কিন্তু বলি অশুদ্ধ হ'য়ে যায়—আর তাকে ছোঁয়া যাবে না—মনে আছে ত'?

গণেশ বিরক্ত হইয়া কহিল,—তুই কাকে এ-সব শেখাচ্ছিস আজ? পাঁচটি বছর সমানে এমনি বলি দিয়ে আসছি—লগ্ন অম্‌নি অম্‌নি ফস্‌কালেই হ'ল?

হরলাল বলিল,—তবু একবার মনে করিয়ে দিলাম। বলিয়া সে হনহন করিয়া চলিতে লাগিল। সনাতন নৌকায় অনিলকে নিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

ভাইবোন দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করা হইল তাহা তাহারা ঘুণাক্ষরেও টের পাইল না। অনিল নৌকায় উঠিয়া ভাবিল কোনো সুযোগে পলাইবার পথ একটা হয়ত পাওয়া যাইবে। জানিতেও পারিল না, কী সর্বনাশ ঘনাইয়া আসিয়াছে।

দশ

অনিল জিজ্ঞাসা করিল,—আমাকে তোমরা ডাকাতের দলে ভর্তি করে' নিলে নাকি?

সনাতন নৌকা ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—কেন, পারবি নে?

—খুব পারবো। নূতন আনন্দে অনিলের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এতক্ষণে তবে সে পথ দেখিতে পাইয়াছে। কোনো না কোনো ছুতায় মুক্তি তাহাদের মিলিবেই। এই ভাবে দলে ভিড়িয়া এক সময় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সে বুলুকে নিয়া সরিয়া পড়িবে। কিছু সময় চাই মাত্র। সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে বৈ কি। ইহার মধ্যে পুলিশ আসিয়া উদ্ধার করিলে ত' ভালোই, নতুবা সে-ই নিজের পথ খুঁজিয়া নিবে।

অনিল আবার জিজ্ঞাসা করিল,—আজকে কোথাও একটা ডাকাতি করবে না?

সনাতন হুঁকা ধরাইতে-ধরাইতে কহিল,—দেখা যাক্।

কিন্তু সারা সন্ধ্যা ধরিয়া তাহারা নিরীহ ভাল মানুষের মত খালি নৌকাই টানিতে লাগিল। খাল ছাড়িয়া বড় নদীর ধারেও গেল না।

দূরে একটা নৌকা যাইতে দেখিলে অনিলের মন আনচান করিয়া উঠে—হয়ত উহারা বাক্স-প্যাঁটরা সাজাইয়া বাড়ি চলিয়াছে! কোথায় না-জানি উহাদের ঘর! সামনে দিয়া গেলে অনিল উহাদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত। এখন ডাকিতে যাওয়া বৃথা—ডাকিতে গেলে জলের মধ্যে নির্ঘাৎ উহাকে চুবাইয়া মারিবে।

অনিল অস্থির হইয়া বলিল,—এখানে এমনি খালি ঘুরবে নাকি? বড় নদীতে যাবে না?

হরললাল ধমক দিয়া কহিল,—কেন, এই এমন মন্দ কী! বেশ ত' হাওয়া খাচ্ছিস্।

মাধব নাক কুঁচকাইয়া টিপ্পনি কাটিল,—ছোঁড়ার বাবুয়ানি ষোল আনা। বসতে পেলে শুতে চান্ একেবারে।

না, মন্দ কী! ভালই ত' সে বেড়াইতেছে। তবু বুলুকে সঙ্গে আনিলে আরো ভাল লাগিত। আসিবার আগে তাকে জানানো পর্যন্ত হইল না।

অনিলের প্রতি উহারা হঠাৎ এমন সদয় হইয়া উঠিল কেন বোঝা কঠিন। অথচ ইহারাই আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার উপর কী অত্যাচারটাই না করিয়াছে! এত অল্প সময়েই ইহাদের স্বভাবে এমন অদ্ভুত পরিবর্তন সম্ভব হইল কী করিয়া? সনাতন এমন সদাশয় যে হাতের হুঁকা পর্যন্ত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিতেছে—টানবি নাকি একটু? কোনোদিন খাবার এমন সুযোগ পাবি কি না কে জানে!

ও! তাহার তামাক খাইতে ভারি বহিয়া গেছে। অনিল মুখ ফিরাইয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল—তবু দাদার ফিরিবার নাম নাই। বুলু অস্থির পায়ে কেবলই ঘর-বাহির করিতেছে। ব্যস্ত হইয়া গণেশকে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—দাদা কখন ফিরবে?

গণেশ কহিল,—এই ফিরলো বলে'। হাওয়া খেতে বেরিয়েছে কি না—

—হাওয়া খেতে বেরিয়েছে—আমিই বা এমন কী দোষ করলাম!

—চাই কি পথে দুয়েকটা শিকারও ত' মিলে যেতে পারে। তুমি গিয়ে কী করতে ?

—বা, আমি থাকলে আগে থেকেই বলে' দিতাম—এ নৌকায় তোমরা উঠো না, এ ডাকাতে নৌকা—সব তোমাদের লুট করে' নেবে—

গণেশ হাসিয়া কহিল,—সেই জন্যেই ত' তোমাকে নিয়ে যায় নি। ভালোই করেছে না নিয়ে।

বুলু তবু মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল,—কিন্তু আমাকে ফেলে দাদা একলা গেল কী করে' ?

গণেশ বলিল,—ওকে জোর করে' ধরে' নিয়ে গেলে ও কী করতে পারে ?

ভয়ে বুলুর আকণ্ঠ শুকাইয়া গেল ; কহিল,—জোর করে' ধরে' নিয়ে গেছে ? দাদাকে ? কোথায় ?

গণেশ কথাটাকে সাম্‌লাইল ; কহিল,—কোথায় আবার নিয়ে যাবে ? হয় ত' ডাকাতি শেখাচ্ছে। তারপর দুই আঙুলে বুলুর কপালের উপর চুলের ঘুঙরি তৈরি করিতে করিতে কহিল,—কে জানে—যেমন জাঁহাবাজ ছেলে তোমার দাদা—হয় ত' এক ফাঁকে কোথা দিয়ে পালিয়ে গেছে। তাই হয় ত' হ'বে—নইলে এতক্ষণ আর কি ওরা ফিরে আসত না ? হয় ত' ওর খোঁজে সারা নদী-বন টহল দিয়ে ফিরছে।

তুবড়ির মত বুলুর সারা দেহে আনন্দের ফুলকি বিকীর্ণ হইতে লাগিল ; দীপ্ত কণ্ঠে কহিল,—সত্যি বলছ, সর্দার—দাদা পালিয়েছে ? বলো, বলো, তুমি কী করে' জানলে ? বলিয়া বুলু দুই হাতে গণেশের হাত ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে লাগিল।

গণেশ চোখ বুঁজিয়া কহিল,—আমার মন বলছে সে পালিয়ে গেছে বুলু—দূরে অনেক দূরে—কেউ তাকে আর ধরতে পারছে না।

—সত্যি ? তুমি ঠিক জানতে সে পালাবে ? তুমিই তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছ বুঝি ?

গণেশ বুলুকে সহসা বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—আমাকে

দেখাতে হ'বে কেন? চালাক ছেলে, নিজেই ঠিক বা'র করে' নেবে দেখো।

তাড়াতাড়ি বুলু গণেশের আলিঙ্গন হইতে আলগা হইয়া হাততালি দিয়া উঠিল ; কহিল,—খুব ভাল হ'বে, সর্দার। তুমি যেন ওকে ধরতে যেয়ো না। বড়ো হ'য়ে ঠিক আমি তোমাকে—কী নেবে বলো দিকি আমার থেকে ? ও বাড়ি গেলে মা কত খুসি হ'বেন বলো ত'—তুমি একবার ভাবতে পারো ?

পরে সহসা আবার মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল,—কিন্তু আমাকে সঙ্গে করে' ও নিয়ে গেলো না কেন ? মা যখন জিগগেস করবেন, বুলু কোথায়, তখন ও কী বলবে ? না, আমাকে না-নিয়ে গিয়ে ভালোই করেছে—কী বলো, সর্দার ? আমি ওর মত অত ছুটতেও পারতাম না, লাফাতেও পারতাম না। আমি সঙ্গে থাকলে আমিই হ'তাম একটা বোঝা। মা-বাবা জিগগেস করলে ওর বলে' দিলেই চলবে—বুলু জলে ডুবে মরে' গেছে। আমার জন্যে কা'র বা কতটুকুন ভাবনা। বলিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

গণেশ আবার তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—কান্না কিসের, বুলু ? তুমি এবারে খেয়ে নাও—রাত ত' বেশ হ'ল, তারপর আমরা ঘুমুব।

দুই হাতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বুলু কহিল,—আজ আমি খাবো কী সর্দার ? দাদা পালিয়েছে এই খবর পেয়েই ত' আমার পেট ভরে' গেছে। খাবার আর দরকার নেই।

—তবে শুয়ে পড়ো।

বুলু চুপ করিয়া তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িল। দাদা যেন সত্যিই আর ফিরিয়া না আসে—দূরে বহুদূরে চলিয়া যায়—ঠিক তাহাদের কলকাতার বাড়িতে—সতেরো নম্বর বকুলবাগান ফার্ষ্ট লেনে। ভোর হইলে বাড়িতে কেমন উৎসব লাগিয়া যাইবে—আকাশের ঐ তারাটির মত বুলু চোখের উপরে সব স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। দাদারই ত' প্রথম বাঁচা দরকার—তাহাকে দিয়া পৃথিবীর কত কাজ হইবে, তাহার কত কীর্তি

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকিবে, দিনরাত্রির অনন্ত বন্যায়ও সে-অক্ষর ম্লান হইবে না। সে মেয়ে বলিয়া তাহাকে দিয়াও কোনো কাজ হইত না এমন নয়, কিন্তু এখন সে-কথা ভাবিয়া মন সে কিছুতেই খারাপ করিবে না। আগে দাদা বাঁচুক,—দাদার জন্য মরিতে তাহার দুঃখ নাই।

কি-একটা কাজে গণেশ বাহিরে যাইতেই বুলুও বাহিরে চলিয়া আসিল ; কিন্তু দরজার ওপারে গুপী হুঁসিয়ার হইয়া কড়া পাহারা দিতেছে। আজ সে সহজে নড়িবে না।

গুপী কহিল,—কোথায় যাচ্ছ খুকুমণি ?

—কে, গুপী ? কোথায় আবার যাবো ?—দাদা পালিয়েছে, জানো ?

—পালিয়েছে ? গুপী একেবারে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

—তুমি কিছু শোননি বুঝি ? সেই সন্ধ্যের সময়—মাঝিরা ওকে ধরতেই পাচ্ছে না। কোথা দিয়ে কোথায় যে পালিয়ে গেল—টিকিটিও দেখতে পেলে না ! ভোর বেলায়ই বাড়ি পৌঁছুবে।

গুপী জোর দিয়া কহিল,—মিথ্যা কথা।

—তুমি বললেই ত' আর মিথ্যে হ'য়ে যাবে না। সর্দার নিজে আমাকে বলেছে। তুমি ত' তার চেয়ে বেশি জানো না।

ব্যাপারটা এতক্ষণে গুপীর আয়ত্ত হইল। বুঝিল এই চঞ্চল মেয়েটাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য গণেশ এই কৌশল করিয়াছে। তাই সে নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার জায়গায় গ্যাঁট্ হইয়া বসিয়া কহিল,—পালিয়েছে ত, বেশ করেছে, তুমি এবার ঘুমোও গে যাও।

বুলু কহিল,—ঘুমুব কী ! দাদা বন-নদী ভেঙে এখন ছুটছে, আর আমি ঘুমুব ! বেশ বলছ, দেখি। ভোরবেলার দিকে দাদার ট্রেন যখন প্রায় শেয়ালদা গিয়ে পৌঁচেছে, তখনই যদি একটু ঘুম আসে। তখন ঘুমুতে আমাকে হ'বেই। কেননা দাদার সঙ্গে আমাকে দেখতে না পেয়ে মা'র সে-কান্না আমি দেখতে পারবো না।

পরে ঘনিষ্ঠ হইয়া বুলু কহিল,—আজকের রাতে তোমাদের সে-বলি ত' আর হ'ল না।

গুপী সাবধানে কহিল,—হ'ল না মানে? হ'তেই হ'বে। বলি না হ'লে মা-কালী যে দল-কে-দল ধরিয়ে দেবেন।

—সেই তোমাদের বিশ্বাস নাকি? তা, মেয়ে জোগাড় হয়েছে তোমাদের?

—হয়েছে বৈ কি। না হ'লে চলবে কেন? জোগাড় একটা যে করে' হোক্ করতেই হ'বে।

—বেশ হ'বে তা হ'লে। মাঝিদের ত' তা হ'লে ফিরে আসতেই হ'বে——দাদার পেছনে আর ছোটা চলবে না। দাদা বেঁচে যাবে—আর সর্দারের কড়া হুকুমে আমার গায়ে ত' হাতই তুলতে পারবে না কেউ। ভালই হ'ল। তা, কখন বলি হ'বে?

—শিগগির। তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, খুকি। বলির কান্না শুনতে নেই। ছেলেপিলেরা শুনলে তাদের অমঙ্গল হয়।

বুলু কান খাড়া রাখিয়া কহিল,—এখান থেকে শোনা যায় নাকি? তোমাদের সেই মন্দির কত দূরে?

—এই ত' খানিকটা পথ। একটা ঝোপের মধ্যে।

—শুনলে কী অমঙ্গল হয়?

গুপী মুরুব্বিয়ানা করিয়া কহিল,—ছেলেপিলেদের কেউ শুনলে তাদের আত্মীয়ের মধ্যে একজন মারা যায়।

—তবে কাজ নেই আমার শুনে। আমি শুয়ে পড়ি গে। ঐ যে সর্দার এসে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়লে কেউ যেন আমাকে জাগিয়ে দিয়ো না, গুপী। ভালো হ'বে না তা হ'লে। বলিয়া বুলু বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

গণেশ শিয়রে ঝুঁকিয়া তাহার কপালে একখানা হাত রাখিয়া প্রশ্ন করিল,—ঘুম আসছে না বুলু?

প্রাণপণে চক্ষু বুঁজিয়া রাখিয়া বুলু কহিল,—এই আসছে। দাদাকে ওরা ধরতে পারেনি ত', সর্দার?

গণেশের বুক ভেদ করিয়া শব্দ বাহির হইল,—না।

এইবার নিশ্চিন্ত হইয়া বুলু ঘুমাইবে।

কিন্তু ঘুম আসিতেছে না। দাদার কথা ভাবিয়া নয়; কালীর মন্দিরে অসহায় কোন্ অনাথ শিশুর অন্তিম আর্তনাদ শুনিবার প্রতীক্ষায় সে কান খাড়া করিয়া রহিয়াছে।

এগারো

অনেক রাত করিয়া নৌকা এক জায়গায় আসিয়া থামিল। সে জায়গাটা যেমন দুর্গম তেমনি অন্ধকার। বিস্তীর্ণ নির্জনতায় ভয় পাইয়া চারিদিকের গাছ-পালা ঝোপঝাড়গুলি পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া রাশীভূত হইয়া উঠিয়াছে। পা ফেলিতে অনিলের স্নায়ু-শিরাগুলি কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল— —মাধবকে জিজ্ঞাসা করিল,—আমরা কোথায় এখন যাচ্ছি? বাড়ি যাবার এই কি রাস্তা নাকি?

মাধব কহিল,—বাড়ি যাবো কোন্ দুঃখে? যাচ্ছি মন্দিরে। আজকে মা'র কাছে সেই বলি দেবার দিন না? বলিয়া সে চোখ টিপিয়া শয়তানি হাসি হাসিয়া কহিল,—তুই কিছু জানিস না বুঝি?

হরলাল বলিয়া উঠিল,—না, না, জেনে কাজ নেই। চলো হে অনিলবাবু।

বলির কথা শুনিয়া অনিলের সর্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসিল। শুক্‌নো গলায় কহিল,—বলির মেয়ে ত' কই ধ'রে আনলে না!

সনাতন তাহার পিঠে এক ধাক্কা মারিয়া কহিল,—সে-জন্য তোর মাথা ঘামাতে হ'বে না। যা, এগো।

তবে উহারা বুলুকেই বলির জন্য ধরিয়া আনিবে নাকি? সর্দার কি তাহাতে বাধা দিবে না একটুও? আর সেই বলি অনিলকে চোখ মেলিয়া দেখিতে হইবে!

একবার বেলতলা রোডের বারোয়ারি দুর্গা-পূজায় সে পাঁঠা-বলি দেখিয়াছিল। মনে-মনে সে-কথা ভাবিয়া এখনো তাহার হৃৎকম্প সুরু হয়,—তাহার পর কত রাত্রি তাহার দুঃস্বপ্নে কাটিয়াছে। সেই পাঁঠাটার

মতই বুলু কাঠগড়ায় গলা পাতিয়া বিকৃতস্বরে প্রাণপণে চীৎকার করিবে—আর অনিল তাহার দাদা হইয়া একটা আঙ্‌ুলও তুলিতে পারিবে না।

গাছ পাতায় নিবিড় করিয়া ঘেরা ছোট একটা ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া সকলে থামিল। এইখানে সমস্ত আকাশ রুদ্ধ হইয়া আছে,—বাহিরে যে প্রকাণ্ড পৃথিবী নদ-নদী মাঠ-পর্বত বেষ্টন করিয়া চারিদিকে প্রসারিত হইয়া আছে, এ-কথা ধারণাই করা যায় না। মন্দিরের সামনে কাপালিক আগে হইতেই বসিয়া আছে—সেই আজ রাত্রে পূজা করিবে। কাপালিকের বিশাল চেহারা, মাথায় স্তূপীকৃত দীর্ঘ জটা, সারা গায়ে ভস্ম মাখা—চক্ষু দুইটা যেন আগুনের ডেলার মত গন্‌ গন্‌ করিতেছে। সকলকে দেখিতে পাইয়া কাপালিক কহিল,—এলি এতক্ষণে? গণেশ কৈ?

হরলাল আগাইয়া আসিয়া কহিল,—ওকে এখুনি খবর পাঠাচ্ছি। পূজোর আয়োজন সব ঠিক ক'রে ফেলি আগে। পরে অনিলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—এই ছোঁড়া, প্রণাম কর এঁকে।

ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অনিল কাপালিকের পায়ের কাছে নত হইল। লোলুপ চক্ষু দিয়া তাহার সর্বাঙ্গ লেহন করিতে করিতে কাপালিক কহিল,—বা! বেশ নধর ছেলেটি ত'। দেখে খুসি হওয়া গেল।

মন্দিরের গায়ে দড়ি বাঁধা একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছে—তাহারই আলোতে অনিল পাষাণময়ী কালীকে দেখিল। রক্তপিপাসু জিহ্বা আগুনের শিখার মত লক্‌লক্‌ করিতেছে। সামনেই প্রকাণ্ড খড়্গ—তাহাতে আবার চক্ষু আঁকা! কাপালিক সিন্দুর দিয়া সেই খড়্গ চিত্রিত করিতে বসিল।

অনিল চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, বুলুকে দেখা গেল না। অথচ অন্য কোন বলিও এখন পর্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। না হোক, সে আগাইয়া আসিয়া মন্দিরের সামনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে কহিল,—বুলুকে তুমি ভালো রাখ, বুলু যেন আর কষ্ট পায় না।

কাপালিক হাসিয়া কহিল,—ছেলেটার দেখছি ভারি ভক্তি!

সনাতন তাহার কানে-কানে কহিল,—এখনো জানতে দিই নি। নইলে এখন থেকেই চ্যাঁচাতে সুরু করবে।

কাপালিক কহিল,—হ্যাঁ, অজ্ঞানেই ত' বেশি আনন্দ। বলিয়া সে মড়ার খুলিতে ঠোকর দিতে-দিতে কি সব দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াইতে লাগিল।

অনিল মাধবকে ফের জিজ্ঞাসা করিল,—এখনো তোমাদের বলির মেয়ে এলো না?

সনাতন কহিল,—এই আসছে। যা ত' মাধো, গণেশকে গিয়ে চুপিচুপি খবর দে। তুই কিন্তু ওখানে থাকিস, মেয়েটাকে পাহারা দিবি, যা।

মাধব অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তবে গণেশই বুলুকে লইয়া আসিবে নাকি? অথচ মেয়েটাকে পাহারা দিবার জন্য মাধবকে ঐ দিকে মোতায়েন রাখা হইল। বুলুকে ছাড়া পাহারা দিবার মত আর মেয়ে কোথায় এখানে? কিন্তু বলি দেবার জন্য মেয়েই বা কখন ধরিয়া আনিবে? অনিল বিমূঢ় চোখে ইহাদের কাণ্ড-কারখানা দেখিতে লাগিল।

কি-সব যাগ-যজ্ঞ সুরু হইয়াছে, মড়ার খুলিতে করিয়া কি সব তরল পানীয় খাইয়া ইহাদের চোখ-মুখ ক্ষিপ্ত, বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। উগ্র গন্ধে অনিলের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। এখনো ত' অভিনয়ের শেষ দৃশ্য বাকি আছে। একটি আশ্রয়চ্যুত দুর্বল শিশুর মুণ্ডুটা খাঁড়ার এক কোপে শরীর হইতে কেমন করিয়া আলাদা হইয়া আসিবে তাহা তাহার চোখ মেলিয়া দেখিতে হইবে। পৃথিবীতে কোথাও এতটুকু ঝড় উঠিবে না।

গণেশ আসিয়া পৌঁছিল—তাহার হাত শূন্য। বুলুকে তাহা হইলে আনে নাই—সর্দার সত্যই খুব ভালো লোক—বুলুর উপর তাহার অগাধ মায়া!

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল,—মেয়েটা কী করছে?

গণেশ কহিল,—ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। সব তৈরি ত'? বেশ! পূজোর আর বাকি কত?

অনিল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। বুলু তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে যে এই বীভৎস দৃশ্য দেখাইতে উহারা তুলিয়া আনে নাই এজন্য মনে-মনে সে খুসি হইল। সে নিজেই বা এই দৃশ্য সহিতে

পারিবে নাকি ? সেই দুর্গা পূজার দিনে পাঁঠার সেই করুণ আর্তধ্বনি এখনো তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে !

কিন্তু বলি কোথায় ? হয় ত' কাপালিকের ঝুলিটার মধ্যে কোন সদ্যোজাত শিশুকে মুড়িয়া রাখা হইয়াছে—এখুনি দেখা যাইবে।

বুলু একলা ঘুমাইতেছে—রক্ষী মাত্র গুপী আর মাধব। গুপীই বা কোন্ ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে নাই ! অনিল সঙ্গে থাকিলে আবার তাহারা পলাইয়া যাইত—আর একবার দৌড়িতে আরম্ভ করিলে কখনোই তাহারা থামিত না। কাল কী ভুলটাই যে হইয়া গিয়াছিল !

কাপালিক হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল,—পূজো শেষ। এবার ধরে' নিয়ে আয় ওকে। খাঁড়াটাও আমি উৎসর্গ করে' দিয়েছি। ওকে চান করিয়ে আনবি নে ?

কাহাকে যে উহারা কাপালিকের কাছে ধরিয়া নিয়া যাইবে অনিল চট্ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। হতভম্বের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

গণেশ কহিল,—চান করাবার সময় নেই। গোলমাল বাধ্‌তে পারে। বলিয়া সে হরলালকে ইসারা করিল।

হরলাল সহসা অনিলের দুই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল,—চলে' এস বাছাধন। তোমার ত' একটা গতি করি, বোন্‌টার পথ কাল সাফ করা যাবে।

গণেশ দুই হাতে প্রকাণ্ড খড়্গটা উত্তোলন করিয়াছে—কোমরে তাহার গামছা বাঁধা। প্রবল কণ্ঠে সে গর্জন করিয়া উঠিল,—পা দুটো ধরে' তুলে আন্ সনাতন ! শিগ্‌গিরি।

কাপালিক চক্ষু মুদিয়া বজ্রস্বরে হাঁকিয়া উঠিল,—জয় মা ভৈরবী !

সনাতনকে সাহায্য করিতে হইল না, হরলাল একাই অনিলকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া আনিতে পারিয়াছে। অনিলের বুঝিতে আর কিছু বাকি নাই, কিন্তু সত্যিই যে সে কী বুঝিল,—তাহা কে বলিবে ! তাহার চোখের উপরে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া নিরেট পাহাড় হইয়া গেল, বাতাসের চলাচল

বন্ধ হইয়া গেল—ছোটার বেগে কোন্ একটা গ্রহের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া কাঁচের বাসনের মত পৃথিবীটা নিমেষে যেন টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া গেল।

অনিল তারস্বরে—অন্ধকার আকাশ বিদীর্ণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—মাগো! বুলু রে—

সেই চীৎকার শুনিয়া গলার রগ ফুলাইয়া কাপালিক অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

গণেশ পুনরায় গর্জন করিয়া উঠিল,—ঘাড় মুচ্‌ড়ে দে না ওকে কাঠগড়ার মধ্যে গুঁজে— দেরি হচ্ছে কেন?

অনিলের মুখ দিয়া আবার একটা ভয়বিহ্বল অসহায় আর্তনাদ বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু গলার উপরে হরলালের দৃঢ় দশটা আঙুলের প্রাণান্তকর চাপে সেই স্বর অর্ধপথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অনিলের কোন কথা আর মনে রহিল না—মা'র মুখ, বুলুর চক্ষু দুইটী, বাবার কথা, ঘর বাড়ি ইস্কুল রাস্তা ট্রাম মোটর মনুমেন্ট্ মিউজিয়ম, সব তাহার চোখের সমুখ দিয়া বায়স্কোপের ফিতার মত ঘুরিয়া চলিল। বুলুকে আর একবার দেখিয়া আসা হইল না, এ-কথা শুনিলে মা আর বাঁচিবেন না। তবুও মনে-মনে সে একবার বলিল,—আমাকে ত' তুমি নিলে, কিন্তু হে মা কালী, বুলুকে তুমি দয়া কোরো। ওকে মার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

গণেশ শূন্যে খড়্গটা দুইবার নাচাইয়া ক্ষিপ্তের মত চেঁচাইয়া উঠিল,—শিগ্‌গিরি কর হরলাল—শিগ্‌গিরি।

হাত তুলিয়া কাপালিক নির্মম কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—জয় মা কালিকে।

বারো

. গণেশ কখন শিয়র হইতে উঠিয়া গেল বুলু ঠিক টের পাইয়াছে। কিন্তু জাগিবার এতটুকু লক্ষণ সে দেখাইল না। সর্দার এত রাতে কোথায় যায়! দরজাটা যে প্রায় খোলাই রহিল। যাইবার সময় গুপীকে সে বলিয়া গেল,—আমি খানিক বাদেই আসছি—কাজটা সেরে। হুঁসিয়ার থাকিস্ গুপী!

গুপী ঘুমো চোখে বলিল,—হুঁ !

গণেশ আবার কহিল,—বুলু অবিশ্যি ঘুমোচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা মেয়ে—ওর দাদার মত নয়। ওর জন্যে ভয় করি না।। তবু চোখ রাখিস যেন। কিছু একটা হ'লে ওদের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। তবুও এখানে থাক্, মাধো। বলিয়া গণেশ পায়ে-পায়ে লতা-পাতার শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

যাক্ আরও দূরে যাক্ ! বুলু মুচকিয়া হাসিল—সে ঠাণ্ডা মেয়ে বৈ কি, এখন ত' তাহার ঘুমাইবার কথা !

মাধব গুপীর গায়ে ঠেলা দিয়া কহিল,—ঐ ত' এক-রত্তি একটা পুঁচ্‌কে মেয়ে—তুই একা সামলাতে পারবি নে ?

ঘুমে জড়াইয়া জড়াইয়া গুপী কহিল,—খুব পারবো।

—আমি তবে বলিটা একটু লুকিয়ে দেখে আসি, কেমন ? নতুন ধরনের বলি কি না—বুঝলি নে ? কাউকে বলে' দিস নে যেন।

—না, যা তুই।

মাধব তখুনি অন্য পথে মন্দিরের দিকে ছুট দিল।

বলি ! নতুন ধরনের বলি ! বুলু বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

হোক গে বলি, বুলুর তাহাতে কণামাত্র কৌতূহল নাই—এক-রত্তি পুঁচ্‌কে মেয়েকে গুপী একা সাম্‌লাইবে বৈ কি ! সে এইবার আস্তে সরিয়া পড়িবে। মাধবও চলিয়া গিয়াছে। সারা সকাল প্রহার ও পীড়ন সহিয়া গুপী ক্লান্তিতে এখন নিশ্চয়ই ঝিমাইতেছে—ঘুমে তাহার স্বর আড়ষ্ট ! দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলে সে টেরও পাইবে না।

আর টের যদি পায়ও,—বুলুর বড় আশা হইল,—গুপী নিশ্চয়ই তাহাকে পলাইয়া যাইতে বাধা দিবে না। সকালবেলা দাদার কাঁধে চড়িয়া সে নিজে হাতে উহাকে খাবার খাওয়াইয়া দিয়াছে। সে কথা কি সে এই কয়-ঘণ্টায় ভুলিয়া যাইবে ? তাহাকে দাদার পিছে-পিছে মা'র কাছে ফিরিয়া যাইতে দিবে না ?

জুতো জোড়া পরিয়া নিবে নাকি ? দরকার নাই,—ফুটুক কাঁটা, বুলু কিছুতেই আর পেছপা হইবে না। জুতো পায়ে থাকিলে সে তাড়াতাড়ি

ছুটিতে পারিবে না,—তাহা ছাড়া জুতো পরিবার সময়ই বা এখন কোথায় ? খুঁজিয়া নিতেও ত' দেরি হইয়া যাইবে। থাক্, বুলু পা টিপিয়া দরজার সামনে আসিল। মেয়ে বলিয়া দাদা যেন আর তাহাকে ঠাট্টা করিতে না আসে! দাদার চেয়ে সে কিসে কম!

আস্তে দরজাটা সে খুলিল—ঠিক, বেড়ার গায়ে হেলান দিয়া বসিয়া গুপীচন্দ্র পা ছড়াইয়া ঘুমযাইতেছেন!

ঘুমাও গুপী, তোমাকে আমি বিরক্ত করিব না।

দরজার বাহিরে বুলু সবে এক পা বাড়াইয়াছে, অমনি রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দূর হইতে একটা করুণ চীৎকার বুলুর বুকে আসিয়া বিদ্ধ হইল। দূর হইতে কে যেন তাকে ডাকিল,—বুলুকে ডাকিল—হ্যাঁ, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল! সেই ডাক গাছ-পালায় বনে-বনান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া বারে-বারে তাহাকে ডাকিতে লাগিল—বড় বিপদে পড়িয়াছি বুলু, আর বুঝি তোকে দেখিতে পাইলাম না।

চীৎকার শুনিয়া গুপীও ধড়মড় করিয়া উঠিল। বুলু ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল,—ও কে কাঁদে গুপী!

গুপী উঠিয়া বসিল না, নির্লিপ্তের মত কহিল,—কে আবার! সেই বলি হচ্ছে না আজ। তার কান্না।

—বলি হচ্ছে ? সূঁচের মত তীক্ষ্ণ একটা কাঁপুনি বুলুর পা হইতে মাথা পর্যন্ত ধীরে-ধীরে উঠিয়া গেল। প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল,—কিন্তু দাদা কাঁদছে যে! ঠিক দাদার গলা!

গুপী কহিল,—তা কী করা যাবে ?

—দাদাকেই ওরা বলি দিচ্ছে নাকি ?

গুপী আবার কহিল,—তা কী করা যাবে!

—কী করা যাবে! বুলু ঘরের মধ্যে পাগলের মত দুই হাতে চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ফাঁকি দিয়া দাদাকে উহারা কালী-মন্দিরে বলি দিতে নিয়া গিয়াছে। সে দাদার ছোট বোন হইয়া ইহার কোনো প্রতিবিধান করিতে পারিবে না ?

সময় নাই, সময় নাই—যাহা করিবার এখুনিই করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু কী করা যায়!

বিদ্যুৎ-বিকাশের মত বুলুর মাথায় কি-একটা চমক দিয়া উঠিল। তাই! তাড়াতাড়ি বুলু কুলুঙ্গি হইতে কেরোসিনের কুপিটা টানিয়া আনিয়া বিছানাময় ছড়াইয়া দিল,—ক্ষিপ্রহস্তে বিছানার চারধারে আর সব জিনিস-পত্র কাপড়-জামা খড়-কুটা কাঠ-কাগজ যাহা যেখানে পাইল সব জড়ো করিয়া লইল। কাল তামাক খাইবার জন্য টিকে ধরাইয়া হরলাল দেশলাইটা কোথায় রাখিয়াছিল তাহা সে আগেই জানিত। সেই দেশলাইটা খুঁটির পিছনে বেড়ার গায়ে তেমনি আট্‌কানো আছে। ভগবান, যেন উহাতে কাঠি থাকে! একটু দয়া করিলে এত বড় সৃষ্টিতে তোমার কিছু ক্ষতি হইবে না।

কাঠি আছে,—কাঠি আছে। বুলু ফস্ করিয়া কাঠি ধরাইল। আগুনের ক্ষণিক শিখায় বুলুর সে মুখ কেমন রুক্ষ, কাতর, অসহিষ্ণু দেখা গেল। কেরোসিন তেলে ভিজানো রাশীকৃত বিছানার উপর কাঠিটা ফেলিয়া দিয়া বুলু নিমেষে ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

প্রথমে খুব-খানিকটা ঘন-কালো ধোঁয়া তার পরে আগুন। সেই আগুনের উৎসবে অমাবস্যা রাত্রি আলোর আনন্দে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

পোড়ার গন্ধ পাইয়া গুপী তন্দ্রা ভুলিয়া লাফাইয়া উঠিল। ঘরের চেহারা দেখিয়া সে একেবারে স্তব্ধ হতবাক্ হইয়া গেল। কী যে এখন করা যায় চট্ করিয়া কিছুই সে ভাবিয়া পাইল না। চীৎকার করিয়া উঠিল—বুলু!

—এই যে।

সামনে দাঁড়াইয়া বুলু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেই লেলিহান আগুনের নৃত্য দেখিতেছে।

হাওয়া ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে—দগ্ধ জিনিসের টুকরা ছড়াইয়া পড়িয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, আগুনের উদ্ধত শিখার সামনে তারাগুলি চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিতেছে না। শিশুর প্রতিহিংসার এই উদ্দাম রূপ

দেখিয়া গুপীর সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া আসিল, কহিল,—এ কী করলি, খুকী?

বুলু মাটিতে এক লাথি মারিয়া কহিল,—বেশ করেছি, একশো বার করবো। আমার দাদাকে ওরা মেরে ফেলেছে না? আমাকেও এইবার মারুক। দাদাকে ছেড়ে আমি বাঁচবো না। বলিয়া বুলু ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তেরো

রুদ্ধবাক মৃতপ্রায় অনিলের ঘাড় বাড়াইয়া গণেশ প্রায় কোপ্ বসাইবে, কাপালিক অমনি শূন্যে হাত তুলিয়া গলা ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—আগুন, আগুন।

দক্ষিণের আকাশটা সমুদ্রের জলে সূর্যাস্তের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। গণেশদেরই বাড়ি-ঘর সব পুড়িতেছে নিশ্চয়—ওদিকে বনের শেষে আর কাহারও বাড়ি নাই। গণেশের হাতের খাঁড়া শিথিল হইয়া আসিল; কহিল,—আমাদেরই বাড়ি নাকি রে হরলাল?

হরলাল গাছের ফাঁকে উঁকি দিয়া কহিল,—তাই ত' মনে হচ্ছে।

—বলিস্ কি? শিগগির ছুটে চল্—ঐ ঘরে যে বুলু শুয়ে আছে।

বলিয়া হাতের খড়্গ মাটিতে ফেলিয়া দিয়া গণেশ দ্রুত পায়ে অগ্রসর হইল।

সনাতন চেঁচাইয়া উঠিল—কিন্তু কালীপুজোর বলি?

আর কালী-পুজো! আগুনের শিখায় রক্তলিপ্ত লেলিহ রসনা দিকে-দিকে প্রসারিত করিয়া উন্মাদিনী কালী আকাশে নৃত্য করিতেছেন। সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার দণ্ড নিষ্ঠুর নিদারুণ রূপে দেখা দিয়াছে। ভয়ে ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া গণেশ বন-বাদাড় ভেদ করিয়া ছুটিতে লাগিল।

চেঁচাইয়া বলিল,—হ্যাঁ রে, আমাদেরই বাড়ি। গেল সব পুড়ে ছাই হ'য়ে—তোরা এগো শিগগির।

বুলু,—বুলু আগুন লাগিবার আগে বাহির হইতে পারিয়াছে ত'?

সেই আগুন যেন গণেশের বুকের মধ্যে জিহ্বা বিস্তার করিয়া দিয়াছে।

হরলালও আর দ্বিধা করিল না, বেগে ছুটিয়া চলিল; কহিল—ছোঁড়াটাকে তুলে নিয়ে চল্। আর কেন?

সনাতন প্রশ্ন করিল—কেন, বলি হ'বে না তবে?

কাপালিক উত্তর দিল,—হাতের খাঁড়া যখন মাটিতে একবার খসে' পড়লো, তখন আর বলি কিসের? কোথায় যেন ভীষণ ত্রুটি হ'য়ে গেছে হরলাল, দেবীর মুখ আজ প্রসন্ন নয়। ছাখ্, ছাখ্, ঐ চেয়ে ছাখ্ মা'র হাতের খড়্গ কেঁপে উঠছে। পরিণামে কোথায় একটা প্রলয় উঠ্‌বে ঠিক। জয় মা কাত্যায়নী!

সনাতন ধীরে-ধীরে অনিলকে কাঠগড়া হইতে মুক্ত করিয়া লইল। নাক মুখ দিয়া টপটপ করিয়া রক্ত গড়াইতেছে—সেই রক্ত দেখিয়া ভয়ে সনাতন দুই পা পিছাইয়া আসিল, তাহাকে স্পর্শ করিতে আর হাত উঠিল না। মনে হইল কালী যেন সেই রক্তের অন্তরালে জিহ্বা মেলিয়া সনাতনের দিকে চাহিয়া আছেন!

সহসা কাপালিক হুঙ্কার দিয়া উঠিল,—ঐ দেখ, কালী আকাশের বুক চিরে রক্ত খাচ্ছেন। এই না হ'লে মা অশিবনাশিনী! বলিয়া সে তাহার জিনিস-পত্র মাল-মশলা ঝোলা ঝুলিতে লইয়া গভীরতর বনের উদ্দেশে পাড়ি দিল।

সনাতন অনিলকে কহিল,—আর দাঁড়িয়ে কেন? তোর ত' আয়ুর বেজায় জোর দেখছি—খাঁড়ার তলায় শুয়ে বেঁচে উঠ্‌লি। কিন্তু আগুনে ওদিকে তোর বোন যে পুড়ে মরলো। যাবি না ওদিকে? না, হাঁ করে' অমনি দাঁড়িয়ে থাকবি?

অনিলের এতক্ষণে একটু হুঁস হইল। সে বাঁচিয়া আছে না মরিয়া গেছে তাহাই সে ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছিল না। বুলু—হ্যাঁ, নামটা তাহার চেনা লাগিতেছে বটে! আকাশটা ঐ ত' টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিয়াছে। পায়ের নীচে কী ওটা পড়িয়া? খাঁড়া? অনিল শিহরিয়া উঠিয়া ঘাড়ের উপরে হাত রাখিল, দুই হাতে মাথাটা ধরিয়া প্রবল ঝাঁকুনি মারিল—না,

মাথাটা অটুট আছে। নাকের নীচে হাত পাতিয়া স্পষ্ট সে অনুভব করিল, সে বেশ নিশ্বাস নিতেছে।

অল্পে-অল্পে সে এখন চারিদিককার অবস্থাটা আয়ত্ত করিতে পারিল। এতক্ষণ সে মৃতের রাজ্যে—চিরস্তব্ধতার দেশের প্রায় সীমান্তে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রাখিতে যাইবে অমনি কে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া নীচে মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছে।

হ্যাঁ,—বুলু, বুলুর কী হইয়াছে বলিলে? অনিল এইবার ঠিক বুঝিতে পারিবে।

তাহাকে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সনাতন ফের কহিল, —তোর বোন যে পুড়ে' মরলো ছাই! এদিকে বোনের জন্যে ত' কত কান্না!

—পুড়ে' মরে' গেছে? বুলু? অনিল আরেকবার কালী-মন্দিরের কাছে ধুপ্ করিয়া মাথা ঠেকাইয়া কহিল,—আমারই মত বুলুকে বাঁচিয়ে দাও। বলিয়া আর দাঁড়াইল না। তীরের মত, এঞ্জিনের মত ছুটিয়া চলিল। সনাতন যে সনাতন, সেও তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া পারিয়া উঠিতেছে না। জীবন ফিরিয়া পাইয়া ছেলেটা যেন কয়েক মুহূর্তেই পক্ষীরাজ ঘোড়া হইয়া উঠি

সকলের আগে গণেশই প্রথম উপস্থিত হইল। আগুনের অবস্থা দেখিয়া গণেশের প্রাণে আর জল নাই—সব ঘর কয়খানাই ধরিয়া গিয়াছে। কাল ভোরে সেই সব ঘর-দুয়ারের কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না—খালি কয়েক মুঠা ছাই হাওয়ায় উড়িয়া যাইবে।

উঠানে আসিয়াই গণেশ ডাক দিল,—বুলু!

পাশে একটা গাছের তলা হইতে বুলু নির্ভয় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—এই ত' আমি—এই দিকে।

স্বর অনুসরণ করিয়া গণেশ গাছের তলায় গিয়া দেখিল একটা শক্ত লতা দিয়া গুপী বুলুকে নির্মমভাবে বাঁধিয়া রাখিতেছে।

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল,—কেন ? আগুন লাগল কিসে ?

গুপী উত্তেজিত হইয়া কহিল—ওই ত' লাগিয়েছে।

—লাগিয়েইছি ত'! একশো বার লাগাবো। কেন তোমরা দাদাকে কেটে ফেললে ? তার বদলে আমি তোমাদের ঘরে আগুন লাগাবো না ?

পাষাণকায়া কালীর চক্ষের মতই বুলুর দুই চোখ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গণেশের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

গণেশ হুকুম করিল,—শিগ্‌গির খুলে ফেল্ বলছি—

বাঁধন খুলিতে-খুলিতে গুপী আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিল,—যদি আবার পালিয়ে যায় সেই জন্যে বেঁধে রেখেছি।

বুলু মুখ-ঝামটা দিয়া উঠিল—তা বাঁধবেই ত'! দাদার কাঁধে চড়ে' তোমাকে খাবার খাইয়ে দিই নি ? না বাঁধলে সে-উপকার শোধ করবে কী করে' ? পাহারা দেবার নাম করে' বাইরে বসে' ঝিমোও, আর ঘরের মধ্যে যাকে কয়েদ ক'রে রেখেছ সে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়— আমাকেই ত' বাঁধবে ? গায়ের জোরে তোমার সঙ্গে পারি না কি না ?

তারপর বাঁধন থেকে ছাড়া পাইয়া বুলু হঠাৎ গণেশের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল,—সত্য কথা বললাম বলে' আমাকে খুব শাস্তি দেবে, সর্দার ? দাদার মত দা দিয়ে কেটে ফেলবে আমাকে ? তা ফেল। দাদাকে ছেড়ে বাঁচতে আমার ইচ্ছা করে না।

পাহাড়ের গা বাহিয়া যেমন ঝর্ণা নামে তেমনি গণেশের কঠিন হৃদয়ে মমতার বান ডাকিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি বুলুকে সে কোলে তুলিয়া লইয়া অগাধ স্নেহে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল,—শাস্তিই তোমাকে দেব বৈ কি।

গণেশের এই স্নেহস্বরের গভীর অর্থ বুলু চট্ করিয়া বুঝিতে পারিল না, কহিল,—তা, যা খুসি তোমার শাস্তি দাও। কিন্তু তুমি যদি দাদার ছোট বোন হ'তে, আর তোমার দাদাকে যদি ডাকাতরা কেটে ফেল্‌ত সর্দার, তাহ'লে তুমি কী করতে বলো দিকি ? কিছুই কী তুমি করতে না ? দাও, আমাকে কোল থেকে নামিয়ে দাও, দাদার মত আমাকেও কেটে ফেল।

গণেশ বুলুকে বুকের উপর নিবিড়তর মমতায় আঁকড়িয়া ধরিল। সে শাস্তি না দিক্, কিন্তু আগুন লাগিবার কারণটা একবার জানিলে হরলাল উহাকে আস্ত রাখিবে না। সেই ব্যবহারটাই ত' হরলালের চরিত্রে অতি-মাত্রায় সঙ্গত হইবে। তাহাকে গণেশ কী বলিয়া বাধা দিবে? কী বলিয়া তখন বুলুকে বাঁচানো যাইবে? যে-মেয়ে ঘর-বাড়ি ধন-সম্পত্তি সমস্ত আগুন ধরাইয়া ছাই করিয়া দিল, তাহার জন্য কোন্ মুখে সে দয়া চাহিবে? দয়া চাহিলেই বা তা শুনিবে কে, আর শুনিবেই বা কেন?

ঐ ত' হরলাল আসিয়া পড়িল—আগুন দেখিয়া আশে-পাশের দলের গুপ্তচরেরা সব ক্রমে ক্রমে আগাইয়া আসিতেছে। তাহাদের সমবেত আক্রমণ হইতে সে একা বুলুকে কী করিয়া রক্ষা করিবে? সে ছাড়া এই সর্বনাশের সময়ে বুলুর আর কে আছে?

ঐ—ঐ—পদধ্বনিগুলি কাছে আসিয়া পড়িল। তাহার পর কাল ফৈজু আসিবে—উহার কাছে বুলুকে বেচিয়া দিবার কথা পাকা হইয়া গিয়াছে। এখন বুলুকে নিয়া পলাইতে না পারিলে আর উপায় নাই।

গণেশ মুহূর্তে মরীয়া হইয়া উঠিল। ইতস্তত না তাকাইয়া সে বুলুকে কোলে লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। গুপী হ্যাঁ-না একটা শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিল না।

বুলু আশ্চর্য হইয়া গেল; করুণ করিয়া কহিল,—এইখানে আমাকে মারবে বুঝি, সর্দার?

ততোধিক স্নেহে বুকের সঙ্গে বুলুকে সাপটিয়া ধরিয়া গণেশ কহিল,—মারবো না, তোমাকে মারবো না, বুলু। কোন ভয় নেই। বেশ করে' গলাটা আমার জড়িয়ে ধরো।

বুলু কহিল,—আমাকে তবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—দূরে অনেক দূরে—কলকাতায়, তোমার বাড়িতে। বাড়ি যাবে না, বুলু?

—বাড়ি? আমাকে তুমি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ। বলো কী সর্দার?

—হ্যাঁ, বাড়িই নিয়ে যাচ্ছি। ঠিকানা তোমার মনে আছে ত'?

—ঠিকানা মনে নেই? আমাকে তুমি কী ভাবো শুনি? সতেরো নম্বর বকুল বাগান ফার্স্ট লেন। কিন্তু দাদা? দাদাকে ছাড়া বাড়ি আমি কী করে' যাবো সর্দার? বলিতে-বলিতে গণেশের কাঁধের উপর বুলুর চোখের জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

চলিতে-চলিতে গণেশ কহিল,—দাদাও তোমার বাড়ি ফিরবে বৈ কি।

—দাদা বাড়ি ফিরবে? বুলু গা-টা টান করিয়া গণেশের মুখের দিকে সোজা তাকাইল; বলিল,—সে কেমন সর্দার? মরা লোক আবার ফিরে আসে নাকি?

—দাদা ত' তোমার মরেনি, বুলু। কালী যখন তাকে একবার বাঁচিয়েছেন, তখন আর তাকে ঠেকায় কে। বাড়ি একদিন ফিরবে বৈ কি।

সর্দার এইসব কী আজগুবি কথা কহিতেছে! তাহার বাড়ি-ফেরা না-হয় বিশ্বাস করিল, কিন্তু মানুষ মরিয়া যাইবার পর কালীর আশীর্বাদে বাঁচিয়া উঠিতে পারিলে আর কথা ছিল না। তবু এমন কথা শুনিয়া বিরুদ্ধ যুক্তি সত্ত্বেও সে খুসি হইয়া উঠিল; কহিল,—দাদা বেঁচে আছে? তবে ওকেও সঙ্গে করে' নিয়ে চলো। নিয়ে যেতেই হ'বে ওকে। আমি একা ফিরে গেলে বাবা-মা যখন দাদার কথা জিগ্‌গেস করবেন, তখন আমি কী বলবো? দাদাকে না নিলে আমি কক্ষনো যাব না তোমার সঙ্গে। দাদা বেঁচে আছেন! সত্যি বলছ ত'?

গণেশ এই এক নতুন মুস্কিলে পড়িল। দাদা যখন বাঁচিয়াই আছে তখন উহাকে সঙ্গে লইতেই হইবে—বুলু দস্তুরমতো হাত পা ছুড়িয়া গণেশের চুল টানিয়া নাক-মুখ খিমচাইয়া চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিল। কিছুতেই মেয়েটা প্রবোধ মানিবে না।

অবশেষে বাধ্য হইয়া গণেশকে বলিতে হইল—পাগল নাকি? মরা লোক কখনো বেঁচে ওঠে? ডাকলে সে কখনো ফিরে আসে? তুমি এত বোঝ আর এই ঠাট্টাটা বোঝ না।

বুলু চুপ করিয়া গেল। দাদার শোকে মুখখানি ম্লান করিয়া সে গণেশের কোলের উপর ছবির মত বসিয়া রহিল। চলিতে-চলিতে বুলুকে লইয়া গণেশ

এমন জায়গায় আসিয়া পড়িল যেখান হইতে আগুনের শিখা আর চোখে পড়ে না।

চৌদ্দ

আগুন দেখিয়া হরলাল পাগলের মত হইয়া গেছে—কিন্তু এই আগুন সমস্ত কিছু গ্রাস করিয়া না পুড়াইয়া ক্ষান্ত হইবে না। কিছুই বাঁচানো গেল না—যাহা কিছু লুট-করা জিনিস অন্যত্র সরাইতে পারে নাই—নানা রকম গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সব এইবার ধূলার সঙ্গে মিশিয়া গেল!

হরলাল গুপীকে দেখিতে পাইয়া গর্জন করিয়া উঠিল,—গণেশ কোথায় গেল?

গুপী ভয়ে পাংশু হইয়া গেল, কহিল,—মেয়েটাকে নিয়ে কোথায় যেন সরে' পড়ল।

—সরে' পড়ল? সে কী? বলিয়া সে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল—গণেশ!

সে ডাকের কোনো সাড়া মিলিল না।

হরলাল ফের জিজ্ঞাসা করিল,—আগুন লাগলো কী করে'?

—ঐ মেয়েটাই লাগিয়েছে। বিছানায় কেরোসিন ঢেলে দেশলাইর কাঠি ধরিয়ে দিয়েছে।

এমন সময় সনাতনের পিছে-পিছে কুণ্ঠিত শঙ্কিত মুখে অনিল আসিয়া দাঁড়াইল। দলের আরো কে-কে সব জড়ো হইয়াছে। হরলাল সনাতনের দিকে ফিরিয়া কহিল,—ঐ মেয়েটারই নাকি এই কাণ্ড। গণেশ তাকে নিয়ে কোথায় নাকি গেছে—গুপী ত' বলছে তাই।

সনাতন কহিল,—হয় ত' এইবারে ও মেয়েটার মাথা গুঁড়িয়ে দেবে। বড্ড মায়া পড়েছিলো, না?

দাঁত কড়মড় করিয়া হরলাল কহিল,—পেলে আমিই ছুঁড়ির মুণ্ডুটা চিবিয়ে খেতাম—

সনাতন কহিল,—এর পর আর কি সয়? কেটে-কুটে সত্যিই এবার ও একটা কাণ্ড করে' বসবে। একেবারে ক্ষেপে গেছে হয় ত'।

আস্তে-আস্তে অনিল একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। বুলু তাহা হইলে আগুনে পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যায় নাই—গণেশই তাহাকে সঙ্গে করিয়া কোথায় নিয়া গিয়াছে! আবার তাহার একটু-একটু করিয়া আশা হইতে লাগিল—হয় ত' গণেশ তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিবে না, বড়-জোর কোনো গাছের তলায় অচেনা জায়গায় রাখিয়া আসিবে।

হরলাল কহিল,– কে জানে, হয় ত' ফৈজুর কাছে সোজা বেচে আসতে গেছে।

সনাতন সায় দিল—তাই হ'বে। আগে কিন্তু বেচতেও ওর আপত্তি ছিলো।

অনিলের মনে হইল তাহাও অসম্ভব নয়—এই রাতে সে কষ্ট করিয়া কি না তালতলা যাইবে মেয়ে বেচিতে! কে জানে হয় ত' নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছে! তাই বই কি—তাই কি না গণেশ সেই দিন নৌকাতে তাহাকে জলে ভাসাইতে গিয়া শেষকালে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়াছিল—তার পর বাড়িতে নিয়া আসিয়া বুলুকে সাজাইবার কী সে ঘটা!

অনিল এক-পা দু'-পা করিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল। তাহার উপর কাহারো তেমন আর এখন লক্ষ্য নাই।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ক্ষতি কি হরলাল চুপ করিয়া সহিবে নাকি? হঠাৎ সে গুপীকে উদ্দেশ করিয়াই কর্কশ কণ্ঠে কহিল,—তুই কী করছিলি? তোকে পাহারা দিতে রেখে গেলাম, আর তোরই চোখের সামনেও আগুন ধরালো? বলিয়া বাঁ হাতের মুঠিতে তাহার চুলগুলি চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতে ধাঁ করিয়া গালে ভীষণ চড় বসাইয়া দিল।

তার পর একবার যখন প্রহারের বৃষ্টি সুরু হইল, তখন হরলাল আর থামিতে চাহিল না।

সনাতনও চীৎকার করিয়া উঠিল,—মাধোটা গেল কোথায়? ওরও ত' পাহারা দেবার কথা।

অর্থাৎ মাধবকে কাছে পাইলে সেও তাহাকে এমনি ঠ্যাঙাইয়া হাতের সুখ করিয়া নিত। কিন্তু মাধব আগে-ভাগেই খসিয়াছে—শিগগির আর সে সনাতনের ঘুষি, কিল, লাথির নীচে পিঠ পাতিতেছে না।

সনাতন অনিলকে প্রশ্ন করিল,—মাধবকে কোথাও দেখেছিস্ ?

অনিল গম্ভীর হইয়া কহিল,—মন্দির থেকে আসবার পথে দেখতে পেলে না ? আমাদের দেখে একটা ঝোপের পাশে গা ঢাকা দিলো।

—কোন্ জায়গাটায় বল্ ত' ?

অনিল আন্দাজে দূরে একটা জায়গার দিকে আঙুল তুলিয়া দেখাইল, কহিল,—ঐ ত'।

কথাটা সম্পূর্ণ সনাতন বিশ্বাস না করিলেও মাধবেরই খোঁজে সে এ-দিক ও দিক উঁকি ঝুঁকি মারিতে মারিতে ক্রমশঃ আগাইতে লাগিল।

এদিকে গুপীর উপরে প্রহারের বৃষ্টি তখনো বিরাম মানিতেছে না! নির্জীবের মত গুপী অনেকক্ষণ সহিয়াছে, কিন্তু পেটে একটা লাথি মারিয়া হরলাল যখন তাহাকে দূরে ছিটকাইয়া ফেলিল, তখন সে আর মাটির উপর চুপ করিয়া শুইয়া রহিল না। হাতের কাছে ভারি একটা পাথরের টুকরা কুড়াইয়া পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আগুন এখনো সমানে জ্বলিতেছে—তাহারই আলোতে হরলালের চওড়া কপালটা স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। গুপী সেই চওড়া কপাল লক্ষ্য করিয়া পাথরটা ছুঁড়িয়া মারিল। অব্যর্থ সন্ধান,—হরলালের ডান ভুরুর উপর সজোরে লাগিয়া পাথরের টুকরাটা চোখের উপর হইতে কপালের খানিকটা বিদীর্ণ করিয়া দিল। চকিত আঘাতে ত্রস্ত বিমূঢ় হইয়া হরলালের মাথা ঘুরিয়া গেল,—মুহ্যমান চোখে দেখিতে পাইল সামনে দিয়া গুপী ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া চলিয়াছে।

রক্ত পড়িয়া চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল বটে, তবু হরলাল বাঘের মত গর্জন করিতে-করিতে গুপীর পিছু নিল। আরো যাহারা কাছে দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদেরো হুকুম করিল অনুসরণ করিতে। কিন্তু এই ঘনঘোর অন্ধকারে কাঁটাবন মাড়াইয়া সারা শরীর ক্ষতাক্ত করিয়া তুলিতে কাহারো সাধ হইল না। তবু হরলাল একাই ছুটিয়া চলিল। ঐ দুর্বিনীত গুপীকে খুন করিয়া তাহার কাঁচা রক্তে স্নান না করিলে তাহার তৃপ্তি নাই।

অনিলের চারিদিকটা এখন প্রায় ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। আগুনের শিখা, আকাশের তারা ও দূরের ঐ চিহ্নহীন দিগন্ত-রেখা—সব যেন তাহাকে কী

ইসারা করিতেছে। সে প্রথমটা আলগোছে ভিড় এড়াইয়া একটু ফাঁকায় আসিল ও যখন দেখিল সবাইর দৃষ্টি গুপী ও হরলালের দিকে নিবদ্ধ, তখন সে তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া বনের মধ্যে মিলাইয়া গেল। মনে হইল কে যেন অদৃশ্য থাকিয়া তাহাকে সম্মুখের পথে আকর্ষণ করিতেছে।

গুপী সেই খোলা মাঠের পথ নিয়াছিল—অনিল ঢুকিল বনে। গুপী উড়িয়া চলিয়াছে চপল একটা ফড়িংয়ের মত, আর হরলাল যেন একটা উন্মত্ত হাতী! কত দূর যায়, কিন্তু রক্তের স্রোতে হরলালের চোখের দৃষ্টি আবার ঝাপসা, বিবর্ণ হইয়া আসে—অন্ধকারে গুপীকে ঠিক আর অনুসরণ করা যায় না। তবুও সে দুর্দমনীয় কালবৈশাখীর মত ছুটিয়া চলে।

কিন্তু কোথায় গুপী! শূন্য মাঠ ভরিয়া অন্ধকার শব্দহীন ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে। হরলাল কপালের ক্ষতস্থানে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এই উদ্ধত অবিনয়ের আর শাসন করা হইল না। কিন্তু যাইবে কোথায়—গুপীকে সে যে করিয়াই হোক, বাহির করিবে।

ও-দিকে সনাতন মাধবকে খুঁজিয়া পাইল না। বাড়ির কাছে আসিয়া খোঁজ করিয়া দেখিল অনিলও অদৃশ্য হইয়াছে। হরলাল? রতন বলিল,—গুপীর পিছনে ধাওয়া করেছে মাঠের দিকে। ছোঁড়াটা এবারে মরলো। বলিয়া হরলালের এই রাগের কারণটা সে বিবৃত করিল।

খানিকবাদে হরলাল শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিল। চোখের যন্ত্রণায় ও পথশ্রমের ক্লান্তিতে শরীর তাহার অসাড় হইয়া আসিয়াছে। সে শিরিষ গাছের তলায় ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িল, সনাতনকে কহিল,—শিগগির কোত্থেকে আমাকে একটু জল এনে দে—

জল জোগাড় করিতে যাইবার আগে সনাতন বলিল,—সেই ছোঁড়াটাও সরেছে দেখছি!

—আর পারি না! বাসা আমাদের ভেঙে গেল, সনাতন। হরলালের সে কী হতাশ স্বর—গণেশ এখনও ফিরে আসে নি?

—না। কিন্তু ছেলেটাকে আমি ধরে' আনবোই—কোথায় যাবে? দাঁড়া, আগে তোকে জল এনে দি।

হরলাল বাধা দিয়া কহিল,—না, জল চাই না। তুই যা, ছাখ ওকে ধরতে পারিস্ কি না। ও পালালে সব ভেস্তে যাবে। বংশীকে খবর দে, রতন—শিগগির। গুপী আমার কী করেছে দেখেছিস ?

সবাই ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল পাথরের আঘাতে হরলালের ডান চক্ষুটা একেবারে থেৎলাইয়া গিয়াছে।

চোখটা চাপিয়া ধরিয়া রক্তের স্রোত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে হরলাল বলিল,—আমার জন্যে ভাবিস নে। আমারটা আমি করতে পারবো। তোরা এখন ছাখ্ ছোঁড়াটাকে পাস কি না। ছোরা-টোরা দু' একটা নিতে পারবি না ? পাবি না খুঁজে ? পিস্তলটায় ত' আর গুলি নেই।

সনাতন কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল—ওকে ধরতে আবার ছোরা-পিস্তল লাগে নাকি ? একবারে টুঁটি টিপে ধরে' ঠাণ্ডা করে' দেব—তার পর দেব ভাসিয়ে। আসুক না লড়তে। চল্ রতন, আয় বিষ্ণুপদ ! তার পর মাধোকেও আমি দেখাচ্ছি।

হরলালের কেমন মনে হইল সমস্তই নিস্ফল আস্ফালন। গণেশ এখনো ফিরিয়া আসিল না কেন ?

পনেরো

অনিলের কাছে সমস্ত বন যেন পথ উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে। সামনে ছাড়া কোনো দিকে তাহার লক্ষ্য নাই—এই অন্ধকার উত্তীর্ণ হইয়া প্রভাতের দেশে সে অবতরণ করিবে। দুঃস্বপ্নের পর আবার সে জান্লার ওপারে ভোরের শুকতারাটির মত মায়ের আশীর্বাদ স্নিগ্ধ কোমল মুখখানি দেখিবে। কে যেন তাহার মনে বসিয়া বলিতেছে—ভয় নাই, ভয় নাই !

পথের মাঝে সে কোন্ কাঁটা-গাছের শীর্ণ ও দীর্ঘ একটা ডাল কুড়াইয়া পাইল। সেটা সে সঙ্গে নিল—আততায়ী আসিয়া পড়িলেও সে বিনাযুদ্ধে হার মানিবে না। পকেট ভরিয়া ঢিল নিল,—গুপীর কীর্তি ত' সে স্বচক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছে। নিজেকে হঠাৎ তাহার অত্যন্ত বলশালী মনে হইল—গায়ে যেন তাহার বাঘের শক্তি, চোখে তাহার রৌদ্রের

তীব্রতা। ইচ্ছা করিলে সে হয় ত' নদীটাও সাঁতরাইয়া পার হইয়া যাইতে পারিবে।

অনিলের খোঁজে এক-একজন এক-এক দিকে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বংশীও খবর পাইয়াছিল। লণ্ঠন লইয়া সেও খুঁজিতে চলিয়াছে। আলো ছাড়া সে পথ চলিতে পারে না—সাপখোপের ভয় আছে, পৃথিবীতে আরো কত-কি ভয়ের জিনিস আছে তাহা ভাবিতেও তাহার ভয় করে। আলো একটা সঙ্গে থাকা ভালো।

সেই আলোটা অনিলেরই নিকটবর্তী হইতে লাগিল। এ আর অন্য লোক নয়,—অনিল আলো দেখিয়া তাহাকে ঠিক চিনিয়াছে। নিমেষে তাহার সমস্ত উৎসাহ জুড়াইয়া আসিল—গায়ে সামান্য একটা খরগোসেরও শক্তি রহিল না। চারিদিকের উন্মুক্ত পথে সহসা প্রাচীর খাড়া হইয়া উঠিল—আবার সে বন্দী!

মনের মধ্যে বসিয়া ঠিক মা'র কণ্ঠস্বরে কে বলিল,—ভয় নাই।

চট্ করিয়া অনিলের মাথায় এক বুদ্ধি আসিল। আর না ছুটিয়া সামনের একটা গাছে তরতর করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। কি গাছ তাহা সে ভাল করিয়া চিনে না—অন্ধকারে চিনিবার উপায় নাই। লণ্ঠনটা ক্রমেই আগাইয়া আসিতেছে।

অনিল তাড়াতাড়ি পরনের কাপড়টা খুলিয়া ফেলিল। হাতের সরু ডালটার ডগায় কাপড়ের একটা প্রান্ত আটকাইয়া অন্য অংশে আপনার শরীরটাকে আগাগোড়া আবৃত করিয়া সে লম্বা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হাতটা মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়াছে—তাহার মধ্যে লম্বা সেই ডাল—ঘোম্‌টার মত করিয়া কাপড়ের উপরের ধারটা নুইয়া পড়িয়াছে—সমস্ত দৈর্ঘ্যটা অনিলের স্বাভাবিক চেহারার দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। মুখ হাত-পা দেখা যায় না, খালি একটা শাদা কাপড় গাছের উপর খাড়া হইয়া ঝুলিতেছে।

অনিল কাঠির ডগাটা আস্তে-আস্তে নাড়িতে লাগিল। দূর হইতে ঠিক মনে হইবে যেন গাছের উঁচু ডালে একটা পেত্নি বসিয়া ঘোমটার তলায় মাথা

নাড়িয়া-নাড়িয়া লোকজনকে নীরবে আহ্বান করিতেছে—আয়, আয় আমার কাছে।

লণ্ঠনটা আরো কাছে আসিল বুঝি, অনিল নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ঈশ্বরের নাম লইতে লাগিল।

গাছের উপরে ঐ মূর্তি দেখিয়া বংশী দেখিতে-দেখিতে বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ডালের উপর পেত্নি বসিয়া ঘোমটা নাড়িয়া তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিতেছে। সমস্ত বন কাঁপাইয়া শন্ শন্ করিয়া হাওয়া বহিল—পেত্নিটা যেন নাকি-সুরে কথা কহিয়া উঠিল। হাওয়ায় একটা শুকনো ডাল খসিয়া পড়িল, পেত্নিটা তাহারই মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল বুঝি।

'—বাবা গো, মা গো। গেলাম গো, মেরে ফেললে গো!—বলিয়া বংশী চোঁচা দৌড় মারিল। যত ছোটে ততই মনে হয় পেত্নিটা যেন তাহাকে তাড়া করিতেছে—এই বুঝি ধরিয়া ফেলিল। একেবারে বাড়ি ফিরিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দিল। তবু তাহার স্বস্তি নাই—পেত্নিটা জান্‌লা দিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। জানলাটাও বন্ধ করিল। তারপর পেত্নিটা তাহার ঘরের চালে দাপাদাপি সুরু করিল। বংশী বাকি রাত আর ঘুমাইতে পারিল না।

বংশী অদৃশ্য হইয়া গেলে অনিল স্বস্তির নিশ্বাসে দুশ্চিন্তার পাথরটা সরাইয়া দিয়া একলাফে নামিয়া পড়িয়াই আবার ছুট দিল—আর তাহাকে কে আটকায়। অতি কাছেই খালের জল কুলকুল করিয়া তাহাকে ডাকিতেছে—শেষরাত্রে জোয়ার আসিয়া গেছে বুঝি।

রাত্রি এখন শিশুর চোখের মত তরল হইয়া আসিয়াছে। ভোর হইতে আর দেরি নাই।

খালের ধারে একটা নৌকা বাঁধা। তাহারই জন্য যেন কে তৈরি করিয়া রাখিয়াছে। সদ্য ঘুম ভাঙিয়া মাঝি একটা ছইয়ের ভিতরে কাহাকে কি যেন বলিতেছে। অনিলের ভয় করিতে লাগিল। তবু সে ডাকিল—মাঝি!

মাঝি চাহিয়া দেখিল। কহিল—সোয়ারি আমি আর নিতে পারবো না।

মাঝির এই কথায় বিপদের আশঙ্কাটা খানিক প্রশমিত হইল। অনিল

কহিল,—দয়া করে' নিয়ে চলো মাঝি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছে দাও, তোমাকে আমি অনেক—অনেক বকশিস দেব।

বাহিরের লোককে না শুনাইয়া ছইয়ের ভিতর হইতে কে তীব্র চাপা গলায় প্রতিবাদ করিয়া উঠিল,—না, গফুর, খবরদার। আর কাউকে নিতে পারবে না। আজকের দিনে আমার একটা কথা রাখো। সেই রাত্রির কথা মনে করো একবার।

গফুর বলিল,—আচ্ছা। বলিয়া সে নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকাটাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া অনিল নৈরাশ্যে একেবারে ক্লান্ত হইয়া উঠিল।

আর্তকণ্ঠে আবার ডাক দিল,—আমাকে তুলে নাও মাঝি, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না।

নৌকাটা তবু থামিল না। অনিল দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এই দৃশ্য দেখিয়া গফুর চঞ্চল হইয়া উঠিল ; কহিল—ছেলেটা জলে পড়লো যে। সকালবেলা মারা যাবে নাকি? শেষকালে একজনের আত্মহত্যার পাপের ভাগী হ'ব?

ভিতরের আরোহীর কোন কথায়ই সে কান পাতিল না। তাড়াতাড়ি নৌকা ঘুরাইয়া জলে নামিয়া অনিলকে সে নৌকায় তুলিয়া আনিল।

অনিল স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িবে,—কিন্তু ও কে? ছইয়ের ভিতর ছালার চট্ মুড়ি দিয়া চোখ মুখ ঢাকিয়া জড়োসড়ো হইয়া কে বসিয়া আছে।

এ আবার কোন্ কারসাজি! অনিলের মুখ ব্লটিং-কাগজের মত শাদা হইয়া গেল।

মুক্তি কি তাহার মিলিবে না?

ষোলো

ষ্টীমারের চোঙাটার কাছে গরম বলিয়াই আর কেহ সেখানে বসে নাই—গণেশ বুলুকে সেইখানে একখানা চাদর বিছাইয়া দিয়া কহিল,—এখানেই বসা যাক্‌। ভারি ভিড় হয়েছে দেখছি।

বুলু সেইখানে বসিয়া আনন্দে দুই চক্ষু মেলিয়া ধরিয়া নদী দেখিতে লাগিল। তাহা হইলে সত্যই সে বাড়ি চলিয়াছে।

সকালে হাটে গিয়া গণেশ চেনা এক স্যাকরার কাছে বুলুর গলার হার বেচিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। তারপর একটা হোটেলে গিয়া কলাপাতায় করিয়া বুলুকে ভাত খাওয়াইল। গণেশকেও খাইতে হইল—নইলে মেয়েটা ছাড়িবে না। তারপর একখানা ধোয়া কাপড় ও একটা ডুরে শার্ট কিনিয়া গায়ে আঁটিয়া গণেশ দেখিতে-দেখিতে ভদ্রলোক হইয়া গেল।

বুলু হাসিয়া কহিল,—তোমাকে ঠিক এখন বাবার মুহুরির মত দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ, কাপড়-চোপড় পরিয়া ভদ্র না সাজিলে যদি লোকে সন্দেহ করে! মেয়ে চুরি করিয়া পলাইতেছে বলিয়া তাহাকে যদি পুলিশের হাতে ধরাইয়া দেয়! চুরি করিয়া সে পলাইতেছে বটে—চুরি না করিলে বুলুকে আজ আর কী করিয়া উদ্ধার করা যাইত?

ষ্টীমারে একজন ভদ্রলোক বুলুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কোথায় যাচ্ছ, খুকি?

বুলু গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল,—কল্‌কাতায়।

—সঙ্গে ও কে?

—আমাদের মুহুরি-বাবু। আমার বাবা যে হাইকোর্টের উকিল।

—একা-একা যাচ্ছ যে! সঙ্গে আর কেউ নেই?

—বা, মুহুরিই ত' আছে। ও না থাকলেও আমি যেতে পারতাম। ষ্টীমার রাত্রে গিয়া গোয়ালন্দ পৌঁছিবে—রাত্তির কটায় বলুন ত'? তারপর

নেমেই ট্রেন তৈরি—চা খাবার আগেই বাড়ি যাওয়া যাবে। কেমন, ঠিক বলছি না ?

ভদ্রলোকটি আর কোন প্রশ্ন করিল না, সঙ্গীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, —মেয়ে দেখছি ধুরন্ধর।

বুলু গণেশকে এমনি অগাধ বিশ্বাস করিয়াছে! ডাকাত জানিয়াও পাঁচজন ভদ্রলোকের সাহায্য লইবার জন্য ষ্টীমারে উঠিয়াও চেঁচামেচি করে নাই। ঠিক তাহার হারানো টগরের মতই সরল বিশ্বাসে তাহার উপর নির্ভর করিয়া আছে। গণেশকে সে তাহার বাড়ি নিয়া যাইবেই—এত যে তাহার উপকার করিল তাহাকে সে মা'র হাতের খাবার খাওয়াইবে—কত দামী জিনিস উপহার দিবে—যা সে চায়! বড় হইয়া ডাক্তারি করিবার সময়ও তাহার কথা বুলু ভুলিবে না।

গণেশ বলিয়াছিল,—কিন্তু ডাকাত জেনে তোমার বাবা যদি আমার হাতে হাতকড়া লাগান ?

—বা, আমি তা জান্‌তেই দেবো কিনা? যে ডাকাত, সে বুঝি মেয়ে খুঁজে বাড়ি ব'য়ে দিয়ে যায় কখনো? তা ছাড়া আমি তোমাকে কত ভালো বল্‌বো দেখো। কিসের তুমি ডাকাত—তুমি আমাদের মুহুরি। বলিয়া বুলু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভোঁ দিয়া ষ্টীমার ছাড়িল। চাকার শিকলে টান পড়িল। দুই পাশে ফেনার ফুল ফুটাইতে-ফুটাইতে ষ্টীমার আগাইয়া চলিল।

দাদার কথা ভাবিয়া বুলু চোখের জল আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। দাদা যদি এখন সঙ্গে থাকিত! মাকে গিয়া সে কী বলিবে ?

দাদার কথা জিজ্ঞাসা করিলেই গণেশ চুপ করিয়া যায়। কি-রকম করিয়া যেন তাকায়। সেই চাউনি দেখিলে বুলুর ভারি ভয় করে। গণেশের সঙ্গে লুকানো অস্ত্র আছে কি না কে জানে। আচম্‌কা যদি তাহাকেও ঘায়েল্ করিয়া বসে! সেই ভয়েই সে ও-কথার ধার ঘেঁষে না। অন্য কথা পাড়িলেই গণেশের চোখ-মুখের ভাব স্নিগ্ধ হইয়া আসে।

গণেশ ঠোঙায় করিয়া চিনি ও কলাপাতায় করিয়া পাতক্ষীর লইয়া আসিল।

বুলু অবাক হইয়া কহিল,—ষ্টীমারের মধ্যেই দোকান আছে নাকি? আসবার সময় ত' দেখিনি। তখন ছিলাম একটা ঘরের মধ্যে গদি-ওলা বিছানায় শুয়ে—সেকেণ্ড্ ক্লাশে। তা, কী আনলে, সর্দার?

গণেশ চাপা গলায় কহিল,—সর্দার না, মুহুরি বাবু।

—হ্যাঁ, মুহুরি বাবু, কী আনলে?

গণেশ হাসিয়া কহিল,—পাতক্ষীর। সেই বংশী তোমাদের খাওয়াবার লোভ দেখিয়েছিলো না? এই দেখ। খেয়েছ কোনো দিন?

পাতক্ষীর দেখিয়া বুলুর আবার দাদার কথা মনে পড়িয়া গেল। কান্না-ছলছল চোখে কহিল,—ও আমি খাবো না। দাদাকে ফেলে ও-জিনিস আমি মুখে তুলতে পারবো না। আমার খিদে নেই একটুও।

একবার যখন ঘাড় বাঁকাইয়াছে শত তেল মাখাইয়াও বুলুর সে-ঘাড় আর সোজা করা যাইবে না।

ষ্টীমারের একটানা ঝকঝক সুরু হইয়াছে—ভীষণ গরম, যাত্রীদের কোলাহলের অবধি নাই। হাসাহাসি, ঝগড়া, চেঁচামেচি, হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান,—তুমুল একটা হাট বসিয়া গেছে। ইহার মধ্যে বুলু নিতান্ত স্তব্ধ হইয়া দাদার কথা ভাবিতেছিল। সে এখন কোথায়—কত দূরে না-জানি চলিয়া গেছে! বুলুর এই ষ্টীমারে করিয়া বাড়ি যাওয়া কি সে দেখিতেছে না? ছোট বোনটির জন্য এত দিনে বুঝি সে নিশ্চিন্ত হইল।

চোখের জল মুছিয়া বুলু কহিল,—আমাকে যে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ, সেখানে যদি মা-বাবাকে দেখতে না পাই? তাঁরা যদি এখনো না ফিরে থাকেন?

—পাগল! গণেশ তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল,—বাড়ি ফিরবেন না? তারা সেইদিন সকাল বেলায়ই নৌকো পেয়েছেন। বাড়ি গিয়ে বাবার কোলে চড়ে' আমাকে ভুলে যাবে, বুলু?

গণেশ বুলুর চুলে হাত বুলাইতে লাগিল।

বুলু কহিল,—ককখনো ভুলবো না। এত যে উপকার করে তাকে কি লোকে ভো'লে নাকি? আমাকে কি তুমি গুপী ঠাওরালে যে, যে-লোক কাঁধে চড়ে' খাবার তুলে দেয় তাকে বেঁধে রাখবো?

গণেশ কহিল,—তোমার গলার হার পর্যন্ত বেচতে হ'ল। দিতে ত' কিছু পারলামই না, বরং—

—বেচবে না? না বেচলে টিকিটের পয়সা হ'ত কী করে'? ভাগ্যিস্ ওটা ছিলো। চলো না, তোমাকে মা'র একটা নেকলেস দিয়ে দেব। তার পর বড়ো হ'য়ে—

—বড়ো হ'য়েও আমাকে মনে রাখবে? বড়ো হ'য়ে তোমার যখন বিয়ে হ'বে—

—হ্যাঁ, ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখে জানিয়ো ঠিক নেমন্তন্ন করবো, দেখো। আমাদের বাড়ির নম্বর ত' জানো-ই।

—যখন আমি খুব বুড়ো হ'য়ে যাবো?

—হ্যাঁ, এসো আমার বাড়ি। আমার বাগানের মালী হ'বে। তুমি এ-কাজ ছেড়ে দাও, সর্দার।

গণেশ হাসিয়া কহিল,—ছেড়ে ত' দিয়েইছি। আমি ত' আর সর্দার নই, আমি ত' তোমাদের মুহুরি! তোমার বিয়ে যদি হাকিমের সঙ্গে হয়, আমাকে তবে তোমার বরের দপ্তরী রাখবে?

মুখ ভীষণ গম্ভীর করিয়া বুলু কহিল,—তা আমি কী করে' বলবো? আমি নিজে হাকিম হ'লে বরং বলতে পারতাম! কিন্তু কী গরম দেখেছ! রেলিঙের পাশে একটু গিয়ে দাঁড়াই না।

গণেশ কহিল,—না!

বুলু আর অনুরোধ করিল না। রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া একা-একা সে কী দেখিবে? পাশে আজ দাদা নাই। সে কতদূরে—কোথায় না-জানি চলিয়া গিয়াছে?

সতেরো

গোয়ালন্দে গণেশ বুলুকে লইয়া ট্রেনে উঠিল—থার্ড-ক্লাশ কামরায় সাভাবিক ভিড়। তবু এমন একটি ফুটফুটে মেয়ে দেখিয়া সবাই জায়গা ছাড়িয়া দিল। অনেকেই গায়ে পড়িয়া গল্প-গুজব করিতে আসিল, কিন্তু গণেশের নির্দেশমত বুলু কহিল,—আমার বেজায় ঘুম পাচ্ছে। আর

বকতে পারি না। বলিয়া হাঁটু দুইটা বুকের কাছে গুটাইয়া কোনরকমে শুইয়া পড়িল।

আর শুইয়া পড়িয়াই তাহার সারা গা ভরিয়া ঘুমের বন্যা নামিয়া আসিল।

নৈহাটির পরেই কামরাটা অনেক পাৎলা হইয়া আসিল। তাহার পর বারাকপুর! বুলু তখনো বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে—মুখে কি মধুর সারল্য, শেষরাত্রির আকাশের মতই মুখখানি কোমল, লাবণ্যময়! সে-মুখে বেদনার কোমল একটু আভা পড়িয়াছে।

দমদম পার হইতেই গণেশ বুলুকে ঠেলিয়া তুলিল; কহিল,—কলকাতা এসে পড়ল এবার।

চোখ কচ্‌লাইয়া বুলু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল! হ্যাঁ, এই ত' উল্টাডিঙির ব্রিজ—নৌকা কতকগুলি জড়ো হইয়া আছে। ঐ ত' দূরে একটা মোটর চলিয়া গেল—ঠিক, আর ভুল নাই। বুলু ঠিক তার হর্ণ শুনিতে পাইতেছে!

প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিয়া বুলু কহিল,—ঐ ত' বাস দাঁড়িয়ে—

গণেশ কহিল,—বাস নয় ট্যাক্সি নিলে ঢের আগে বাড়ি পৌঁছুনো যাবে। বাস্‌-এ অনেক ভিড়।

ট্যাক্সি পিচের রাস্তা ধরিয়া তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। রাস্তার দুইধারে বাড়িগুলি তেমনি অটুট—এই কয়দিনের অদর্শনে কলিকাতার কিছুই বদল হয় নাই। বুলু ভাবিয়াছিল সে নাই বলিয়াই হয়ত কলিকাতা অভিমানী বন্ধুর মত মুখ ভার করিয়াছিল--হয়ত ছিল, কিন্তু তাহাকে কাছে পাইয়া আগের মতই হাসিয়া উঠিয়াছে।

ল্যান্সডাউন রোড—ও মা, ইহারই মধ্যে ল্যান্সডাউন রোডে আসিয়া পড়িয়াছে! আর কি, মার্কেটের পাশ দিয়াই ত' তাহাদের বাড়ি যাইবার গলি।

বুলু গণেশের মুখের দিকে চাহিল। সে-মুখ কেমন থম্‌থমে, দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে মনে হইল।

বাড়ি যতই কাছে আসিতে লাগিল ততই বুলু দুঃখে মুষড়িয়া পড়িতেছিল। এত বড় দুঃসংবাদ সে কেমন করিয়া শোনাইবে? আবার সে জিজ্ঞাসা করিল,—সত্যিই ওরা দাদাকে মেরে ফেলেছে, সর্দার?

এত ক্ষতি ও বিফলতার পরেও যে হরলাল আর সনাতন অনিলকে ছাড়িয়া দিবে তাহা গণেশের মনে হইল না। একে তাহার কোপ বসাইতে এক সেকেণ্ড দেরি হইল, তাহার পর বুলু ঘরময় আগুন ধরাইয়া দিল—তাহারা যে বাগে পাইয়াও অনিলকে ছাড়িয়া দিবে তাহা গণেশ কী করিয়া বিশ্বাস করে? গণেশের খড়্গ হইতে সে রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু দলের মধ্যে একলা সেই ত' অস্ত্র চালনা করে না। এখন নিশ্চয়ই আর সে বাঁচিয়া নাই। বুলুকে মিথ্যা আশা দিয়া লাভ কী? গণেশ কহিল,—এমন রাতে ছেড়ে দেবার জন্যে ত' কাউকে কালী-মন্দিরে নিয়ে যায় না, বুলু। দাদা তোমার নেই।

বুলু অস্ফুটস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার পর ড্রাইভারকে কহিল,—ডাইনে যাও।

ঐ—ঐ তাহাদের বাড়ি। সদর বন্ধ, জানলায় জাপানী পর্দা ঝুলিতেছে—ঐ পর্দাটা ত' বুলুই সেলাই করিয়াছিল—রাস্তায় সদ্য জল দিয়া গিয়াছে—এখনো কাহারো ঘুম ভাঙে নাই। রোয়াকে রাস্তার বাজে লোক শুইয়া আছে।

গণেশ কহিল,—ঐ তোমাদের বাড়ি?

বুলু দোতলার বারান্দার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—হ্যাঁ, এই ত'। দরজার ওপরে বাড়ির নম্বর লাগানো আছে দেখছ না? ওপরে ঐ ত' আমাদের পড়ার ঘর।

গণেশ মলিন মুখে কহিল,—বড়ো হ'য়েও আমাকে চিনতে পারবে, বুলু? বাগানের মালী রাখবে?

সে-কথায় কান না দিয়া বুলু কহিল,—দাঁড়াও, আগে দেখি বাড়িতে মা ওঁরা ফিরেছেন কিনা। এখুনি তোমাকে নেক্‌লেস কী করে' দিই?

—নেক্‌লেস আমি চাই নাকি?

—আচ্ছা, নগদ টাকাই দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, মা আছেন, সর্দার। দড়িতে তাঁর সেই শাড়ি ঝুলছে—যেটা সেদিন তাঁর পরনে ছিলো। বলিয়া কোনো-দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে ছুটিয়া রোয়াকে উঠিয়া দুই হাতে কড়া নাড়িতে লাগিল।

কাহারো কোনো সাড়া-শব্দ নাই যে। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল গণেশও কখন অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া কোথায় গেল সে? সে কী! নেকলেস্ নিবে না? এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল, কোথাও সে নাই। সহসা বুলুর অত্যন্ত ভয় করিতে লাগিল—মনে হইল তাহাকে ধরিয়া নিবার জন্য আবার কাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া নির্জন রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গণেশই তাহাদের সর্দার।

বুলু দরজার উপর লাথির পর লাথি মারিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া কহিল,—শিগ্‌গির দরজা খুলে দাও মা, আমি বুলু এসেছি—আমাকে আবার কারা সব ধরতে এলো বুঝি—শিগ্‌গির নেমে এস, মা। ওমা!

বুলুর এই চীৎকারে ঘরের মধ্যে নিদ্রোত্থিতদের তুমুল সোরগোল পড়িয়া গেল। যেন ভীষণ ভূমিকম্প সুরু হইয়াছে! সিঁড়ি দিয়া একসঙ্গে নামিতে গিয়া কেউ-কেউ হোঁচট খাইল, সহসা কী যে হইল, ঠিক কেহ বুঝিতেও পারিল না।

মা ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

—বুলু, বুলু যে। আমার বুলু এসেছে!

তীরের উপরে সমুদ্রের ঢেউ-এর মত বুলু মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। চতুর্দিক হইতে শত-সহস্র কণ্ঠের প্রশ্ন শিলাবৃষ্টির মত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল—কেমন করিয়া আসিল, কোথায় ছিল এই কয় দিন, এই কয়দিন একেবারেই খাইতে পায় নাই বুঝি! কিন্তু সবারই প্রশ্ন ভেদ করিয়া মা'র স্বর তীরের মত বুলুর বুকে আসিয়া বিঁধিল—তিনি কহিলেন,—অনিল? অনিল কোথায়? অনিল আসে নি?

বুলু মা'র কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—দাদাকে ডাকাতরা কাল রাতে কালীমন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়েছে।

—এ্যাঁ? কী বল্লি? সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া মা বৈঠকখানার একটা তক্তপোষে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। আনন্দে ও দুঃখের উত্তেজনায় বুলুও অসাড় হইয়া পড়িল।

তুমুল কান্না লাগিয়া গেল। বুলু নিতান্ত হতভাগী, তাই সে দাদাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতে পারে নাই।

অমরেশবাবু বুলুর কাকাকে কহিল,—থানায় গিয়ে শিগগির একটা খবর দিয়ে এস, কুমার। ইন্‌স্পেক্টারবাবু যেন একবার আসেন। এতদিনে ত' কিছু সুবিধে করতে পারলেন না, বুলু এবার যথেষ্ট ক্লু দিতে পারবে। যাও। পরে স্ত্রীকে বলিলেন,—একটু থামো, আগে শুনি সবটা।

কিন্তু অমরেশবাবু আর কী শুনিবেন? বুলু বলিল, সর্দার-ডাকাত নিজে বলিয়া দিয়াছে অনিল আর নাই। অমরেশবাবু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

বুলুর পিসিমা কহিল,—অন্তত একজনকে ত' পেয়েছ, তাকেই বুকে করে' থাক, বৌ।

বুলু কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—আমি না ফিরে দাদা ফিরলে কত ভাল হ'ত। আমি মেয়ে—আমাকে দিয়ে কী কাজ হ'বে? আমাকে কেন বলি দিলো না?

পিসিমা তাড়াতাড়ি বুলুকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

কতক্ষণ বাদেই ইন্‌স্পেক্টারবাবু আসিয়া পড়িলেন। কুমার বলিল,—এখন দয়া করে' তোমরা একটু থাম। ব্যাপারটা সব শোনা যাক্ আগে—

কিন্তু গণেশের কথা অবিশ্বাস করিবারই বা কী আছে?

আঠারো

চটের ভিতর হইতে লোকটা চক্ষু বাহির করিয়া খালি মিটমিট করিয়া তাকাইতেছে, অথচ অনিলকে তক্ষুনি আক্রমণ করিতে আগাইয়া আসিতেছে না। নৌকা চলিয়াছে বটে। গফুর বলিল,—অমন ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ো

না বাবু, পড়ে' যাবে। আচ্ছা বিনি-পয়সার কিরায়া পেলাম আজ! সকালবেলাতেই অমনি—

অনিল ইচ্ছা করিয়াই ধারে দাঁড়াইয়াছিল, লোকটা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেই জলে সে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। পদ্মপুকুরে নামিয়া সে বৃথাই আর সাঁতার শিখে নাই। লোকটার সঙ্গে সাঁতারেরই প্রতিযোগিতা করিয়া দেখিবে—আগের মত সহজে সে ধরা দিবে না।

লোকটা আস্তে-আস্তে মুখের আবরণ উন্মোচন করিতে লাগিল। শরীরের সমস্ত চেতনা দুই চোখের দৃষ্টিতে কেন্দ্রীভূত করিয়া অনিল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

লোকটা গায়ের খোলস একটানে খুলিয়া ফেলিয়া কহিল,—তুই? অনিল?

অনিলও লাফাইয়া উঠিল—আরে, গুপী নাকি? আমাকে ধরিয়ে দিবি না ত'?

গুপী হাসিয়া কহিল,—তুই আমাকে ধরিয়ে দিবি না ত'? বোস্ এখানে। ওরে গফুর, একটু জোরে বেয়ে চল্ ভাই।

দুই জনে ছইয়ের মধ্যে পাশাপাশি বসিল। গুপী কহিল,—খুব দেখা হ'য়ে গেল ভাই। আমার প্রথমটা এমন ভয় হয়েছিল—

অনিল কহিল,—আর আমি ত' ফের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে রেডি ছিলাম।

গফুর টিপ্পনি কাটিয়া বলিল,—এত তোদের ভাব, অথচ ওকে কিনা তুই ফেলে যাচ্ছিলি, গুপী?

গুপী জিজ্ঞাসা করিল,—এখন তুই কোথায় যাবি?

—আগে ষ্টীমার-ঘাটে ত' পৌঁছে দিক্, তার পর দেখা যাবে।

—বাড়ি যাবি ত'?

—হ্যাঁ, যদি আর না ধরে।

—আর ধরতে দিলে ত'? আমরা এখন ষ্টীমার-ঘাটে না গেলাম—ওরা নিশ্চয়ই ও-পথে ওৎ পেতে আছে। আমরা যাই এখন বেলতলি, সেখানে

থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে—পয়সাও কিছু তোর জোগাড় করে' দিতে পারবো হয় ত'। একদিন জিরিয়ে গেলেই ভালো হ'বে।

অনিল খুসি হইয়া রাজি হইল। কহিল,—কিন্তু এই মাঝিকে কী দেওয়া যাবে?

—গফুরকে? ওকে একবার যা বাঁচিয়েছিলাম তাই মনে করে' আবার পয়সা নিবে নাকি? সেবার ডাকাতি করতে যাব—হঠাৎ আরেকটা নৌকার দরকার হ'ল। ডাক পড়লো গফুরের। ও কিছুতেই নৌকো দেবে না। হরলাল ওকে এই মারে ত' সেই মারে। আমি আলগোছে ওর হাতে একটা ছোরা চালান্ করে' দিলাম। ডাকাতের বাপ ডাকাত বলে' হরলাল ভাগ্‌লো। সে-কথা মনে আছে, গফুর?

গফুর বলিল,—কিন্তু ওরা এসে টুঁটি কামড়ে ধরে' সব না ভুলিয়ে দেয় এবার।

গুপী বলিল,—তোর সব ফাঁকির রাস্তা দিয়ে বেয়ে চল্। বুঝলে অনিল, গফুর সেদিনের সেই উপকারের কথা ভোলে নি। তোমরা সেদিন আমার ক্ষুধার সময় মুখের সামনে খাবার তুলে ধরেছিলে, সেই উপকারের কথা আমি ভুল্‌লাম কী ক'রে? বুলুকে কি না মোটা একটা লতা দিয়ে বেঁধে রাখলাম।

থামিয়া আবার সে কহিল,—কিন্তু সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি এখন করব, অনিল। ডাকাতের দলে থেকে একেবারে অধঃপাতে গেছি—কী বলিস গফুর? কোথায়ই বা যাবো? কেই বা আমার আছে?

অনিল কহিল,—কিন্তু ওদের দলে ফিরে যাবার ত' আর রাস্তা নেই।

গুপী হতাশার সুরে কহিল,—রাস্তা কোথায়ই বা আছে? সেই সব দুঃখের কথা তুমি বুঝবে না, অনিল। আর যখন আমাদের দেখা হ'বে না, তখন ব'লেই বা আর লাভ কী?

—আর দেখা হ'বে না কেন?

গুপী কহিল,—কী ক'রেই বা হ'বে? কোথায় ভেসে যাই ঠিক কী।

এই কথায় অনিলের মন ভারি উদাস হইয়া উঠিল—বুলুর সঙ্গেও কি

আর তার দেখা হইবে না? শেষকালে গণেশই নিজে তাহার গায়ে হাত তুলিল?

গুপী পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে বটে। সারাদিন কোথায় কোন্ কোন্ চেনা বাড়িতে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া চাহিয়া-চিন্তিয়া সে পয়সা জোগাড় করিল—গফুরের কোন্ আত্মীয়-বাড়িতে পরম পরিতোষের সহিত দুইজনে মুর্গি আর পরোটা খাইল; রাত্রে শুইবার একটু জায়গা করিয়া লইল—আর রোদ উঠিতেই আর একটি লোক নিয়া গফুরই ষ্টেশন-ঘাটে তাহাদের পেঁছাইয়া দিল। কোথাও ডাকাতদের ক্ষীণ একটু ছায়াও পড়িল না।

দুপুরে ষ্টীমার আসিবে—ততক্ষণ দুইজনে বঁড়শী জোগাড় করিয়া মাছ ধরিল। নৌকা হইতে গফুরের একটা ময়লা চাদর পরিয়া একেবারে দুইজনে স্নান করিল ও ষ্টেশনের দোকান হইতে টাট্‌কা মুড়ি, ফেনি বাতাসা ও খুরিতে করিয়া চা কিনিয়া আনিয়া দুইজন চমৎকার ফলার করিল।

ষ্টীমার আসিতেছে।

কিন্তু গুপী টিকিট কাটিল মোটে একজনের। টিকিটটা অনিলের হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া গুপী কহিল,—নে, উঠে পড়্, সিঁড়ি দিয়েছে।

অনিল কহিল,—এই যে বললি তুই আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় যাবি?

তাহার কাঁধ চাপড়াইয়া গুপী কহিল,—পাগল! আমার যাবার জায়গার অভাব কোথায়! নে. ওঠ্ এবার, মন খারাপ করিসনে—বাড়িই ত' ফিরে যাচ্ছিস্? তোর দুঃখ কী তবে?

সিঁড়ির তক্তায় উঠিয়া অনিল আবার কহিল,—এখন কোথায় যাবি তবে তুই?

গুপী কহিল,—যে-দিকে দু' চোখ যায়। পৃথিবীতে যার কেউ নেই তার আবার ভাবনা আছে নাকি? বলিয়া সে অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টায় গুন্‌গুন্ করিয়া গান ধরিয়া দিল।

ষ্টীমারটা চলিতে সুরু করিয়াছে—রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া অনিল অপলক চোখে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে বুঝি। আকাশে দিব্যি খট্‌খটে রোদ থাকিলেও গুপী দেখিল সমস্ত কিছু কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

ষ্টীমারটাকে আর দেখা যায় না—তাহার দুই চোখে অশ্রুর নদী দুলিয়া । খালি বুকের মধ্যে ষ্টীমারের চলার শব্দ অব্যক্ত হাহাকারের মত কেবলি বাজিতে লাগিল।

উনিশ

কলিকাতা শহরটা অনিলের কাছে একটা প্রাণবান দানব বলিয়া মনে হইত—কিন্তু ভোরবেলায় শেয়ালদায় ট্রেন আসিলে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সেই দানবটা শরবিদ্ধ ঈগলের মত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া আছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তার চাঞ্চল্য নাই, দুই চোখ অন্ধের দৃষ্টির মত করুণ ও উদাস—মুখভাবে শোকের বিষণ্ণতা!

সঙ্গে তাহার বুলু নাই। দাদা হইয়া ছোট বোনটিকে সে রক্ষা করিতে পারিল না। তাহাকে সেই জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিয়া সে একলা চলিয়া আসিয়াছে।

অনিল একটা বাস্ পাইল। রাস্তা ঘাট এখনো প্রায় নির্জন, শহরটা মৃতপ্রায়। আবার নিঝুম ভোরবেলা—জনশূন্য রাস্তা—চিত্রার্পিতের মত নিস্তব্ধ বাড়ি।

মা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন—বুলুকে কোথায় রাখিয়া আসিলি? তখন সে লজ্জা ও দুঃখ সে রাখিবে কোথায়?

মা-বাবারাও নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছেন কি না কে বলিবে?

অত্যন্ত অপরাধীর মত ম্লান কুণ্ঠিত মুখে রোয়াকে দাঁড়াইয়া অনিল অতি আস্তে-আস্তে কড়া নাড়িতে লাগিল। তাহার প্রত্যাবর্তনটা যুদ্ধজয়ীর নয়, হারিয়া গিয়া মুখে চুন-কালি মাখিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের মতই সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কড়া-নাড়ার শব্দ উপরে গেল না, নীচে সুখিয়া চাকর শুইয়া ছিল, সে আসিয়া দরজা খুলিল।

এবং দরজা খুলিয়াই সে হাঁ হইয়া গেল। হারানো অনিলকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াও সুখিয়া আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল না। কপালে চোখ তুলিয়া সে কয়েক পা পিছাইয়া গেল।

অনিল কহিল,—কি রে সুখিয়া ? আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছিস্ না ?

সুখিয়া তাহাকে চিনিবে কি, টেবিলের পায়ার গুঁতা খাইয়া, দরজার উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া, দরজার পর্দা ছিঁড়িয়া মরি বাঁচি করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। অমরেশবাবুর ঘরের দরজায় সজোরে ধাক্কা মারিতে মারিতে সে তারস্বরে কহিল,—শিগগির দরজা খুলুন বাবু, নীচে দাদাবাবুর ভূত এসেছে। সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া সুখিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অমরেশবাবু দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—কী বলছিস যা-তা ? ভূত কি রে হতভাগা ? বলিয়া ঠাসিয়া তাহাকে ধম্‌কাইয়া দিলেন।

সুখিয়া প্রতিবাদ করিল,—হ্যাঁ বাবু, দরজা খুলে দিতেই বৈঠকখানায় এসে ঢুক্‌লো।

অমরেশবাবু কহিলেন,—যা, যা, এখন নিশ্চয়ই চলে' গেছে। কাল রাতে ঠেসে খুব গাঁজা খেয়েছিস বুঝি ? যা, দরজা বন্ধ করে' দে।

—কী হয়েছে ? বলিয়া অনিলের মাও তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পেছনে বুলু।

—কী-নাকি এক ভূত দেখেছে। যত আজগুবি—মাথামুণ্ডু !

অমরেশবাবু কহিলেন,—নীচে এখনো বসে' আছে কি না ! তুই যা না নেমে। ভূত আর কাকে বলে ? তুই-ই ত' একটা আস্ত ভূত দেখছি।

সুখিয়া তখনো দেয়াল ধরিয়া কাঁপিতেছে।

কুমার বলিল,—যাই বলো, শিগ্‌গিরই গয়ায় একটা পিণ্ডি দেবার ব্যবস্থা করো।

নীচে অনিল খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু কেহই নামিয়া আসিল না দেখিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। বুলুকে সঙ্গে আনিতে পারে নাই এই লজ্জাই তাহাকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া সে ফিরিয়া আসিতে পারিল বলিয়া বাবা-মা তাহাকে একটুও অভ্যর্থনা করিবে না ? তাহাকে দেখিয়া সুখিয়া কি না পাগলের মত মুখ-ভঙ্গি করিয়া পলাইয়া গেল। সে নিজের বাড়িতেই আসিয়াছে ত' ? হ্যাঁ, ঐ ত' বাবার সেক্রেটারিয়েট্

টেবিল, দেয়ালে চন্দন-কাঠের ফ্রেমে সেই ঘড়িটা, সেই ক্যালেণ্ডার! তবে বাবা কি ফিরিয়া আসেন নাই? পিসিমা ত' আছেন।

ধীরে অনিল সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। উপরে উত্তেজিত কণ্ঠে কাহারা সব কথা কহিতেছে—অনিল কান খাড়া করিয়া রাখিল। মা, বাবা, কাকা, পিসিমা—বুলু! হ্যাঁ, বুলুরই ত' কণ্ঠস্বর? সিলিঙ্‌ ও দেওয়ালের দিকে আবার সে চাহিয়া দেখিল,—ভুল করিয়া সে অন্য বাড়িতে ঢুকিয়া পড়ে নাই ত?

বুলুর গলা, বুলু কথা কহিতেছে, বুলুর মুখ হইতে ঝর্ণার জলের মত শব্দ বাহির হইতেছে—

অনিল এক লাফে তিন সিঁড়ি করিয়া লাফাইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহাকে অমন ভঙ্গিতে উঠিতে দেখিয়া সুখিয়া ভয়ে একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল—ঐ এলো, এলো, আমাকে মেরে ফেললে বাবু। বলিয়া প্রাণপণ শক্তিতে সে অমরেশবাবুকেই জড়াইয়া ধরিল।

অনিলকে দেখিয়া সবাই আকস্মিক বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্‌, স্তম্ভিত হইয়া গেছে। বুলু যে বুলু, সেও পর্যন্ত তাহাকে দেখিয়া আনন্দে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে না। অনিল ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল—হ্যাঁ, তাহারই ত' বাবা, মা, ঐ বুলু, কুমার-কাকা—তবে এ কেমন অদ্ভুত লাগিতেছে!

অনিল সকলের দিকে চাহিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

সবাই তখন সমস্বরে বীণার সমস্ত তারের সমবেত ঝঙ্কারের মত আর্তনাদ করিয়া উঠিল,—কে অনিল, না?

—হ্যাঁ আমাকে তোমরা চিনতে পাচ্ছ না?

মা ছুটিয়া আসিয়া দুই ব্যগ্র বাহুতে অনিলকে আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়া পড়িলেন। ঠিক কাঁদিতেছেন না হাসিতেছেন তাহার মুখের সেই বিকৃত শব্দটার কোন অর্থই স্পষ্ট বোঝা গেল না। ছেলের সর্বাঙ্গে স্নেহহস্ত বুলাইয়া কপালে ও গালে অসংখ্য চুমা খাইয়া মা বলিলেন,—ভূতই ত' বটে!

বুলুকেও মা সেই সঙ্গে কোলে ডাকিয়া লইলেন। বুলু কহিল,—কী করে' এলি দাদা?

অনিল বুলুর ডান হাতটা নিজের মুঠিতে টানিয়া লইয়া কহিল,—তুই কী করে' এলি ?

অনিল ও বুলুকে কোলে লইয়া মা চক্ষু বুজিয়া এই তীব্র অনুভূতিটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অমরেশবাবু কহিলেন,—তুই একবার যা, কুমার। থানায় গিয়ে ইন্‌স্পেক্টারবাবুকে খবর দে, ডাকাতদের খোঁজ করবার জন্য ব্যস্ত হ'বার আর দরকার নেই। অনিলও এসে পড়েছে।

কুমার বাহির হইয়া গেল।

সারা বাড়িতে উৎসবের সমারোহ চলিল। তাহার কী বর্ণনা করিব ? যে মরিয়া গিয়াছে বলিয়া তোমাদের বিশ্বাস, সে যদি একদিন সত্য-সত্যই সশরীরে বাড়ি ফিরিয়া আসে, তখনকার সেই আনন্দের ছবি তোমরাই কল্পনা করিয়া দেখিয়ো।


দুই
ভাই

এক

উপরের ঘর থেকে সবই বিনয় দেখছিলো। দেখছিল ফটকের বাইরে ছই-ঢাকা একখানা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গরু ছেড়ে নিয়ে গাড়িটা নামিয়ে রাখতেই তার থেকে নেমে এলো একজন প্রৌঢ় স্ত্রীলোক, দেখলেই মনে হয় যেন অত্যন্ত দুঃস্থ। আভাসে বোঝা যাচ্ছিলো মুখ করুণ, বেদনার্ত ; কেমন উৎসুক অথচ ভীত চাহনি।

গাড়ি থেকে নেমে স্ত্রীলোকটি খোলা ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। সামনেই কাছারি, নায়েবের দপ্তর। ফরাসে বসে জমানবীশ ও তার মুহুরিরা কাজ করছে, নায়েববাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানছেন, উপর থেকে চোখে ঠিক না পড়লেও দৃশ্যটা কল্পনা করে নেয়া বিনয়ের পক্ষে কঠিন নয়।

উঠোন পেরিয়ে স্ত্রীলোকটি কাছারি-বাড়ির সিঁড়ির প্রথম ধাপের উপর পা রেখেছে, ভিতর থেকে নায়েববাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন : 'আবার এসেছেন আপনি ? বাবু আপনাকে আসতে বারণ করে দিয়েছেন আপনার তা মনে নেই ?'

ক্ষীণ ম্লানকণ্ঠে স্ত্রীলোকটি কী বলল তা কিছুই বোঝা গেল না।

কিন্তু নায়েবের কণ্ঠস্বরে একবিন্দু কোমলতা নেই। তাঁর গলা যেমন স্পষ্ট তেমনি তেজী। বললেন, 'না, হবে না, কোনো সময় হবে না।'

প্রত্যুত্তরে স্ত্রীলোকটি আবার যেন কী বলল নিম্ন, আর্দ্র স্বরে।

নায়েবের গলায় আবার বাজ ডেকে উঠলো : 'না, আপনার কোনো কথা শোনা হবে না। ভালোয় ভালোয় যদি না যান—'কথাটা শেষ না করেই যেন ইঙ্গিতটা তিনি আতঙ্কময় করে তুললেন।

তার জানলা থেকে বিনয় দেখলো স্ত্রীলোকটি তার গাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে। যে আঁচল গায়ের উপর দিয়ে ঘন করে টানা ছিল তারই প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মুছছে বোধহয়।

দ্রুত পায়ে বিনয় নীচে নেমে এলো। একেবারে কাছারিঘরে। যা সে ভেবেছিলো, নধর দেহখানাকে আধখানা ভেঙে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নায়েববাবু কোমল আলস্যে গড়গড়া টানছেন।

স্পষ্ট, একটু বা কঠিন গলায় বিনয় বললে, 'ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার করার অর্থ ?'

তার ভঙ্গিটা ঠিক শাসনকর্তার ভঙ্গি, কিন্তু ব্রজলাল ভ্রূক্ষেপও করলেন না। মোটা একটা হিসাবের খাতা টেনে নিয়ে অনাবশ্যক আগ্রহে তাতে মনঃসংযোগ করলেন।

'কে ঐ ভদ্রমহিলা ?' বিনয় কর্কশ কণ্ঠে জিগগেস করলে।

খাতা থেকে চোখ না তুলেই ব্রজলাল বললেন, 'এখানকার একজন ভিক্ষুক।'

'এখানকার ভিক্ষুক—কই, কোনোদিন দেখিনি তো আগে!' বিনয় একটু অবাক হলো।

'ঠিক এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নয়', ব্রজলাল তেমনি নির্লিপ্ত, উদাসীন ভাবে বললেন, 'মাঝে-মাঝে আসে, আবার চলে যায়। অনেকদিন পরে আজ আবার এসেছিলো।'

'কী চায় সে ভিক্ষে ?'

'অভাবে পড়লে লোকে যা চায়।' ব্রজলালের স্বরে তেমনি উপেক্ষা।

'চাল-ডাল ? পয়সা-কড়ি ?'

'তাই হবে হয়তো।'

'হবে হয়তো মানে ?' বিনয় ঝাঁজিয়ে উঠলো: 'তাকে জিগগেস করেন নি সে কী চায় ? আর, সাধারণ চাল-ডাল বা পয়সা-কড়ির যে ভিক্ষুক সে কখনো গাড়িতে করে ভিক্ষে করতে আসে ?'

ব্রজলাল চুপ করে রইলেন।

'এই বললে, তাকে 'আপনি' বলে সম্মান দেখালুম আর এই বলছ চলে যেতে বলায় তাকে অপমান করা হলো—ভাষার কৃতিত্ব আমার নেই বটে।' ব্রজলাল তাঁর স্বরটাকে একটু বাঁকা করলেন। তারপর সোজাসুজি, একটু বা দৃঢ় গলায় বললেন, 'ভিক্ষুক এসেছিলো আমার কাছে, তাকে কী দিতে হবে বা না-হবে কী বলতে হবে বা না-হবে তা আমি জানি। তোমার কাছে যখন সে যাবে, তখন তুমি তাকে দান-খয়রাৎ করো বা পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পুজো করো আমি কিছুই বলতে আসবো না।'

'আচ্ছা, দেখা যাবে।' খুব একটা রাগের ভঙ্গি করে বিনয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যেন এখুনি সে এর একটা কিছু প্রতিবিধান করবে এমনি ভাব।

গেল সে তার বাবার কাছে। জানতো, নায়েব ব্রজলাল বাবার ডান-হাত, কোনো সুরাহাই হয়নি এ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে নালিশ করে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। আজকের তার নালিশটা জমিদারি-সংক্রান্ত কোনো অত্যাচারের বিরুদ্ধে নয়, নিতান্তই ব্যক্তিগত। সুফল কিছু হলেও হতে পারে হয়তো।

বিজয়নারায়ণ তখন রোদে বসে তেল মাখাচ্ছিলেন, ব্যস্ত ভঙ্গিতে বিনয় কাছে এসে দাঁড়ালো। কোনো ভূমিকা না করেই বললে, 'ব্রজ-নায়েব দিন-কে-দিন ভীষণ বেয়াদব হয়ে উঠছে বাবা। ওকে এক্ষুনি বরখাস্ত করে দেয়া উচিত।'

'কেন, কারু পাকা ধানে মই দিয়েছে বুঝি?' বিজয়বাবু কুটিল দৃষ্টিতে বললেন, 'কারু জমির দখল নিয়েছে বুঝি জোর করে? ভিটে-মাটি থেকে কাউকে দিয়েছে বুঝি উৎখাত করে?'

'তেমন কিছু করলে আপনি তো নালিশ কানেই তুলতেন না। আপনার মতে সেগুলো তো অত্যন্ত গুণের কাজ।'

'নিশ্চয়ই।' বিজয়বাবু সপ্রশংস ভাবে বললেন, 'জমিদারিটা যদি রাখতে হয় বাঁচিয়ে। জানো তো, আইন নিরপেক্ষ, কর্তব্য নিষ্ঠুর। তাই, আইন যে অধিকার দিয়েছে তা খাটাতে গিয়ে নায়েবমশাই যদি কখনো কোথাও

নিষ্ঠুর হন, তবে তাঁকে তুমি মোটেই দোষ দিতে পারো না। বরং তাঁকে তোমার কর্তব্যপরায়ণ বলে প্রশংসা করা উচিত। প্রশংসা করা উচিত কুশলী বলে, বিচক্ষণ বলে। এমন লোককে বরখাস্ত করাও যা জমিদারিটি গোল্লায় দেয়াও তাই।'

'কিন্তু একজন দরিদ্র ভদ্রমহিলাকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়াও কি তার কর্তব্যের মধ্যে নাকি?'

'তাড়িয়ে দিয়েছে? কাকে তাড়িয়ে দিয়েছে?' বিজয়বাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

যতটুকু জানতো, বিনয় খুলে বললে ঘটনাটা।

যে দুটো চাকর দলাই-মলাই করছিলো তাদের একটাকে বিজয়বাবু পাঠিয়ে দিলেন নায়েবমশাইকে ডেকে আনতে।

ব্রজলাল একপাশে এসে দাঁড়ালেন। ঋজু, সতেজ ভঙ্গি।

'কী হয়েছে বলুন তো? কাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?' জিগগেস করলেন বিজয়বাবু।

'সেই পাগলীটা আজ এসেছিলো। তাকে।' ব্রজলাল প্রসন্নমুখে বললেন।

'কোন পাগলী?' বিজয়বাবুর মুখ সন্দেহে ঈষৎ ঘোরালো হয়ে উঠলো: 'সেই জগৎঠাকরুন?'

'হ্যাঁ,' ব্রজলাল বললে, 'সেই জগৎমোহিনী।'

'বেশ করেছেন সেই পাগলটাকে তাড়িয়ে দিয়ে। কোনোদিন ঢুকতে দেবেন না এ-মুখো। আমি ভাবছিলুম কে-না-কে না-জানি এসেছিলো!' নিশ্চিন্ত মনে বিজয়বাবু তাঁর তৈলাক্ত দেহটা আবার চাকর দুটোর হাতের নীচে সমর্পণ করলেন।

সন্দেহ ঘুচলো না বিনয়ের। তাই জিগগেস করলে, 'পাগল হলে গরুর গাড়িতে আসবে কেন?'

'পাগল হলেও ভোলেনি যে সে পর্দানশীন। আর এই গাঁয়ে হাওয়া-গাড়ি হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় না।' বিজয়বাবু টিপ্পনি কাটলেন।

ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হতে পারতো, কিন্তু বিনয় তার জের টেনে নিয়ে চললো তার মার কাছে।

সুনয়নী তখন রান্নাঘরে রান্নার তদারক করছেন। বিনয় সটান সেখানে এসে উপস্থিত। বললে,'আচ্ছা মা, চার বছর আগে, যখন আমি স্কুলে পড়ি, ক্লাশটেন্-এ, তখন আমার শক্ত টাইফয়েড হয়েছিলো, তোমার মনে আছে?'

'মনে থাকবে না কেন?'

'তোমরা সব আমার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলে—বিয়াল্লিশ দিনের দিন—'

'কেন, তার হয়েছে কী?'

'বিয়াল্লিশ দিনের দিন—তোমার মনে আছে মা, রাত্রে আমার অবস্থা যখন খুব খারাপ, তোমরা সবাই কাঁদাকাটা করছ, সেই সময় এক পাগলী চুপি-চুপি দোতলায় আমার শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছিলো, সবাইর অলক্ষ্যে বসেছিল এসে আমার শিয়রে। বালিশের থেকে আমার মাথাটা তার কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে আমার গায়ে হাত বুলুতে-বুলুতে বলেছিলো: 'কেঁদো না তোমরা, ভয় নেই, আমি এসেছি। খোকাকে আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।' তোমার মনে আছে মা?'

'তোর কী করে মনে আছে?' সুনয়নী হাসলেন।

'আমি ভালো হয়ে ওঠবার পর তোমরা সবাই আমাকে বলেছিলে সেই ঘটনাটা। বলেছিলে, পাগলী সমস্ত রাত আমাকে তেমনি কোলে করে বসে রইলো, বিজবিজ করে সমস্ত রাত কী ভূতের মন্ত্র আওড়ালে, আর সেই রাতেই আমার অবস্থা ভালোর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। আমি তখন আচ্ছন্নের মতো ছিলুম বটে, কিন্তু পরে, ভালো হয়ে, আমাকে ঘিরে তার সেই স্নেহের ব্যাকুলতাটা সর্বক্ষণ আমি অনুভব করেছি।'

'কেন, সে-সব কথা এতদিন পরে কেন?'

'সেই পাগলীই বোধহয় ফিরে এসেছে, মা।'

'কোন পাগলী?' সুনয়নী যেন ভয় পেলেন: 'জগপাগলী?'

বিনয় একমুহূর্ত অবাক হয়ে গেল। বললে, 'নায়েববাবুও এই নামই

বলছিলো বটে। কিন্তু সে ফিরে এসেছে শুনে তোমার ভয় পাবার কারণ কী! যে আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে সে তো আমাদের ঘরে একজন বাঞ্ছনীয় অতিথি, মা।'

সুনয়নী আর কোনো কথার ধার ধারলেন না। গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন: 'মাধব! মাধব!'

মাধব সুনয়নীর ছোট ছেলে, পাঁচবছর প্রায় বয়স।

এত বড়ো বাড়ির কোথা থেকেও মাধবের সাড়া পাওয়া গেল না। মুহূর্তে সুনয়নীর মুখ শুকিয়ে সাদা হয়ে গেল। পাগলী মাধবকে নিয়ে গেল নাকি কোলে করে?

'কী দাঁড়িয়ে আছিস হাঁ করে?' সুনয়নী বিনয়ের উপর মুখিয়ে উঠলেন: 'ছাখ, আমার মাধব গেল কোথায়?'

'এই তো মা, আমি এখানে।'

'কোথায়?' সুনয়না ঝুঁকে নীচু হলেন।

'এই যে।' লাউয়ের মাচার তলা থেকে মাধব এলো বেরিয়ে। মোজা থেকে টুপি—সর্বাঙ্গ তার জামা-কাপড়ে ঠাসা, ব্যাণ্ডেজ-করা বলতে পারো। রোগা, পুঁচকে ছেলে, তাগায়-কবচে জর্জরিত। শেষবয়সের সন্তান বলে এক মুহূর্তও চোখের আড় করা যায় না। তুলোর উপর শুইয়ে তুলোতে করে দুধ খাওয়াতে সাধ যায়। কিন্তু মাধবের স্বভাব বড়ো দুরন্ত। কোল-কাঁখের চেয়ে ধুলো-মাটিই তাকে বেশি টানে।

'কী করছিলে ওখানে?' সুনয়নী প্রায় ধমকে উঠলেন।

'ছিকার করছিলাম।' মাধব খুব একটা বীরত্বের ভঙ্গি করে বললে। কিন্তু সামনেই দাদাকে দেখতে পেয়ে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। লজ্জায় মুখ লুকোতে গেল দাদারই কোলের মধ্যে।

দু' পা পিছিয়ে গিয়ে বিনয় জিগগেস করলে: 'তোর হাতে ওটা কী?'

হাতের মস্ত লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে মাধব বললে, 'ভুন্দুক।'

'ফেলে দাও ওটা, তবে আমার কোলে আসতে পারবে।' বিনয় দু'হাত বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে।

বন্দুকের চেয়ে দাদার কোল মাধবের কাছে বেশি লোভনায়। তাই সে লাঠিটা সহজেই ফেলে দিয়ে দাদার কোলে এলো ঝাঁপিয়ে।

'কী শিকার করছিলে ?'

মাধব চোখ বড়ো করে বললে, 'চলুই পাখি।'

'ভুন্দুক দিয়ে হবে কী ?'

'ভন্দুক দিয়ে পাখিল মাথায় একতা বালি মাববো।'

'পাখির মাথায় বাড়ি মারবে, পাখির ব্যথা লাগবে না, কাঁদবে না পাখি ? তোমার মাথায় যদি বাড়ি মারি, তুমি কাঁদ না ?'

কুচকুচে কালো চোখ দুটি অচঞ্চল রেখে মাধব কী কতক্ষণ গভীর চিন্তা করলো। পরে বললে, 'তা হলে আল ছিকাল কববো না। কেমন ? কিন্তু বাবা কেন কলে ? ছেদিন দু'তা হলিন মেলে এনেছিলো কেন ?'

ও-পাশ থেকে সুনয়নী বলে উঠলেন : 'বড়ো হয়ে তুমিও শিকার করবে। এখন শিকার করতে ও-সব বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে পাগলী এসে ধরে নিয়ে যাবে দেখো।'

হাত দিয়ে দাদার চিবুক তুলে ধরে মাধব জিগগেস করলে : 'পাগলী ধলে নিয়ে যাবে দাদা ?'

'ককখনো না। যার দাদা আছে তার আর ভাবনা কী।'

মাধব যেন প্রকাণ্ড আশ্রয় খুঁজে পেল। উৎসাহে দুই চোখ উজ্জ্বল করে বললে, 'তা হলে বলো হয়ে ছিকাল কববো। কেমন ?'

'না, বড়ো হয়েও শিকার করবে না।'

চোখ দুটি ম্লান করে মাধব বললে, 'পাখিল ব্যথা লাগে বুঝি ?'

'হ্যাঁ, যে পাখি ব্যথা পেয়ে মাটিতে পড়ে যাবে তাকে জল দেবে, ছোলা দেবে, ছাতু দেবে। তাকে ভালো করে তুলবে। আর যেই ভালো হয়ে উঠবে তাকে খাঁচায় বন্ধ করে না রেখে আকাশে ছেড়ে দেবে। সে উড়ে যাবে তার বাসায়—আকাশের পথ চিনে চিনে।'

মাধব দাদার কাঁধে চড়ে ভুরু কুঁচকে তাকালো একবার আকাশের দিকে। কোথায় কোন পাখি কিছুই তার চোখে পড়লো না।

দুই

গ্রীষ্মের ছুটিতে বিনয় এসেছে বাড়িতে, সহরের কলেজ থেকে। গাঁয়ের ছেলেরা এখন সবাই মিলে থিয়েটার করছে, পিকনিক করছে, বিলে আর নদীর চরে গিয়ে পাখি শিকার করছে। কিন্তু ও-সব দিকে বিনয়ের কোনো উৎসাহ নেই। জমিদারবাড়িগুলির ইঁট-কাঠের এলেকা ছেড়ে সে চলে যায় দূর গ্রামের মধ্যে, যেখানে মাটির ঘরে গরিব চাষাদের বসতি।

হরেকৃষ্ণ তাদের অনেক দিনের প্রজা। জমি-জিরাত এখনো তার কিছু বেহাত হয়নি, খাজনা দিয়ে যাচ্ছে বরাবর।

কানে এলো সেই হরেকৃষ্ণ হঠাৎ আজ বিদ্রোহী হয়ে জমিদারের লোকদের মারপিট করেছে। খবরটা যেন সহজে বিশ্বাস করবার নয়। কাউকে কিছু না বলে বিনয় হরেকৃষ্ণর বাড়ির দিকে রওনা হলো।

গিয়ে দেখলো ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত। হরেকৃষ্ণ দাওয়ায় মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে আর মাথার যেখানটায় হাত সেইখান থেকে রক্ত আসছে বেরিয়ে।

'ব্যাপার কী হরেকৃষ্ণ ?'

ভিতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে কে কেঁদে উঠলো : 'আমাদের পুন্নিমে-অমাবস্যেকে ধরে নিয়ে গেছে।'

অনেক কান্না ও কোলাহলের মধ্যে আসল খবর যেটুকু বিনয় সংগ্রহ করলো সংক্ষেপে তা এই :

অজন্মার জন্যে পর-পর চার বছর হরেকৃষ্ণ খাজনা দিতে পারেনি। বাকি খাজনার জন্যে আদালতে নালিশ করে জমিদার ডিক্রি করে নিয়েছে। সেই ডিক্রি জারিতে দিয়ে আদালতের পেয়াদা নিয়ে জমিদারের লোক এসেছিল তার অস্থাবর ক্রোক করতে। তারপর—

'কে জমিদারের লোক ?' বিনয় গর্জে উঠলো।

'নাম জানিনা বাবু। পশ্চিমী গুণ্ডা।'

'সে তো রামকিষণ, আমাদের কাছারির দরোয়ান। তারপর—'

তারপর, ধরবার মতো মালামাল কিছু না পেয়ে শেষকালে তার গোয়ালে ঢুকে দুটো গাই ধরে নিয়ে গেছে।

'আমার পুন্নিমে-অমাবস্যে, বাবু।' পিছন থেকে হরেকৃষ্ণর মা কেঁদে উঠলো।

'হালের বলদ ধরবার নাকি হুকুম ছিলনা, বেছে-বেছে তাই আমার দুধেল গাই দুটোকে ধরে নিয়ে গেল।' হরেকৃষ্ণ হাপুস চোখে কেঁদে উঠলো: 'মায়েদের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের বাছুর দুটো—আমার শুক্লা আর কৃষ্ণাও চলে যাচ্ছিলো, আমি ছুটে ছিনিয়ে আনতে গেলাম, ঘুরে দাঁড়িয়ে আপনাদের সেই দরোয়ান আমার মাথায় তার হাতের লাঠি দিয়ে এই বাড়ি মারলে।'

বিনয় জিগগেস করলে, 'গরু দুটো আছে কোথায় ?'

'এই পাশেই, দেবনাথের বাড়িতে।'

'কে দেবনাথ ? আমাদের প্রজা ?'

'হ্যাঁ, বাবু, আমারই সরিক, খুড়তুতো ভাই। বাবা-কাকাদের আমলে জমা-জমি সব একসঙ্গেই ছিল, কিন্তু হাল-আমলে আর এজমালি রাখা গেল না। সব ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেল, বাবু। সেই থেকে দেবনাথের কেবল রোক কী করে আমাকে পথে বসাবে। জামিন-নামা দিয়ে গরু দুটো ও-ই রেখেছে ওর জিম্মায়। ইস্তাহার বেরুলে ও-ই কিনে নেবে আর কি।'

বিনয় এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। বোধহয় মনে-মনে একবার দেখে নিল প্রতিহিংস্র সরিকের চেহারাটা। বললে, 'ডিক্রিতে তোমার দেনা কত ?'

'জারির খরচা নিয়ে গোটা চল্লিশ টাকা হবে। পরোয়ানা পড়ে আদালতের পেয়াদা তাই চাচ্ছিলো বটে।'

'চল্লিশটা টাকা দিয়ে দিতে পারলে না ?'

'দিয়ে দিতেই যদি পারবো তবে আমার পুন্নিমে-অমাবস্যেকে ছেড়ে দেব কেন ? লাঠির ঘায়ে কেনই বা তবে মাথাটা ফাটাবো বলুন ?'

'এই বা তোমার কী আবদারের কথা!' বিনয় ঈষৎ অসহিষ্ণু গলায় বললে, 'জমি চাষ করবে, তার ফসল খাবে, অথচ তার খাজনা দেবে না ?'

'খাজনা দেব বই কি বাবু', হরেকৃষ্ণ হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালো, 'তবে, অভাবের সংসার, সব সময় সময়মতো দিতে পারি না। তা, দিতে পারি না, খাজনার দায়ে জমি নিলেম করে নিলেই হয়, আমার গরু-বাছুরের গায়ে হাত দিতে আসে কেন?'

বিনয় খানিকটা অবাক হলো বলতে হবে। বললে, 'জমি তুমি ছেড়ে দিতে চাও নাকি?'

'কী করবো না ছেড়ে দিয়ে? নায়েববাবুর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লুম, আর দুটো মাস আমাকে সময় দিন, মাঠের ধানটা উঠে গেলেই আমি সুদ সমেত সব টাকা আপনার চুকিয়ে দেব। নায়েববাবু শুনলেন না গরিবের কথা। পাছে জমির দিকে গেলে দুটো মাস আমি বেশি সময় পাই, তারি জন্যে চিলের মতো এসে ছোঁ মেরে আমার গরু দুটো ধরে নিয়ে গেলেন। জমি বিক্রি হয়ে গেলে সময়মতো টাকা জমা দিয়ে আবার তা ফিরে পাবার পথ আছে, কিন্তু গো-হাটায় গরু বিক্রি হয়ে গেলে তাদের আর পাব কোথায়?' হরেকৃষ্ণ আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠলো : 'এ শুধু আমাকে জব্দ করা, আর কিছু নয়।'

'আচ্ছা, তুমি বোসো।' বলে বিনয় ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে গেল।

কতক্ষণ পরে সে পুন্নিমে-অমাবস্যেকে নিয়ে হাজির। ঢুঁ মেরে-মেরে শুক্লা আর কৃষ্ণা যার-যার মায়ের দুধ খেতে লেগে গেছে।

গরু দুটোকে ফিরে পেয়ে কোথায় হরেকৃষ্ণ উৎফুল্ল হয়ে উঠবে, তা নয়, ভয়ে তার মুখ গেল শুকিয়ে। বড় বড় চোখ করে বললে, 'এ আপনি কী সর্বনাশ করলেন বাবু? আপনি কি শেষকালে আমাকে ফাটকে পাঠাবেন নাকি?'

বিনয় তলিয়ে কিছুই বুঝতে পারলো না। বললে, 'ফাটক হবে কেন?'

'আদালতের ক্রোকী মাল ছিনিয়ে আনলুম, আমাকে ওরা ছেড়ে দেবে নাকি?'

'তুমি আনলে কোথায়! আনলুম তো আমি। যা হবার তা আমার হবে।' বিনয় সাহসীর মতো বললে।

কিন্তু হরেকৃষ্ণ তাতে উৎসাহিত হতে পারলো না। বললে, 'যা হবার তা এই গরিবের উপরেই হবে বাবু। জামিন দিয়েছে দেবনাথ, সেই প্রথম আমাকে তিষ্ঠোতে দেবে না। তার পরে আছে জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ। তারো ওপরে আছে আদালতের পিওন-পেয়াদা। আমি একেবারে শেষ হয়ে যাব। না, দরকার নেই, গরু আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। যার গরু তাকে দিয়ে আসুন গিয়ে।'

'যার গরু মানে?' বিনয় প্রায় ধমকে উঠলো।

'আপনারা যখন ধরে নিয়েছেন তখন ওরা আপনাদেরই।' মিনতিময় চক্ষু মেলে অমাবস্যাটা তার গলাটা কখন লম্বা করে দিয়েছিলো হরেকৃষ্ণর দিকে, হরেকৃষ্ণ নিজেরো অলক্ষ্যে তার গলায় আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

'আচ্ছা, আমাদেরই হয়, আমরাই আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।' বলে আর কোনো কথায় কর্ণপাত না করে বিনয় প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

এদিকে ঘটনাটা ডাল-পালা মেলে ব্রজলালের কাছে পৌঁছে গেছে। বিজয়নারায়ণ তাঁর ভিতরের বৈঠকখানায় বসে ইয়ারবন্ধুদের সঙ্গে পাশা খেলছেন। গগন-বিদারণ অট্টরোল চলেছে।

তার মাঝে ব্রজলাল এসে দাঁড়ালেন গাম্ভীর্য ও স্তব্ধতার প্রতিমূর্তি।

'এ কী, তুমি এখানে অসময়ে?' বিজয়নারায়ণ ভুরু কুঁচকোলেন।

'জরুরি একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।' ব্রজলাল নম্র অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, 'নইলে অযথা আপনাকে বিরক্ত করতে আসতুম না।'

'তোমার উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েও কি আমার শান্তি নেই?' বিজয়নারায়ণ তাকিয়ায় ঠেস দিলেন: 'তোমাকে বলেছি তো, যা তুমি ভালো বুঝবে তাই করবে, কোনো-কিছুর মাঝে আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবে না। দ্বারী দ্বার রক্ষা করে, গৃহস্বামী ঘুমোয়। তেমনি তুমি জমিদারিটা রক্ষা করবে আর আমি ভোগ করবো।' বলে তিনি পার্শ্বস্থিত গড়গড়ার নলটা মুখে তুলে দিলেন।

'কিন্তু, ব্যাপারটা বিনুবাবুকে নিয়ে।' ব্রজলালের গলা অত্যন্ত স্থির ও শান্ত।

'কী আবার করেছে হতভাগা?' তাকিয়া ছেড়ে বিজয়নারায়ণ খাড়া হয়ে উঠে বসলেন।

'ডিক্রিজারিতে হরেকৃষ্ণর দুটো গরু ক্রোক করা হয়েছিলো, বিনুবাবু গিয়ে জামিনদারের জিম্মা থেকে জোর করে সে দুটো খালাস করে দিয়েছেন।'

'তার অর্থ?' বিজয়নারায়ণের গলায় যেন বাজ ডেকে উঠলো।

'তার অর্থ আর কিছু নয়, সব কিছুর মাঝেই তিনি জমিদারি অত্যাচার দেখতে পান। কোলকাতার কলেজে ঢুকেছেন কিনা তাই ভাবের ধোঁয়ায় মাথাটা কিছু গরম হয়ে আছে। অত্যাচারিতের পরিত্রাতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এমনি একটা ধারণা তাঁকে পেয়ে বসেছে।'

'হুঁ!' বিজয়নারায়ণ সংক্ষেপে একটা হুঙ্কার দিলেন। পরে খেলার দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, 'আমি ও-সবের কিছু জানিনা, আমাকে খেলতে দাও নিরিবিলিতে।'

'তবে যা করবার আমিই করবো?'

'নিশ্চয়। তাতে এক পা-ও পিছু হটবে না। দেখিয়ে দেবে, বাইরেই হোক আর ভেতরেই হোক, কোথাও তুমি অশিষ্টকে শাসন করতে ভয় পাও না। ঘরের ছেলে বাইরে চলে যায় তা-ও ভালো তবু মাথা খাড়া রেখে নিজের কর্তব্য ঠিক করে যাবে, বলে দিচ্ছি। আর বলে দিচ্ছি, এ সবের জন্যে আমার খেলায় কোনোদিন ব্যাঘাত ঘটাবে না।'

ব্রজলাল দৃঢ় পায়ে চলে গেলেন। ঘরের মধ্যে আবার খেলার হুল্লোড় সুরু হলো।

কাছারিতে বসে আছেন ব্রজলাল, বিনয় ক্ষিপ্রবেগে ছুটে এসে তাঁর ডেস্কের উপর চারখানা দশ টাকার নোট বের করে বললে, 'বার করুন হরেকৃষ্ণর হিসেব, হিসেব করে যা পাওনা হয় তা নিয়ে ওর ডিক্রির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দিন।'

ব্রজলাল এক মুহূর্ত বিনয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জিগগেস করলেন, 'এ টাকা তুমি পেলে কোথায়?'

'যেখানেই পাই না কেন আপনার কাছে আমি জবাবদিহি দিতে বসিনি। যা বলি তাই শুনুন। হিসেব করে পাওনা টাকাটা হরেকৃষ্ণর নামে উশুল লিখে নিন।'

'পারবো না।'

'পারবেন না কেন?'

'পারবো না কেননা টাকাটা হরেকৃষ্ণর বাক্স থেকে আসছে না। আসছে তোমার পকেট থেকে। জামা-কাপড় কিনবে বলে যে টাকাটা তুমি আজ বার করে নিয়েছিলে এ সেই টাকা।'

'যে টাকাই হোক, আমি বলছি, আপনাকে নিতে হবে।' বিনয়ের গলায় প্রভুত্বের প্রতাপ ফুটে উঠলো।

'এক কথা বার-বার বলা আমার অভ্যেস নয়।' ব্রজলালের গলাও এতটুকু টললো না। 'স্টেটের টাকা থেকেই স্টেটের পাওনা মেটাবে এমন জড়বুদ্ধিকে তোমার বাবা নায়েব করেন নি। যদি রেগে না ওঠো, জিগগেস করি, হরেকৃষ্ণর জন্যে তোমার এত মায়া কেন?'

'আপনি ওর গরু ধরতে গেলেন কেন?' বিনয় ঝাঁজিয়ে উঠলো: 'ওর জমি ধরলে ও কিছু সময় পেত টাকাটা দেবার। প্রজার কিছুটা আসান হয় সেদিকটা দেখলে কি আপনার মান যায়? যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে অতিলোভে তার পেটের মধ্যে ছুরি চালালে কী পাবেন জিগগেস করি?'

'কিন্তু হরেকৃষ্ণ তোমার হাঁস নয়, সে একটি ঘুঘু। চারবছর সমানে সে কাঁচকলা দেখিয়েছে, একটি পয়সাও সে আদায় দেয়নি।' ব্রজলাল মমতালেশহীন উদাসীন গলায় বললেন, 'ডিক্রি পাবার পরেও তার হুঁস নেই। তাগাদার পর তাগাদা, কানই পাতে না। ও পয়লা নম্বরের ধড়িবাজ। ওর ওপর দয়া দেখানো অর্থ জোচ্চরিকে প্রশ্রয় দেয়া।'

'চুপ করুন। আপনাকে কেউ দয়া দেখাতে বলছে না। বাবা যে

জড়বুদ্ধিকে না এনে একটি অর্থপিশাচকে নায়েব করেছেন তা আমার জানা আছে। আর জানা আছে বলেই শুধু হাতে আমি আসিনি, টাকা নিয়ে এসেছি।'

এততেও ব্রজবাবু হাসলেন, হাসিটা নিষ্ঠুর একটা রেখার মতো তাঁর চোখের নীচে ফুটে রইলো। বললেন, 'তবিলের টাকা দিয়েই তবিল ভরাবো এমন ভেলকি আমি শিখিনি। জামার টাকাটা খাজনার টাকা হয়ে ঘরে ফিরবে, আবার খাজনার টাকাটাই জামার টাকা হয়ে যাবে বেরিয়ে এমন যোগ-বিয়োগে আমি অভ্যস্ত নই।'

ইঙ্গিতটা বিনয় বুঝলো না। ভুরু কুঁচকে জিগগেস করলে, 'তার মানে?'

'য়্যালজেব্রা শিখেও এটার মানে করতে পারছো না? বলি, এখন না-হয় পকেট থেকে টাকাটা বের করে দিচ্ছ, কিন্তু কালকেই তো আবার জামা-কাপড়ের বাবদ টাকাটা চেয়ে নেবে! তবে লাভটা কী হলো! নাকের বদলে নরুনও তো পাওয়া গেল না।'

'কিন্তু জামা-কাপড়ের জন্যে কে আবার টাকা চায়!'

ব্রজলাল চমকে উঠলেন, তাকালেন একবার বিনয়ের মুখের দিকে। বললেন, 'জামা-কাপড়ের জন্যে আবার টাকা চাইবে না তুমি?'

'ককখনো না। আপনি কি মনে করেন নিজের লোভ ষোল আনা বজায় রেখে পরের কখনো ভালো করা যায়? না, তাতে য়্যালজেব্রা ছেড়ে ট্রিগোনোমেট্রি লাগে?'

এততেও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না ব্রজলাল। বললেন, 'তার মানে, নিজের জামা-কাপড় না করে সেই টাকা দিয়ে তুমি প্রজার খাজনা দিয়ে দিচ্ছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনুন, শিখুন।' বিনয় সবিনয়ে বললে।

'কিন্তু গায়ে দেবে কী? পরবে কা?' ব্রজলালের কণ্ঠে যেন ব্যঙ্গের আভাস, অভিনন্দনের উত্তাপ নয়।

'যা আছে তাতেই আমি চালিয়ে নিতে পারবো।'

'কিন্তু কত দিন?'

'যত দিন না আপনাকে আমি তাড়াতে পারবো।' বিনয় তীব্র কটাক্ষ করলো।

'ভালো কথা। টাকাটা তা হলে আমি নিলুম হরেকৃষ্ণর পাওনার মধ্যে।' ব্রজলালও একবার কুটিল দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। 'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, জামা-কাপড়গুলো তোমার খুব বেশি না ময়লা আর ছেঁড়া হয়ে পড়ে।'

'সেই জন্যে আপনার ভীত হবার দরকার নেই।' বিনয় ফিরে যাচ্ছিলো, ঘুরে দাঁড়ালো। 'আমারই বরং ভয় আরামের এই আমিরি ছেড়ে আপনাকে না শিগগিরই কৌপীন এঁটে বনে চলে যেতে হয়।'

তিন

সেদিন নয়নশুকা গ্রামের গরিব এক চাষীকে তাদের ভেতর-বাড়ির উঠোনের এক কোণে পাত পেড়ে খেতে দেয়া হয়েছিলো। ব্যঞ্জনের বৈচিত্র্য ছিল অনেক, কিন্তু লোকটার খাদ্যের চেয়ে পানীয়ের প্রতি বেশি লোভ। দু' এক গরস খায় কি না খায়, ঘটি উঁচু করে জল খায় এক ঢোক। ভাত লাগবে কিনা জিগগেস করলে বলে জল লাগবে। 'কেমন খেলে, ঘনশ্যাম?' ঘনশ্যাম জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলে, 'আ, জল তো নয়, অমৃত।' বলে শূন্যে ঘটি কাৎ করে আকণ্ঠ সে নিজেকে সিক্ত ও স্নিগ্ধ করে নেয়।

বিনয় এলো এগিয়ে। বললে, 'পাতে সব পড়ে রইলো, তোমার একেবারেই পেট ভরলো না।'

'খুব পেট ভরেছে, জল খেয়েই আমার পেট ভরেছে।' ঘনশ্যাম বিশাল একটা উদগার তুললো: 'কী মিষ্টি জল! এর কাছে কোথায় লাগে আপনার দই-সন্দেশ!'

'তোমাদের গাঁয়ে বুঝি দই-সন্দেশের খুব ছড়াছড়ি? খেয়ে-খেয়ে মুখে বুঝি আর রুচি নেই!'

'তা নয় বাবু।' ঘনশ্যাম লজ্জিত বোধ করলো। বললে, 'দই-সন্দেশ

আর সবাইর অদৃষ্টে রোজ-রোজ জোটে না বাবু, কিন্তু জল তো মানুষের রোজকার জোটবারই জিনিস। শুধু মানুষ কেন, গরু-ছাগলেরো জল চাই। কিন্তু আমাদের গ্রামে বাবু এক ফোঁটাও খাবার জল নেই।'

'বলো কী?'

'হ্যাঁ বাবু, গ্রামের নাম যে নয়নশুকা। নয়ন তার শুকিয়ে রয়েছে। এক ফোঁটাও জল নেই তার চোখে।'

'জল নেই তো খাও কী সব?'

'খাই কী? খাই কাদা।' বলে ঘনশ্যাম বিকৃত মুখে হেসে উঠলো।

'কী সর্বনাশ! নদী নেই ধারে-পারে?'

'আমাদের গাঁ থেকে মহানন্দা প্রায় তিন ক্রোশ। কে যাবে সেখানে? ছোট-ছোট দু'চারটে পাত-কুয়ো যা আছে তাই আমাদের ভরসা।' ঘনশ্যাম আবার হাসলো। 'ও-গুলোকে কুয়ো না বলে গর্তই বলা উচিত। যা ওখান থেকে ওঠে তা জল নয়, পাঁক।'

'তাই খেয়ে বাঁচো কি করে?'

'বাঁচি কোথায়! গ্রাম তো প্রায় উজাড় হয়ে গেল। কলেরা তো লেগেই আছে।'

'আর আগুন? আগুন লাগলে করো কী?'

ঘনশ্যাম আবার তেমনি বিকৃত মুখে হেসে উঠলো। বললে, 'করবো কী আবার! গাঁয়ের সবাই একত্র হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখি।' বলেই শূন্যকৃত ঘটিটা সে আগিয়ে দিয়ে বললে, 'আরেকটু জল দিতে বলুন না। একেবারে কানায়-কানায় ভরতি করে দিয়ে দিতে বলুন। আ, জল যে এমন মিষ্টি হয় তা আগে কোনোদিন জানিনি।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে মাথায় ভিজে গামছা ফেলে ঘনশ্যাম যখন বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে, নেমে পড়েছে কাঁচা মাটির রাস্তায়, পিছনে পায়ের শব্দে চমকে চেয়ে দেখলো জমিদারের বড় ছেলে, বিনয়। বিস্ময়ের তার শেষ রইল না। বললে, 'এ কি বাবু, আপনি চলেছেন কোথায়?'

বিনয় স্নিগ্ধ মুখে হেসে বললে, 'তোমাদের গাঁয়ে, নয়নশুকায়।'

ঘনশ্যাম যেন ভয় পেল। 'সে কী কথা? নয়নশুকা যে এখান থেকে প্রায় আড়াই কোশ রাস্তা।'

'হ্যাঁ, কাছারির গোমস্তা-দফাদাররাও তাই বললে। মাইল পাঁচেকই হবে। তুমি ভুল বলোনি।'

'ভুল বলিনি তো,—আপনার পাল্কি নিয়ে চলুন। এই রোদ্দুর, পাঁচ মাইল পথ, গাছের ছায়া পাবেন না কোথাও,—ভীষণ কষ্ট হবে যে!'

'আর তোমার?' বিনয় স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে জিগগেস করলো।

'আমাদের কথা ছেড়ে দিন।'

'না ঘনশ্যাম, তোমাদের কথা আর ছেড়ে দেয়া হবে না। তোমার যদি কষ্ট না হয় আমারো হবে না। তুমি যদি যেতে পারো পায়ে হেঁটে, আমিও পারবো। তোমার আর আমার পথ আলাদা নয়। চলো, চলো,' বিনয় ঘনশ্যামের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল: 'পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?'

সমস্ত ব্যাপারটা যেন ঘনশ্যামের কাছে অভাবনীয় বলে মনে হচ্ছে। অভিভূতের মতো সে জিগগেস করলে, 'নয়নশুকায় যাবেন কোথায়?'

'কোথায় আবার!' বিনয় হেসে উঠলো: 'তোমার বাড়িতে।'

'আমার বাড়িতে!' ঘনশ্যাম রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। 'সেখানে কী?'

'কিছুই না। তোমার বাড়িতে গিয়ে অতিথি হব শুধু।'

জমিদারপুত্রের নিশ্চয়ই কোনো দুরভিসন্ধি আছে, গ্রামে নিশ্চয়ই আজ কোনো নতুন রকমের উৎপীড়ন সুরু করে দেবে। কাঁধে ঐ যে কী-ওটা ঝুলিয়ে নিয়েছে চামড়ার দড়ি দিয়ে, ওটার ভিতরে নিশ্চয়ই রয়েছে পিস্তল। আজ আর কারুর রক্ষা নেই।

'আমার বাড়িতে কেন, বাবু?' ভয়ে কাঁচুমাচু মুখে ঘনশ্যাম বললে, 'আমার খাজনা-পত্তর কিচ্ছু বাকি নেই। গোমস্তা-মশাইকে জিগগেস করবেন, চলুন, পাওনা-গণ্ডা আমি সব চুকিয়ে দিয়েছি। দাখিলা আছে আমার ঘরে।'

জোরে-জোরে পা ফেলতে-ফেলতে বিনয় বললে, 'চলো, তাই দেখে আসি তোমার বাড়িতে।'

ঘনশ্যামের কাছে সমস্ত দিনটা মুহূর্তে নিরানন্দ হয়ে গেল। এত জল খেয়ে এসেও তার গলা গেল শুকিয়ে, কাঠ হয়ে। বিনয়ের কাঁধের ঐ ঝোলানো জিনিসটাই তার উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

'রোদ্দুরে আড়াই-পো পথ ভেঙে আমার বাড়ি গিয়ে দাখিলা দেখার চেয়ে কাছারির খাতায় আমার নামে সত্যি উশুল পড়েছে কি না দেখে নেয়াটা অনেক সহজ ছিল।' ঘনশ্যাম দুই হাত জোড় করে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়লো। 'আমি হলফ করে বলতে পারি বাবু, এক আধলা আমার বাকি নেই।'

'তোমার এক আধলাও বাকি নেই বলে তোমার বাড়িতে যাওয়া যাবে না?' বিনয় ধমক দিয়ে বলে উঠলো : 'তোমার বাড়িতে যেতে হলে হয় মহাজনের মুহুরি নয় জমিদারের গোমস্তা হতে হবে? এমনি-এমনি যাওয়া যাবে না?'

ঘনশ্যাম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললে, 'কিন্তু আমার বাড়িতে কী আছে?'

'কেন, ছেলেপিলে নেই?'

'তা আছে গোটাকতক কাচ্চাবাচ্চা।'

'তবে আর কী! ওরাই তো আমার সঙ্গী। ওদের মতন আর কে আছে!'

'কিন্তু আপনাকে বসতে দেব কোথায়?'

'কেন, দাওয়ায় একটা চাটাই বিছিয়ে দিতে পারবে না?'

'তা পারবো।'

'তবে আর কী! হাতীর হাওদা তবে কোথায় লাগে!'

'কিন্তু খেতে দেব কী আপনাকে?'

'কেন, জল!'

'জল?' ঘনশ্যামের মুখ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল। 'আমাদের নয়নশুকার জল দেবো আপনাকে খেতে?'

'দেবে না? কাঠফাটা রোদ্দুর মাথায় করে পাঁচ মাইল রাস্তা ভেঙে

তোমাদের গাঁয়ে যাচ্ছি, তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে, আর জল চাইলে জল দেবে না খেতে ?'

'ও তো জল নয়, কাদা।'

'তা কী করা যাবে! যেই দেশে যেমনি।' বিনয় নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় হাসলো। 'কলকাতায় কলের জল, আমাদের মোহনপুরে কালো দীঘির জল, আর তোমাদের নয়নশুকায় না-হয় কুয়োর কাদা। মানুষ হয়ে তোমরা যদি তা খেতে পারো মানুষ হয়ে আমিই বা তা খেতে পারবো না কেন ? তোমরা কি আমার চেয়ে এতই উঁচু, এতই আলাদা ?'

ঘনশ্যাম চোখে অন্ধকার দেখলো। বললে, 'আপনি তো বাবু শিকার করতে চলেছেন।'

'কে বললে ?'

'কাঁধে ঐ যে আপনার বন্দুক ঝোলানো।' ঘনশ্যাম চারদিকের মাঠ-প্রান্তর একবার দেখে নিল। বলসে, 'পাখি চান তো ? বেলেহাঁস, চাহা, হরিয়াল ? তার জন্যে কষ্ট করে অতদুর যাবেন কেন ? এই কাছেই জলার কাছে বিস্তর পাওয়া যাবে আসুন।'

বিনয় অসহিষ্ণুর মতো বললে, 'আমি পাখি-টাখি চাই না, আমি চাই জল। বুঝলে ঘনশ্যাম, আমি চাই শুধু নয়নশুকার জল খেতে। তাই এখন একটু জোর-কদমে চলো।'

নয়নশুকায় এসে বিনয় চারদিকে শুধু শুকনো মাঠ দেখলো আর দেখলো শুকনো মাটির নিদারুণ পিপাসা। জলের জন্যে জায়গায়-জায়গায় মাটি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে যেন মুখবিবর থেকে আর্ত জিভ বের করে ধরেছে।

'এ কি, তোমাদের ধান কই ?

'এবারের এ-ফসলটা বাবু মারা গেল।' ঘনশ্যামের চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে উঠলো : 'সময়মতো এবার জল হলো না যে।'

'আবার জল !' বিনয় শুকনো মুখে হাসলো।

'কী করবো বলুন! আকাশ যদি খুসি হয়ে জল দেয় তবেই মাটি বাঁচে, আর মাটি যদি খুসি হয়ে জল দেয় তবেই আমরা বাঁচি, আমরা মাটির

মানুষরা। কিন্তু, আকাশ আর মাটি দুইই যদি বিমুখ হয়, তবে আমরা দাঁড়াই কোথায়?'

তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বিনয় বললে, 'কেন, জমিদারের কাছারিতে!'

কথাটা ঘনশ্যাম কিছুই বুঝতে পারলো না।

'জমিদারের কাছে গিয়ে বলবে অনাবৃষ্টিতে ফসল কিছুই পাইনি, আমাদের খাজনা মাপ দিয়ে দিন; বলবে, জলের অভাবে মরে যাচ্ছি সবাই, জলের বন্দোবস্ত করে দিন। আমরা না বাঁচলে খাজনা পাবেন আপনি কার কাছ থেকে?'

'ও বাবা!' ঘনশ্যাম একেবারে মাথায় হাত দিল। চোখ বড় করে বললে, 'নায়েববাবু শুনবেন অমন কথা? উল্টে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবেন না?'

'নায়েববাবু বুঝি খুব অত্যাচার করেন?' ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিনয় জিগগেস করলে।

'সে কথা আর আপনাকে বলে লাভ কী বাবু? ও সব আমাদের অদৃষ্ট।'

'তোমরা সবাই মিলে গিয়ে বড়বাবুর কাছে নালিশ করতে পারো না?'

ঘনশ্যাম খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। বললে, 'কী সর্বনাশ! আমরা দেখা করবো বড়বাবুর সঙ্গে? ঘাড়ে আমাদের ক'টা মাথা গজিয়েছে জিগগেস করে সাবেক যে-মাথাটা আছে তাই নায়েববাবু গুঁড়ো করে দেবেন। আমাদের ঘেঁসতেই দেবেননা কাছে।'

'সবাই একসঙ্গে এসে দাঁড়ালে কার সাধ্য তোমাদের পথ বন্ধ করে দাঁড়ায়!'

'ওরে বাবা!' ঘনশ্যাম আবার একটা বিস্ময়ের ভাব করলো: 'কোনো কাজে এ-গাঁয়ের লোককে একত্র করতে পারবেন নাকি আপনি?'

বিনয় আর কিছু বললো না। খানিকদূর নিঃশব্দে এগিয়ে এসে হঠাৎ জিগগেস করলে, 'কই, তোমার বাড়ি কদ্দূর?'

'ঐ তো ঐ আম গাছটার নীচে।'

'আর তোমার কুয়ো?'

'বাড়ির গায়েই।'

'চলো, আগে তোমার কুয়ো দেখি।'

সে কী আর দেখবার! যা ঘনশ্যাম বলেছিলো, অগভীর একটা গর্ত। অনেক ঝুঁকে পড়েও তলায় বিনয় তার নিজের ছায়া দেখতে পেল না, জল শুকিয়ে কাদা হয়ে গেছে। বললে, 'গাঁয়ের সব কুয়োই কি এমনি?'

ঘনশ্যাম সংক্ষেপে বললে, 'সব।'

'আমি ও-সব কিছু জানিনা, আমাকে জল খাওয়াও।' বলে বিনয় একটা ছেঁড়া চাটাইয়ের জন্যেও অপেক্ষা না করে ঘনশ্যামের মাটির ঘরের দাওয়ার উপর বসে পড়লো।

'সে কী বাবু, মাটির উপর বসে পড়লেন যে!' ঘনশ্যাম ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

'এখন আমার যা অবস্থা, খাবার জল না পেলে হয়তো শুয়ে পড়তে হবে।'

ঘনশ্যাম চোখে অন্ধকার দেখলো। গোঙানির মতো আওয়াজ শুনে বাড়ির ভিতর ও আশ-পাশ থেকে বেরিয়ে এল এক দঙ্গল ছেলে, গামছা মাথায় দিয়ে কারা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, থেমে পড়লো।

'আপনার কী হয়েছে বাবু?' দুই হাত জোড় করে ঘনশ্যাম বিনয়ের পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে পড়লো।

'কী হয়েছে বলতে পারবো না, তবে জল খেতে না পেলে মরে যাবো, ঘনশ্যাম। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

'জল, জল এখানে পাবো কোথায়? আপনি তো নিজের চোখেই দেখলেন কুয়োর অবস্থা। কাদা-ছাঁকা জল আপনাকে দিই কি করে?'

'দিই কি করে!' বিনয় হঠাৎ মুখবিকৃতি করে ধমকে উঠলো: 'ভালো জলের ব্যবস্থা তবে আগে থাকতে করে রাখোনি কেন? জানো না, আমি বা নায়েব বা বড়বাবু যে কোনোদিন চলে আসতে পারি তোমাদের গ্রামে?

মাথায় হাত দিয়ে বসে আছ কী! যেমন করে পারো আমাকে জল এনে দাও। তেষ্টায় জল খেতে না দিয়ে আমাকে তোমরা মেরে ফেলবে নাকি?'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বললে, 'এমনি ভাবেই জল-জল করে রমু মোড়লের বড় ছেলেটা মাঠের মধ্যেই মরে গেল।'

'কিন্তু জলের বদলে কাদা তুলে এনে দিলে যে—' ঘনশ্যাম আমতা-আমতা করতে লাগলো।

'কাদা ছাড়া আর উপায় কী?' বিনয়ের ঝিমুনো গলায় হঠাৎ ঝাঁজ ফুটে উঠলো: 'তোমাদের নায়েববাবুকে ধরে এনে একদিন এই কাদা খাইয়ে দিতে পারোনি কেন? এই খরার সময়ে দুপুরবেলায় মাঠের মধ্যে বেঁধে রেখে কেন তাকে বুঝতে দাও নি পিপাসা কাকে বলে? আর, পিপাসায় যখন সে আকণ্ঠ কাঠ হয়ে গেছে, আর যখন জলের জন্যে আর্তনাদ করছে তখন তার মুখটা কুয়োর মধ্যে গুঁজে দিতে পারো নি কেন? কেন বলতে পারো নি, আগে আমাদের জল দিন, পরে আমরা ফল দেব? নায়েববাবুকে কাদা বানাতে পারো নি, বুঝলুম, কিন্তু সটান বড়বাবুকে গিয়ে কেন তোমরা জানাও নি তোমাদের অভিযোগ? তাঁকে কেন ডেকে এনে দেখাও নি তোমাদের এগুলো কুয়ো না খোদল? কেন এতদিন এ সব অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধান করো নি? করো নি তো, অতিথি-সৎকারও তেমনি করেই করতে হবে। বড়বাবুকে আনতে পারো নি, এনেছ তাঁর ছেলেকে, এখন তবে সেই ছেলেকেই তোমাদের কুয়োর কাদা খাইয়ে দাও। পরে অসুখ হয় তো হবে, মরে যদি যাইই কাদা খেয়ে তো যাব, নইলে তোমাদের হুঁস হবে কী করে, বড়বাবুই বা বুঝবেন কিসে সামান্য সাদা জলের কী দাম, আর তোমাদের নায়েবই বা গায়েব হবেন কিসের ওজুহাতে? যাও, নিয়ে এস আমার জন্যে তোমাদের কুয়োর কাদা, তোমাদের মাটির প্রসাদ!'

ঘনশ্যাম সত্যি-সত্যি কুয়োর মধ্যে দড়ি নামিয়ে দিল।

ছেলেপিলেদের দেখিয়ে বিনয় বললে, 'এরা সব কারা, ঘনশ্যাম?'

'আমারই, বাবু। ও দুটো ভুবন খামারুর।'

কাদার উপর থেকে ভাসমান খানিকটা কালো জল ভাঁড়ে করে সত্যি-সত্যি ঘনশ্যাম বিনয়ের মুখের কাছে তুলে ধরলো। ভাঁড়টা হাতে নিয়ে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বিনয় জিগগেস করলে, 'এই, জল খাবি?'

জিভের ডগা থেকে খানিকটা থুতু ছিটকিয়ে কে-একটা ছেলে বললে, 'থুঃ! গন্ধ!'

কে আরেকজন বললে, 'ওর মধ্যে পোকা ভাসে।'

ঘনশ্যামকে লক্ষ্য করে বিনয় বললে, 'এরাও এই জলই তো খায় দু বেলা?'

'কী করবে না খেয়ে? যদ্দিন না বৃষ্টি ঝরবে বাবু, তদ্দিন চলবে এই টানাটানি।' অপরাধীর মতো অসহায় মুখ করে ঘনশ্যাম বললে।

বিনয় হঠাৎ তার হাতের মৃৎপাত্রটা দূরে ছুঁড়ে দিল। দু' হাত বাড়িয়ে ছেলে-মেয়েগুলোকে সস্নেহ ব্যাকুলতায় ডাকতে লাগলো কাছে। বললে, 'এই, জল খাবি? খাবি তোরা এই জল?' বলে কাঁধ থেকে ঝোলানো ফ্লাস্কটা নামিয়ে তার মুখের গ্লাশটা সে খুলে ফেললো: 'খাবি তোরা এই মোহনপুরের কালো দীঘির জল? টলটলে পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা, খাবি? শরীর জুড়িয়ে যাবে, খাবি তোরা এই জল?'

প্রথমটা কিঞ্চিৎ দ্বিধা করেছিলো ছেলেরা, কিন্তু বিনয় যখন ছিপি খুলে গ্লাশে জল ঢেলে খেয়ে নিলো খানিকটা তখন কারুর যেন আর বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ-সন্দেহ রইলো না। ঠেলাঠেলি করে সবাই চাইলো আগে এগিয়ে আসতে। অথচ, সম্ভ্রম বাঁচিয়ে দূরত্বও খানিকটা রাখা দরকার।

'ওদের ধরো, ঘনশ্যাম, ওরা যে মারামারি সুরু করে দিল।' পরে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বিনয় বললে, 'গ্লাশ মোটে আমার একটা, ওটা দিয়ে দিতে আরম্ভ করলে এত দেরি হয়ে যাবে যে তোরা সইতে পারবি না। যা, বাড়ি থেকে যার-যার গ্লাশ নিয়ে আয়।'

ঘনশ্যামের ছেলেমেয়েগুলো পড়ি-মরি করে ছুটলো বাড়ির মধ্যে। শুধু বড় ছেলেটাই কাড়াকাড়ি করে গ্লাশ একটা যা-হোক আনতে পেরেছে, আরগুলোর কারু হাতে বাটি, কারু হাতে ঘটি, খাড়া বাসনে আর কুলোয়নি বলে শেষেরটার হাতে ছোট একটা কাঁসি।

'আর, তোরা কিছু আনলি না ?'

তোরা অর্থ ভুবন খামারুর ছেলেমেয়ে। কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে।

মেয়েটাই বড়। বললে, 'আমাদের বাসন-কোসন কিছু নেই।'

'তবে, খাবি কি করে জল ?'

শুকনো মুখ আরো শুকিয়ে গেল ভাই-বোনের। বোন বললে, 'হাতে ঢেলে দেবেন, মুখ লাগিয়ে হাত কাৎ করে খেয়ে নেব।' বলে দু'হাত একত্র করে ভঙ্গিটা সে দেখালো।

ভাই বললে, 'আর, আমি হাঁ করে থাকবো, আমার মুখের মধ্যে ঢেলে দেবেন। আপনার গ্লাশ কখনো ছোঁয়া যাবে না।'

বিনয় ছেলেটাকে কোলের মধ্যে টেনে আনলো। বললে, 'আমাকে তো আগে ছুঁয়ে ফ্যাল।' বলে তার ফ্লাস্কের গ্লাশে জল ঢেলে ছেলেটার মুখের কাছে নিয়ে এলো :

'নে, খা। গ্লাশে মুখ ঠেকিয়ে না খেলে জল খাওয়ার সুখ কী !'

ছেলেটা এক ঢোকে খেয়ে ফেললো। মুখ-বুক ভিজে গেছে, আর উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চোখ। কী যে হয়ে গেল তার মধ্যে সে যেন কিছুর হদিস পেল না।

এবার দিদির পালা। সে খেল অতি আস্তে-আস্তে, থেমে-থেমে, চুক-চুক করে।

ছোট ভাই ক্ষেপে উঠলো। 'আমাকে আরেক গ্লাশ। আমি দিদির মতো খাবো।'

ছোট ভাই সেই যে দ্বিতীয়বার গ্লাশ ধরলো, আর ছাড়তে চায় না। একটুখানি খায়, আর হাসে, এ-দিক ও-দিক তাকায় আর একটুখানি খায়।

এদিকে ঘনশ্যামের ছেলেমেয়েগুলোর সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। 'আমাদের ঐ ছোট গ্লাশে কিচ্ছু হবে না, আমাদের যার-যার বাসনে ঢেলে দিন।' কাঁসিখানা নিয়ে শেষেরটা পর্যন্ত উন্মত্ত !

ভুবন খামারুর ছেলের কবল থেকে ফ্লাস্কের গ্লাশটা ততক্ষণে বিনয়

উদ্ধার করতে পেরেছে। সেটা ঘনশ্যামের কনিষ্ঠটার হাতে চালান দিয়ে সে জল পরিবেশন করতে বসলো।

রসগোল্লা-সন্দেশ নয়, চকোলেট-আইসক্রিম নয়, সাদা সাধারণ জল, যা জলেরই মত খরচ করবার। চাতকের কাছে বৃষ্টির মতো, তাই যেন এদের কত আরাধনার। বিন্দু বিন্দু করে খাচ্ছে, মুখের মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ রেখে দিচ্ছে জিভ ভিজিয়ে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঢোক গিলছে না। যেন কি-এক অমূল্য সম্পত্তি, ভোগ করে সহজে শেষ করে দিতে চায় না।

'তুলিকে আপনি বেশি দিয়েছেন। ও একটা আস্ত ঘটি নিয়ে এসেছে।'

'ঘটি হলে কী হয়, চুমুক দিতে যে গড়িয়ে পড়লো অনেকখানি। পাওয়া নিয়ে কী হবে, খাওয়া নিয়ে হচ্ছে কথা।'

তারপর জলের ভাগ নিয়ে ঝগড়া, কান্নাকাটি।

'নে বাবা, খা যত পারিস।'

শিশুদের মধ্যে বিনয় আরেক কিস্তি বণ্টন করে দিতে বসলো।

পথের উপর দাঁড়িয়ে সামান্য কয়েকজন যারা এই মজা দেখছিলো তাদের এই অমিতব্যয়িতাটা আর সহ্য হলো না। সাহসে ভর করে কয়েক পা এগিয়ে এসে তারা বললে, 'আমাদের অদৃষ্টে দু' এক ফোঁটা প্রসাদ পড়বে না বাবু?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' শিশুগুলিকে নিবৃত্ত করে বিনয় ঐ গ্রাম্য লোকগুলির দিকে এগিয়ে গেল। বাকি জলটুকু বিতরণ করে দিল ওদের মধ্যে। ওরা এমন ভাবে খেল, যেন দেবতার চরণামৃত।

ঘনশ্যাম গিয়েছিলো বাড়ির মধ্যে। বেরিয়ে এসে বিনয়ের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আর আছে বাবু ছিটে-ফোঁটা?'

'তুই তো আচ্ছা পেটুক দেখছি।' বিনয় ধমকে উঠলো: 'এই না এক কলসী জল খেয়ে এলি আমাদের বাড়ি থেকে? তবু তৃপ্তি নেই? তুই কি জলহস্তী?'

মুখ কাঁচুমাচু করে ঘনশ্যাম বললে, 'আমার জন্যে নয়, বাবু।'

'তবে, কার জন্যে?'

'আমার ইস্ত্রি—ঐ ঢুলি-বুলিদের মায়ের জন্তে। জীবনে এমন পরিষ্কার জল সে খায়নি। আমাকে বলছিলো ঐ দরজার ফাঁক দিয়ে।'

ফ্লাস্কটা শূন্য!

চার

সকালবেলা বিজয়নারায়ণ তাঁর ঘরে বসে আঙুলে মেরজাপ লাগিয়ে সেতার ঝঙ্কার তুলছিলেন। সামনে ওস্তাদের হাতে বাঁয়া-তবলা।

এমন সময় বিনয় ঘরে প্রবেশ করলো। কোনো ভূমিকা না ফেঁদেই বললে, 'আমার কিছু টাকার দরকার, বাবা।'

বিজয়নারায়ণ চোখ না তুলেই বললেন, 'নায়েববাবুকে বলো গে।'

'না, আপনি হুকুমনামা লিখে দিন, টাকার কিছু বেশি দরকার।'

তেমনি নির্লিপ্ত ভাবেই বিজয়নারায়ণ বললেন, 'নায়েববাবুকে বললেই হবে।'

আসলে, তাই তো হওয়া উচিত। টাকাটা তার বাবার, আর সে হচ্ছে বড় ছেলে। নায়েববাবু তো মাইনের চাকর। হুকুম তামিল করাই তার কাজ।

বিনয় গেল নায়েববাবুর কাছে। সরাসরি বললে, 'আমার নামে খরচ লিখে শিগগির আমাকে দু'শোটা টাকা দিন।'

'কত?' চশমার কাঁচের উপর চক্ষু তুলে ব্রজলাল জিগগেস করলেন।

তাঁর চোখের সামনে ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমাটা দৃঢ় করে তুলে ধরে বিনয় বললে, 'দু'শো।'

'দু'শো?' যেন ভীষণ চমৎকৃত হয়েছেন এমনি ভাব দেখিয়ে ব্রজলাল তাঁর হাতের কলমটা ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখলেন।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। দু'শো। টু হানড্রেড।'

'চল্লিশ টাকা খয়রাতের পর আবার দু'শো টাকার খেসারৎ?' ব্রজলাল মুখ টিপে হাসলেন।

নিমেষে বিনয়ের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে এল। কর্কশ গলায় বললে,

'তার জন্যে আপনার উদ্বিগ্ন হতে হবে না। কেননা টাকা আপনার বাবার নয়, আমার বাবার।'

ব্রজবাবুর বিশাল মুখমণ্ডল গাম্ভীর্যে বিশালতর হয়ে উঠলো। বললেন, 'সেটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট। টাকা তোমার বাবার, যদ্দিন তিনি বেঁচে আছেন ততদিন তোমার এতে কাণাকড়ির অধিকার নেই।'

'অধিকার আছে কি নেই সে তর্ক আপনার সঙ্গে করতে চাইনি। কোনো তর্কেরই যোগ্য পাত্র আপনি নন। আপনি মাইনে-করা চাকর, প্রভুর আদেশ পালন করাই আপনার কাজ। সুতরাং বেশি বাকবিস্তার না করে টাকা ক'টা বের করে দিন।'

'হ্যাঁ, মাইনে-করা চাকরই বটে, কিন্তু যুবরাজের নয়, স্বয়ং সম্রাটের।' ব্রজবাবু মুখে হাসির একটু আভা আনলেন যেটা বিদ্রূপের বিদ্যুৎ-ঝলক।

'সেই সম্রাটেরই আদেশ, টাকা আপনাকে এক্ষুনি দিয়ে দিতে হবে।'

'বেশ, আশ্বস্ত হলুম।'

'আশ্বস্ত হলেন মানে?'

'আশ্বস্ত হলুম এই ভেবে যে যুবরাজ বুঝেছেন তাঁর হুকুম তামিল করবার আমার কথা নয়।' ব্রজবাবু তাঁর বসবার ভঙ্গিটা একটু শিথিল করে নিলেন। 'কিন্তু টাকাটা কী জন্যে চাই শুনি?'

অত্যন্ত রূঢ়, রুষ্ট গলায় বিনয় বললে, 'তা জানবার আপনার কথা নয়। বাবা বলেছেন দিয়ে দিতে, দিয়ে ফেলেই আপনি খালাস। এর বেশি কিছু প্রশ্ন করাটা আপনার বেয়াদবি।'

কানের পিঠ চুলকে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে ব্রজবাবু বললেন, 'তা, ও-রকম প্রশ্ন করাটা আমার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। আর, তোমার বাবাও আমার এই বেয়াদবিটা চিরকাল মার্জনা করে এসেছেন।'

ভুরু কুঁচকে বিনয় জিগগেস করলো: 'তার মানে?'

'তার মানে, তোমার বাবা যখন তাঁর ব্যক্তিগত খরচের জন্যে আমার কাছে এসে টাকা চান তখন তাঁকেও ঐ প্রশ্নটা করে থাকি। সদুত্তর না পেলে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দি।'

'আপনার এতদূর আস্পর্ধার কারণ ?'

'কারণ তোমার বাবারই নির্দেশ।' ব্রজবাবু আবার সোজা হয়ে ঋজু ভঙ্গিতে বসলেন। 'অবিশ্যি, প্রায় সব সময়েই তাঁর উত্তরটা সদুত্তর হয়, তবু যখন দেখি নিজের প্রমোদ-বিলাসের জন্যে তিনি একটা খুব বড় রকম অঙ্কপাত করেছেন আমি প্রায়ই সেটা নিষ্ঠুর হাতে খর্ব করে দি! এটুকু অধিকার তিনি আমাকে সেধেই দিয়েছেন। ঘোড়া যে মাঝে-মাঝে এলেমেলো ছুটতে পারে এটুকু জেনেই বলগা উনি ছেড়ে দিয়েছেন আমার হাতে। তাই বলগা যখন জোরে টেনে ধরি, দুর্দান্ত ঘোড়া বশীভূত তো হয়ই, খুসিও হয়। স্টেটের কিসে হিত হবে ওঁর চেয়ে আমি ভালো বুঝি ওঁর এই বিশ্বাসই আমাকে স্পর্ধিত করেছে।' ব্রজবাবু কুটিল দৃষ্টিতে একটু হাসলেন। 'স্বয়ং সম্রাট যদি উত্তর দিতে পারেন, যুবরাজই বা দিতে পারবেন না কেন ?'

'ককখনো না।' বিনয় একেবারে ফেটে পড়লো। আপনি বলতে চান এ টাকা আমি আমার প্রমোদ-বিলাসের জন্যে চেয়ে নিচ্ছি ?'

ব্রজবাবু বিচলিত হলেন না। স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, কেননা পরের দুঃখনিবারণের স্বপ্ন দেখাটাও একটা বিলাসিতা।'

বিনয় স্তব্ধ হয়ে গেল। একটু-বা অসহায় বোধ করলো নিজেকে। তবু নিজের কর্তৃত্বের জায়গা থেকে এক চুল ভ্রষ্ট না হয়ে বললে, 'তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না। টাকা দেবেন কিনা তাই বলুন।'

'বললুম তো টাকা নেবার কারণটা না যতক্ষণ গ্রাহ্য হচ্ছে—'

অসহ্য। বিনয়ের সমস্ত রক্ত যেন ফুটতে লাগলো। বললে, 'কারণটা কি আপনার কাছে গ্রাহ্য হতে হবে ?'

ব্রজবাবু নীরবে শুধু হাসলেন।

'বাবার কাছে গ্রাহ্য হলে চলবে না ?'

'না।' ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে ব্রজবাবু মাথা নাড়লেন।

বিনয় ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবং সটান গিয়ে উপস্থিত হলো বিজয়নারায়ণের ঘরে। বিজয়নারায়ণ শ্লথভঙ্গিতে বসে গড়গড়া

টানছেন, তামাকের মন্থর আবেশে দুই চোখ তাঁর স্তিমিত হয়ে এসেছে।

'বাবা!' বিনয়ের তীক্ষ্ণ ডাকে বিজয়নারায়ণের তন্দ্রা ভেঙে গেল।

'কি,' বিজয়নারায়ণ বিরক্ত মুখে বললেন, 'আবার কী হলো?'

'নায়েববাবু টাকা দিলে না।'

বিজয়নারায়ণ চুপ করে রইলেন। কিন্তু স্তব্ধতার ভিতরে অনুভব করলেন বিনয় যেন কি-একটা প্রতিবিধানের জন্যে প্রতীক্ষা করছে। চোখ চেয়ে তাই বললেন, 'দেয়নি, তা আমি কী করবো?'

'আপনি বললেও কি সে দেবে না? সে কি আপনার চাকর নয়?' বিনয়ের নাসারন্ধ্র দুটো ফুলতে লাগলো।

'আমি বলেছিলুম নাকি দিতে?' বিজয়নারায়ণ তাঁর ধূমমলিন মস্তিষ্কে একটুও যেন আলোর আভাস খুঁজে পেলেন না। বললেন, 'তা যখন দেয়নি, ভালো বুঝেছে বলেই দেয়নি।'

'ভালো বুঝেছে!' বিনয় ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বললে, 'কাজটা ভালো কি মন্দ তা কি ও আমাদের চেয়ে ভালো বুঝবে নাকি?'

'তা ও বোঝে বই কি ভালো।' বিজয়নারায়ণ নির্বিবাদে সায় দিলেন: 'অনেক দিনের পাকা লোক। অনেক ঝড়-ঝাপটা থেকে বাঁচিয়ে নৌকো ও অনেক বার ঘাটে পৌঁছে দিয়েছে। তাই ওর হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। টাকা যখন সে দেয়নি তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে টাকাটার তোমার কোনো সত্যি প্রয়োজন ছিল না।'

'কারণটা না শুনেই?'

'কারণটা না বললে তা আর শোনা যায় কি করে?' বিজয়নারায়ণ আর বিনয় একসঙ্গে তাকিয়ে দেখলো, ঘরের মধ্যে স্বয়ং ব্রজলাল। অল্প একটু হেসে ব্রজবাবু বললেন, 'কিন্তু, তবু, কারণটা আমি জানি।'

'জানেন?' বিনয় ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

'হ্যাঁ, নয়নশুকা গ্রামে তুমি একটা টিউবওয়েল করে দিতে চাও।'

কি করে খবরটা ব্রজবাবু সংগ্রহ করলেন বিনয়ের তা নিয়ে প্রশ্ন

করতে ইচ্ছে হলো না। সে শিখার মতো জ্বলে উঠলো। বললে, 'সেই কাজটা কি খুবই মন্দ? সমস্ত গ্রাম জল খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, সেখানে একটা টিউবওয়েল বসানো কি আমাদের কর্তব্য নয়? যারা আমাদের পিপাসায় জল দেবে তাদেরই পিপাসায় জুটবে পাঁক এ ব্যবস্থাটা আপনি বরদাস্ত করতে বলেন নাকি? শেষকালে নিজেদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে যে ওদের চোখের জলটুকুও জুটবে না।'

'না জুটুক,' ব্রজবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'তাই বলে গ্রামে-গ্রামান্তরে টিউবওয়েল আমরা বসাতে পারবো না। টিউবওয়েল বসানোটা আমাদের কাজ নয়।'

'আমাদের কাজ নয়, বাবা?' বিনয় সরাসরি বিজয়নারায়ণের কাছে আবেদন করলো: 'সমস্ত গ্রাম পুড়ে মরবে আর আমরা টানা-পাখার নীচে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে নিশ্চেষ্ট হয়ে তাই দেখব? কোনোই প্রতিবিধান করবো না? প্রজারা কি জমিদারের অপত্য নয়? ওদের আমরা শোষণ করবো, শাসন করবো, কিন্তু পালন করবো না, কষ্ট থেকে বাঁচাবো না ওদের?'

'আঃ!' বিজয়নারায়ণ বিরক্তিসূচক শব্দ করে উঠলেন। তন্দ্রালস চোখ দুটো একবার একটু মেলে ধূমময় তাম্রকূটে আবার নিমগ্ন হয়ে গেলেন। বললেন, 'শোনই না নায়েববাবু কী বলেন।'

'না, তা আমাদের কাজ নয়।' ব্রজবাবু শান্ত অথচ নিষ্ঠুর কণ্ঠে বললেন, 'আমরা বুদ্ধদেবের পার্ট প্লে করতে বসিনি। জমির বদলে খাজনা নেয়া আমাদের কাজ, দৈবদুর্যোগে ফসল মারা যায় কারু কোনোবছর, পাওনা কিছু রেয়াৎ দিতে পারি বড়জোর, কিন্তু তাই বলে ঘরে যার চাল নেই তার চাল ছেয়ে দিয়ে আসবো কিম্বা কুয়ো যার শুকিয়ে গেছে তার জন্যে দীঘি কেটে দিয়ে আসবো এমনধারা বদান্যতা দেখানো আমাদের কাজ নয়।'

'তবে সেটা কার কাজ?' বিনয় কথাটা যেন ছুঁড়ে মারলো।

'গ্রামে যে ইউনিয়ন বোর্ড আছে তার। বছরে যে সে ট্যাক্সো নেয় সে কি অমনি? গাঁয়ে-গাঁয়ে দুটো-একটা করে সে টিউবওয়েল বসিয়ে দিতে

পারে না? না, সমস্ত টাকাটাই তার প্রেসিডেন্টের পেটের কুয়োর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে?' ব্রজবাবু তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করলেন।

কিছুক্ষণ বিনয় কোনো কথা বলতে পারলো না। মনে হলো তাকে যেন কে চড় মেরে বসিয়ে দিলে। তবু সে বললে—দ্বিধাজড়িত দুর্বল গলায় বললে, 'কর্তব্যই কি সব, দয়া-মায়া, ভালোবাসা বলে কি কিছু নেই? এতে আমার দায় নেই বলে কি এতে আমার দান করা নিষেধ? চোখের সামনে কারু দুঃখ দেখলে কি সহানুভূতি না জেগে জাগবে আপনার তর্কবুদ্ধি? পথের ধূলায় শিশু আছাড় খেয়ে পড়ে কেঁদে উঠলে আশ্রয় দেবার জন্যে আপনার হাত কি আপনা থেকেই এগিয়ে যায়, না, হাত গুটিয়ে বসে-বসে ভাবেন, আমি তুলবো কেন, তুলবে ওর মা, কাঁদুক ও ততক্ষণ?'

ব্রজবাবু নির্লিপ্তভাবে হাসলেন। বললেন, 'তাই তো বলছিলুম এও একরকম একটা বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়।'

'বেশ, বিলাসিতাই হলো। বিলাসিতারো রকম-ফের আছে। কারুটা ভোগ, কারুটা না-হয় ত্যাগ। মন্দ কি, পিপাসার্তকে জল দেবার একটা অত্যাশ্চর্য বিলাসিতাই না হয় করা গেল। দিন, তাই দিন,' বিনয় নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত পাতলো: 'আমার একটা ব্যক্তিগত বিলাসিতার জন্যেই টাকাটা ফেলে দিন চোখ বুজে।'

'আবার বিলাসিতা!' বিজয়নারায়ণ তাঁর বিহ্বল তন্দ্রার ভিতর থেকে চমকে উঠলেন: 'বাবুগিরি করে দু' পুরুষ বিষয়-আশয়ের আর্দ্ধেকের বেশি ফুঁকে দিয়ে গেছে। এ বংশে আর বিলাসিতা চলবে না। যেটুকু আছে রয়ে-সয়ে খরচ করতে হবে।'

'চলবে না?' বিনয়ের কণ্ঠে আওয়াজটা যেন আর্তনাদের মতো শোনালো।

কেউ কোনো কথা বললেন না। বিজয়নারায়ণ নিবিষ্ট মনে ধূমোদ্গীরণ করতে লাগলেন আর ব্রজলালের চাপা ঠোঁটের কোণ থেকে বাঁকা-বাঁকা হাসির ধারালো সূঁচ বেরুতে লাগলো।

'এত চলে—আর এ চলবে না?' বিনয় যেন আপন মনে বলে উঠলো: 'এত যেখানে অজস্রতা, সেখানে দরিদ্রের প্রতি এটুকু দয়াই শুধু অপব্যয়?'

বলে দ্রুত পা ফেলে সে অন্দরমহলে গেল, যেখানে সুনয়নী টেবিলের সামনে বসে হাতে সেলাইয়ের কল চালাচ্ছেন।

'মা, সামান্য ছু'শোটা টাকা আমি পেতে পারি না?' বিনয় শেষ আশ্রয় মার কাছে গিয়ে হাত পাতলো।

ববিনে সুতো ভরতে-ভরতে সুনয়নী বললেন, 'দু'শোটা টাকা সামান্য বলতে চাও?'

'অতি সামান্য, মা। যা তাদের অভাব তার কাছে ঐ দু'শোটা টাকা কিছুই না।'

'কাদের অভাব?' সুনয়নী চোখ তুলে স্পষ্ট করে চাইলেন বিনয়ের দিকে।

'নয়নশুকার প্রজাদের। ও-অঞ্চলে ওদের খাবার এতটুকু জল নেই। কুয়োগুলো সব শুকিয়ে কাদা হয়ে গেছে।' বিনয়ের দুই চোখ করুণার আভায় কিঞ্চিৎ আর্দ্র হয়ে এল: 'আমি ওদের ওখানে একটা টিউবওয়েল বসিয়ে দিতে চাই, মা। জলের অভাবে ওরা মরে যাচ্ছে।'

কলের দিকে মুখ ফিরিয়ে এনে সুনয়নী বললেন, 'কেউ মরেছে বলে তো শুনিনি।'

'কেউ বেঁচে আছে বলেও শোনা যায়নি কখনো।' বিনয় যেন একটা দীর্ঘশ্বাস দমন করলো: 'ওদের বাঁচা আর মরা—শালগ্রামের শোয়া আর বসার মতো। বেঁচেই যদি ওরা থাকতো তবে কোনদিন আমাদের এই মোহনপুরের কালো দীঘির জল ওরা গণ্ডূষে শুষে নিত, মা। ওরা যে তৃষ্ণার্ত তাই কি ওরা জানে?'

'যতো জানো তুমি!' সুনয়নী বিরক্তি-ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বললেন, 'নিজের পড়াশুনা ছেড়ে গ্রামে-গ্রামে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছ বুঝি?'

'তাই তো একমাত্র কাজ হওয়া উচিত, মা। আমরা যারা রাজা, তারা তো কেবল প্রজার দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াবো, কার কী দুঃখ কার কী অভাব তার প্রতিকার করবার জন্যে।' বিনয় সুনয়নীর আরো কাছে এসে দাঁড়ালো: 'আমি পড়াশোনা একদম ছেড়ে দেব, মা।'

'কী করবে তবে ? গুণ্ডামি ?' সুনয়নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ, আপাতত তাই।' বিনয় ম্লান একটু হাসলো। 'ব্রজনায়েবকে প্রথমেই ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বিতাড়িত করবো, মা।'

'তার মানে ?'

'তার মানে নিজেই জমিদারি দেখব। আমারি শিল-নোড়া দিয়ে আমারি দাঁতের গোড়া ভাঙবে তা কিছুতেই আমি সহ্য করতে পারছি না। জমিদারিটা যে আমার আর ও যে সামান্য মাইনেখোর চাকর তা ওকে প্রত্যক্ষ বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।'

'জমিদারিটা তোমার হলো কবে ?' সুনয়নী বক্র দৃষ্টিক্ষেপ করলেন।

'এখনো হয়নি বটে, কিন্তু একদিন তো হবে।'

'যখন হবে তখন। ততদিন চুপ করে বসে থাকো।' সুনয়নী আবার সেলাইয়ে মনোনিবেশ করলেন।

'না, বসবো না ; বাবা বহুদিন বাঁচুন, থাকুন আমাদের মাথার উপরে, খুবই ভালো কথা, কিন্তু জমিদারিটা আমি তাঁর হাত থেকে শিগগির ছিনিয়ে নেব।'

কী-এক অজানা আশঙ্কায় সুনয়নীর মুখ থেকে একটা ভয়ার্ত শব্দ বেরুল : 'তার মানে ?'

'তার মানে খুবই সহজ, মা। দুর্বল হাতে কখনো দুরন্ত ঘোড়ার বল্গা ধরা যায় না। ইতিহাসে দৃষ্টান্ত তার বিরল নয়। সাজাহানের হাত থেকে আওরঙ্গজেবও একদিন জোর করে ঘোড়ার রাশ ছিনিয়ে নিয়েছিলো।'

'হঠাৎ তোমার অমন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হতে চাইবার কারণ ?'

'কারণ ঐ ব্রজনায়েবের কর্তৃত্ব দিনে-দিনেই সীমা ছাড়িয়ে চলেছে। বাবাকে দুর্বল, অলস বা বিলাসী পেয়েই ওর এতটা আস্ফালন। সে আস্ফালনটা ওর শাসন করা দরকার।'

সুনয়নী তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে রুক্ষতাটা মুছে ফেললেন। বললেন, 'কেন, ব্রজবাবু তো একজন পাকা নায়েব, খুব কাজের লোক। ওঁর আমলে জমিদারির অনেক উন্নতি হয়েছে, কত বাজেয়াপ্ত মহাল কত কায়দা-কানুন

করে উনি ফিরিয়ে এনেছেন। যেখানে আদায় হতো আগে শতকরা ত্রিশ টাকা খাজনা, ওঁর আমলে এখন সেখানে আদায় হচ্ছে শতকরা পঁচানব্বুই টাকা। একমাত্র লাঠির ঘায়েই কত দুর্দান্ত প্রজা বশ মেনেছে—'

'ঐ লাঠির জোরেই, মা। কিন্তু লাঠি খেয়ে দুর্বল প্রজা যখন মাটিতে পড়ে 'জল' 'জল' বলে কেঁদেছে তখন তোমাদের ঐ ধুরন্ধর নায়েব তার গলায় এক বিন্দু জল ঢেলে দেয়নি। না, মা, আমার জমিদারিতে আমি অমন অত্যাচার কখনো হতে দেব না।'

সুনয়নী নিজেরো অলক্ষ্যে আবার বাঁকা করে হাসলেন। বললেন, 'সব সময়ে জমিদারিটা যে তুমি তোমার একার বলে ভাবছ!'

'কেন, একারই তো!'

'কেন, মাধব নেই?'

'মাধব!' বিনয় হেসে উঠলো: 'ও আবার আমার কোনোদিন অবাধ্য হবে নাকি?' বলেই সে গলা ছেড়ে হাঁক পাড়লো: 'মাধব! মাধব! মেধো!'

মাধব তখন একটা লাঠিকে ঘোড়া বলে কল্পনা করে নিজেই সেটাকে টেনে নিয়ে ঘরে-বারান্দায় ছুটোছুটি করছিলো, দাদার ডাকে কাছে এসে বললে, 'আমায় ডাকছ দাদা?'

'হ্যাঁ, ডাকছি।' অত্যন্ত নৃশংস শাসকের ভঙ্গি করে বিনয় বললে, 'তুই আমার কথা শুনবি কি শুনবি না?'

'ছুনবো।' মাধব পরম আপ্যায়িতের মতো ঘাড় হেলালো।

'তবে বোস।'

মাধব বসলো উবু হয়ে।

'দাঁড়া।'

মাধব দাঁড়ালো।

'হাস্ হি-হি করে।'

হি-হি-হি-হি। মাধব হাসলো একটি কাষ্ঠ হাসি।

'কাঁদ্ ভেউ ভেউ করে।'

কান্নাটা মাধব ফোটাতে পারলো না। বরং, সত্যিকারের সরল হাসি সে হেসে উঠলো।

'কাঁদবি না তুই, দুষ্টু ছেলে? আমার তুই কথা শুনবি না?' বলে বিনয় মাধবের গালে এক চড় বসিয়ে দিল।

আর, মাধব উঠলো ভেউ-ভেউ করে কেঁদে!

অমনি তাকে দুহাতে বুকের মধ্যে তুলে নিল বিনয়। দাদার কাঁধের মধ্যে মুখ গুঁজতে পেয়ে কান্না থামাতে মাধবের এক নিশ্বাসেরো সময় লাগলো না। তার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বিনয় বললে, 'এ তো একটা সার্কাস হয়ে গেল—তুই জোকার সাজলি!'

দুই চোখে জল নিয়ে মাধবের তখন সে কী সলজ্জ হাসি!

কোল থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে বিনয় বললে: 'আমাদের দু' ভায়ের জমিদারিতে আমরা এত অবিচার কখনো ঘটতে দেব না। কড়ায়-ক্রান্তিতে পাওনা-গণ্ডা যেমন আদায় করে নেব, তেমনি প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশাও নিবারণ করবো। ফলও নেবো, মূলও নেবো, তারপর গাছ মরে গেলে তার কাঠও নেবো—জমিদারিটা এমনি একটা শুধু লাভের ব্যবসা নয়। দায়িত্বটাও কিছু আছে আমাদের। সুতরাং, নয়নশুকায় টিউবওয়েল বসাবার জন্যে আমার প্রথম কিস্তিতে দুশোটা টাকা চাই।'

সুনয়নী আকাশ থেকে পড়লেন: 'আমি টাকা পাবো কোথায়?'

'তুমি ব্রজনায়েবকে হুকুম করবে। বলবে, খোকাকে এখুনি দুশো টাকা বার করে দিন।'

সুনয়নীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো: 'সর্বনাশ! আমারো হুকুম সে বাতিল করে দিতে পারে।'

'করুক দেখি বাতিল। তারপর কেমন সে দাঁড়িয়ে থাকে দু' পায়ে, দেখি আমি।'

'তার চেয়ে তোমার আব্দারটা বাতিল করে দেয়াই উচিত মনে হচ্ছে।' সুনয়নীর কণ্ঠস্বর ঈষৎ কঠিন শোনালো।

'তার মানে, পাইয়ে দেবে না আমাকে টাকাটা?'

'না, দরকার বোধ করি না।'

'দরকার বোধ কর না?' বিনয় বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো: 'সমস্ত গ্রাম পিপাসায় কাঠ হয়ে যাচ্ছে সেখানে জলের দরকার নেই?'

'জানি না। তবে যেটাকা খরচ করায় ব্রজবাবুর মত নেই, সহজেই বোঝা যাচ্ছে তা দিয়ে স্টেটের কোনো উপকার হবে না।'

'সমস্তটাই স্বার্থ?' দুঃখে ও রাগে বিনয় যেন অসহায় বোধ করতে লাগলো: 'পৃথিবীতে পরের উপকার বলে করণীয় কি কিছুই নেই বলতে চাও?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না। শুধু এইটুকু বলতে চাই, পড়াশোনার সময় পড়াশোনা করো।' স্নুনয়নী জোরে হুইল ঘোরাতে লাগলেন।

'যত পড়াশোনা করি ততই তো বুঝি জীবনটা শুধু পড়াশোনার জন্যেই নয়।' বিনয় শেষ বার কণ্ঠে কাতরতা আনলো: 'কোনো রকমেই কি হুশোটা টাকা আমি পেতে পারি না? জমিদারের ছেলে, অনেক কিছু আব্দার করেই তো তারা টাকা পেয়ে থাকে—কত রকম বাবুগিরিতে, কত রকম উচ্ছৃঙ্খলতায়—'

'অন্যায় আব্দার করলে চলবে কেন?'

'তৃষ্ণার্তকে জল দেয়া যদি অন্যায় হয়, তো হোক, তবু যেমন করে পারো, টাকাটা আমাকে পাইয়ে দাও, মা। আমি যে ওদের কথা দিয়ে এসেছি।'

উদাসীন গলায় স্নুনয়না বললেন, 'ব্রজবাবু যখন না বলেছেন তখন তা আর হয় না।'

'হয় না? আচ্ছা বেশ, আমি চললুম—'বিনয় দরজার দিকে অগ্রসর হলো।

কথাটা বৈরাগ্যের না আতঙ্কের স্নুনয়নী ঠিক করতে পারলেন না। 'শোন, শুনে যা, বিনু।' তাঁর কণ্ঠস্বরে এতক্ষণে শাসনকর্ত্রীত্বের নিষ্ঠুরতার বদলে মাতৃস্নেহের ব্যাকুলতা ফুটে উঠলো।

বিনয় ফিরে দাঁড়ালো।

'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'জানি না।'

বিনয় বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

পাঁচ

সমস্ত দিন বিনয়ের আর দেখা নেই। এখানে-ওখানে পাইক-বরকন্দাজরা ঘুরে এসে বললে, দাদাবাবুর সন্ধান পাওয়া গেল না। অভিজ্ঞের মতো উদাসীন হাসি হেসে ব্রজলাল বললেন, 'যাবে আর কদ্দুর ? খিদে পেলেই চলে আসবে দেখবেন।' বিজয়নারায়ণ তন্দ্রাবিষ্ট চোখে বললেন, 'তা ছাড়া আবার কী ! মার উপর রাগ করে এ বয়সে আমিও একবার রিক্ত হাতে বেরিয়েছিলুম রাস্তায়, কিন্তু নস্যির কৌটোটা ফেলে গিয়েছিলুম বলে আমাকে ফের ফিরতে হয়েছিল।' বলে তিনি নিজে যত না হাসলেন তার চেয়ে বেশি হাসালেন সমাগত তাঁবেদারদের। পরে ব্রজলালের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'এইটুকু শুধু দেখো, বিদঘুটে কিছু করে বসে আমার না নাম ডোবায় !'

সামান্য মানহানির ভয়ের চেয়েও বেশি ভয় সুনয়নীর। অবয়ব নেই, তবু যেন কেমন একটা অতিকায় আতঙ্ক। কোথা থেকে কেমন করে কী যেন একটা সর্বনাশ ঘটে যাবে তিনি যেন তার আভাস পাচ্ছেন অথচ আকৃতি পাচ্ছেন না। ভয় পেয়ে মাধবকে কেবল বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরছেন বারে-বারে।

যে যাই বলুক, মাধব জানে তার দাদা কোথায়। তার কেমন ধারণা হয়েছে সে-কথা বলে ফেললেই দাদাকে এরা ধরে বেঁধে ফেলবে, মারবেও বুঝি বা। তাই সে প্রাণপণে চুপ করে আছে। একটু যদি সে ছাড়া পায়, তার চারদিকের পাহারাটা একটু যদি আলগা হয়, সে তবে ছুটে এখুনি দাদার কাছে গিয়ে হাজির হতে পারে ; ষড়যন্ত্রীর মতো দাদার কানে-কানে গিয়ে বলে, তুমি এখান থেকে পালাও দাদা, ওরা ওই এসে পড়লো।

তাদের বাড়ির পিছনে যে আম-কাঁঠালের বাগান, তারই গা ঘেঁষে একটা জঙ্গল, তারই মধ্যে আছে একটা চুন-বালি-খসা পুরোনো পোড়ো ঘর। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আছে একটা পায়ে-চলা পথ, কিন্তু, দুঃসাহসী ছাড়া কেউ সহজে ও পথ মাড়াতে চায় না। তার কারণ জঙ্গলের অন্ধকার তত নয়, যত ঐ পোড়ো ঘরখানা। পূর্বতন যুগের দুর্দান্ত জমিদাররা ঐ ঘরটা আগে কী জন্যে ব্যবহার করতেন তার বহু-বিচিত্র প্রবাদ এখনো প্রচলিত আছে, কিন্তু বর্তমানে পঞ্চাশ বছরেরো উপর ঐ ঘরটা ভূতের আস্তানা বলেই প্রসিদ্ধি পেয়ে এসেছে। কিন্তু ভূতের সঙ্গেই বন্ধুতা করার সাধ বড় বিনয়ের। তাই সে কাউকে না জানিয়ে যেটুকু নেহাৎ না করলেই নয় সেই ঘরের সে সংস্কার করে নিয়েছে, নিয়ে এসেছে কোত্থেকে একটা টেবিল আর চেয়ার, দড়ির একটা খাটিয়া, খানকতক বই আর লেখবার সরঞ্জাম। এইখানে, জঙ্গলের অন্ধকারে ও নিভৃতিতে বসে সে লেখে আর পড়ে আর তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে থেকে-থেকে যে-সব প্রকাণ্ড সমস্যা উদ্ভূত হয় তার সমাধানের পথ খোঁজে।

ভূত বলে যে কিছু নেই তাই দেখাবার জন্যে বাড়ির ও বাইরের অনেককেই সে এই ঘরে নিয়ে এসেছে। একদিন মাধবকেও সে নিয়ে এসেছিল।

যে যাই বলুক, মাধবের দৃঢ় বিশ্বাস দাদা ঐ ঘরে আছে লুকিয়ে। যদিও চাকররা বলছে ও-ঘরের দরজায় তালা লাগানো, মাধব ঠিক জানে, দাদা এক সময় না এক সময় নিশ্চয়ই ফিরে আসবে সেখানে; তার বোধের অগম্য শিশুমন থেকে কে বলছে আজকের এই অভিমানের দিনে অমনি একটি শান্তি ও স্তব্ধতারই উপর দাদার বেশি টান পড়বে।

ঠিক সন্ধ্যেটার আগে। মা স্নানের ঘরে, চাকর রমু একটু আড়াল হয়েছে কী কাজে—মাধব চারদিকে চেয়ে ক্ষিপ্র হাতে প্যাণ্টের দু-পকেট লজেন্সে আর চকোলেটে বোঝাই করে নিল, আর তারো চেয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে।

রাস্তা-ঘাট সমস্ত মাধবের চেনা, এমনি বেপরোয়াভাবে, অথচ ধরা না

পড়ে যায় এমনি সতর্ক দৃষ্টিতে সে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলো। লোক চলাচল নেই, ফিকে-হয়ে-আসা দিনের আলোয় নির্জন বনে গা কেমন ছমছম করে ওঠে, কিন্তু মাধবের এতটুকুও ভয় নেই, কেননা খানিকদূর এগিয়েই তো সে দাদাকে ধরে ফেলবে। দাদা বলে ডেকে উঠলেই তো বুকের মধ্যে ভয় থাকে না।

ঐ সেই ঘর। বাইরে থেকে দরজায় আর তালা লাগানো নেই। যা মাধব ভেবেছিলো, ঘরের মধ্যে দড়ির খাটিয়ার উপর দাদা শুয়ে আছে—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত চেহারা, সমস্ত গায়ে মাটি মাখা।

'দাদা।' দরজার বাইরে থেকে আনন্দিত কলকণ্ঠে মাধব ডেকে উঠলো।

কোনো একটা পাখি উঠলো কিনা ডেকে, মর্মমূল পর্যন্ত চমকিত হয়ে বিনয় চারদিকে চাইতে লাগলো।

'এ কি, মাধব ? তুই কোত্থেকে ?' ছুটে এসে বিনয় মাধবকে বুকের উপর আঁকড়ে ধরলো।

'তোমাল জন্যে চলে এসেছি একা-একা। তোমাল জন্যে খাবাল নিয়ে এসেছি।' মাধবের কুচকুচে কালো দুটি চোখের তারা গর্বে ও আনন্দে ঝকঝক করে উঠলো।

'খাবার ? কই দেখি ?'

'তুমি হাঁ কলো, চোখ বোজো—'

পরম বিশ্বাসে বিনয় চোখ বুজে হাঁ করলো, আর মাধব তার প্যান্টের পকেট থেকে একমুঠ লজেন্স আর চকোলেট বের করে বিনয়ের মুখের মধ্যে চালান করে দিলে।

'আমার আর কী চাই ? আমার তো তুইই আছিস।' মাধবকে বুকে করে বিনয় চলে এলো ঘরের মধ্যে। বসলো তার খাটের উপর, খেতে-খেতে মাধবের মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'ছাখ্ মাধব, আমাদের চাইনে এই জমিদারি, এই বিত্তবেসাত, এত সব প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি। যে ধন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে পরের প্রয়োজনে লাগে না, সেই ধনে আমাদের রুচি

নেই। যে ঐশ্বর্য নিজের পূর্ণতাকে বড় করে না দেখিয়ে অন্যের দারিদ্র্যকেই বড় করে—দেখায় সে-ঐশ্বর্য তো আবর্জনা। আমরা গরিব হবো, রিক্ত হবো, কিন্তু হাতে আসবে আমাদের শক্তি, চোখে জ্বলবে আমাদের আগুন। আমরা সমস্ত সবহারারা নতুন করে পৃথিবী নির্মাণ করবো, মাধব। তুই আসবি আমার সঙ্গে ?'

পাঁচ বছরের শিশু দাদার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল এতক্ষণ, হঠাৎ একটা বোধগম্য প্রশ্নের নাগাল পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে উঠলো। বললে, 'যাবো দাদা।'

'কোথায় যাবি বল তো ?' বিনয় হাসলো।

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে ঘাড় নামিয়ে মাধব বললে, 'সে অনেক দূলে। বেলাতে।'

'না মাধব, অনেক দূরে নয়, আপাতত কাছেই, গ্রামের মধ্যে। আর, বেড়াতে নয়, কাজ করতে।' বিনয় আবার গম্ভীর মুখে স্বগতোক্তি সুরু করলো : 'আজ আমি সমস্ত দিন কাজ করেছি, খন্তা দিয়ে মাটি কুপিয়েছি। তৃষ্ণার্ত গ্রামবাসীরা আমার সঙ্গী হয়েছে। আমার আজকের উপবাস ওদের উপবাস, ওদের আজকের তৃষ্ণা আমার তৃষ্ণা। নয়নশুকায় আমরা মস্ত বড় দীঘি কাটবো, মাধব।'

এতক্ষণে মাধব আবার আরেকটা বোধগম্য কথার নাগাল পেয়েছে। বললে, 'দীঘি ? তাতে মাছ থাকবে, দাদা ?'

'সব থাকবে। কিন্তু জানিস মাধব, আমি বড়ো শ্রান্ত। মাটি কুপিয়ে আমার গা-হাত-পা সব ব্যথা করছে।'

'কোথায় ? বলো না, আমি হাত বুলিয়ে দি।' মাধব পরম স্নেহে বিনয়ের হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। বললে, 'তুমি বালি চলো দাদা, বিছানায় ছোবে চলো, নমুকে বলবো তোমাল পা তিপে দিতে।'

'আমার মনে হয় কী জানিস মাধব ? মনে হয় ও-বাড়িতে আমার আশ্রয় নেই, ঐ আরাম ঐ সুখ ঐ বিলাস আমার জন্যে তৈরি হয়নি।

আমার জন্যে ধূলো আর কাদা, ঝড় আর বৃষ্টি, আর পথ আর পথ। কে জানে, হয়তো পৃথিবীতেই আমার আশ্রয় নেই।'

কে যেন খুব কাছে থেকে অস্ফুটস্বরে হঠাৎ বলে উঠলো : 'আছে। আয় আমার সঙ্গে।'

বিনয় আপাদমস্তক শিউরে উঠলো। চেয়ে দেখলো সামনের জানালার ওপারে কার মুখ। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দুই চক্ষু। কেমন অদ্ভুত একটা হাসি। 'কে?' বিনয় চমকে উঠলো।

'আমি রে আমি।' এই যেন তার সমস্ত পরিচয়। বলে সেই মূর্তি হাতছানি দিয়ে হাসিমুখে ডাকতে লাগলো বিনয়কে : 'আয় আমার সঙ্গে।'

ঘরের কোণ থেকে লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে বিনয় মাধবকে কোলে করেই একলাফে বাইরে চলে এল, কিন্তু মূর্তিকে সম্পূর্ণ করে দেখে ভয়ের চেয়ে বিস্ময়ই তার বেশি হতে লাগলো। এ আর কেউ নয়, সেই বুড়ি, পাগলি, জগমোহিনী!

'তুমি এখানে এসেছ কেন?' বিনয় ধমকের সুরে প্রশ্ন করলো।

'আমার গোপালের খোঁজে, বাবা।'

'কে তোমার গোপাল?'

জগমোহিনী অদ্ভুত করে হাসলো। বললে, 'এই যে, গোপাল আমার সামনে দাঁড়িয়ে।'

বিনয় ভেবেছিল বুড়ি বোধহয় মাধবকে লক্ষ্য করছে, কিন্তু চেয়ে দেখলো তার একাগ্র দৃষ্টি তারই মুখের উপর দৃঢ়-নিবদ্ধ।

'তুমি তো পাগল!' বিনয় উপেক্ষার সুরে বললে।

'কে পাগল নয় এ দুনিয়ায়? দুনিয়ার যিনি মালিক তিনিও তো পাগল হয়ে সব সৃষ্টি করেছেন। পাগল না হবো তো মাটির গোপালের মাঝে মানুষের গোপালকে খুঁজবো কেন? আয় বাবা, আয় আমার সঙ্গে', বুড়ির গলায় অদম্য আন্তরিকতা ফুটে উঠলো, 'আমার ঘরে এসে আসন পেতে একবারটি বোস আমার চোখের সুমুখে।' বলে সে ক্ষিপ্র পায়ে এগুতে সুরু করলো।

'কোথায় যাবো তোমার সঙ্গে ?'

'আমি যেখানে থাকি—'

'কোথায় থাক ?'

'হরিহর গাঙ্গুলি, টোলের যে পণ্ডিত এখানকার, আমি তার দূরসম্পর্কের পিসি হই। যখন আসি তার ওখানেই উঠি, কিন্তু বাবা, গরিবের সংসার, বেশি দিন পুষতে পারে না।'

'আমি ওখানে যাবো কেন ?' বিনয় অসহিষ্ণুর মতো বললে, 'সাহায্য-টাহায্য করবার মতো কিছু আমার সঙ্গে নেই।'

'আরে, সাহায্য কি শুধু পয়সা দিয়েই হয় ?' জগমোহিনীর চোখ ছলছল করে উঠলো : 'আমি আজ গোপালের পূজো করেছি, সমস্ত দিন আজ আমার উপোস, সন্ধ্যের সময় গোপালকে ভোগ দিয়ে আমি একটু প্রসাদ নেব।'

'ভালোই হলো, আমিও আছি আজ উপোস করে।' বিনয় হেসে উঠলো : 'দেখছ না, তাই ননী খাচ্ছি।' বলে সে হাঁ করে মুখের মধ্যেকার চকোলেট দেখালো।

'সমস্ত দিন উপোস করে আছিস ? কেন ?' জগমোহিনীর গলায় উদ্বেগ ফুটে উঠলো : 'অসুখ করেছে ? হাতে-পায়ে-গায়ে এত মাটি মেখেছিস কেন ? রাজার ছেলে না তুই ?'

'রাজার ছেলের চেয়ে পথের ভিখারীতে অনেক শান্তি। এখন চলো দেখি পথ দেখিয়ে।' বিনয় তাড়া দিল। পরে মাধবের দিকে চেয়ে বললে, 'কিন্তু মাধব ? মাধবের কী হবে ?'

'আমিও তোমাল ছঙ্গে গোপালের পূজো দেখতে যাবো।' মাধব বায়না ধরলো।

'তাই। তুইও চল আমার সঙ্গে, আমার সাথী।' বলে বিনয় মাধবকে তার কাঁধের উপর তুলে নিল। দাদার কাঁধে চড়ে মাধবের আনন্দ আর ধরে না।

বিনয়ের বুঝতে কিছু বাকি নেই, জগমোহিনী জমিদার-বাড়ির তরফ

থেকে কঠিন কোনো একটা ঘা খেয়েছে, কী একটা নির্মম অত্যাচার হয়েছে তার উপর, এবং তারই প্রতিকার খুঁজতে সে সেদিন নায়েববাবুর দ্বারস্থ হয়েছিল, আর কে না জানে, দুঃস্থ ও দুর্গতের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াটাই নায়েববাবু চমৎকার বাহাদুরি মনে করেন। কী তার দুঃখ, কিসের তার অভিমান, কেন সে এত বঞ্চিত—এত সব জানবার জন্যেই জগমোহিনীর সে পিছু নিয়েছে।

জঙ্গলটা পার হয়ে গেল নিঃশব্দে। পাকা রাস্তা পেয়ে বিনয় প্রকৃতিস্থ ভাবে জিগগেস করলে, 'আপনার গাড়ি কই ? গরুর গাড়ি ?'

জগমোহিনী অদ্ভুত করে হাসলো। বললে, 'গাড়ি ? আমি তো বাবা রাজদর্শনে যাচ্ছি না, আমি কাঙালিনী, যাচ্ছি আমার গোপালের মন্দিরে। আমার গাড়ি লাগবে কেন ? যত দীর্ঘ আমার পথ তত বিস্তৃত আমার

ঠিক পাগলের মতো কথা নয়, অথচ ঠিক স্বাভাবিক যেন বলা যায় না। কোন অতলান্ত এর বেদনা তা কে বলবে ?

আসলে সেখান থেকে হরিহর ঠাকুরের টোল বেশি দূরের রাস্তা নয়। খড় দিয়ে ছাওয়া ছেঁচা বাঁশের বেড়া-ঘেরা কাঁচা মাটির ঘর। দাওয়ায় উঠে জগমোহিনী হঠাৎ হাঁক পাড়লো : 'ও হরি, ও রাঙা বৌ, দেখে যাও, তোমাদের ঘরে আজ কে এসেছে।' বলতে-বলতেই সবাইকে নিয়ে বুড়ি চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

ভিতরের বারান্দার এক কোণে মাদুর বিছিয়ে বসে হরি ঠাকুর প্রদীপের আলোয় শাস্ত্র পড়ছিলো আর আরেক কোণে তার স্ত্রী কুপির আলোয় রান্না করছিলো তোলা উনুনে, জগমোহিনীর কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে চেয়ে দেখে বিস্ময়ে তারা যুগপৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল—একজনের হাত থেকে শিথিল হয়ে খসে পড়লো বই, আরেক জনের হাত থেকে হাতা। একই সঙ্গে দু'জনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল একই শব্দ : 'কী সর্বনাশ !'

বিনয় ভাবলো, এমন প্রকাণ্ড পদমর্যাদাবান হয়ে তারা দুই ভাই নগণ্য এক দরিদ্র টোলের পণ্ডিতের বাড়ি এসেছে তাতেই এরা ভয় পেয়ে গেছে

নিশ্চয়, ভাবছে কত বড়ো অপমান-অবহেলার মাঝে না জানি টেনে নিয়ে এসেছে তাদের। তাই সে অভয় দিয়ে বললে, 'তাতে কী, বড়োলোক হতে পারি, কিন্তু গরিবের মতোই সমান খিদে পায়, আর খিদের সময় খুদ-কুঁড়া পেলে তাকেই মনে হয় অমৃতের চেয়েও অমৃত।'

'দাঁড়িয়ে কী দেখছ, রাঙা বৌ! ঠাঁই করে গোপালকে আমার খেতে দাও।' জগমোহিনী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন: 'শুনছ না, গোপাল আমার সমস্ত দিন অভুক্ত রয়েছে।'

হরি পণ্ডিত আর তার স্ত্রী নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। জগমোহিনী নিজেই জায়গা করে পাশাপাশি দু'খানা আসন পেতে দিলেন। বসলো বিনয়, আর তার গা ঘেঁষে মাধব, এখন কেমন একটু লাজুক, একটু-বা অপ্রসন্ন।

হরি পণ্ডিতের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বিনয় বললে, 'দিন কী রান্না হয়েছে। গরিবের অন্ন শুধু আন্তরিকতার গুণেই সুস্বাদু হয়ে ওঠে। কিছুমাত্র কুণ্ঠা করবার কারণ নেই, সত্যি আমি অভুক্ত আছি সমস্ত দিন।'

দু'থালায় করে জগমোহিনী নিজেই ভাত বেড়ে আনলেন—গরম ভাত, ঘি, আলু-ভাতে আর পটলভাজা। 'অপূর্ব!' বিনয় গ্লাসের জলে হাত ধুয়ে ভাতের থালায় বাঘের থাবা বসালো। গরম দেখে মাধবের উৎসাহ এসেছিলো ঠাণ্ডা হয়ে, তাই জগমোহিনী নিজেই এসে ভাত মেলে ছোট-ছোট গ্রাসে তাকে খাইয়ে দিতে লাগলো।

মাঝপথে বিরাট এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে বিনয় বললে, 'আগে খেয়ে নি, পরে আপনাদের সমস্ত কাহিনী শুনবো। শুনবো, জমিদারের অত্যাচারটা আপনাদের কাছে কোন চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে। আপনারা ভয় পাবেন না, একটি কথাও লুকোবেন না আমার কাছে, সমস্ত অত্যাচারের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবো।'

শুনতে হলো না, দেখতে হলো স্বচক্ষে।

হঠাৎ একটা তুমুল অট্টরোল উঠলো: 'এইখানে, এইখানে।' অমনি অনেকগুলি মিলিত কণ্ঠের আগুন লেলিহান হয়ে উঠলো: 'মারো, বাঁধো, ছিনিয়ে নিয়ে এসো।'

প্রথমেই দেখা দিলেন ব্রজলাল, আক্রমণ-উদ্যত বাঘের মতো তাঁর ভঙ্গি। এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি মাধবকে ছিনিয়ে নিলেন তার আসন থেকে, কর্কশ কণ্ঠে মুখিয়ে উঠলেন জগমোহিনীর উপর : 'এ-সব কী হচ্ছে আপনার ? বিষ খাওয়াচ্ছেন শেষকালে ?'

'বিষ !' ঘি-মাখা গরম ভাতের দিকে বিস্ময়বিমূঢ় চোখে বিনয় চেয়ে রইলো।

বুড়ি জগমোহিনীর চোখে অশ্রুর বান ডেকে এল। বললে, 'বাছাদের মুখে আমি বিষ তুলে দেব ?'

'নইলে, আর মতলোব কী আপনার ? কেন তবে এদেরকে ডেকে এনেছেন খাবার লোভ দেখিয়ে ?' ব্রজলালের চক্ষু দুটো জ্বলতে লাগলো।

'আজ আমার গোপালের পূজো ছিল। গোপাল খুঁজতে আমি পথে বেরিয়েছিলুম। কী সৌভাগ্য কে জানে, হঠাৎ দেখা পেয়ে গেলুম। দেখলুম রাজার ছেলে পথের ভিক্ষুকের মতোই আজ ক্ষুধার্ত। বুঝলুম, ছদ্মবেশে এই আমার গোপাল। তাই ভোগ দেবার জন্যে কাঙালের ঘরে তাকে ধরে নিয়ে এসেছি।' দুই বিগলিত চোখে জগমোহিনী উদ্বেল হয়ে উঠলো।

'কিন্তু এই ছোট ছেলেটাকে তার মার আঁচলের তলা থেকে চুরি করে এনেছেন কেন ? আপনার উদ্দেশ্য কী ?' ব্রজলালের কথাগুলি যেন চাবুকের মতো বাড়ি মারতে লাগলো।

এর উত্তর দিল বিনয়। বললে, 'মাধবকে কেউ চুরি করে আনেনি, মাধব আপনিই এসেছে তার দাদার সঙ্গে। আর যতক্ষণ তার দাদা আছে সামনে ততক্ষণ তার মঙ্গলের জন্যে সামান্য এক অনাত্মীয় কর্মচারীর চিন্তা করবার দরকার নেই।'

ব্রজলাল রাগ করলেন না, শুধু তাঁর অভ্যস্ত সেই সূক্ষ্ম ও শাণিত হাসিটুকু হাসলেন। বিনয়কে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ইনি না-হয় সন্ন্যেসী, হয়েছেন, চাষা-ভুষোর দলে গিয়ে ভর্তি হয়েছেন, কিন্তু জমিদারের এই

ছেলেকে আপনি কোন সাহসে মাটির উপর বসিয়ে ঐ কুৎসিত মোটা চালের ভাত খাওয়ান ?' বলে এবার ইঙ্গিত করলেন মাধবকে।

এবারও বিনয়ই উত্তর দিল। বললে, 'জমিদারের ছেলের কিসে মর্যাদা হয় বা না হয়, তা গৃহীই হোক আর সন্নেসীই হোক, জমিদারের ছেলেই ভালো জানে, তার মাইনে-করা নায়েব-গোমস্তারা নয়।'

'সাধু! সাধু সর্দার!' ব্রজলাল ডেকে উঠলেন বাইরের দিকে চেয়ে।

'হুজুর।' হাতে লাঠি, কোমরে রুমাল বাঁধা সাধু সর্দার একলাফে এসে উপস্থিত। সাধু হচ্ছে জমিদারের আটপ্রহরী অর্থাৎ এক কথায় অষ্ট প্রহরের ভৃত্য।

'একটা কলাপাতা কেটে নিয়ে এসে খোকাবাবুর পাতের ঐ মাখা ভাত কটা আর যা ঐ সব উপকরণ আছে আশে-পাশে—সব বেঁধে নিয়ে চল। ডাক্তারখানায় পাঠাতে হবে দেখবার জন্যে ও সবের মধ্যে বিষ আছে কিনা।' পরে হঠাৎ সবাইকে ফেলে ব্রজলাল নিরীহ হরি পণ্ডিতের প্রতি ঝাঁজিয়ে উঠলেন: 'আপনাকে শেষবারের মত বলে দিয়ে যাই পণ্ডিত-মশাই, যদি আপনার এই পিসিটিকে গ্রাম থেকে না তাড়ান তবে আপনাকেই আমাদের তাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

বস্তুত তারই আজ একটা হেস্তনেস্ত ব্যবস্থা করবার জন্যে ব্রজলাল তাঁর দলবল নিয়ে এসেছিলেন। মাধবকে খোঁজাখুঁজি করতে সমস্ত বাড়ি যখন তোলপাড় হচ্ছে, দলে-দলে লোক যখন বেরিয়ে গেছে দিকে-দিকে, তখন একটা উড়ো খবর তাঁর কানে এল যে বুড়ি জগমোহিনীই মাধবকে চুরি করে পালিয়েছে। ব্রজলাল চোখে বিভীষিকা দেখলেন। স্থির করলেন, মাধবকে শুধু উদ্ধার করলেই চলবেনা, হরি গাঙ্গুলির ঘরে আগুন লাগিয়ে তাকে একেবারে নিরাশ্রয় করে দেবেন, যাতে কোনোদিন তার চালের তলায় তার বুড়ি পিসি, জগমোহিনী না মাথা গুঁজতে আসতে পারে। কিন্তু এখানে এসে বিনয়কে তিনি দেখতে পাবেন এমনটি কখনো ভাবতে পারেন নি। তাই তাঁর সমস্ত সঙ্কল্প বিনয়ের উপস্থিতির বাধায় চাপা পড়ে গেল।

কাজ ছেড়ে তাই তাঁর শরণ নিতে হল বাক্যে। হরি পণ্ডিতের দিকে তর্জনী তুলে তিনি ফের বললেন, 'এখনো সাবধান হন বলে দিচ্ছি।'

ভয়ে ও বিনয়ে হরি পণ্ডিত এতটুকু হয়ে গেল। করজোড়ে বললে, 'কোথায় ফেলবো বলুন পিসিটাকে? সংসারে আম ছাড়া আর কেউ নেই। রাজপুত্রের মতো ছেলেগুলি ওঁর একে-একে বিদায় নিয়ে গেল, এখন ছাই ফেলতে আমি শুধু এক ভাঙা কুলো, আমার কাছে যদি আশ্রয় চাইতে আসে তবে কি বুড়ো পিসিকে তাড়িয়ে দেব বলতে চান?'

'নিশ্চয়।' ব্রজলাল নির্মমের মতো বললেন, 'আর তা যদি না হয়, তবে ভবিষ্যতে আশ্রয়খানাই আপনার ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। ছেলেপুলে পিসি-মাসি সবাইকে নিয়ে আপনাকে তখন গাছতলায় দাঁড়াতে হবে—এ আমি বলে গেলাম।'

জগমোহিনীর দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধস্বরে বিনয় বললে, 'এ-সবে আপনি ভয় পাবেন না। এখানে আপনার আশ্রয় যদি না মেলে আপনি সটান আমাদের বাড়ি চলে যাবেন। বাড়িতে ঢোকবার আগে কাছারির নায়েব-গোমস্তার পরামর্শ নেবেন না, আমি বিনয়ের কাছে এসেছি, আমি বিনয়কে চাই, এ-কথা বললে কারু সাধ্য নেই আপনাকে বাধা দেয়। বাড়িতে আমরা অনেক অযোগ্য কর্মচারীকেই আশ্রয় দিয়েছি, একজন দুঃস্থ অনাথ দরিদ্র বিধবাকে স্থান দিতে আমাদের উদারতার কিছু অভাব হবে না—আমাদের ওখানেই আপনি চলে আসবেন স্বচ্ছন্দে।'

ব্রজলাল কর্ণপাত করলেন। তেমনি অনম্র, রূঢ় ভঙ্গিতে হরি পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর, আমার কথার অবাধ্য হয়ে এঁকে আবার এ-গাঁয়ে ঠাঁই দিয়েছেন বলে আসছে মাস থেকে আপনার টোলের বরাদ্দ বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল।' বলে তিনি মাধবকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মাধব এতক্ষণ থ হয়ে ছিল। তার শিশুমনে এটুকু শুধু বুঝতে পাচ্ছিল ঐ বুড়ি পাগলি তাকে আর তার দাদাকে ঘোরতর একটা বিপদের মধ্যে এনে ফেলেছে। বাড়ির এরা সব ঠিক সময়ে এসে পড়তেই তারা বেঁচে গেছে এ-যাত্রা। কিন্তু বাইরে বেরুবার সময় সে বুঝতে পারলো, দাদা তার সঙ্গে

আসছে না, দাদা থেকে গেল সেই বুড়ির কাছে, সেই অজ্ঞানিত বিপদের মধ্যে। ব্রজলালের বাহুর মধ্যে থেকে মাধব আকুলি-বিকুলি করে উঠলো : 'দাদা, দাদা,—দাদাকে নিয়ে এস—'

ব্রজলাল ভ্রূক্ষেপও করলেন না। বেয়ারারা পালকি নিয়ে এসেছিল, মাধবকে কোলে নিয়ে তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

আপদে-নিরাপদে, মাধবের মনে হলো, দাদার কোলের মতো সুখের আশ্রয় তার কিছু নেই, তাই সে আর্তস্বরে চীৎকার করতে লাগলো : 'আমি দাদার কাছে যাব, দাদার কাছে যাব—'

সেই চীৎকার বাতাসে মিলিয়ে যাবার পর বিনয় শান্তমনে ভাতের থালায় মন দিল।

যন্ত্রণায় বিবর্ণ জগমোহিনীর মুখ, বাষ্পাচ্ছন্ন দুই চক্ষু, অবসন্ন তাঁর বসবার ভঙ্গি। অতিশয় নিস্তেজ গলায় তিনি বললেন, 'সব জুড়িয়ে গেছে যে—'

অল্প একটু হেসে বিনয় বললে, 'গোপালের ভোগের আবার ঠাণ্ডা আর গরম কী! সবই সমান মিষ্টি।' বলে সে গোগ্রাসে খাওয়া সুরু করলো।

এমন সময় সাধু ফিরলো কলাপাতা নিয়ে মাধবের পরিত্যক্ত থালার ভাত নিয়ে যেতে, ডাক্তারখানায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। কেউ তাকে কিছু বললো না, অদূরে বসে থালার থেকে ভাত কটি সে পাতায় ঢালতে লাগলো, আর কতক ভয়ে কতক বিস্ময়ে আড়চোখে দেখতে লাগলো বিনয়কে।

ঘি-মাখা ভাত কটি ঢালা হয়েছে পাতায়, ভাজা-ভাতেগুলিও নেয়া হয়েছে আশে-পাশে, পাতা মুড়ে সাধু উঠতে যাবে অমনি বিনয় অতি-আকস্মিক একটা বজ্রাকার শব্দ করে উঠলো : 'খবরদার।'

সেই শব্দে সাধুর প্রাণ গেল উড়ে, গা পড়লো ঢলে, গুটোনো পাতা গেল উন্মোচিত হয়ে।

'খবরদার! এই ভাত তুই নিয়ে যেতে পারবি না।' বিনয় পিঠ খাড়া করে বসলো : 'এই ভাত তোকে খেতে হবে।'

'খেতে হবে!' সাধুর চোয়াল দুটো ভেঙে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা হাঁ

বেরিয়ে পড়লো। গলার ভিতর থেকে আওয়াজ বের হলো : 'এর মধ্যে বিষ আছে।'

'থাক্, তবু তোর খেতে হবে। দেখছিস না, আমি কেমন খাচ্ছি।'

'মরে যাব যে বাবু।' সাধু কেঁদে ফেললো।

'আর যদি না খাস তা হলেও মরবি।' বিনয় জামার আস্তিন গুটোলো। বললো, 'আমার সঙ্গে যদি মরিস, তবে, ভয় নেই, আমার সঙ্গে স্বর্গেও যেতে পারবি। নে, খা, ঘটির জলে হাত ধুয়ে নে আগে—'

'কিন্তু যদি মরে যাই ?'

'যদি মরে যাস, ভূত হয়ে নায়েববাবুর কাঁধে চাপবি, তাকে এ-জায়গা থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবি জঙ্গলে। নে, চেটেপুটে খেয়ে নে সব, যদি তোর জীবনের মায়া থাকে এতটুকু।'

সাধু ভয়ে-ভয়ে ভাতের পাতায় হাত দিল। নায়েববাবুর কথাটাই খাঁটি না চোখের সামনে দাদাবাবুর খাওয়াটাই খাঁটি, সে কিছু ঠিক বুঝতে পারলো না। হাতে করে কিছু ভাত সে নাকের নীচে তুলে ধরে শুঁকতে লাগলো, পরে কি মনে করে হঠাৎ সে তার মুখের গহ্বরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। আশ্চর্য, বিষক্রিয়ায় শরীর তার অবশ হয়ে এলো না, বরং কি-রকম যেন ভালই লাগছে মনে হচ্ছে। আবার তুলে দিল সে আরেক গ্রাস। আবার।

বিনয় হাসি চেপে রেখে বললে, 'বিষমাখা ভাত কোথায়, যদি জিগ্‌গেস করেন নায়েববাবু, তবে বলবি উদরের রসায়নাগারে পাঠিয়ে দিয়েছি সেগুলো। বুঝলি ?'

খাওয়ার আনন্দে বিভোর সাধু স্বচ্ছন্দে ঘাড় হেলিয়ে বললে, 'আচ্ছা।'

ছয়

নয়নশুকায় মণ্ডল প্রজাদের বসতির পিছনে প্রায় বিঘে পাঁচেক খাস-পতিত জমি পড়ে ছিল। গ্রামের লোকদের নিয়ে বিনয় সেখানে দীঘি কাটছে। গাঁয়ের লোকেরা প্রথমে রাজি হতে চায়নি, আর কিছুতে নয়, শুধু তাদের এরকম সৌভাগ্য হতে পারে তারই অবিশ্বাসে। কিন্তু বিনয়

তাদের সন্দেহ ভেঙে দিয়েছে নিজ হাতে খন্তা চালিয়ে। বলেছে, 'জমি দিলাম আমি, তোমরা শুধু একটু পরিশ্রম দিতে পারবে না? আমাদের টাকা নেই বটে, কিন্তু আমাদের তো আছে গায়ের জোর, একতার জোর। কোন কাজটা তবে আর আমাদের অসাধ্য?'

পাশ-দীঘ মেপে নিয়ে সবাই লেগে গিয়েছে তখন দীঘি কাটতে—ঘনশ্যাম আর তেজোবর, চিন্তারাম আর ফুলচাঁদ, হরিচরণ আর বৈষ্ণবদাস। মাথার উপরে প্রখর সূর্য, সর্বাঙ্গে মাটি—বিনয় লেগে গেছে জলের আবিষ্কারে, পিপাসার্তের দুঃখমোচনে। ওদের সে কথা দিয়েছিল, জল এনে দেবে সে তাদের ঘরের দুয়ারে, অপর্যাপ্ত অফুরন্ত জল,—সে-কথা সে এখন ফিরিয়ে নেবে কি করে? টাকা নেই, না থাক, কিন্তু অনন্য সঙ্কল্প তো আছে।

উপদেশের চেয়ে কাজ বড়ো—তাই বিনয় নিজে লেগে গেছে মাটি কোপাতে। কাউকে কিছু আর বলতে হয়নি।

কিন্তু পরদিন সকালে এসে দেখে একজনও কেউ আসেনি। ধারে-পারে যে কেউ নেই তাই শুধু নয়, কালকের-কাটা গর্তগুলো পর্যন্ত বুজিয়ে দেয়া হয়েছে। যে জায়গাটা কাল উৎসাহে ভীষণ সরগরম ছিল আজকে তা একেবারে শোকনীরব। এমন কেউ চোখে পড়ে না যে ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করে।

কাছেই তেজোবরের বাড়ি। বিনয় সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলো। দেখলো তার বাড়ির গলির ছায়ায় বসে তেজোবর তামাক সাজছে, কাছেই বসে ঘনশ্যাম আর চিন্তারাম। এমন একখানা তাদের ভাব যেন সকালবেলাটা তাদের আজকে গাফিলতি করেই কাটাতে হবে।

তাদের গুলতানি করতে দেখে বিনয় একেবারে ফেটে পড়লো: 'কী, তোমরা এখনো কাজে যাওনি যে? আমি এসে তাড়া না দিলে নিজেরা গিয়ে লাগতে পারো না? গরজটা কি আমার না তোমাদের?'

ওরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো, কারুরই মুখে কোনো কথা জুয়ালো না।

'কালকের গর্তগুলি সব কে বুজিয়ে দিয়ে গেছে দেখেছ?' বিনয় আবার ধমক দিয়ে উঠলো।

তেজোবরই সাহস করলো শেষ পর্যন্ত। বললে, 'দেখেছি। ও আমাদেরই কাজ। আমরাই বুজিয়ে দিয়েছি ঐ গর্তগুলো।'

'কেন?' বিশ্বাস করা বিনয়ের পক্ষে সহজ ছিল না।

'পুকুর আমরা চাই না। দরকার নেই আমাদের ভালো জলে।'

'তার অর্থ?' বিনয়ের কপালের শিরা দুটো দপদপ করতে লাগলো।

তেজোবর কী বলতে যাচ্ছিল, ঘনশ্যাম তাকে বাধা দিল। বললে, 'সোজা কথা স্পষ্ট করেই বলি বাবু। নায়েববাবু আমাদের পুকুর কাটতে বারণ করে দিয়েছেন।'

'শুধু বারণ করে দেননি, খবর পেয়ে কাল রাত্রে লোকজন নিয়ে এসে জোর-জুলুম করে আমাদের দিয়ে গর্তগুলো বুজিয়ে দিয়েছেন।' বললে চিন্তারাম।

এমনি কিছু একটা বিনয় আশঙ্কা করছিলো। বললে, 'তোমরা শুনলে কেন তার কথা?'

'না শুনি এমন সাধ্য কী আমাদের?' ঘনশ্যাম বললে, 'তাঁরি আশ্রয়ে বাস করি তাঁরি অবাধ্য হই কী করে? বললেন, না বোঝাবি তো ঘর জ্বালিয়ে দেব, লাঠিপেটা করে গায়ের হাড় তোদের আস্ত রাখবো না। মরতে তো এমনিই বসেছি, তার আগে খামোখা জখম হতে যাই কেন?'

অসহিষ্ণু গলায় বিনয় বললে, 'তোমরা বললে না কেন হুকুম করবার তুমি কে? স্বয়ং জমিদারের ছেলে আমাদের কাটতে বলে গিয়েছে, লড়তে হয় তার সঙ্গে লড়ো গে যাও।'

'বলেছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন, আপনি নাকি কেউ নন।'

'আমি কেউ নই, আর উনি, মাইনেখোর কর্মচারী, উনিই হচ্ছেন সব! এমন বুদ্ধি না হলে তোমাদের এই দশা!' বিনয় টিটকিরি দিয়ে উঠলো।

'উনি বললেন, পুকুর কাটতে হলে বড়োবাবুর মত লাগবে। তিনি বেঁচে থাকতে—'

'তাঁর সেই মত আছে কি নেই সে সম্বন্ধে কার কথাটা বেশি মূল্যবান? আমার, তাঁর বড়ো ছেলের, না, তাঁর নায়েবের, আজ বাদে কাল যার চাকরি চলে যেতে পারে? আমি বলছি পুকুর কাটতে, সেইটেই বাবার যথেষ্ট অনুমতি, এর পর আর তাদের নায়েবের সমর্থনের প্রয়োজন হয় না। তোমরা থামলে কেন? বললে না কেন সোজাসুজি, বড়োবাবুর ছেলের আদেশের মাঝেই বড়োবাবুর নিজের অনুমতি রয়েছে।'

'আমরা সবই বলেছিলাম বাবু যদ্দুর যা বলবার।' চন্তারাম চিন্তিত মুখে বললে, 'কিন্তু নায়েববাবু শেষকালে এক মোক্ষম কথা বলে গেলেন। বললেন, আপনার মত-অমতের কোনোই দাম নেই, কেননা—'

'কেননা আপনি বড়োবাবুর ছেলেই নাকি নন।' তেজোবর তেজের সঙ্গে বললে।

'আমি ছেলে নই, ছেলে ঐ তোমাদের ব্রজ-নায়েব? পঞ্চাশ বছরের ঐ ধুমসো?'

'না, ছেলে হচ্ছে তাঁর খোকাবাবু—মাধব—মাধববাবু।'

'আর আমি বানের জলে ভেসে এসেছি, না?' বিনয় বিরক্তিতে ঝাঁঝিয়ে উঠলো: 'তোমাদের ধোঁকা দেবার আর কোনো ও ফিকির পেল না? ছেলে হই বা না হই, নিজের আরব্ধ কাজ তো আগে শেষ করি, অন্তত মানুষের তো ছেলে। তোমরা না আস সঙ্গে, একলাই আমাকে করতে হবে। দাও দেখি তোমাদের খন্তা-কোদাল, আমি একলাই মাটি কোপাবো।'

ঘনশ্যাম বললে, 'যন্ত্রপাতি সব নায়েববাবু আজ ধরে নিয়ে গেছেন।'

'কোথায়?'

'হরিণবাড়ির কাচারিতে। তিনি সকালেই সেখানে এসেছেন শুনলাম। তাঁর দফাদারদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাল ধরতে।'

পাশের গ্রামই হরিণবাড়ি, বেশি দূরের রাস্তা নয়। বিনয় একবার তাকালো গ্রামান্তের অভিমুখে। বললে, 'আমি এখুনি চললুম হরিণবাড়ি। আমার সঙ্গে আসবে কেউ তোমরা? কেউ তোমরা দেখতে চাও স্বচক্ষে,

আমার কথাটাই বড়ো না নায়েবের কথাটাই বড়ো? আমারই না নায়েবের এই জমিদারি?'

তিন জনই বিনয়ের সঙ্গ নিল, উদ্দেশ্যটা নিরপেক্ষ মজা দেখবার জন্যে।

হরিণবাড়ির কাচারিতে ব্রজ-নায়েব সমাগত প্রজাবৃন্দের কাছে তখন নানাজাতীয় সদুপদেশ বিতরণ করছিলেন, সঙ্গীসহ বিনয় এসে উপস্থিত হলো।

কিছু তার বলবার আগেই ব্রজলাল সরাসরি বলে উঠলেন, 'খাস-পতিত জমিতে পুকুর তুমি কাটতে পারো, কিন্তু সর্বাগ্রে তোমার মত নিতে হবে।'

'কার? আপনার?'

'না, না, আমার কেন? আমি কে? আমি তো মাত্র মাইনে-করা কর্মচারী।'

'হ্যাঁ, দয়া করে সেটা সর্বক্ষণ মনে রাখবেন।' বিনয় উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলে, 'আপনার নয়, তবে কার মত নিতে হবে? বাবার?'

কানের পিঠ চুলকে ব্রজলাল কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললেন, 'তাই বা বলি কি করে? তিনি তো তার সমস্ত মতামত আমার ওপরই ন্যস্ত করেছেন।'

'আপনারো না বাবারো না, তবে মত নিতে হবে কার?'

'এই জমিদারির যে ভবিষ্যৎ মালিক, তার। মাধবের।'

'মাধবের?' বিনয়ের গলাটা কেমন টলে গেল। 'এই জমিদারির সেই একমাত্র ভবিষ্যৎ মালিক নাকি? আর আমি?'

'তুমি কেউ নও।' ব্রজলালের গলা এতটুকুও কাঁপলো না। 'জমিদারের ছেলেই তুমি নও।'

'আপনার গায়ের জোরে নাকি?'

'আমার গায়ের জোরে হবে কেন? ভাগ্যের বিধানে। অনেক বছর পর্যন্ত জমিদার বিজয়নারায়ণের সন্তানাদি হয়নি বলে তোমাকে পোষ্য নিয়েছিলো—'

'এ কথা আমি জানি না, জানেন আপনি?' বিনয় প্রতিবাদ করে উঠলো।

'তুমি জানবে কি করে? তখন তুমি মোটে এক বছরের শিশু, যখন দত্তকপত্র হয়। তোমার মা—'

'আর আপনার এ-স্টেটে চাকরি কদ্দিন?'

'বেশি দিন নয়, দশ বছর। হ্যাঁ, মানছি, আমার জ্ঞানটা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ, কিন্তু প্রজাদের মধ্যে অনেকেই তা জানে—'

'হ্যাঁ, জানি বৈ কি। এ আর কে না জানে? অঃ, কত উৎসব সেদিন জমিদার-বাড়িতে।' প্রজাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ ও বয়স্ক সবাই একবাক্যে কথা কয়ে উঠলো।

বিনয় বুঝলো তার বিরুদ্ধে নতুন রকম একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছে।

'তাই, যদ্দিন একা ছিলে, একেশ্বর ছিলে।' ব্রজলাল নিষ্ঠুর, নির্লিপ্ত গলায় বলতে লাগলেন, 'ততদিন এই বিশাল জমিদারি একা তোমার বলে অনায়াসে ভাবা যেত। কিন্তু যেদিন মাধব এসে জন্মালো সেই দিনই তোমার সমস্ত স্বত্ব সমস্ত অধিকার লোপ পেয়ে গেল। সেইদিন থেকে তুমি একজন পথের মানুষ, মাটি-কাটা মজুর হয়ে গেলে।' ব্রজলাল তাঁর চশমার ভিতর থেকে তীব্র চোখে বিনয়কে দেখতে লাগলেন। 'তুমি নিজে টের পাচ্ছ না মাধবের জন্মাবার আগে তোমার যে আধিপত্যটা ছিল সে আজ কোথায়? বুঝতে পাচ্ছ না, কেন, কিসের জন্যে, তোমার সামান্য দুশোটা টাকার প্রার্থনা আমাকে নামঞ্জুর করতে হয়। কারণ, তুমি আর কেউ নও, এখন মাধবই হচ্ছে যুবরাজ। সুতরাং, তোমার রোজগার-পাতি না থাকে, সামান্য মাটি-কাটার মজুরি খেটে পয়সা কামাতে চাও, তবে স্বয়ং মাধববাবুর মত আনতে হবে, তাঁর মত ছাড়া তাঁর খাস-পতিত জমিতে গর্ত করা দূরে থাক, একগাছি ঘাসও তার তুমি তুলতে পারবে না।'

যদিও বুকের ভিতরটা তার হিম হয়ে এসেছিল বিনয় মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়ে রেখে বললে, 'আমার সম্বন্ধে এই অমূল্য আবিষ্কারটা আপনি করলেন কবে?'

'বহু আগে। প্রথমত শুনে, দ্বিতীয়ত স্বচক্ষে দলিল দেখে। উদ্ঘাটন

করলুম শুধু আজ। এতদিন তার দরকার হয়নি। যেহেতু সম্প্রতিই তুমি দিনে-দিনে হয়কে নয় মনে করে মাত্রা ছাড়িয়ে চলেছ—'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো বিনয়। বললে, 'মাত্রা ছাড়ানোর আপনি দেখেছেন কী ? বেশ, আপনি বসুন, আমি এখুনি মাধবের, মাধববাবুর মত নিয়ে আসছি।' বলে বিনয় দ্রুত পায়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলতে সুরু করলো।

ব্রজলাল তার পিছনে দুজন গুপ্তচর লাগিয়ে দিলেন।

গ্রাম থেকে গ্রাম পেরিয়ে দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করে বিনয় যখন বাড়ি পৌঁছুলো তখন বেলা প্রায় দুপুর ছাড়িয়ে গেছে। সোজা সে অন্দর-মহলে চলে গেল, তার মার ঘরে। দেখলো সুনয়নী একটা টুলের উপর বসে আছেন আর দাসী তাঁর খোলা চুলে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে।

বিনয় সরাসরি ব্যাকুল কণ্ঠে জিগগেস করলো : 'মা, সত্যি করে বলো, তুমি আমার মা নও ?'

উত্তর দেবার আগে সুনয়নী ব্যাকুল চোখে দেখে নিলেন মাধব কোথায়। দেখলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর মাধব স্নিগ্ধ, সুস্থ দেহে খাটের উপর ঠিকই ঘুমোচ্ছে, খাটের পায়ার কাছে বসে চাকর ঠিকই আছে পাহারায়। কাল যে ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝখানে মাধবকে বিনয় নিয়ে গিয়েছিল তারপর তার প্রতি তাঁর মনে আর এতটুকুও আর্দ্রতা নেই, থাকতে পারে না।

'না।' নিষ্কম্প গলায় সুনয়নী উত্তর দিলেন।

বিনয় ভাবলো মার এটা অভিমানের স্বর, তাই অনুনয়ের সুরে বললে, 'তুমি যদি আমার মা নও, কে তবে আমার মা ?'

'কে আবার ! ঐ বুড়ি জগঠাকরুন—জগমোহিনী।'

বিনয় ভাবলো, এটাও মার ঠাট্টা। বললে, 'কেউ গোপাল বলে ডাকলেই কি সে গোপালের যশোদা হয়ে গেল, মা ? আমার এমন সুন্দর মা থাকতে অমন বুড়ি আমার মা হবে কেন ?'

'যা হয়ে গেছে তা আর বদলানো যাবে কি করে ? আমি সুন্দর মা শুধু মাধবের। তুমি যদি আমার ছেলে হতে তবে তোমার চেহারা তো সুন্দর হতোই, স্বভাবটাও ভালো হতো।'

বিনয় পাথরের মতো অচল হয়ে রইলো, কেননা সুনয়নীর এইবারের কথার স্বরটাতে রাগ বা ঠাট্টা নেই, দস্তুরমতো ঘৃণা রয়েছে পুঞ্জীভূত হয়ে। সামনে জানলার একটা শিক ধরে বিনয় দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালো। বললে, 'আমি এ কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা, মা।'

'কিন্তু বুঝতে তো একদিন হবেই। চিরকাল তো চোখে ধুলো দিয়ে থাকা যাবে না।' বলে সুনয়নী উঠে পড়লেন। স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে দাসী বাথ-রুমে চলে গেল। সুনয়নী দরজার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'আগাগোড়া ভালো করে যদি বুঝতে চাও, তবে ওঁকে গিয়ে সব জিগগেস করো।'

দরজার কাছে গিয়ে বিনয় সুনয়নীকে বাধা দিল। বললে, 'বাবা কেন, তুমিই তো যথার্থ বলতে পারবে তুমি আমার সত্যিকারের মা কিনা।'

'হ্যাঁ, আমিই বলছি, নই আমি তোমার মা।' সুনয়নী এমন ভঙ্গিতে কথাটা বললেন, বিনয় অনুভব করলে, তাতে সত্যিসত্যিই মাতৃস্নেহের এত-টুকু কোমলতা নেই।

জিভ দিয়ে বিনয় একবার তার ঠোঁট দুটো লেহন করলো। বললে, 'তবে এখানে আমি এলুম কি করে?'

'তোমাকে পোষ্য নেয়া হয়েছিল বলে।'

'পোষ্য?' বিনয় দরজাটা শক্ত করে চেপে ধরলো।

'হ্যাঁ, তাই। বিশ্বাস না করো, নায়েববাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দত্তকপত্রটা পড়ে দেখতে পারো।'

'কার ছেলে পোষ্য নিয়েছিলে?'

'বলেছি তো, জগমোহিনীর।' সুনয়নী একটা জ্বলন্ত কটাক্ষ করলেন। 'যে এখন প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমার মাধবের দিকে হাত বাড়িয়েছে।'

'প্রতিশোধ কিসের?'

'তার বাড়া ভাতে যে এখন ছাই পড়েছে। মাধব যে তার পথের কাঁটা।'

শুকনো গলায় বিনয় ঢোক গিললো। বললে, 'সব কথা আমাকে দয়া করে একটু খুলে বলবে, মা?'

অতি-উৎসাহে বিস্তৃত আকারে সুনয়নী যা বললেন, সংক্ষেপে তা এই :

জগমোহিনী বিজয়নারায়ণের মাসতুতো দাদা গঙ্গাচরণের স্ত্রী। গঙ্গাচরণ ভীষণ দরিদ্র ছিলেন, প্রায়ই দু' বেলা আহার জোটাতে পারতেন না। তিনি যখন মারা যান, তিনটি নাবালক ছেলে নিয়ে জগমোহিনী অকূলে পড়লেন—বড়োটির বয়স তখন বারো, ছোটটির বয়স এক—আর এই ছোটটিই হচ্ছে বিনয়। সে আজ প্রায় আঠারো-উনিশ বছর আগেকার কথা। এদিকে বিজয়নারায়ণের প্রথম পক্ষের স্ত্রী যখন নিঃসন্তান মারা গেলেন আর দ্বিতীয় পক্ষের আমলেও যখন বছর পাঁচেকের মধ্যে ঘরে ছেলে এলো না, তখন বিজয়নারায়ণ ঠিক করলেন পোষ্য নেবেন। জগমোহিনী তখন অভাবের তাড়নায় মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সে তার কনিষ্ঠ ছেলেটিকে উপহার দেবার জন্যে আবেদন জানালো।

'তাতে তার লাভ?' বিনয় হঠাৎ বেখাপ্পা প্রশ্ন করলে।

'একসঙ্গে কিছু টাকা পাবার জন্যে।'

'তাঁর বুকের থেকে ছেলে কেড়ে না নিয়েও তো কিছু টাকা তাঁকে দেয়া যেত—তাঁর যখন অমন অভাব, আর তিনি যখন তোমাদের আত্মীয়া।' বিনয়ের চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো।

সুনয়নী নিষ্ঠুরের মতো হাসলেন। বললেন, 'যেখানে স্বার্থ নেই সেখানে উনি এক পয়সা ব্যয় করেন না।' পরে আবার তিনি কাহিনীর পৃষ্ঠা উলটোলেন :

জগমোহিনীর ছোট ছেলেটির তখন মৃতকল্প অবস্থা, মুখে তার এক ফোঁটা দুধ দেবার শক্তি নেই তাঁর। শুধু যে দয়াপরবশ হয়েই বিজয়নারায়ণ বিনয়কে গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, ললাটলিখন ও করকোষ্ঠি বিচার করে কুল-জ্যোতিষীরা একবাক্যে বললে, এ ছেলে অত্যন্ত সুলক্ষণ ছেলে, অনন্য-সাধারণ ছেলে, ভবিষ্যতে এ দেশপূজ্য হবে, দিগ্বিজয়ী হবে।

বিনয়ের মুখে একসঙ্গে দৃঢ়তা ও দীপ্তি ফুটে উঠলো। বললে, 'তারপর তোমরা নিলে সেই ছেলেকে ?'

প্রকাণ্ড ধুমধাম করে হোম-যজ্ঞ করে পোষ্য নেয়া হলো। এককালীন কিছু মোটা টাকা নিয়ে জগমোহিনী কাশী চলে গেলেন। একের বিনিময়ে বাকি দু'জনকে তিনি একটু আরামে রাখবেন এই ভরসায়। আর সেই এক, মানে বিনয়ের তো আরামের অবধিই রইলো না। কাশী গিয়ে চুপচাপ রইলেন উনি অনেকদিন, মেজ ছেলেটি যখন ওঁর মারা গেল তখনো বড়টিকেই তিনি আঁকড়ে রইলেন, কিন্তু বছর চারেক আগে বড়টিও যখন চলে গেল তখন উনি প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেলেন। কিসের আকর্ষণে চলে এলেন মোহনপুর, আর একদিন রাত্রে, বিনয় যখন রোগশয্যায় প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে, সেই পাগলিনী হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে-কয়ে সোজা উপরে বিনয়ের ঘরে চলে আসেন আর শিয়রে বসে বিনয়ের মাথাটা তাঁর কোলের মধ্যে টেনে নেন। আর, বাড়ির সবাই যখন কাঁদছে সেই পাগলী রুগীর গায়ে-মাথায় হাত বুলুতে-বুলুতে অদ্ভুত হেসে ওঠে এই বলে : 'আর ভয় কী তোমাদের ! আমি এসে পড়েছি। খোকাকে আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।'

'এ বাড়ির খোকা আর তখন তুমি নও।' সুনয়নীর মুখে-চোখে একটা কেমন ভয়ের ভাব ফুটে উঠলো, মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলেন মাধব খাটে ঠিক শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে কিনা, বললেন, 'এ বাড়ির খোকা তখন মাধব, এক বছরের। আমরা সবাই চিনতে পেরেছিলুম পাগলীকে যদিও তার তখন উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, পরনের কাপড়-চোপড়গুলো অত্যন্ত জীর্ণ। কেউ তাকে তখন কিছু বললো না বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে তাড়িয়ে দিই। আমার কেবলি ভয় হচ্ছিল আমার মাধবকে সে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। মাধবকে বুকের মধ্যে প্রাণপণে আঁকড়ে বসে আছি, উন্মাদিনীর সঙ্গে হঠাৎ আমার চোখোচোখি হয়ে গেল। সে কী ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত চাহনি !'

সেইদিনই জগমোহিনী জানতে পেলেন বিনয়ের পথ আর নিষ্কণ্টক নেই।

'তারপর ?' বিনয় জিগগেস করলো।

'তারপর তুমি সে-রাত্রে ভালোর দিকে মোড় ফেরবার পর সকাল না হতেই দিদি কোথায় অন্তর্ধান করলে। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। কিন্তু তারপর থেকে-থেকেই তাকে মোহনপুরে দেখা যেতে লাগলো, বিশেষত ছুটির সময়, যখন তুমি বাড়িতে। ঘুরঘুর করতো রাস্তায়, দাঁড়িয়ে থাকতো গেটের কাছে, কখনো বা অত্যন্ত সাহস করে কাছারি-বাড়িতে ঢুকে পড়তো। কাকে চাই জিগগেস করলে বলতো, খোকাকে চাই। সে হয়তো তোমাকেই চাইতো, কিন্তু এ-বাড়ির খোকা বলতে এখন মাধব, তাই ভয়ে আমি শিউরে উঠতুম।'

'আমাকে একবার দিয়ে ফেলে আবার আমাকে ফিরে চাইবে কেন?' বিনয় হঠাৎ কর্কশ গলায় প্রশ্ন করলো।

'চায় মানে দেখতে চায়, কাছে রাখতে চায়, সাহায্য পেতে চায়। দু'-দু' ছেলে ছেড়ে চলে গেছে, তাই ছোট ছেলের জন্যে টান হওয়াটা স্বাভাবিক, তায় এমন বড়লোক ছেলে! কিন্তু ওটা শুধু তার একটা ছল, তার আসল উদ্দেশ্য এখন দেখছি তুমি নয়, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধব।' সুনয়নীর চোখে একটা হিংস্রতা ফুটে উঠলো: 'সে তার খোকাকে চায় না, চায় আমার খোকাকে, আর তা তার নিজের খোকার জন্যে।'

'তার মানে?'

দাঁতে দাঁত ঘষে সুনয়নী বললেন, 'কাঁটা গাছ সে উপড়ে তুলে ফেলতে চায়। তারি জন্যে কাল সে মাধবকে তার বাড়িতে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।'

'বাজে কথা। সমস্তটাই তোমার বাজে কথা, মা।' মুখে হঠাৎ সরল সরসতা এনে বিনয় বললে, 'তুমি কি আমার মা না হয়ে পারো?' বলে সে মাকে ধরতে গেল।

সুনয়নী পিছনে সরে গিয়ে বললেন, 'আমাকে যদি বিশ্বাস না হয়, ওঁকে তবে জিগগেস করো গে।'

বিনয় নিজেকে গুটিয়ে নিল। কিছু আর না বলে দৃঢ় পায়ে সোজা চলে

গেল সে বিজয়নারায়ণের ঘরে। বাথরুমে ঢোকবার আগে পাহারা থাকা সত্ত্বেও মাধবের ঘরের দরজাগুলি সুনয়নী বন্ধ করিয়ে নিলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বিজয়নারায়ণ ইজিচেয়ারে শুয়ে তাঁর সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রের উপর ঢুলছেন, বিনয় দরজার কাছে এসে গম্ভীর গলায় বললে, 'বাবা, আপনাকে আমি একটা কথা জিগগেস করতে চাই।'

বিজয়নারায়ণ চমকে উঠলেন। নানারূপ অভিযোগ-অশান্তি তাঁকে এখন একেবারে বিরক্তির শেষ সীমায় নিয়ে এসেছে, তাই তিনি আজ ঠিক করেছিলেন সেই সব অভিযোগ-অশান্তির মূল, বিনয়কে, তিনি সত্যিকার অবস্থাটা সম্বন্ধে সচেতন করে দেবেন। সে যে মাধবের সমান নয়, মাধবের চেয়ে নীচু, এই দিব্যজ্ঞান না হলে, তিনি বুঝেছিলেন, তার আস্ফালন থামবে না। একদিন যখন তাকে জানতেই হবে তখন আর দেরি করে লাভ নেই, বরং ক্ষতির সম্ভাবনা।

বিজয়নারায়ণ বললেন, 'জিগগেস করবার কিছু দরকার নেই। যা শুনেছ সব সত্যি।'

'কী সত্যি?' বিনয় অবাক হবার চেষ্টা করলো।

'তুমি শোননি তোমার মার কাছে, মানে, মাধবের মার কাছে?'

বিনয়ের বুকের মধ্যে একটা ঘা পড়লো। বললে, 'শুনেছি। কিন্তু সত্যি-সত্যিই কি মাধবের মা আমার মা নন?'

'না। নন।' বিজয়নারায়ণের স্বর অত্যন্ত স্পষ্ট।

'তবে সেই জগ—জগমোহিনী আমার মা?'

'যার নাম উচ্চারণ করতে হয় না।' বিজয়নারায়ণ ধমক দিয়ে উঠলেন।

'বোধহয় হয় না। কিন্তু তেমন মা হলে একশোবার করা উচিত। নাম শুধু উচ্চারণ নয়, নাম কীর্তন করা উচিত।' বিনয় অসহিষ্ণুর মতো বললে, 'আমি আপনার মুখে স্পষ্ট করে শুনতে চাই তিনিই কি আমার মা?'

'হ্যাঁ, তিনিই। নায়েববাবুর কাছে চাইলেই তুমি আসল দত্তকপত্রখানা দেখতে পাবে। যা সত্য তা জেনে ও জানতে দিয়ে উভয়পক্ষই আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। আশা করি এবার তুমি তোমার অবস্থাটা বুঝে একটু চুপচাপ

থাকবে, একটু সামলে চলবে চারদিক।' বিজয়নারায়ণ গড়গড়ার স্খলিত নলটা তুলে নিলেন।

দ্রুত পায়ে বিনয় আবার সুনয়নীর ঘরের দিকে ফিরে এল। দেখলো দরজা কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ডাকলো : 'মা।'

কেউ সাড়া দিল না।

'আচ্ছা বেশ, আমি চললুম—'

কারুরই আর কোনো ব্যাকুলতা নেই।

সাত

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই চড়া রোদে বিনয় সোজা এসে হাজির হলো, আর কোথাও নয়, হরি গাঙ্গুলির বাড়িতে। হরি পণ্ডিত তখন বাইরের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে দিবানিদ্রার উদ্যোগ করছেন। কিছুটা দূর থেকেই বিনয় উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো : 'আপনার পিসিমা কোথায়?'

প্রশ্নটা যেন কিছুই বুঝতে পারেনি হরি পণ্ডিত এমনি একখানা সরল মুখ করে রইলো।

বিনয় কাছে এসে বললে, 'আপনার পিসিমাকে একবার ডেকে দিন।'

'পিসিমা!' হরি পণ্ডিত ডাঙায়-তোলা মাছের মত চেয়ে রইলো, বললে, 'সে তো আজ চলে গেছে।'

'চলে গেছে না তাকে আপনি তাড়িয়ে দিয়েছেন?'

'তাড়িয়ে না দিয়ে কী আর করি বলো? দূর সম্পর্কের কে-না-কে-এক পিসির জন্যে কে তার রোজগারের পথটা মাটি করে দেয়?' হরি পণ্ডিত ভয়-কাতর মুখে বললে, 'ধর্মই বলো আর পরকালই বলো, তোমাদের নায়েববাবুর লাঠির কাছে কিছুই নয়।'

'কোথায় গেছেন তিনি বলতে পারেন?'

'কী করে বলবো, কোথায় গেছে! বললুম তো এই গ্রাম থেকেই চলে যেতে।'

'যাবার রেল-ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন?' বিনয়ের গলায় বিদ্রূপ মেশানো।

'রেলভাড়া দেবার ক্ষমতা কোথায়? নিজেরই দিন চলে না। ভিক্ষে-টিক্ষে করে জোগাড় করে নেবে নিশ্চয়। কিন্তু তাকে তোমার এত খোঁজ কেন বলতে পারো?' হরি পণ্ডিত জিজ্ঞাসু চোখে চাইলো: 'কী দরকার তার কাছে?'

'দরকার—ভীষণ দরকার।' বিনয় ম্লানমুখে হাসলো: 'কী দরকার বললে বলে দিতে পারবেন কোথায় আপনার পিসিমা?'

'কী করে বলবো? আমি আর তার কোনোই খোঁজ রাখি না।'

মুহূর্তে বিনয়ের কাছে সমস্ত আলো যেন অন্ধকার হয়ে গেল। কোথায় সে যাবে, কার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াবে, কিছুরই সে কোনো দিশে পেল না।

তার এই গ্রাম, নরম স্নেহময় মাটি, গ্রীষ্মকালে ঘন সবুজ ঘাসের উচ্ছ্বাস, এই তার অনেক বড় উন্মুক্ত আকাশ, বিদ্যুৎঝলকের মতো পাখার ভিতরকার অদেখা রঙ ফুটিয়ে পাখিদের হঠাৎ উড়ে যাওয়া, এই সব ডাল-পালা-মেলা বড়-বড় গাছ, গাছের তলাকার ছায়া, দূরে তার ঐ সোনালি নদী, ওপারে বিস্তীর্ণ চর ভরে ধানের ক্ষেত—সব, সমস্ত কেমন যেন তাকে কান্নার সুরে বলে উঠলো, বিদায় বিদায়! যেন এরা আর তার কেউ নয়, যেন সবাইর সে অচেনা, সবাইর সে দূর। সমস্ত প্রকৃতি আজ বোবা, বধির।

কোথায় সে যাবে জানে না, শুধু চলে যাবে চক্ষু যেখানে যায়, চক্ষু যেখানে ঘুমে বুজে আসে।

কখন যে এরি মধ্যে নীল আকাশ কালো হয়ে উঠেছে বিনয় টের পায়নি। হঠাৎ এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া বইতেই তার জ্ঞান হলো; চেয়ে দেখলো আকাশে ঝড়ের আড়ম্বর উঠেছে সঞ্চিত হয়ে। দেখতে না দেখতেই দিঙ্মণ্ডল কাঁপিয়ে ঝড়ের তাণ্ডব সুরু হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে সশব্দ শিলাবৃষ্টি। আশ্রয় নেবার জন্যে বিনয় তাড়াতাড়ি সামনে কার এক একচালার দাওয়ায় উঠে দাঁড়ালো।

বাঁশের একটা খুঁটি ধরে দেখতে লাগলো সে ঝড়, মাটির সবুজের উপর

আকাশের শুভ্র পুষ্পবৃষ্টি—দেখতে লাগলো সে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে, নিরপেক্ষ নিরুৎসাহের মতো। জলের ছাঁটে গা তার ভিজে যাচ্ছে বটে, কিন্তু বন্ধ দরজায় করাঘাত করতে প্রবৃত্তি হয় না—যেটুকু স্থান সে পেয়েছে এই তার যথেষ্ট।

অজস্র শিল পড়ছে অথচ সে একটাও কুড়াচ্ছে না, এ যে কেমন করে আজ সম্ভব হলো বিনয় ভেবে পেলো না।

সশব্দে দরজা গেল খুলে। ভিতর থেকে কে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'দাঁড়িয়ে কে ওখানে ?'

বিনয় মুখ ফেরালো।

'ও মা, এ যে রাজপুত্তুর।'

'কে, আমার গোপাল ?' ঘরের ভিতর থেকে আরেক জন কে ছুটে এল ব্যাকুল হয়ে।

বিনয় চেয়ে দেখলো, আর কেউ নয়, জগমোহিনী। ঝড়ের আগেকার স্তম্ভিত আকাশের মতো রুদ্ধনিশ্বাসে সে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিনয়ের মনের মধ্যে কি একটা তোলপাড় চলেছে একদৃষ্টে বুঝে নিয়েছে জগমোহিনী। এক পা এগিয়ে এসে তিনি বললেন, 'কী হয়েছে তোর গোপাল ?'

'আমার নাম গোপাল নয়।' বিনয় ধমকে উঠলো।

'কিন্তু জননীর কাছে সব সন্তানই গোপাল, বাবা।' জগমোহিনী অদ্ভুত করে হাসলেন।

'জননীর কাছে। কিন্তু তুমি তো জননী নও, তুমি রাক্ষসী।'

নিষ্পলক চোখে জগমোহিনী বিনয়ের চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দু' চোখ ছাপিয়ে তাঁর অশ্রুর বান ডেকে এল, এবং দু' চোখে পরিপূর্ণ জল নিয়েই তিনি ভাঙা গলায় হেসে উঠলেন—হাসিটা শোনালো ঠিক হাহাকারের মতো। বললেন, 'কী করে জানলি তা তুই ?'

'ওরা আজ আমাকে সব বলে দিয়েছে।'

'বলে দিয়েছে! বলে তো তা একদিন দেবেই। দু' দুটো ছেলে আমি খেয়েছি, রাক্ষসী তো আমি বটেই। ওরা তো তাই আমাকে বলবে!' জগমোহিনী কান্নার আবেগে কাঁদতে লাগলেন।

'তার জন্যে নয়। মৃত্যুর উপরে মানুষের হাত কী। অকালে তোমার ছেলে মারা গেছে বলে তুমি রাক্ষসী নও, তুমি রাক্ষসী পেটের ছেলেকে তুমি পরের হাতে বিলিয়ে দিয়েছিলে বলে।'

'কিন্তু কেন বিলিয়ে দিয়েছিলুম, তা তুই জানিস?'

'জানি, তোমার নিজের পেট ভরাবার জন্যে।'

'নিজের পেট!' জগমোহিনী বিকটভাবে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তখন তুই এক বছরের শিশু, কী জানবি তুই সেই দুর্দিনের ইতিহাস! কারুর রান্নাঘরের নর্দমার মুখে হাঁড়ি পেতে ফ্যান সংগ্রহ করে বড় ছেলে দুটোর মুখে ঢেলে দিচ্ছি, দুধের বদলে তোকেও খাওয়াচ্ছি সেই ফ্যান। তার ওপরে তোর হলো জ্বর আর তড়কা—সে দুর্দিনের কথা আর মনে করিয়ে দিস না—সবাই তখন একসঙ্গে মরতে বসেছি।'

'তাই আমার বিনিময়ে নিজেরা সবাই বাঁচলে। তোমাদের সঙ্গে একত্র মরলে পরকালের নৌকোটা কি বেশি বোঝাই হতো? এক বছরের একটা শিশু কি খুবই ভারি?'

'তুই মরবি কেন? বালাই, ষাট। তুই যে রাজা হবি। তোকে যে রাজা বানিয়ে দিলুম।' জগমোহিনী বিনয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে হাত বাড়ালেন।

বিনয় সরিয়ে নিল নিজেকে। বাঁকা গলায় বললে, 'রাজা! কে চেয়েছিল এই রাজত্ব? তার চেয়ে তোমাদের সবাইর সঙ্গে আমার সমান দুঃখ ভাগ করে নেয়াও সুখের ছিল। যদি মরতুম, মার কোলে শুয়ে মরতুম। কিন্তু এ কী, এ আমার তুমি কী করেছ?'

'কী করেছি?'

'পথের ভিখারী করেছ। হয়তো তার চেয়েও নীচে ঠেলে দিয়েছ আমায়।'

'আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, খোকা।' জগমোহিনী চেঁচিয়ে উঠলেন।

'বুঝতে পারবার কথা নয় তোমার। মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনটাই তুমি বোঝবার জন্যে নিজের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে পর্যন্ত তুমি পর করে দিতে পারো। টাকা-পয়সার ওপারে আর কিছুই কোনো দিন দেখতে শেখনি। ছেলেকে ঐশ্বর্যের মাঝে ফেলে রেখে গেলে, ভাবলে ছেলের সুখের আর শেষ রইলো না।'

'কেন, তুই কি সুখী হসনি খোকা? এত বড় বিশাল সম্পত্তি—'

'না, হইনি সুখী, হতে পারে না কেউ সুখী। ও-সব সুখ-ঐশ্বর্য আমার জন্যে নয়, আমি তা অনেক পিছনে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

'কেন?'

'সমস্ত মিথ্যা। সমস্ত মিথ্যা বলে। আমি এত মিথ্যার বোঝা আর বইতে পারছি না।' বিনয়ের চোখ ছলছল করে উঠলো: 'যাকে এতদিন মা বলে ডেকেছি সে আমার মা নয়, যাকে বাবা বলে জানতুম সে আমার বাবা নয়, সব চেয়ে অসহ্য, মাধব আমার সহোদর ভাই নয়। ঐ বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার মাঠ-নদী কিছুই আমার নয়। আমি পর, আমি বিদেশী, আমি কেউ নই কারুর। এখন সমস্ত কিছু মাধবের। আমি অনায়াসে ভাবতে পারি, আমি চিরদরিদ্র, আমার সমস্ত কিছু আমার মাধবকে দিয়ে এসেছি।'

'কেন, কেন তুই তাকে দিয়ে আসবি?'

'তাতে বুঝি হিংসায় তোমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে, না? মাধব কিছু পায় এইটেই তোমার অসহ্য! তোমার বোধহয় ধারণা মা বলে পরিচয় দিয়ে পরিত্যক্ত ছেলের কাছ থেকে কিছু দয়া চেয়ে নেবে শেষ বয়সে? একবার বেচে পয়সা নিয়েছিলে, এবার যেচে যতটা পাও। নইলে এত বারণ করা সত্ত্বেও তুমি এখানে আস কেন বারে-বারে?'

'আসি কেন?' জগমোহিনী দুই চোখে কাতরতা ভরে বললেন, 'আসি তোকে শুধু একটু দেখতে। হরি যখন আজ সকালে আমাকে তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল তখনো সোজা রেল-ইস্টিশনের দিকে চলে যেতে পারলুম না। পথে এই জানকী বোষ্টমীর বাড়িতে আশ্রয় নিলুম। অস্পষ্ট একটু আশা—যদি আবার তোর দেখা পাই!'

'তবে দেখ, এই আমার কলঙ্কিত মুখ, এই আমার নিরানন্দ নিরাশ্রয় মূর্তি, চক্ষু সার্থক করো।' বলে বিনয় এক পা এগিয়ে এলো।

জগমোহিনী চোখ বুজলেন। চোখ মেলে বললেন, 'চোখের তবুও তৃপ্তি হয় না, খোকা। দুঃখে থাক, সুখে থাক, তোকে দেখবার কামনা আমার হয়তো ঈশ্বরকে দেখার কামনার চেয়েও বেশি। ঈশ্বর তোর আশ্রয় কেড়ে নিয়ে থাকেন, তোর আশ্রয় আছে তোর মার কোলে, মার আঁচলে। তুই আয়, খোকা।' জগমোহিনী হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বিনয় আবার পিছু সরে গেল। বললে, 'এক বছরের শিশুকে যখন পরের হাতে বিলিয়ে দিয়েছিলে তখন এই কোল আর আঁচল কোথায় ছিল? একদিন ক্ষুধার তাড়নায় দূর করে দিয়েছিলে, এখন আবার সেই ক্ষুধার তাড়নায়ই ডাকাডাকি করছ। কিন্তু আমার ভিতরটা সব পাথর হয়ে গেছে, কোনো দাগই তাতে পড়ছে না।'

'না পড়ুক, ডাকবো না আমি। তুই শুধু আমাকে একবার ডাক। কতদিন শুনিনি সে-ডাক, কোনো দিন শুনিনি তা তোর মুখে।'

কথাটা বোধহয় বিনয় বুঝলো না। বললে, 'আমার এখনকার ডাক অনেক দুর্গম দূরে, দুঃসহ দুঃখের মধ্যে। মার কোল, মার আঁচল আর আমার দরকার নেই।' বলে বিনয় রাস্তায় নেমে পড়লো।

'শোন, শোন খোকা।' জগমোহিনী আর্তকণ্ঠে কাকুতি করে উঠলেন: 'সারাদিনে তোর কিছু এখনো খাওয়া হয়নি। আয় তুই আমার কাছে। আয়, তোকে দুটো ফুটিয়ে দি। খিদেয় তোর মুখ-চোখ কেমন শুকিয়ে গেছে।'

'তার জন্যে তোমার ভাবনা নেই।' বিনয় ফিরলো। বললে, 'আমার সঙ্গে ছেলে-মেয়ে বা ভাই-বোন নেই যে বিক্রি করে নিজের খিদে মেটাবো। যদি খেটে খেতে পাই খাবো না-পাই না-খেয়ে মরে যাবো। তবু আমি একা, আমার জন্যে কারু ভাবনা নেই পৃথিবীতে। যদি থাকতো তবে পেটে ধরে তা পরের হাতে বিলিয়ে দিত না।' বিনয় পিছনে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে চললো।

বৃষ্টির ধারা তখন সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। জগমোহিনীও রাস্তায় নেমে বিনয়ের পিছু নিলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন: 'না, তুই একা নোস। আমি, আমি আছি তোর। ফিরে আয় তুই আমার কাছে।'

'অসম্ভব। তুমি আমার কেউ নও।'

'আমি তোর মা, সত্যিকারের মা। ফিরে না আসিস, একবার শুধু আমার দিকে ফিরে তাকা, খোকা। দিবানিশি যে-ডাক শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছি সেই ডাকে একবারটি আমাকে ডাক।' জগমোহিনী বিনয়কে প্রায় ধরে ফেললেন: 'বল্, মা, একবার আমাকে মা বলে ডাক, খোকা।'

বিনয় থামলো।

ডাক শোনবার আশায় জগমোহিনীও থামলেন।

বিনয় তাঁর কাছে এসে স্পষ্ট, একটু বা কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো: 'জেঠিমা।'

আট

কোথায় চলেছে কিছুই বিনয়ের খেয়াল নেই, হঠাৎ একজন লোক পাশে এসে বিনীত ভঙ্গিতে বললে, 'বাবু আপনার জন্যে পালকি পাঠিয়ে দিলেন।'

'কে বাবু!' বিনয় লোকটার মুখের দিকে অপলক চেয়ে রইলো, কোথাও কোনোদিন দেখেছে বলে মনে করতে পারলো না।

'সাড়ে সাত-আনির বাবু। শোভনডাঙার দিগিন্দ্র সান্যাল। সোনালি পেরিয়েই শোভনডাঙা।' আগন্তুক নদীর অভিমুখে ইসারা করলো।

'আমি নাম শুনেছি দিগিন্দ্রবাবুর। বাবার, মানে বিজয়নারায়ণ মৈত্রের সঙ্গে সরিকান সম্পত্তি নিয়ে অনেক তার মামলা চলে শুনেছি। কোনো দিন দেখিনি ভদ্রলোককে।'

'তিনি আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন। পালকি নিয়ে বেয়ারারা ওপারে আছে।'

'আপনি কে ?'

'আমি তাঁর নায়েব, আমার নাম শ্রীঅনাথনাথ বাগচী।' বিনয়ে বিগলিত হয়ে ভদ্রলোক বললে।

নায়েব বলতে যে একটা ঔদ্ধত্য ও কাঠিন্যের ছবি তার মনে ছিল বিনয় দেখলো তার সঙ্গে অনাথনাথের কোনো মিল নেই। তিনি একজন দাসানুদাস, প্রভুর অনুগ্রহে-আশ্রয়ে খুবই আপ্যায়িত সর্বদা এমনি একটা গদ্‌গদ ভাব করে রয়েছেন। লোকটিকে বিনয়ের ভালো লাগলো, মনে হলো শিষ্টতার অভিনয় একটু বেশি করলেও এই হওয়া উচিত নায়েবের চেহারা।

কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললে, 'কিন্তু আমাকে তিনি ডাকছেন কেন ?'

'তা অনুমান করতে পারি এমন আমাদের শক্তি নেই, শক্তি থাকলেও উচ্চারণ করতে পারি এমন আমাদের সাহস নেই।'

'জিজ্ঞাসা করেন নি ?'

'সর্বনাশ! তাঁর আদেশ নির্বিবাদে পালন করাই আমাদের কাজ, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন বা কৌতূহল প্রকাশ করাটা ধৃষ্টতা। সে-ধৃষ্টতার শাস্তি সাঙ্ঘাতিক।'

'এই দুপুরে আমার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন কী!' বিনয় বিস্মিত সুরে বললে, 'খাওয়া-দাওয়ার পর এখন তো তিনি নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছেন!'

'ঘুম—দুপুরে ঘুমোবেন উনি! এ-দৃশ্য আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এখন তিনি কাচারিতে এসে বসেছেন।'

'কেন, তিনি তামাক খান না, সুগন্ধি তামাক ?' জমিদার ভাবতে এক শ্লথ-মন্থর মাংসপিণ্ড বিনয়ের মনে পড়লো।

'দাঁতে করে সুপুরিটিও তিনি কোনো দিন কাটেননি।'

'চলুন। কোনো ডাকই আমি উপেক্ষা করবো না। কিন্তু ভারি আশ্চর্য লাগছে,' বিনয় চলতে-চলতে বললে, 'আমাকে উনি চিনলেন কেমন করে ?'

অনাথনাথ আর কোনো কথা বললো না।

সোনালি পেরিয়ে ও-পারে এসে বিনয় বললে, 'মাইল চারেক তো রাস্তা, ও আমি হেঁটেই যেতে পারবো।'

'সর্বনাশ !' অনাথনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলো : 'খালি পালকি ফিরে যাবে নাকি ? গর্দান যাবে যে সবাইকার।'

'সমস্ত শরীর আমার ভিজে গেছে, কাপড়ে-জুতোয় কাদা, ভিতরের মখমলের আসন যে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে না। উঠুন।'

'পালকিতে চড়বার আর আমার মান নেই।'

'আমাদের জমিদার আপনার মানের কথা ভাবেননি। ভেবেছেন নিজের মানের কথা।' নায়েব সানুনয় ভঙ্গিতে হাত জোড় করলো।

পালকি এসে দাঁড়ালো কাচারি-বাড়ির সমুখে।

সঙ্গে সঙ্গে কে-একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললে, 'আসুন এদিকে।'

নায়েবের জিম্মা থেকে বিনয় এল এখন সরকারের হেপাজতে।

যে ঘরে বিনয়কে নিয়ে আসা হলো সেটা স্নানের ঘর। বড়-বড় গামলায় জল ধরা, ব্র্যাকেটে সদ্য পাট-ভাঙা কোঁচানো ধুতি, নতুন তোয়ালে ও গেঞ্জি, দেয়ালে আটকানো কাঠের তাকের উপর তেল, সাবান, দাঁত মাজবার পেষ্ট আর ব্রাশ—সব নতুন, সদ্য-ক্রীত। ওদিকে একটা ড্রেসিং-টেবিলের উপর সাজানো যত স্নানান্তের সরঞ্জাম।

'এটা আমাদের গেস্ট-হাউসের বাথরুম।' সরকার বললে।

'কিন্তু এখানে কেন ?' বিনয় যত না বিস্মিত তার বেশি বিরক্ত হয়ে বললে, 'আপনাদের বাবু কি স্নানের ঘরে এসে দেখা দেন নাকি ?'

'না, না, বাবু আসবেন কেন ? আপনার জন্যেই এ-সব ধুতি-গেঞ্জি। আপনিই এখানে চান করে নিন।' সরকার ঈষৎ মুরুব্বিয়ানা-চালে বললে, 'বৃষ্টিতে আপনার জামা-কাপড়গুলি নোংরা হয়ে গেছে। বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, বেশ-বাসে একটু ছিরি-ছাঁদ আনতে হয় তো।'

'কেন, বেশ-বাস যাদের অপরিচ্ছন্ন তাদের সঙ্গে আপনাদের বাবু দেখা করেন না বুঝি ?'

'না, না, তা কেন,' সরকার আমতা-আমতা করতে লাগলো। 'তবু অত বড় একটা মানী লোকের সামনে এমন ভাবে দেখা দেওয়া কি ঠিক ?

'তা আপনাদের ঐ মানী লোকই বিচার করুন। কোথায় আপনাদের বাবু?' বলে বিনয় সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা কাচারি-বাড়ির দিকে রওনা হলো।

'শুনুন, শুনুন, আমার অন্যায় হয়েছে—দাঁড়ান, কথাটা আমার ও-ভাবে বলা ঠিক হয়নি—আসল কথা হচ্ছে এই—' সরকার তার পিছে-পিছে চললো।

কিন্তু বিনয় কর্ণপাত করলো না। সোজা কাচারি ঘরে ঢুকে ফরাসে-সমাসীন গৌরবর্ণ সুদর্শন এক ভদ্রলোককে সামনে দেখতে পেয়ে সে সরাসরি জিগগেস করলে একটু-বা পরুষ কণ্ঠে: 'আপনিই কি সাড়েসাত-আনির দিগিন্দ্র সান্যাল?'

ভদ্রলোকের চোখে-মুখে একটা বিদ্যুৎ ঝল্‌কে উঠলো। বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি—তুমি কে?'

'আমি? আমি মোহনপুরের বিজয়নারায়ণ মৈত্রের—ধরুন, আমি কেউ নই, আমি এমনি একজন মানুষ, পথিক—'

দিগিন্দ্র হাসলেন। বললেন, 'তোমার জন্যে আমি পালকি পাঠিয়েছিলুম।'

'কিন্তু এখন দেখছি আমাকে অপমান করাই আপনার উদ্দেশ্য ছিল।'

দিগিন্দ্র তাঁর মুখের হাসিটি অস্ত যেতে দিলেন না। বললেন, 'কি করে বুঝলে?'

'আপনার ধারণা আপনার সঙ্গে কেউ নগ্নপায়ে দেখা করতে এলে আপনার অবমাননা হয়। কিন্তু কে চায় আপনার সঙ্গে সেধে দেখা করতে? আমি চেয়েছি?'

'নিশ্চয়ই না। আমিই নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছি তোমাকে। তোমাকে তো গেপ্তার করে নিয়ে আসতে বলিনি যে তোমার কোমরে দড়ি বেঁধে তোমাকে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসবে। তোমাকে নিয়ে এসেছি রাজ-অতিথি করে।'

'কিন্তু সোজা এখানে না এনে আমাকে বাথরুমে নিয়ে যাবার কারণ

কী ?' বিনয় তেজী গলায় বললে, 'আপনার কি মনে হয় ময়লা কাপড়ে ধূলো-পায়ে আপনার সঙ্গে কারুর দেখা করার অধিকার নেই ? আপনার প্রজাদের কি আপনারই মতো পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ, না, আপনি এতই গর্বিত যে প্রজাদের সঙ্গে দেখা করতে আপনি ঘৃণা বোধ করেন ?'

দিগিন্দ্র বিনয়ের উদ্দীপ্ত চক্ষুর দিকে চেয়ে রইলেন, কিন্তু নিজে উত্তেজিত হলেন না। বললেন, 'তবে এরা সব কে আমার চারদিকে ?'

বিনয়ের এবার দৃষ্টি পড়লো ফরাসের নীচে সমবেত গ্রাম্য প্রজাদের উপর। চেহারা দেখে চিনতে এদের দেরি হয় না। নায়েব-গোমস্তা ডিঙিয়ে সোজা জমিদারের কাছে দরবার করতে এসেছে।

'তবে আমার বেলায় আপনার এই অদ্ভুত আদেশ কেন ? কেন আমি আমার গায়ের ধূলো-কাদা না ধুয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবো না ? আমি কি আপনার এ-সব মলিন প্রজার চেয়ে আলাদা ?'

'কে বলে তোমাকে আমার এ আদেশ ?'

বিনয় নিকটবর্তী সরকারকে দেখিয়ে দিল।

'বলেছেন অমন কথা ?' দিগিন্দ্রের অগ্নিময় দৃষ্টি সরকারের দিকে ধাবিত হলো।

বিবর্ণ মুখে নত চক্ষে সরকার বললে, 'ঠিক অমন ভাবে বলিনি—'

'বলেছেন, আপনাদের বাবুর মতো মানী লোকের সামনে এমন ছিরিছাঁদহীন পোষাকে দেখা করাটা সঙ্গত হবে না, এবং সেই জন্যেই আমাকে স্নান করে সর্বাগ্রে পরিচ্ছন্ন হতে হবে।' বিনয় স্পষ্ট, নির্ভীক কণ্ঠে বললে।

'বলেছেন এমন কথা ?'

মিথ্যা বলাটা সরকারের পক্ষে কঠিন না হলেও, এখন, এ-মুহূর্তে, কেন-কে-জানে, মুখে মিথ্যা এলো না। হয়তো মনে করলে যে মিথ্যা সে যত জোরের সঙ্গেই বলুক না কেন, এ-যাত্রায় প্রভু বিনয়কেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন। তাই সে কানের পিঠ চুলকাতে-চুলকাতে বললে, 'বলেছি।'

'বলেছেন ?' দিগিন্দ্র শিখার মতো জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'আপ চান,

মাপ চান বিনয়ের কাছে। বাড়ি থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে বলছে চান ওর কোনো মান নেই? গরিব হোক, দুর্বল হোক, মানুষের নিজস্ব যে মান তার মাঝে তারতম্য কোথায়? সবাই সমান, আর কিছুতে না হোক, মানে সবাই সমান।'

অনুতপ্ত সরকার মিনতিময় গলায় বললে, 'আমাকে মাপ করুন।'

'হাতে ধরে মাপ চান!' দিগিন্দ্র হুঙ্কার করে উঠলেন।

সরকার বিনয়ের হাত চেপে ধরলো। বিনয়েরই এখন উলটে ভদ্রলোকের জন্যে সহানুভূতি হলো, কেননা লোকচক্ষে তাঁর সম্মান এভাবে খর্ব হতে দেয়াটাও কেমন তাকে পীড়া দেয়। সে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'দরকার নেই এ অভিনয়ে। গায়ে-কাপড়ে ধুলো-কাদা নিয়েই যখন আপনার প্রভুর দেখা পেয়ে গেছি, আপনার গায়ে-পড়া হিতোপদেশের যে দাম নেই তাতেই আমি সুখী। যান, সামান্য বালি হয়ে সূর্যের চেয়ে বেশি তাত দেখাবেন না।' বলে দিগিন্দ্রের দিকে ফিরে তাকিয়ে সে বললে, 'এখন বলুন, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?'

দিগিন্দ্র হাসিমুখে বললেন, 'এখন তোমাকে বাথরুমে যেতে বলতে পারি?'

'তার মানে?'

'সমস্ত দিনে আজ তুমি চান করবে না? খাবে না চারটি? টই-টই করে ঘুরে বেড়াবে?' দিগিন্দ্রের গলায় স্নেহ উচ্ছল হয়ে উঠলো।

'চান করবো, খাবো—তা, এখানে কেন?'

'এখানে খেতে কিছু দোষ আছে? আমি তোমার বাবার—ব্রজনারায়ণ, মানে বিজয়নারায়ণের শত্রু হতে পারি, কিন্তু তোমার তো আমি শত্রু নই।' দিগিন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন।

দিগিন্দ্র যে কত সুন্দর পুরুষ তার দাঁড়াবার পর যেন তা আরো ভালো করে বোঝা গেল। সৌন্দর্য তাঁর বয়সের অল্পতায়, গায়ের রঙে বা দীর্ঘায়ত চেহারায় নয়, সৌন্দর্য তাঁর ব্যক্তিত্বের কাঠিন্যে, প্রভুত্বের বলশালিতায়। এবং তারই প্রতীক তাঁর ঐ চেহারা। বিনয় মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে গেল।

দিগিন্দ্র বললেন, 'তোমার প্রতিকারের পরিচয় যে তোমার কাছে

এতদিন অজানা ছিল তাই আমি জানতুম না। বংশী, মানে আমার স্পাই, গুপ্তচর, যখন এসে আজ খবর দিলে যে তুমি তোমার সত্য পরিচয় পেয়ে মিথ্যে-মিথ্যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছ, তখন আমার মন অবোধ তোমার জন্যে কেঁদে উঠলো। তখনই চারদিকে লোক পাঠালুম তোমার জন্যে। ছেলেমানুষ, আঘাতের প্রথম ধাক্কায় কখন কী করে বস কে জানে, ভাবলুম, তোমাকে রক্ষা করতে হবে বিপদের থেকে। বোঝাতে হবে, যাই তুমি শুনে থাকো বা ভেবে থাকো, সংসারে তুমি নিরাশ্রয় নও। ব্রজনারায়ণ, মানে বিজয়নারায়ণ আমার শত্রু হতে পারেন, কিন্তু তাঁর ছেলের এ দুর্দিনে যদি না আমি মিত্রতা দেখাই তবে সেই শত্রুতার মধ্যে কোনোই মহিমা থাকবে না। তাই বন্ধুর মতো, শুভার্থীর মতো গোটাকতক কথা তোমাকে বলবো বলে ডেকে পাঠিয়েছি। নাও, চট করে চান করে নাও, এত বেলা পর্যন্ত উপোস করে থাকা আমার অভ্যেস নেই।'

বিনয় স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে, 'আমার জন্যে আপনি এখনো অভুক্ত আছেন ?'

দিগিন্দ্র অল্প একটু হাসলেন। বললেন, 'তাই তো রীতি। তুমি যে আজ আমার অতিথি – রাজ-অতিথি।'

সরকারের সঙ্গে বিনয় এবার বিনাতর্কে বাথরুমের দিকে অগ্রসর হলো।

স্নান সেরে খাবার-ঘরে ঢুকে বিনয় দেখলো দিগিন্দ্র আগে থেকেই আসনে বসে তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। থালার চারপাশে রাশি-রাশি বাটি সাজানো হচ্ছে দেখে বিনয় বললে, 'ষোড়শ ছেড়ে উপচারের সংখ্যা ছত্রিশ হয়েছে দেখছি। কিন্তু আমার জন্যে কি আর এত উপকরণের প্রয়োজন আছে ?'

দিগিন্দ্র বললেন, 'কেন, নেই কেন ? তুমি কম কিসে ?'

'কেন আপনি জানেন না আমার সব ইতিহাস ?' বিনয় একটু বিস্মিত হলো।

'জানি বৈ কি।'

'কী জানেন ?'

'জানি, তুমি ব্রজনারায়ণ, মানে বিজয়নারায়ণের পোষ্য ছেলে।'

'আর এ-ও নিশ্চয় জানেন যে আমার একটি ছোট ভাই আছে, নাম মাধব।'

'জানি বৈ কি। সে ঐ ব্রজনারায়ণ, মানে বিজয়নারায়ণের সত্যিকারের ছেলে।'

ম্লান হাসি হেসে বিনয় বললে, 'তা হলে তো আপনি সমস্তই জানেন দেখছি। কিন্তু বিজয়নারায়ণকে বারে-বারে আপনি ব্রজনারায়ণ বলছেন কেন?'

'তা ছাড়া আর কি!' সঘৃণ স্বরে দিগিন্দ্র বললেন, 'ওটার মধ্যে কোনো মনুষ্যত্ব আছে নাকি? সবই তো সেই ব্রজলাল। হাঁচতে বললে ব্রজলাল, কাশতে বললে ব্রজলাল। কানু ছাড়া যেমন গীত নেই তেমনি ব্রজ ছাড়াও ওঁর বুলি নেই। সম্পত্তিটি ব্রজলালের হাতে তুলে দিয়ে উনি নেশায় টং হয়ে আছেন। তুখোড় ব্রজলাল সেই ফাঁকে দু'হাতে লুটে খাচ্ছে। কী যে সে সর্বনাশ করছে দিনে-দিনে উনি তা কল্পনাও করতে পারছেন না। একদিন যে ওঁর নেশার বরাদ্দ রসদও জুটবে না তা ওঁর খেয়াল নেই। এমন অকর্মণ্য! তাই ওঁর নাম বদলে আমি নাম রেখেছি ব্রজনারায়ণ। তুমি বোস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ক্ষণকালের জন্যে বিনয়ের চোখে নিষ্ঠুর একটা দীপ্তি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। সে শান্ত, একটু-বা বিমর্ষ স্বরে বললে, 'ব্রজনায়েবের দম্ভ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ও এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন জমিদারিটা ওর নিজের। বাড়ির কর্তা-গিন্নিও উদাসীন, বরং প্রশ্রয়ই ওকে দিয়ে আসছেন। ওর এই আধিপত্য, এই স্বেচ্ছাচার আমারই একমাত্র অসহ্য ছিল, এবং যদিও সঙ্ঘর্ষে আমি ওর কাছে বারে-বারেই হেরে যাচ্ছিলুম, তবুও আপনাকে বলতে পারি, মনে-মনে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, একদিন-না-একদিন ওকে তাড়াবোই, ধূলিসাৎ করে দেবো ওর ঐ অহঙ্কার, কর্তৃত্বের সিংহাসন থেকে নামিয়ে নিয়ে আসবো ওকে আমার পায়ের তলায়। ও যে শুধু আমার চাকর এ কথা ওকে হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে দেবো আমি।'

'কিন্তু সে সম্বন্ধ তোমার গেল কেন ?'

'সমস্তই গেল, সম্পত্তিই আর রইলো না, সেই সম্বন্ধ তবে আর থাকে কি করে ?' বিনয় আবার কষ্টে একটু হাসলো। বললে, 'আমি তো এখন গৃহহীন, আশ্রয়হীন পথের পথিক। চাল নেই, চুলো নেই, গাছতলাই আমার সম্বল। কে কার আধিপত্য নষ্ট করে—বলে হাসলেন একটু ভগবান। তাই তো বলছিলুম, উপোস করে যাকে হয়তো কাটাতে হবে, কিম্বা জন খেটে বড়জোর যাকে নূন দিয়ে শুধু মোটা ভাত খেতে হবে, তাকে এত সব থালা-বাটি সাজিয়ে খেতে দেয়া কেন ?'

'কে বললে তুমি গৃহহীন, কে বললে তোমার আধিপত্য নষ্ট হয়ে গেছে ?' দিগিন্দ্র জায়গা ছেড়ে উঠে বিনয়ের হাত ধরলেন, তাঁর মুখোমুখি তার জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় তাকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'কে বললে তোমাকে শুধু নূন দিয়ে মোটা ভাত খেতে হবে ?'

গভীর বিস্ময়ের মধ্যে থেকে বিনয় বললে, 'নিজের ছেলে হবার পর কি পোষ্য ছেলের আর কোনো অংশ বা স্বত্ব থাকে ?'

'কে বললে থাকে না ?'

'ব্রজনায়েব বললে, বাবার মৃত্যুর পর জমিদারি সম্পূর্ণ মাধবের ; আমি পোষ্য, আমি পরগাছা, সম্পত্তিতে আমার আর কোনো স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই—'

'নায়েব বললে !' দিগিন্দ্র হঠাৎ ঘর-দোর কাঁপিয়ে তুমুল অট্টহাস্য করে উঠলেন। বললেন, 'কেন, তোমার বাবা, ব্রজনারায়ণকে কিছু জিজ্ঞাসা করোনি ? না, তিনি বললেন, ব্রজের মতই আমার মত।' বলে তিনি আবার হেসে উঠলেন শব্দ করে।

বিনয়ের বুক কাঁপতে লাগলো। সে বললে, 'তবে—তবে আমার আছে নাকি কিছু স্বত্ব ?'

'আছে বৈ কি, নিশ্চয়ই আছে। তুমি ডাক্তারি পড়ছ, আইনের কিছুই জানো না এই ভেবে ধূর্ত ব্রজনায়েব তোমাকে একটা ধোঁকা দিতে চেয়েছে। ওর মতলবই হচ্ছে তোমাকে কোনোরকমে সরিয়ে দিয়ে

সম্পত্তিটি গ্রাস করা। তোমাকে বলে দিয়েছে যে তুমি পথের ভিখারী, কোনো অধিকারই তোমার আর নেই? কী হারামজাদা দেখেছ!' দিগিন্দ্র থালার দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, 'নাও, আরম্ভ করো। এ-সব কথা এখন থাক, খাওয়া-দাওয়ার পর আলোচনা হবে'খন। নইলে, উত্তেজিত হয়ে কিছুই তুমি খেতে পারবে না।'

'না, আমি খাচ্ছি।' বিনয়ের মুখে যেন স্বাদ আর স্পৃহা ফিরে এল, খেতে-খেতে বললে, 'আপনি বলুন, এই উত্তেজনা আমার ক্ষুধাকে সাহায্য করবে। বলুন, এই আবিষ্কারের পরেও কি আমি স্বত্ব দাবি করতে পারি? কত আমার অংশ এখন সম্পত্তিতে? তেমনি আট আনা?'

'না, এক-তৃতীয়াংশ, পাঁচ আনা চার পাই। বাকি দশ আনা আট পাই মাধবের। পোষ্য ছেলের থেকে সত্য ছেলের এই শুধু প্রায় তিন আনার তারতম্য হয়েছে বাঙলা দেশে।'

বিনয়ের উদ্দীপ্ত মন আবার কেমন নিস্তেজ হয়ে এল। মাধবের চেয়ে তার অংশ কম। সে বড়, সে জ্যেষ্ঠ, সে দাদা, তবু অধিকারে মাধবের চেয়ে সে ছোট, তার আসন তার মর্যাদা মাধবের চেয়ে নীচে। সে এক ঢোক জল খেল। বললে, 'পাঁচ আনা হোক তিন আনা হোক, কী হবে আমার সম্পত্তি দিয়ে? আমি সমস্ত মাধবকে দিয়ে দিলুম।'

দিগিন্দ্র এক পলকে বিনয়ের মনের ভিতরটা স্পষ্ট দেখে নিলেন। বললেন, 'সে তো ভালো কথা। কিন্তু মাধব আগে বুঝে নিতে শিখুক। এখনই যদি দিয়ে ফেল তবে তা আর কোনো দিন মাধবের হাতে পৌঁছুতে পাবে না, মাধবের বিষয়বুদ্ধি হবার আগেই তা ব্রজনায়েবের জঠরে গিয়ে প্রবেশ করবে। দিয়ে যে দেবে তোমার পাঁচ আনাই আগে রক্ষা করো। নইলে দেবে কী?'

বিনয় চুপ করে খেতে লাগলো। আবার যেন সে স্বাদ পেতে লাগলো খাবারে।

দিগিন্দ্র বললেন, 'আসল কি জানো? আসল হচ্ছে অধিকার, আধিপত্য। লাভের অঙ্কটা পাঁচ আনা কি পাঁচ পাই সেটা কিছু নয়, এক

পয়সাও যার অংশ আছে অধিকারের বেলায় তার সেই ষোল আনা। মাধবকে তুমি সব দিতে পারো তা মানি, কিন্তু দেবার মতো কিছু রাখতে হবে তো শেষ পর্যন্ত। কে জানে তোমাকে সরিয়ে ফেলে কী মতলব করেছে ব্রজনায়েব। যেটুকু বাধা ছিল তার স্বেচ্ছাচারের, সেটুকুও আর নেই। কোনো দুর্বল মুহূর্তে ব্রজনারায়ণকে দিয়ে সে নিজের অনুকূলে কোনো উইলই বা করিয়ে নেয় কিনা তার ঠিক কী।'

'অসম্ভব।' বিনয় মেরুদণ্ড সোজা করে বসলো। বললে, 'না, আমি ফিরে যাবো। আমার অধিকার যদি এখনো থাকে তা আমি ক্ষুণ্ণ হতে দেব না কিছুতেই।'

'নিশ্চয়ই না। এই তো পুরুষসিংহের মতো কথা।' দিগিন্দ্র গম্ভীর গলায় বললেন, 'ট্রেনে যদি আমি টিকিট কেটেই উঠেছি তবে কিছুতেই কোনো অত্যাচারেই আমার জায়গা ছাড়বো না আমি। সমাজ বা আইন আমাকে যেটুকু জায়গা দিয়েছে. তাই আমি আঁকড়ে থাকবো। কী সাধ্য ব্রজনায়েবের যে তোমাকে গায়ের জোরে ঠেলে সরিয়ে দেবে। তোমার প্রতিজ্ঞাটা ভুলে যাবার কোনোই কারণ হয়নি। নিজে ভোগ করবে বলেই হোক বা আর-কাউকে বিলিয়ে দেবে বলেই হোক পাঁচ আনা চার পাই অংশটা তোমার কম নয়।'

বিনয়ও গম্ভীর গলায় বললে, 'না, প্রতিজ্ঞাটা আমি আবার মনে-মনে আওড়ে নিচ্ছি।'

বাকি খাওয়াটা নিঃশব্দে শেষ হলো। দিগিন্দ্র সান্যালের সমস্ত রকমের উন্নতি-প্রচেষ্টার বাধা হচ্ছেন ঐ ব্রজলাল। তাঁকে উৎপাটিত করা চাই। কণ্টক দিয়ে কণ্টক তোলাই প্রশস্ত। খাওয়া-দাওয়ার পর বিনয়কে দিগিন্দ্র তার মন্ত্রণাকক্ষে নিয়ে এলেন। বললেন, 'একটা উপদেশ শুধু আমার মেনে চোলো—যদি কৃতকার্য হতে চাও। কখনো চঞ্চল বা অসহিষ্ণু বা উত্তেজিত হবে না। চুপচাপ থাকবে। দেখাবে কিছুই তুমি জানো না, কিছুই তুমি বোঝ না, তুমি অতি গোবেচারা। আর, নিঃশব্দে স্থিরলক্ষ্য হয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে যাবে।'

বড় কঠিন উপদেশ—বিনয় যেন বিশেষ উৎসাহিত হতে পারলো না।

কিন্তু উৎসাহিত হলো পরের কথাটা শুনে।

'এগিয়ে যাবে কোথায়? এগিয়ে যাবে ব্রজনায়েবকে উচ্ছেদ করতে। তার জন্যে কী চাই? চাই হাতে-নাতে প্রমাণ যে সে একজন প্রবঞ্চক, সে তোমার বাবাকে লুকিয়ে জমিদারিতে কামড় বসাচ্ছে। আমি দিতে পারি তার একটা প্রমাণ। আর জেনো, যতই না কেন চেঁচামেচি করো, কিছুতেই কিছু হবে না, তোমার বাবাকে লিখিত প্রমাণ দেখাতে হবে যে ব্রজনায়েব চোর। তবেই ব্রজনারায়ণ সত্যিকার বিজয়নারায়ণ হয়ে উঠবেন।'

'দিন, দেখান আমাকে সেই প্রমাণ।'

'চঞ্চল হবে না, অসহিষ্ণু হবে না, উত্তেজিত হবে না। তবে শোন—'

দিগিন্দ্র যা বললেন, ঘোরপ্যাঁচ বাঁচিয়ে সংক্ষেপে তা এই।

অশথতলা বলে বড়ো একটা মৌজা বা গ্রাম আছে। সেটার অংশ নিয়ে একটা মোকদ্দমা চলেছে দিগিন্দ্র আর বিজয়নারায়ণের মধ্যে। ওটার কতক অংশ আগে গিয়াসুদ্দিন বলে এক মুসলমান জমিদারের ছিল, বিজয়নারায়ণ তার কাছ থেকে সেটা কিনে নেন। বিজয়নারায়ণ তো আর তাঁর মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করেন না, করে সব ঐ ব্রজলাল, বিজয়নারায়ণ শুধু মামুলি দস্তখৎ করেই খালাস। এখন মামলায় বিজয়নারায়ণের পক্ষে এই বলে জবাব দেয়া হয়েছে যে গিয়াসুদ্দিনের থেকে সম্পত্তি খরিদ করেছিল সে নিজে নয়, তার নায়েব ব্রজলাল। অর্থাৎ টাকাটা হলো বিজয়নারায়ণের অথচ সম্পত্তির মালিক হলেন ব্রজলাল।

'এতদূর?' বিনয়ের চোয়ালের রেখাদুটো দৃঢ় হয়ে ফুটে উঠলো।

'তোমার বাবা নিশ্চয়ই জানেন না তোমার নায়েবের এই কীর্তি। তুমি যদি তাঁকে মুখে গিয়ে বলো এ-কথা, তিনি কক্ষনো তা বিশ্বাস করবেন না।'

'কখনো না। এমন মোহান্ধ তিনি।' বিনয় সায় দিল।

'তাঁকে লিখিত প্রমাণ দিতে হবে।'

'পাবো কোথায়?'

'আমি সন্ধান বলে দিচ্ছি।' দিগিন্দ্র বড়মন্ত্রীর মতো সাবহিত হয়ে বসে নিম্ন কণ্ঠে বললেন, 'দলিলপত্র সব ব্রজলালের জিম্মাতেই তো থাকে ?'

'হ্যাঁ, স্ট্রং-রুমে, ফায়ার-প্রুফ ক্যাবিনেটে। ডবল তালা-দেয়া! চাবিগুলি প্রায় হাতুড়ির মতো দেখতে। সে-ঘরে ঢুকে দলিল বেছে উদ্ধার করে নিয়ে আসা সম্ভব হবে না।'

'তা হবে না আমি জানি। কিন্তু সেই দলিল আসছে-সোমবার ব্রজলাল সেই ঘর থেকে বের করে আনবে। আসছে-সোমবার সেই দলিল আদালতে দাখিল করবার শেষ দিন। দলিল দাখিল করতে ব্রজলাল আর নিজে সদরে যাবে না, আর কোনো তদবিরকারকে পাঠিয়ে দেবে। তুমি একটু তক্কে-তক্কে থেকে সেই তদবিরকারের থেকে সেটা উদ্ধার করে নেবে। ঐ শুধু সুযোগ, নইলে আদালতে একবার আসল দলিল দাখিল হয়ে গেলে তা আর পাওয়া যাবে না। পারবে কি বাগাতে ?'

'নিশ্চয়ই পারবো। মামলার তদবিরের ভার মামলা-সেরেস্তার মুহুরি কালীপদর উপর। ছলে না পারি, বলে ছিনিয়ে নেব সে-দলিল। আপনি কিছু ভাববেন না।'

দিগিন্দ্র উৎসাহব্যঞ্জক হাসি হাসলেন। দলিলখানা নিয়ে সম্প্রতি তিনি খুবই ভাবনায় পড়েছেন।

নয়

কারুর কাছেই কোনো সদুত্তর মাধব সংগ্রহ করতে পারেনি—তার দাদা কোথায়। মা মুখ বেঁকিয়ে বলেছেন, জানি না, বাবা শুধু বলেছেন, ফিরে আসবে। যাওয়ার জায়গাই যদি অজানা তবে ফিরে আসার ভরসা কী! মাধব রমুকে পাঠিয়ে দিল কাচারি-বাড়িতে খোঁজ করতে। রমু ফিরে এসে বললে, 'নায়েববাবু বলে দিলেন বড়দাদাবাবুর কলেজ খুলতেই কোলকাতায় চলে গেছেন।'

মাধব বিজ্ঞের মতো হাসলো। ছুটি-ছাটাতে দাদা এলেই প্রথমে মাধব

নিজেকে প্রস্তুত করে রাখবার জন্তে দাদাকে জিগগেস করে রাখে সে যাবে কবে। তারিখটা যদিও তার মনে থাকে না, বারটা তার কঠিন লাগে না একটুও। এবার দাদা বলে রেখেছে মঙ্গলবার যাবে। আজ কী বার?

'আজ কী বার, রমু?'

'বার?' হাঁ করে চোখ কপালে তুলে রমু অনেকক্ষণ ভাবলো, পরে বললে, 'দাঁড়াও কাচারি-বাড়ি থেকে জিগগেস করে আসি।' এবং এক ছুটে জেনে এসে সে বললে, 'শুক্কুরবার।'

'তবে বলে দাও নায়েববাবুকে, দাদা যায়নি কোলকাতায়। আমাল ছঙ্গে দেখা না কোলে সে যেতে পারে?' মাধব একটা বীরত্বের ভঙ্গি করলো।

সে যাই বলুক, মাধব জানে দাদা কোথায়! কিন্তু মার আজকে বড়ো কড়া পাহারা। ঘর থেকে বারান্দায় বেরুনো পর্যন্ত তার আজ বারণ।

অগত্যা সে জানলা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পথের দিকে চেয়ে কতক্ষণে তার দাদা ফিরে আসে। সন্ধ্যায় চারদিক ঘোর-ঘোর হয়ে আসছে তবু দাদার দেখা নেই। দাদা আজ বাড়ি না ফিরলে সে খাবে কি করে, ঘুমুবে কি করে? আর, সব চেয়ে তার এই ভেবে আশ্চর্য লাগছে, দাদার জন্তে সে যত ভাবছে মা কেন তত ভাবছে না? মা কেন দাদার পথ চেয়ে এমনি জানলা ধরে বসছে না, কেন দিকে-দিকে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছে না খুঁজতে। দাদা যে সমস্ত দিন কিছু খায়নি তা কি মার খেয়াল নেই?

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল সে স্থিরচক্ষে সমুখের পথের দিকে চেয়ে, হঠাৎ পিছন থেকে দুহাতে কে মাধবের চোখ চেপে ধরলো।

মাধব পুলকিত হয়ে উঠলো। চোখের উপরকার হাতদুটো সে চেপে ধরে আগন্তুককে জিগগেস করলে, 'বলো তো আমাল নাম কী?'

'আর অমনি তুমি আমার গলার আওয়াজ শুনে চিনে নাও, আমি কে। কেন, চোখের উপর হাতের ছোঁয়া দেখে বুঝতে পারো না?' বলে চোখ ছেড়ে দিয়ে বিনয় হাসতে লাগলো।

ঢেউয়ের মতো মাধব ঝাঁপিয়ে পড়লো বিনয়ের বুকের উপর। বিনয়ের কাঁধের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে বললে, 'আমি তোমার জন্তে কানছিলুম, দাদা।'

তার পিঠে ও মাথায় সস্নেহে হাত বুলুতে-বুলুতে বিনয় বললে, 'কাঁদছিলে ? কেন ?'

'তুমি রাগ করেছ কেন ?'

'রাগ করেছি ? কার উপর রাগ করবো ?'

'আমার উপর !' বলে মাধব তেমনি মুখ লুকিয়ে হাসতে লাগলো যেন খুব একটা মজার কথা বলেছে।

শিশুর মুখের এই আজগুবি কথার কোনো অর্থ আছে কিনা তাই বোধ-হয় বিনয় একটু নীরবে চিন্তা করছিলো, এমন সময় কোথা থেকে সেখানে সুনয়নী ছুটে এলেন। যেন কী-একটা হঠাৎ ভয় পেয়েছেন এমনি তার চেহারা।

সত্যিই, অসম্ভব ভয় পেয়েছেন তিনি। বিনয় ফিরে এসেছে বলে নয়, বিনয় মাধবকে জাড়িয়ে ধরেছে বলে। এখনো যে বিনয় মাধবকে সত্যিকার স্নেহ করতে পারে এ-কথা সুনয়নী আর বিশ্বাস করতে পারেন না। বিনয় জেনে গেছে তার স্বরূপ, জেনে গেছে তার স্থান, আর সর্বোপরি, জেনে গেছে যে মাধবের আবির্ভাবটা তার জীবনে একটা কদর্য অভিশাপ। মাধবের প্রতি তার মন আর কিছুতেই প্রসন্ন থাকতে পারে না—মাধব তার আজ সব চেয়ে বড় শত্রু। এই মনোভাব নিয়েই সুনয়নী দেখলেন এখন বিনয়কে, এবং দেখে একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর একটা উদ্ভট উপমা মনে হলো। মনে হলো ধৃতরাষ্ট্র যেন লৌহভীম জড়িয়ে ধরেছে।'

বিনয় বললে, 'করেছিই তো। তুমি আমার কাছে আসো না কেন ?'

'আসতে হবে না কাছে। ছেড়ে দাও।' কোত্থেকে পাগলের মতো ছুটে এসে সুনয়নী মাধবকে বিনয়ের বুক থেকে এক ঝটকায় ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন।

এর চেয়ে ভূমিকম্পে বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়লেও যেন বিশ্বাস করা সহজ ছিল। বিনয় অসাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। শুধু বলতে পারলো : 'এর মানে ?'

'এর মানে অত্যন্ত স্পষ্ট।' সুনয়নী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন : 'আনন্দময়ীর

খুইয়ে যখন এ-বাড়িতেই ফের ফিরে এসেছ দুটো ভাতের জন্যে, তখন নিজের জায়গাতেই থেকো, তার উপরে আর উঠতে চেয়ো না। ওর তুমি যাই হও, মাধবের তুমি কেউ নও, সেটা মনে রেখো, তাই আত্মীয়তা দেখাতে অত কাছে ঘেঁষে এসো না।'

বিনয়ের ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো থরথর করে। কিন্তু দিগিন্দ্র সান্যালের কথাটা তার মনে পড়ে গেল—চঞ্চল হবে না, অসহিষ্ণু হবে না, উত্তেজিত হবে না। সে তাই আর একটিও কথা না বলে কারু দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

'দাদা—আমি দাদাল কাছে যাবো।' বিনয়ের যাওয়ার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে মাধব আর্তনাদ করে উঠলো।

সুনয়নী তাকে কী করে বোঝাবেন যে যাকে সে দাদা বলছে আসলে সে একটা ডাকাত—তার বুকের নিচে রয়েছে ছোরা, তার নিশ্বাসে রয়েছে বিষ, তার দৃষ্টিতে রয়েছে অভিশাপ। কী করে বোঝাবেন যে সে তার দাদা নয়।

প্রথমে ধমক, পরে প্রহার—তবু মাধবের কান্না দ্বিগুণতর হয়ে ওঠে—'আমি দাদাল কাছে যাবো। দাদাগো, আমাকে নিয়ে যাও—'

অগত্যা সুনয়নী দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

বিনয় চঞ্চল হলো না, অসহিষ্ণু হলো না, শুধু নিজের ঘরে এসে অন্ধকারে একটা চেয়ারের উপর চুপচাপ বসে রইলো।

এই চুপচাপই সে থেকে গেল এর পর থেকে। সমস্ত দিনরাত সে তার ঘরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে থাকে, পড়াশোনা করে, কখনো বা পড়ে-পড়ে ঘুমোয়, সংসারের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে দু'বেলা সময়মত দুটো খেয়ে আসে। নইলে সে কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই—কোথায় কার পাকা ধানে মই পড়লো বা কে জলের অভাবে কাদা চেটে খাচ্ছে, কিছুতেই তার আর কিছু আসে যায় না। সে আর এখন ভাবুক নয়, সে এখন বুদ্ধিমান।

ব্রজলাল টিপ্পনি কাটলেন : 'বাছাধন এখন একেবারে ঢিট হয়ে গেছে। মুখে আর রা-টি নেই। এতদিনে বুঝতে পেরেছেন কত ধানে কত চাল।'

এর মধ্যে বিনয় একদিন শুধু ব্রজনারায়ণের সঙ্গে একটু কথা বলেছিল, ব্রজনারায়ণ যখন স্নানের আগে তেল মাখাচ্ছিলেন।

'আচ্ছা বাবা, অশথতলা মৌজায় আমাদের অংশ আছে?' বিনয় জিগগেস করলো।

'আছে বৈ কি।'

'আছে? কত?'

'ছ' আনা পাঁচ গণ্ডা।'

'ও-অংশটা কি আমাদের মৌরসী?'

'না। ওটা আমি কিনেছিলুম গিয়াসুদ্দিন না রইসুদ্দিন পাটোয়ারের কাছে। নামটা আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু হঠাৎ তোমার আর-সব ছেড়ে এই অশথতলা সম্বন্ধে কৌতূহল হলো?'

'এমনি। গ্রামের নামটা ভারি সুন্দর।' বিনয় দুর্বলভাবে একটু হাসলো।

এই মলিন হাসিটুকুতে বিজয়নারায়ণও যেন খানিক দুর্বল বোধ করলেন। সুনয়নী যাই বলুক, স্নেহ তুমি জোর করে সরিয়ে ফেললেও কর্তব্যকে, ধর্মকে সরাবে কি করে? এই একটা নিঃস্ব শিশুকে এ-সংসারে নিয়ে এসেছিলে কিসের অঙ্গীকারে? তার ভবিষ্যৎটা শূন্যময় করে দেবার জন্যে নয়। শিশু-বিনয়কে নিয়ে সুনয়নী একদিন কত মাতামাতিই না করেছেন, কত সাজানো-গোছানো, কত আদর-অভিমান—কিছুরই যেন কোথায় শেষ ছিল না। শুধু সংসার ভরে ওঠেনি, সুনয়নীর হৃদয় উঠেছিল ভরে। কিন্তু আশ্চর্য মায়ের মন! যেই সে পেয়ে গেল তার নিজের সন্তান, আপনার হৃদয়ের রক্ত দিয়ে গড়া, অমনি তার মন পরের সন্তানের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠলো। অমনি সে এক নিমেষে বুঝে নিল বিনয় পর, বিনয় মেকী, বিনয় বাজে। তার এতদিনের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ালো একটা বিভীষিকা। মাধবের জন্মাবার পর যতদিন বিনয় জানতো না তার আসল পরিচয়, ততদিন সে মার থেকে দূরে-দূরে থাকলেও এমন যেন ঘৃণ্য, পরিত্যজ্য ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে সে কে, অমনি সে তার এতদিনের স্নেহদাত্রী মার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে শত্রু, শাবক-রক্ষিণী পক্ষিনীর কাছে শিকারসন্ধানী

ব্যাধের মতো। মাধবকে সে তার দৃষ্টির বাইরে নিয়ে গিয়েই শান্তি পাচ্ছে না—সে চায় এখন বিনয়কেই সবাইর দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে। বিজয়নারায়ণের মন ম্লান বোধ করতে লাগলো। একদিনের মা যে অন্য-দিনে ডা'ন হয়ে যেতে পারে চোখের উপর না দেখলে তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না। নিজে তিনি যতই দুর্বল হোন বা অলস বা ব্যক্তিত্বহীন হোন মনের দিক থেকে তিনি বিনয়ে-মাধবে এক আনারও তফাৎ করতে পারছেন না। বরং সংসারে বিনয় এখন অনাকাঙ্ক্ষিত বলেই যেন তার প্রতি তাঁর বেশি করুণা।

সোমবার সকালবেলা আবার বিনয়কে একটু কর্মতৎপর দেখা গেল। নেমে এল সে কালীপদ মুহুরির ঘরে।

'এত সকালে স্নান করেছেন? যাচ্ছেন নাকি কোথাও?' বিনয় কালীপদ মুহুরিকে জিগগেস করলে গায়ে পড়ে।

কালীপদ পরম আপ্যায়িত হয়ে বললে, 'হ্যাঁ, সকালের ট্রেনে সদরে যাচ্ছি। মামলা আছে একটা।'

যেন কিছুই জানে না এমনি মুখে বিনয় বললে, 'কার মামলা?'

'আপনাদের। শোভনডাঙার দিগিন্দ্র সান্যালের সঙ্গে।'

'তা আপনি যাচ্ছেন কেন? আপনি কি আমাদের উকিল নাকি?'

কালীপদ হাসলো। বললে, 'মোকদ্দমায় কতগুলি দলিল দাখিল করবার জন্যে আমাকে যেতে হবে।'

'ও! সেগুলি খুব বড় একটা বোঝা হবে নাকি? বাক্সে করে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'না, বোঝা কোথায়? ছোট্ট একটা পুঁটলি শুধু।'

'কই দেখি। দেখি, আপনার অসুবিধা হবে কিনা।'

'ঐ তো—' কালীপদ সামনের টেবিলের উপর লাল সালু দিয়ে মোড়া ছোট একটা পুঁটলি দেখালো। বললে, 'কেন বলুন দেখি?'

'দেখলাম ওটার সঙ্গে আরো মাল আপনার উপর চাপানো ঠিক হবে কিনা। সদরে আমার কলেজের একজন বন্ধু আছে, কামাখ্যা মোক্তারের

ছেলে। তার কাছে কয়েকখানা বই আপনি পৌঁছে দিতে পারবেন? আর একটা চিঠি।'

'স্বচ্ছন্দে। এ আবার এমন কী মাল।' কালীপদ আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে হাসলো। বললে, 'আপনি তবে পাঠিয়ে দিন যা দেবেন। আমি খেয়ে আসি ততক্ষণ।' বলে সে ডেকে উঠলো: 'বংশ, বংশধর।'

দরজার কাছে চাকর-মতন একটা ছোকরা বসে ছিল, সে খাড়া হলো সেই ডাকে।

কালীপদ বললে, 'দরজা-জানলাগুলো বন্ধ কর। বন্ধ করে বাবুর ঘর থেকে বইগুলি নিয়ে আয়।'

'দরজা আপনি বন্ধ করে যান নাকি খেতে? কোনো দরকার নেই বন্ধ করার, আমিই আছি এখানে বসে। বই আর পাঠাবো না ভাবছি। এক-খানা চিঠিই শুধু লিখে দিই। দোয়াত-কলম তো সামনেই আছে, আমাকে একটু শুধু কাগজ দিন দয়া করে। চিঠিটা আমি এখানেই বসে লিখছি। আপনি ততক্ষণ খেয়ে আসুন।'

'ও বংশ, আলমারি খুলে এক তা কাগজ বের করে দে বাবুকে।' টেড়িটাকে ঠিক কায়দায় আনবার চেষ্টা করতে-করতে কালীপদ বললে।

কাগজ পেয়ে বিনয় দীর্ঘ এক চিঠি ফাঁদলো, আর অসন্দিগ্ধ কালীপদ দলিলের বাণ্ডিলটা ডেস্কের উপর ফেলে রেখেই খেতে চলে গেল ভিতরে।

বিনয় আর এক মুহূর্তও দেরি করলো না। ত্রস্ত চোখে চাইলো একবার চারদিকে। নেই, কেউ নেই কোথাও। চোখের পলকের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দলিলের বাণ্ডিলটা সে তুলে নিল আর নিশ্বাসপতনের আগে ঘর থেকে গেল বেরিয়ে।

একেবারে সোজা তার ঘরে, দোতলায়। কোথায় রাখবে সেটা লুকিয়ে ঘরের চারদিকে সে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। যেখানে চোখ যাবার সম্ভাবনা খুব কম, রাখলো সে সেটা তার টেবিলের নীচেকার ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেটের জঞ্জালের মধ্যে। আর, কতক্ষণের জন্যেই বা! বাধা বন্ধুবান্ধবদের

নিয়ে পাশা খেলছেন, খেলাটা একটু মন্দা পড়লেই দলিলের বাণ্ডিলটা সে তাঁর হাতে তুলে দেবে, মুহূর্তে ব্রজলালের বেরিয়ে পড়বে সব জারিজুরি। বিনয় দেখে আসতে গেল খেলাটার এখন কী অবস্থা—আর দেরি কত! দরজা দিয়ে উঁকি মেরে যেটুকু সে দেখলো ও বুঝলো তাতে তার বিশেষ উৎসাহ হলো না—খেলোয়াড়দের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গায়ে তেল মাখাবার সময় ছাড়া তাঁর আজ মোলাকাত পাবার সম্ভাবনা নেই। বিনয় ভাবলো, দলিলের বাণ্ডিলটা সঙ্গে নিয়ে বাইসিকেলে করে কোথাও বেরিয়ে পড়াই সঙ্গত—একেবারে শোভনডাঙায়, দিগিন্দ্র সান্যালের বাড়িতে। কে জানে, রাস্তায় ব্রজলাল বা তার দলের কেউ তাকে মারধোর করে তার কাছ থেকে দলিল ছিনিয়ে নেবে হয়তো। তার চেয়ে, বাড়ির ভিতর, আবর্জনার ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখাটাই নিরাপদ। কোনো গোলমাল হয়, চারদিকে জানাজানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। ঐ ঝুড়ির চেয়েও আরো নিরাপদ জায়গা কী হতে পারে তাই ভাবতে-ভাবতে বিনয় তার ঘরে ফিরে এল। স্বভাবতই, ঝুড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করতে গেল সে দলিলের বাণ্ডিলটা, কিন্তু, কী ভয়ঙ্কর, পুরো পাঁচ মিনিটও হয়নি, এরি মধ্যে দলিলের বাণ্ডিল অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বিনয় জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলো ছাতা মাথায় দিয়ে কালীপদ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কালীপদ দলিল ফেলে রেখে যাচ্ছে না নিশ্চয়ই।

উন্মাদের মতো বিনয় নিচে নেমে এল। ফটক খুলে বেরুতে যাবে ব্রজলালই তাকে ধরে ফেললেন। বললেন, 'যাচ্ছ কোথায়?'

ব্রজলালের মুখের দিকে চেয়ে কী বলছে কিছু বুঝতে না পেরে বিনয় বললে, 'কালীপদ দলিল পেয়ে গেছে?'

'পেয়ে গেছে বৈকি।'

'পেলো কী করে?'

'পেলো কি করে?' ব্রজলাল বিকট গলায় হেসে উঠলেন। বললেন, 'তুমি ভাবো দিগিন্দ্র সান্যালেরই বংশী আছে, আর আমার বংশ নেই? তোমার জন্যে দু'চারটে স্পাই আমাকেও রাখতে হয়।'

বিনয় ব্রজলালের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। পরে আস্তে-আস্তে ফ্যাকাসে মুখে বাড়ির দিকে ফিরে চললো।

দশ

মাধব—মাধব—সবখানেই মাধব। সব কিছুই মাধবের। চাকর-বাকর, পাইক-পেয়াদা—সব মাধবের জন্যে খাটছে। বাজার আসছে মাধবের জন্যে। ঠাকুরবাড়ি পূজো হচ্ছে মাধবের কল্যাণে। সংসারে যে এত আনন্দ-কোলাহল সব মাধবের উদ্দেশে। তুমি কে? তুমি কেউ নও। এটায় হাত দিও না, এটা মাধবের। এটায় দাঁত বসাতে চেয়ো না, মাধবের ভাগে কম পড়ে যাবে। মাধব আগে খেয়ে নিক, তারপর তার পাতে যদি উচ্ছিষ্ট কিছু থাকে, তবে তোমার। সমস্ত সংসারে এটাই এখন উচ্চ ভাষায় বিঘোষিত।

এমন অবান্তর, অবাঞ্ছিতের জন্যেও আইন কিছু অংশ রেখেছে এটাই সুনয়নীর মর্মশূল। অংশ যদিও কিছু পাও, আশ্রয় পাবে না, পাবে না আর মা, পাবে না আর ভাই, কোনো দিন না। বিনয় যখন ছুটির শেষে কোলকাতায় চলে আসে তখন বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মা সামনে আসেন নি পদধূলি দিতে, মাধবকে দেখতে পায়নি সে যাবার পথের দিকে জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে। সম্পূর্ণ পরের ছেলে হয়ে কেন সে মাধবের বাপের সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে এটাই সুনয়নীর অসহ্য। তাই এতদিন বাইরেই ছিল ব্রজলাল, এখন অন্তঃপুরে এল সুনয়নী।

বিনয়ের সমস্ত চিন্তার মোড় একেবারে ঘুরে গেল, যখন কোলকাতায় তার নামে এবার মনি-অর্ডার এলো কুড়ি টাকা কম। টানাটানির বছর বলে কুড়ি টাকা কম পাঠিয়েছে শুনলে বিনয় ব্যস্ত হতো না, কেননা যে টাকা আসে তার থেকে কুড়ি টাকা কম পড়লে তার দুদিনের রেস্টোর‍্যান্ট বা সিনেমাই যা বাদ পড়তো। কিন্তু সুনয়নী যুক্তি যা দেখিয়েছেন তা

অসাধারণ। লিখেছেন, মাধবকে বর্ণপরিচয় পড়াবার জন্যে মাস্টার চাই। জমিদার-বাড়ির মর্যাদা রেখে মাইনে দিতে গেলে কুড়ি টাকার কম দেয়া যায় না। অতএব সেই কুড়ি টাকা বিনয়কেই জরিমানা দিতে হবে।

এবার বিনয় নিজের অন্তরকে প্রথম জিগগেস করলো : কে মাধব ?

এবং তখন থেকে একই প্রশ্ন তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে।

কে অবান্তর—সে না মাধব ? কে আকস্মিক ? কে অকারণ ? সে মাধবের জীবনে রাহু না তার জীবনে রাহু ঐ মাধব ? কে কার সর্বনাশ করেছে ? সে মাধবের, না মাধব তার ?

যদি মাধব না আসতো এ পৃথিবীতে ! তা হলে সে এক চুলও নড়ে বসতো না। সুনয়নীর চোখেও জ্বলে উঠতো না এই হিংসার আগুন। সব তার ঠিক-ঠিক বজায় থাকতো। তার বাবা, তার মা, তার নায়েব-গোমস্তা —তার ভূসম্পত্তি। থাকতো সে একেশ্বর, একচ্ছত্র। থাকতো তার অপ্রতিহত গতি, অনমনীয় প্রভুত্ব। সমস্ত সংসারে চলতো তার স্বেচ্ছাতন্ত্র। কিন্তু কোত্থেকে পুঁচকে একটা শিশু এসে সমস্ত তছনছ ওলোট-পালোট করে দিল। বসেছিল সে সিংহাসনে, এখন আর কার প্রবেশে জায়গা ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো। ক্রমশ সে বিতাড়িত হয়ে চলেছে বাইরে, পথে, গাছের তলায়। কী দুর্ধর্ষ শক্তি ঐ শিশুটার। তার এতদিনের মা আর তার মা রইলো না, বাবা মুখ ফিরিয়ে রইলেন, আমলা-মুহুরিরা নীরবে অবজ্ঞা করতে লাগলো। কার—কার জন্যে তার এই ক্ষতি—এই অধঃপতন ?

বিনয় ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলো।

কিন্তু মাধব—মাধব যদি আর না থাকে।

সহসা বিনয়ের বুকের মধ্যখানটা যেন কে মুঠি চেপে ধরলো, মেরুদণ্ড বেয়ে উঠে গেল সূঁচের মতো তীক্ষ্ণ একটা ঠাণ্ডা স্রোত। তার টেবিলের উপর সাজানো মড়ার মাথার খুলিটা দুই শূন্য চক্ষুকোটর থেকে তার দিকে চেয়ে রইলো।

দিগিন্দ্র সান্যালের একটা কথা বারে-বারেই তার মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরতে লাগলো : ঐ তো এক রতি একটা খুদে শিশু, তার জীবনের

মূল্য কী, ভরসা বা কোথায় ? কে বলতে পারে একদিন তোমার পাঁচ আনা চার পাই অংশ ফের ষোল আনা হয়ে উঠবে না ?

কেউ বলতে পারে না। একদিক থেকে দেখলে সংসারে বিচিত্র যেমন কিছু নেই, আবার আরেক দিক থেকে দেখলে সংসারে সব কিছুই বিচিত্র।

আচ্ছা, ধরো, এমনিতে স্বাভাবিক নিয়মেই যদি মাধব মরে যায়! কী হয় তবে ? বিনয়ের হঠাৎ যেন হাঁপ ধরে গেল, ক্ষণকালের জন্য। ক্ষণকাল—সমস্ত কিছুই ক্ষণকালীন! মাধবের জন্যে, তার শৈশব তার সারল্য তার অসহায়তার কথা ভেবে তার দুঃখ হবে বটে, কিন্তু একদিক থেকে সুখও হবে প্রচুর। তার পাঁচ আনা চার পাই ফের ষোল আনা হয়ে উঠবে বলে নয়, ব্রজনায়েবকে কান ধরে ওঠ বোস করাবে বলে নয়, বংশধরকে বাঁশডলা দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে বলে নয়, সুনয়নীর সমস্ত গর্ব চূর্ণ হয়ে যাবে বলে, তাঁর মেঘলোকের রঙীন স্বপ্নপ্রাসাদ ঝড়ের ফুঁয়ে উড়ে যাবে বলে। সে একটা কী উল্লাস, হৃতসর্বস্ব সুনয়নী শোকাকুল চোখে অতি দীন ভাবে তার কাছে এসে হাত পেতে দাঁড়াবেন। আর, প্রচ্ছন্ন গর্ব ও উদারতার ভাব নিয়ে বিনয় বলবে, 'তোমাকে কি মা আমি ফেলতে পারি ?'

টেবিলের উপরকার মড়ার হাড়গুলি নিয়ে বিনয় নাড়াচাড়া করতে লাগলো। তার মনে হলো, সব মানুষই তো আর স্বাভাবিক নিয়মে মরে না। মরে অপঘাতে, মোটর চাপা পড়ে, ট্রেন-কলিশনে, স্টিমার-ডুবি হয়ে। আরো কত ভয়ঙ্কর আকৃতি নিয়ে মৃত্যু এসে দেখা দেয়। সেই কবে কে কার শরীরে শুধু একটা ইনজেকশানের স্ুঁচের ডগা ফুটিয়ে মেরে ফেলেছিলো। মাধব যে স্বাভাবিক নিয়মে রোগে ভুগেই মরবে তার ঠিক কি!

বিনয় আজকাল আর কলেজে যায় না, দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকে। যদিও বা বাইরে কখনো সে যায়, বাছাই-করা দু'-একজন বয়স্ক ডাক্তারের সঙ্গে সে আড্ডা দেয়, পরামর্শ করে। সে জমিদারের ছেলে এই আকর্ষণে বাছাই-করা বয়স্ক ডাক্তাররাও তার সঙ্গে মিশতে কুণ্ঠিত হয় না।

কিছু দিন যেতে-না-যেতেই বিনয়ের নামে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির : মাধব মারাত্মক অসুস্থ, শিগগির চলে এসো।

খবরটা পেয়ে কোথায় বিনয়ের শোক উথলে-উঠবে, তার বদলে কেমন-যেন একটা ভয় করতে লাগলো।

বিনয়কে খবর পাঠাতে হবে তাতে সুনয়নীর প্রথমে সমর্থন ছিল না, কিন্তু সদর-থেকে-আনা সরকারী বড়-ডাক্তার যখন বললেন, 'ছেলেটা এমন দাদা-দাদা করছে, দিন না ওর দাদাকে টেলি করে। কী এমন পড়ার ক্ষতি হবে! আগে ভাই না আগে পড়া!' তখনই সুনয়নী টেলি করতে বললেন ব্রজনায়েবকে। বড়-ডাক্তার আরো বললেন, 'রোগ যে কী এখনো ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, কে জানে হয়তো দাদাকে পেয়ে ভালোর দিকে মোড় ফিরবে।'

প্রথম ট্রেনেই বিনয় মোহনপুরে ফিরে এল, এবং বাড়িতে পৌঁছেই প্রথম মাধবের বিছানায়। বললে, 'মাধব, আমি এসেছি, আমি দাদা।'

যে-ছেলে এতদিন ধরে জ্বরে বেহুঁস, চোখ মেলেনি শত ডাকেও, সে হঠাৎ এক ঝাঁকুনিতে বিছানার উপর উঠে বসলো, লজ্জিত আনন্দে যেন-বা একটু হাসলো আর দুই হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে দাদার বুকে। বিনয় তাকে সস্নেহে অথচ নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো।

সুনয়নী আজ তাঁর বাহুতে এমন শক্তি পেলেন না যে বিনয়ের বুকের থেকে মাধবকে কেড়ে নেন। শুধু বললেন, 'খোকাকে আস্তে-আস্তে বিছানায় শুইয়ে দাও।'

মাধবকে বিনয় শুইয়ে দিল বটে কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে নিতে পারলো না। দেখলো তার জামার গলাটা মাধব এক হাতে আঁকড়ে ধরে আছে। বলছে, 'বলো, আমাকে না বলে চলে যাবে না? বলো, যখন যাবে আমাকে আদর করে যাবে?'

বিনয় প্রতিশ্রুতি দিল, তবে মাধব জামা ছাড়লো।

বড়-ডাক্তার এসে ভারি খুসি হলেন। বললেন, 'বাঃ, দাদাকে পেয়েই অসুখ সেরে গেছে দেখছি।'

মাধব হাসলো—লজ্জায় ও আনন্দে মেশানো সেই হাসি।

মাধবের অবস্থার অনেক উন্নতি হলেও রোগ কিছুতেই নির্মূল হচ্ছে না,

গা থেকে জ্বর যাচ্ছে না মুছে। এখন সে বিছানায় উঠে বসে, কখনো-কখনো স্বাভাবিক দৌরাত্ম্যবশে খাট থেকে নেমে পড়ে, একটু-একটু হেঁটে বেড়ায়— কিন্তু আসল রোগের এখনো বিনাশ হচ্ছে না বলে শেষ পর্যন্ত বিছানায়ই ফের ফিরে আসতে হয়। কোথায় যে রোগ বাসা বেঁধে আছে তার সন্ধান নেই।

রোগ যখন সারবার হয় সারবে, কিন্তু মাধব যে দাদাকে সমস্তক্ষণের জন্যে সাথী পেয়েছে তাতেই তার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু তার ততখানি বাড়াবাড়ি সুনয়নী বরদাস্ত করতে পারেন না। দাদা ছাড়া কারু হাতে সে পথ্য খাবে না, দাদা তাকে ধরে না থাকলে ডাক্তারের হাতে সে ইনজেকশান নেবে না, দাদা শিয়রে বসে চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে গল্প না বললে ঘুমুবে না সে কিছুতেই। বিনয়ের ঘর ছিল কত দূরে, তাকে টেনে নিয়ে এসেছে সে পাশের ঘরে—আর ছু' ঘরের মাঝখানে দরজা রেখেছে খোলা। পাশের ঘরে দাদা শুয়ে আছে এই মাধবের অনেকখানি সাহস।

'কিন্তু দাদাকে পড়তে যেতে হবে না কোলকাতায়?' সুনয়নী বলে ওঠেন: 'ও কি এইখানেই থাকবে নাকি? ওর কলেজ নেই?'

বিনয়ের এখানে কলেজ কামাই করে বসে থাকাতে যে ক্ষতি হচ্ছে তাতে সুনয়নীর বিশেষ মাথা-ব্যথা ছিল না কিন্তু দিনে-দিনেই দাদার প্রতি মাধবের আসক্তি ও আনুগত্য গভীর হয়ে উঠছে তাতেই তিনি ভয় পাচ্ছেন।

সমস্যাটা মাধব এক কথায় জল করে দিল। বললে, 'চলো না সবাই আমরা কোলকাতায় যাই।'

বিজয়নারায়ণ কথাটা পাড়লেন বড়-ডাক্তারের কাছে। বড়-ডাক্তার সায় দিলেন না। বললেন, 'কী দরকার! জ্বর তো এখন আরো কম উঠছে, থাকছেও কম সময়। কোলকাতায় যাওয়া অর্থ চিকিৎসা-মহাসমুদ্রে নেমে খাবি খাওয়া।'

তাই বিনয় শিগগিরই ফিরে যাবে, ছু'চার দিনের মধ্যে। আরেকটু— আরেকটু—মাধব ভালো হলেই। কতটুকু ভালো হলে, সে ঠিক করতে পারে না। কেবল দিন খোঁজে।

এক দিন মাধব বললে, 'তুমি যাবে কোলকাতা, দাদা ? যাও, কিন্তু যাবার সময় আমাকে খুব আদর করে যাবে, কেমন ? আর আমাকে চিঠি লিখবে ।'

বিনয় বললে, 'না, এখন না। তুমি আরো একটু ভালো হও।'

সে যে কতটুকু ভালো সে বুঝে উঠতে পারে না।

বড়-ডাক্তার এখন আর নিয়মিত আসেন না, তাঁর সহকারী আসেন। সদর থেকে মোহনপুর তিনখানা ট্রেন যাতায়াত করে, রাস্তাও দূরের নয়, আর দক্ষিণা সম্বন্ধে দাক্ষিণ্য যেখানে অবারিত, সেখানে ডাক্তারের কোনো পরিশ্রমই গায়ে মাখবার নয়।

সপ্তাহে এখন দু'দিন করে ইনজেকশান চলছে। এরি একদিন সহকারী-ডাক্তার বললেন, 'পরের দিন আমি আসতে পারবো না, আমার ভাগ্নীর বিয়ে, না গেলেই নয়।' পরে হঠাৎ বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি পারবেন না একটা হাফ সি-সি দিয়ে দিতে ?'

'স্বচ্ছন্দে।' বিনয় বললে।

'কেন, আপনি আর-কোনো ডাক্তার না-হয় সদর থেকে পাঠিয়ে দেবেন।' সুনয়নী প্রতিবাদ করে উঠলো।

কিন্তু মাধবের প্রতিবাদটা বেশি শক্তিশালী। সে বলে উঠলো, 'দাদা ছাড়া আর কারো হাতে আমি ইনজেশান নেবো না।'

'কেন, সেদিন যখন মাধব ডাক্তার-সাহেবকে কিছুতেই ইনজেকশান দিতে দেবে না তখন তাঁর কথা-মতো আমিই তো দিয়ে দিলাম।' বিনয় বললে।

'হ্যা, এ আবার কী একটা শক্ত কাজ!' সহকারী ডাক্তার সায় দিলেন : 'কদিন পরে তো দোহাত্তাই চালাতে হবে।'

'দাদা দিলে আমার এৎতুও ব্যথা লাগে না।' মাধব সব সময়েই তার দাদার পক্ষে।

'আর আমি দিলে বুঝি লাগে ?' সহকারী ডাক্তার হাসলেন। সুনয়নীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি যাই কি না এখনো ঠিক নেই। আচ্ছা, আমার জন্যে সেকেণ্ড ট্রেনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।'

সুনয়নী বললেন, 'না, শেষ ট্রেন পর্যন্ত অপেক্ষা করবো।'

'শেষ ট্রেন তো রাত নটায়।'

'কেন, তখন ইনজেকশান চলে না?'

'চলে বৈ কি।'

'তবে, দশটা পর্যন্ত না এলে বুঝবো যে আপনি এলেন না। তখন—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তবে রাত দশটার সময়ই হাফ সি-সি একটা ইনজেকশান করে দিও।' বিনয়ের পিঠ ঠুকে দিয়ে সহকারী ডাক্তার হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন। বললেন, 'যদি না আসি, সিরিঞ্জ ইত্যাদি সব রেখে গেলাম।'

পরবর্তী দিনটা বেস্পতিবার। সকালে উঠেই বিনয়ের মনে হলো, ডাক্তার যেন আজ না আসে!

সকালটা কাটলো রুদ্ধ নিশ্বাসে। সকালের ট্রেনে আসেনি। দুপুরটা কাটলো ঘুমিয়ে। দুপুরের ট্রেনেও নয়। এখন রাত ন'টার ট্রেন।

সন্ধ্যার সময় মাধবের ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর রাখা ডাক্তারের সিরিঞ্জটা খুলে বিনয় একবার পরীক্ষা করলো, দেখলো, সূঁচটার ধার কেমন। ভাবলো, না, নিজের সিরিঞ্জ ব্যবহার করাই নিরাপদ।

একটু সকাল-সকালই সে রাতের খাওয়া সেরে নিল।

সন্ধ্যার কতক্ষণ পরে সে আরেকবার মাধবের ঘরে ঢুকেছিল। মাধব তখন নিশ্চিন্ত শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। আশে-পাশে গোটা দুই তিন চাকর, বিশেষ করে সুনয়নী যখন নেই ঘরে। তার মধ্যে কোনটা যে ব্রজনায়েবের গুপ্তচর বিনয় ঠাহর করতে পারে না। কিন্তু গুপ্তচরকে তার আর ভয় নেই। সে লুকিয়ে কিছু করছে না। যা সে করছে প্রকাশ্যে করছে। সে এখন ডাক্তার। অন্তত ডাক্তার কর্তৃক আদিষ্ট!

ন'টা বাজলো—সাড়ে ন'টা। সহকারী ডাক্তারের দেখা নেই। সুনয়নী হয়তো ভেবেছেন, ডাক্তার যখন শেষ পর্যন্ত এলো না, তখন ইনজেকশানটা আজ বাদই পড়লো না হয়, এবং এই ভেবে হয়তো তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে মাধবের শিয়রে শুয়ে পড়েছেন। কিন্তু বিনয় নিজে ডাক্তারি লাইনে থেকে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনতার তো প্রশ্রয় দিতে পারে না। তাই তাকে এখুনি প্রস্তুত হতে হয়।

বিনয় বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। প্রথমেই মাথায় খানিকটা সে জল ঢাললে। না, যতই জল ঢালুক, মাথা তার ঘুরবেই।

ঘুরুক, এখনো টলে পড়েনি একেবারে। আর দেরি করা যাবে না।

বিনয় তার জামার পকেটে হাত ঢোকালো। এ-পকেট থেকে ও-পকেট, ও-পকেট থেকে আবার এ-পকেট—মুখ তার ছাইয়ের মতো পাংশু হয়ে গেল —কিন্তু, কিন্তু তার সেই প্যাকেটটা গেল কোথায়? কী ভীষণ! তার পকেট থেকে ব্রজনায়েব সেই প্যাকেটটা আলগোছে তুলে নিয়ে গেল নাকি? সেই প্যাকেটের মধ্যে যে তার সিরিঞ্জ আর সূঁচ ছিল, আর-একটা ছোট্ট টিউবের মধ্যে যে ছিল বিষ! অনেক সূক্ষ্মে, অনেক সুদূরে যার কাজ এবং পরিণাম যার অলঙ্ঘনীয়।

ভূতগ্রস্তের মতো বিনয় বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। যদিও সে জানে এখানে আসা অবধি প্যাকেটটা তার পকেটে-পকেটেই ঘুরছে, শোবার সময় বালিশের খোলের মধ্যে, তবুও সে তার বাক্স-বিছানা ওলোট-পালোট করে দেখতে লাগলো। কোথাও কিছু নেই। ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল। সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগলো বিনয়ের। এতক্ষণে ব্রজনায়েব নিশ্চয়ই প্যাকেটটা নিয়ে সদরে রওনা হয়ে গিয়েছে। বড়-ডাক্তার, পরে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট! কী ভয়ঙ্কর হাত-সাফাই। এতদিন পরে যেই প্রথম সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হলো ঠিক সেই দিনই কিনা ব্রজনায়েব সেটা আলগোছে চুরি করলে। অথচ এত সতর্ক এত সাবধান সে।

বহুক্ষণ পরে বিভ্রান্তের মতো বিনয় আবার তার জামার পকেট হাটকাতে লাগলো, জুতোর থেকে পা তুলে নিয়ে দেখলো জুতোর মধ্যে আছে কিনা, শূন্য একটা কুঁজো নেড়ে দেখলো তার মধ্যে যদি থেকে থাকে। বিনয় হঠাৎ দুই হাতে চুলগুলি আঁকড়ে ধরে দেয়ালের উপর সজোরে মাথা ঠুকতে লাগলো। নিজের গলা সে নিজেই দু' হাতে প্রাণপণ জোরে চেপে ধরলো। দাঁত বসিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে কামড়াতে লাগলো সে নিজের হাত।

মুহূর্তে জানাজানি হয়ে যাবে, সে ভাইকে সেবা করবার অছিলায় পকেটে করে বিষ নিয়ে এসেছিল ভাইকে খুন করবার জন্যে। হায়, কোথাও

খুঁজে পায় না সে প্যাকেটটা ? যদি পেত, নিজের হাতে এক্ষুনি তবে সে-বিষ সে নিজের রক্তে দিত মিশিয়ে।

হঠাৎ ঘরে যেন কিসের একটা কালো ছায়া পড়লো। আতঙ্কে বিনয় একেবারে হিম হয়ে গেল। কিন্তু ছায়াটা দেয়ালে সরে আসতেই তার কায়ার পরিমাপ ও সামঞ্জস্য বিচার করে বিনয় শিউরে উঠলো। দরজার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো, মাধব। দুর্বল পায়ে কাঁপতে-কাঁপতে চলে এসেছে।

'ঠং ঠং করে দশটা বেজে গেছে দাদা, আমাকে ইনজেশন দেবে না ? মা ঘুমিয়ে পলেছে, তুমিও আসছ না, তাই আমিই চলে এসেছি।'

বিনয় নিষ্প্রাণ পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এ কি মাধব না মাধবের প্রেতাত্মা ?

'আল দাদা, এতা তুমি আমাল বিছানায় ফেলে এসেছ।' মাধব তার শীর্ণ ডান হাতখানা একটু বাড়িয়ে ধরলো।

মাধবের হাতে বিনয়ের সেই প্যাকেট।

'এটা তুই কোথায় পেলি ?' বিনয় ছুটে গিয়ে মাধবকে বুকে তুলে নিল।

'তখন তোমাল পকেটের লুমালতা আমাকে দিয়ে দিলে না, তখন ছেতোল সঙ্গে এতাও চলে এসেছে !'

ক্ষিপ্র হাতে বিনয় তার পকেটটা অনুভব করলো, সত্যি সেখানে রুমাল নেই।

'ওতাল মধ্যে কী আছে, দাদা ? চকোলেট ?'

'না, ওষুধ—ওষুধ আছে।' প্যাকেটটা বিনয় বুক-পকেটে রেখে দিল।

'আমাল জন্যে ? ইনজেশান দিয়ে দেবে ?' ঈষৎ অভিমানী গলায় মাধব বললে, 'তবে দিয়ে দিচ্ছ না কেন ? তুমি ইনজেশান দিয়ে দিলেই আমি ভালো হয়ে যাব, দাদা। তোমাল ইনজেশানে এৎতুও ব্যথা লাগে না।'

বিনয় মাধবকে ব্যাকুল আগ্রহে বুকের উপর চেপে ধরে তার মাথায় কপালে ও গালে অজস্র চুমু খেতে লাগলো।

মাধব হাসলো মৃদু-মৃদু। বললে, 'আমাকে তুমি এখন এত আদর কচ্ছ কেন, দাদা?'

'আমি যে এখন চলে যাচ্ছি, মাধব। তুই বলিসনি যাবার আগে তোকে যেন আদর করে যাই।' বিনয় নিবিড় স্নেহে মাধবকে বেষ্টন করে রইলো। তার শুষ্ক চোখ জলে আচ্ছন্ন হয়ে এল।

'আমায় ইনজেশান দেবে না?'

'না। দরকার হবে না। আমি বলছি এমনিতেই তুই ভালো হয়ে উঠবি।' মাধবের জ্বরজীর্ণ শীর্ণ গায়ে বিনয় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

মাধবের ঘরে এসে মাধবকে শুইয়ে দিল বিছানায়। সুনয়নী ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ভয়ার্ত মুখে বললেন, 'এ কী, হয়ে গেল নাকি ইনজেকশান? আমাকে ডাকোনি কেন? আমাকে না দেখিয়ে কেন ইনজেকশান দিলে? ও রমু, ও বংশ, ও মদন, কোথায় তোরা? শিগগির নায়েববাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।'

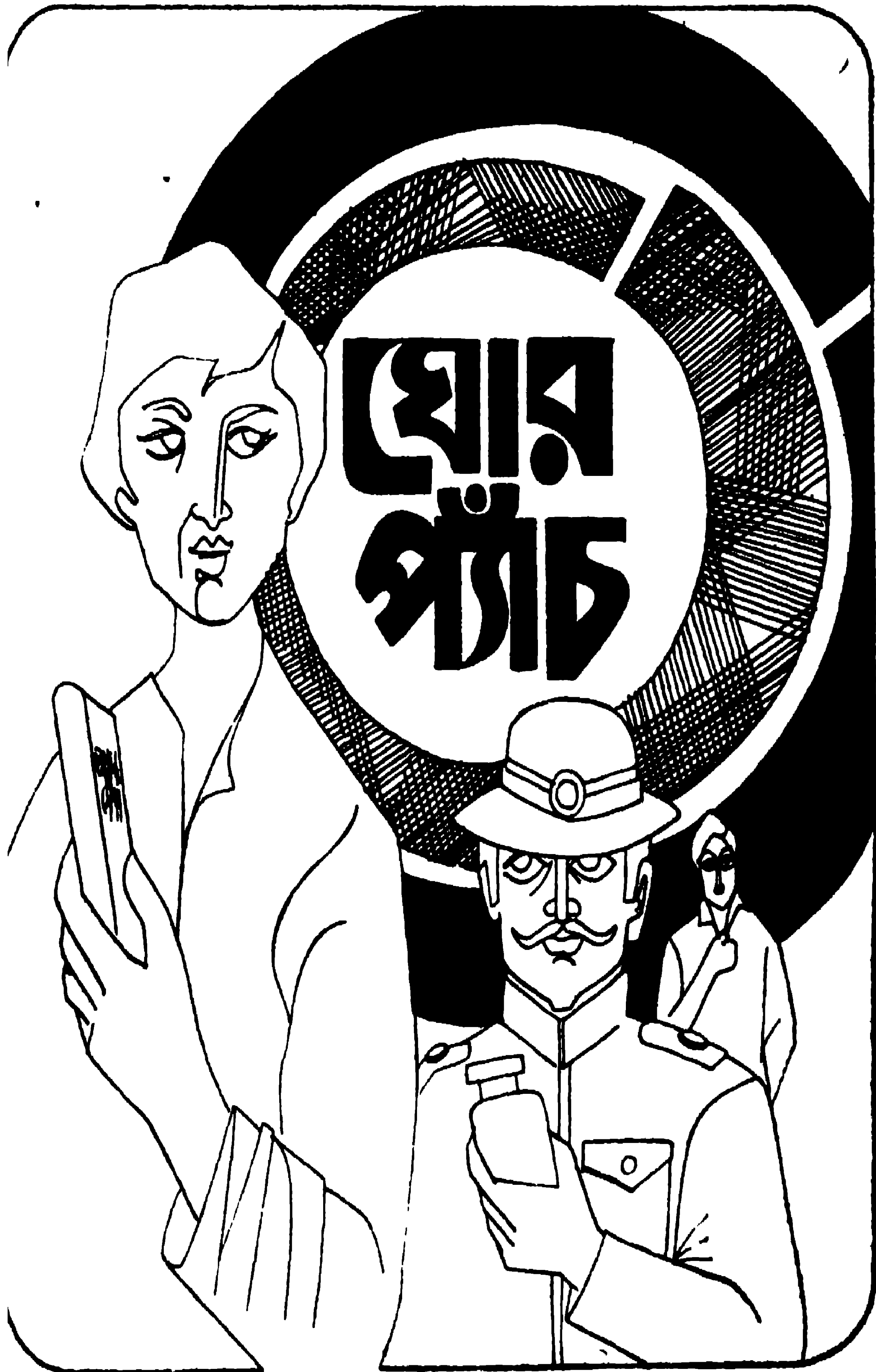
মাধব হেসে উঠলো। বললে, 'না মা, ইনজেশান দেয়নি দাদা। দাদা বললে, এমনিতেই আমি ভালো হয়ে উথবো।'

'দেয়নি? কই দেখি?' সুনয়নী সূক্ষ্ম চোখে মাধবের বাহু দুটো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, উঠে গিয়ে দেখলেন টেবিলের উপর ডাক্তারের সব সরঞ্জাম তেমনিই আছে, কেউ তাদের ধরেনি, নাড়াচাড়া করেনি।

সুনয়নীর দৃষ্টির সঙ্গে বিনয়ের দৃষ্টির একটা সঙ্ঘর্ষ হলো। সুনয়নীর দৃষ্টিতে আতঙ্ক আর ঘৃণা, বিনয়ের দৃষ্টিতে হিংস্র কুটিলতা।

'ইনজেকশান আর দিলুম না, মা। কেননা, তুমি যদিও আমার মা নও, মাধব আমার ভাই। মাধবকে আমি সব, আমার প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি। মাধবকে আমি সব—সব দিয়ে গেলুম।' বলে বিনয় খোলা দরজা দিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল।

বাইরে বনবহুল গ্রামের নিবিড় অন্ধকার, দিকহীন বিনয় আজ দিগন্তের সন্ধানী।


ঘোর
প্যাঁচ

এক

হঠাৎ দুপুরবেলা গোবিন্দ গোস্বামী লেনের সতেরো নম্বর বাড়ি থেকে একটা তুমুল হট্টগোল উঠলো। লোক ছুটতে লাগলো এদিক-ওদিক। কী ব্যাপার?

ব্যাপার সাঙ্ঘাতিক। বাড়ির ঠাকুর তরকারির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দু'-দু'জন লোককে মেরে ফেলেছে।

চক্ষের পলক ফেলতে-না-ফেলতে লোকে লোকারণ্য।

'কী ব্যাপার মশাই?'

'আরে মশাই, সেই যে নৃপতি আর ভূপতি চৌধুরি—দুই ভাই—তাদেরকে মেরে ফেলেছে।'

'বলেন কী মশাই? মেরে ফেলেছে?'

ঘরে-বাইরে সে একটা পাগলের জনতা। জল—বাতাস—ডাক্তার—টেলিফোন—য়্যাম্বুলেন্স—হাসপাতাল—ভাতের থালা—ঠাকুর—পুলিশ—কে যে কোথায় কী করবে ঠিক করতে পারছে না। এলোমেলো একটা সুতোর বাণ্ডিলের মতো জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

প্রায় ঘণ্টাটাক পরে য়্যাম্বুলেন্স এসে উপস্থিত। অসাড় দুই ভাইকে তুলে নিয়ে গেল হাসপাতাল। বড় নৃপতি, বয়েস প্রায় চল্লিশ, ছোট ভূপতি, কুড়ি-বাইশ।

কে একজন বললে পিছন থেকে: 'বৃথা। এত দেরি করে ফেললে চলে কি করে?'

আরেকজন কে ধমকে উঠলো: 'আপনিই বা কষ্ট করে একটু আগে কেন য়্যাম্বুলেন্সে খবর দিলেন না?'

প্রথমোক্ত ব্যক্তি তেড়ে এলো: 'আপনিই বা মশাই এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলেন কোন সুখে? নিজে একটা খবর পাঠাতে পারেন নি?'

প্রায় একটা ঝগড়ার সূচনা। কে আরেকজন এলো মধ্যস্থতা করতে।

বললে, 'আরে মশাই, আমরা হচ্ছি পাড়া-পড়শী, আমাদের কী মাথাব্যথা? বাড়ির লোক কী করছিলো?'

কে আরেকজন এলো এগিয়ে: 'বাড়িতে আর লোক কোথায়? থাকবার মধ্যে দুই ভাই—ঠাকুর-চাকর, আর গোটা দু'তিন কর্মচারী—তা, তাঁরা কোথায় হাওয়া খেতে গেছেন কে জানে? শেষকালে মশাই ছোকরা চাকরটাই যা হোক য়্যাম্বুলেন্সে খবর পাঠালে বুদ্ধি করে। এমনি আপনাদের গলি, ধারে-কাছে কারু বাড়িতে একটা ফোন নেই।'

'আপনি মশাই কোন গলিতে থাকেন?'

ঝগড়াটা ক্রমে-ক্রমে শাখা বিস্তার করছিলো মূল থেকে অনেক দূরে। পুলিশের আবির্ভাবে উবে গেল সবাইর উৎসাহ। ভিড় পাতলা হয়ে গেল।

নিকটবর্তী থানা থেকে তদন্ত করতে এলো ইন্‌স্পেক্টর ভানুবাবু আর তার সহকারী সোমেন। ভানুবাবুর বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, আর সোমেনের ত্রিশ ধরো-ধরো।

বাড়ির দরজার কাছেই দেখা পেল তারা প্রৌঢ় এক ভদ্রলোকের। ভানুবাবু জিগগেস করলে, 'আপনি এই বাড়িতে থাকেন নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি হচ্ছি নায়েব, আমার নাম কৃষ্ণকমল কুণ্ডু।' ভদ্রলোক বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে।

'বাড়ির বাবুরা জমিদার নাকি?' ভানুবাবু বিস্ময় প্রকাশ করলো। তাকালো একবার বাড়ির চেহারার দিকে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ময়মনসিং জেলার কাঞ্চনপুরের জমিদার। দু' আনার মালিক। আগে অবিশ্যি আট আনার ছিলেন। এখন পড়তি দশা। এটা ভাড়া বাড়ি। বাড়ির ভাড়া বায়ান্ন টাকা। বাড়িওলা—'

ভানুবাবু ভদ্রলোককে সংযত করলো। বললে, 'বাড়িতে মেয়েছেলে কেউ নেই?'

'থাকলে এতক্ষণে কান্নাকাটি শুনতে পেতেন নিশ্চয়ই।'

'কোথায় সব? দেশের বাড়িতে?'

'হায় হায় হায়।' কৃষ্ণকমল শোকাভিভূতের মতো বললে, 'নৃপতিবাবু বিয়েই করেননি, আর ভূপতি তো একটুখানি।'

নিশ্চিন্ত হয়ে ভানুবাবু আর সোমেন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো। ঢুকেই শুনতে পেল চাপা গলার একটা অস্ফুট গোঙানি। দু' জনেই চমকে উঠলো। ভানুবাবু জিগগেস করলো, 'কে কাঁদে?'

'কাঁদে নাকি?' কৃষ্ণকমল অদ্ভুত ভাবে হাসলো: 'আমি কানে কিছু খাটো, ঠিক-ঠিক শুনতে পাই না।'

কান্না লক্ষ্য করে ভানুবাবু আর সোমেন ঢুকলো প্রায়ান্ধকার ছোট ঘরে, নীচের তলাতেই। দেখলো কে একটা আধা-বয়সী লোক তক্তপোষের পায়ার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা আর তার সর্বাঙ্গ প্রহারে জর্জর। চিনতে লোকটাকে দেরি হলো না, তার মাথায় সুপুষ্ট একটি টিকি।

'তুমি বুঝি এ বাড়ির ঠাকুর?'

'হুজুর।' ফোলা চোখে ও কাটা ঠোঁটে করুণ করে তাকিয়ে রইলো লোকটা।

ভানুবাবুর ইঙ্গিতে সঙ্গের কনস্টেবল তার বাঁধন খুলে দিতে লাগলো।

'কে করেছে তোমার এই দশা?'

'পাড়ার ছেলেরা, হুজুর।' ঠাকুর কাঁদতে-কাঁদতে বললে, 'বাবুরা যেই খেতে-খেতে বমি করতে লাগলেন আর ঢলে পড়লেন মাটিতে, অমনি গোলমাল শুনে পাড়ার ছেলেরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে আমাকে বেদম পিটতে লাগলো। একটা কথা বলতে দিলে না আমাকে, একবার দেখতে দিলে না আমাকে—কী হলো না-হলো বাবুদের।'

বুঝতে পারা গেল, এতটা সময় কি নিয়ে ব্যাপৃত ছিল পাড়ার ছেলেরা। পীড়িতের শুশ্রূষার চেয়ে উৎপীড়ক ভেবে যে-কাউকে প্রহার করতে পারার মধ্যে বেশি উন্মাদনা নিশ্চয়ই।

'পাড়ার ছেলেরা কী করে তোমাকে সন্দেহ করলো হঠাৎ?' সোমেন এতক্ষণে প্রথম প্রশ্ন করলো।

'খেতে-খেতে বাবুরা ঢলে পড়লেন, সবাই ভাবলে, ভাতের সঙ্গে আমি বিষ মিশিয়েছি।' ঠাকুরের চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে এলো অনর্গল।

'এমনিও তো লোকে হার্ট ফেল করে মরে যেতে পারে খেতে-খেতে। পাড়ার ছেলেরা বিষ বুঝলো কি করে?' সোমেন সূক্ষ্ম চোখে তাকালো ঠাকুরের মুখের দিকে।

ঠাকুর তাকালো একবার কৃষ্ণকমলের মুখের দিকে। বললে, 'বড়বাবু যে গোঙাতে-গোঙাতে স্পষ্ট বললেন—'

'কী বললেন?'

'বললেন, "ঠাকুর, শেষকালে বিষ দিয়ে মারলে আমাকে?" পাড়ার ছেলেরা কেউ-কেউ তা শুনে থাকবে হয়তো। কিন্তু ঠাকুর বলতে তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন কিনা কে বলবে।'

'আর কেউ ঠাকুর আছে নাকি এ বাড়ি?'

'তা নেই, কিন্তু ঠাকুর এখানে ভগবানও হতে পারেন তো। লোকে শুনলো এক, ভাবলো অন্য। হাতের কাছে পেল আমাকে, হাতের সুখ করে নিল মেরে আর মুখের সুখ করে নিল গালাগালি দিয়ে, থুতু ছিটিয়ে।'

সোমেন আরো কী বলতে যাচ্ছিলো, ভানুবাবু বাধা দিল। বললে, 'তবে তুমি বলতে চাও তুমি বিষ মেশাওনি তোমার বাবুদের খাবারে?'

'আমি? আমি বিষ মেশাবো কেন? আমার তাতে লাভ কী?'

'তোমার চাকরি কদ্দিন এ-বাড়িতে?'

'বেশি নয়, মাস সাতেক।' ঠাকুর তাকালো আবার কৃষ্ণকমলের দিকে।

'তুমি কিছুই মেশাওনি বলছ, অথচ বাবুরা একসঙ্গে ভাতের গ্রাস মুখে তুলে শুধু-শুধুই ঢলে পড়লো মেঝের উপর? বাবুরা মরলো কি ভোজবাজিতে?'

'ভোজবাজিতে নয়, হুজুর,' ঠাকুর জোরে একটা নিশ্বাস ফেললো: 'বাবুরা মরেছেন ঐ বিষেই।'

'বিষেই? বিষ এলো কোত্থেকে শুনি?'

'ডালে-ভাতে মাছে-তরকারিতে কোথাও নয়, আমার রান্নার কোনো জিনিসেই নয়. বিষ রয়েছে ঐ চাটনির শিশিতে।'

সবাই এগিয়ে গেল খাবারের জায়গায়, সামনের দালানে। মেঝের উপর পাশাপাশি দু'খানা আসন পাতা, সামনে দু' থালায় ভাত, একখানা থালা বড়, অন্য থালা মাঝারি—কিন্তু বড়র চেয়ে মাঝারি থালার ধারে বেশি বাটি। বড়টাতে খাচ্ছিলো বড় ভাই, ছোটটাতে ছোট—এক নজর তাকালেই বোঝা যায়। কিন্তু নৃপতির চেয়ে ভূপতির খাওয়ার মর্যাদা বেশি এটা কেমন বিসদৃশ মনে হয়। ব্যাখ্যাটা খুবই সহজ—সাত দিন জ্বরে ভুগে উঠে কাল শুধু নৃপতি ভাত খেয়েছে—মুখে তার রুচি নেই, খাওয়াও তার অত্যন্ত সাধারণ, রুগীর পথ্য। তাই তার খাওয়ার মাত্রাটা অত ক্ষীণ এবং তার আয়োজনও ভূপতির তুলনায় অল্প। আর-আর খাদ্য-দ্রব্যে যাই কেননা তারতম্য থাক, চাটনির বেলায় সুস্থ-অসুস্থ দুই ভাইরই সমান লোভ।

ভানুবাবু প্রশ্ন করলো, 'তুমি কী করে বুঝলে যে চাটনির মধ্যেই বিষ ?'

ঠাকুর সপ্রতিভের মতো বললে, 'চামচে করে আমি চাটনি দিলাম বাবুদের পাতে, বাবুরা খেলেন, খাওয়া মাত্রই বমি করতে লাগলেন আর ঢলে পড়লেন একে-একে। চাটনিতে ছাড়া বিষ আর থাকবে কোথায় ?'

'কোথায় সেই চাটনির শিশি ?'

দেয়ালে-ঢোকানো সামনের একটা তাকের উপর থেকে এক রাজ্যের শিশি-বোতলের মধ্য থেকে ঠাকুর চাটনির শিশিটা বের করে ধরলো।

দেখলেই বোঝা যায়, দোকান থেকে শিশিটা সদ্য কেনা, একেবারেই খরচ হয়নি—আর তার গায়ের ল্যাবেলটা ঝক্‌ঝক্ করছে। ল্যাবেলে দোকানের নাম ও ঠিকানা লেখা—"রসামৃত", ৪৯৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

'এ চাটনি বাবুরা কদ্দিন খাচ্ছে ?'

'আজ প্রথম।'

হঠাৎ কৃষ্ণকমল আতঙ্কিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'ভাগ্যিস আমাকে দেয়নি !'

'আপনাকে দেয়নি কেন ?' তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে প্রশ্ন করলো সোমেন।

কপালে হাত ঠেকিয়ে কৃষ্ণকমল বললে, 'বরাত-জোর। অনেক পুণ্যকর্মের ফল বলতে হবে।'

'আপনি আজ খেয়েছেন কখন?'

'সাড়ে-দশটায়। ভাগ্যিস খেয়েছিলাম।'

'সাধারণত খান কটায়?'

'ঠিক নেই। মোট কথা, বাবুদের পরে।'

'তবে আজ আগে খেয়ে নিয়েছেন কেন?'

'বোধহয় বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি পাবো বলে।' কৃষ্ণকমল অদ্ভুতভাবে হাসলো।

ধমকে উঠলো ভানুবাবু: 'রসিকতা করবার সময় নয়। কেন আজ বাবুদের আগে খেয়েছেন তার জবাব দিন।'

কেঁপে উঠলো কৃষ্ণকমল। বললে, 'বড়বাবু আজ আমাকে একটু বড়বাজারে পাঠিয়েছিলেন—ছেদীলাল চামারিয়ার গদিতে। তাই খেয়ে নিতে বলেছিলেন তাড়াতাড়ি। এত যে কাণ্ডমাণ্ড হয়ে গেল কিছুই আমি টের পাইনি, এসে শুনলাম গলির মাথাতেই। আপনাদের আসার কয়েক মিনিট আগেই কেবল আমি এসেছি।'

'আচ্ছা, আপনাকে নিয়ে যাব আমরা ছেদীলালের গদিতে। অপেক্ষা করুন।' ভানুবাবু আবার ঠাকুরকে নিয়ে পড়লো।

কিন্তু তার আগে সোমেন কৃষ্ণকমলকে লক্ষ্য করে বললে, 'আচ্ছা, আপনি বললেন বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি পাবেন বলেই আগে-ভাগে আজ খেয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু, বাবুদের পরেই যদি আজ খেতেন তা হলেও কি মুক্তি পেতেন না? চাটনি খেয়ে বাবুদের ঢলে পড়ে যাবার পরেও কি আপনার আর ঐ বিষাক্ত চাটনি খাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকতো? বলুন, কেন বললেন ও-কথা?'

কৃষ্ণকমল ভয়ানক ঘাবড়ে গেল। ঘাড় চুলকে ঠোঁট চেটে আমতা-আমতা করে বললে, 'ওটা অমনি বলে ফেলেছি, কিছু ভেবে বলিনি, দেখতে গেলে সত্যিই ও-কথার কোনো মানে হয় না। সত্যিই তো, চাটনিতে বিষ

আছে জানাজানি হয়ে গেলে কেই বা ফের দিতে যাবে আমাকে? আমিই বা কেন খাবো? কেউ খায়? সত্যিই তো!' খাঁচায়-পোরা ইঁদুরের মতো তাকাতে লাগলো কৃষ্ণকমল।

ভানুবাবু ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বললে, 'এ চাটনির শিশি কিনে এনেছে কে?'

'জানি না।'

'আপনি জানেন?' ভানুবাবু তাকালো এবার কৃষ্ণকমলের দিকে।

'আমি জানলে কখনো খেতে দিই তা বাবুদের?' কৃষ্ণকমল ভয় চাপতে গেল হাসি দিয়ে।

'আরে মশাই, বিষের কথা হচ্ছে না। বলি, কি করে বাড়িতে এলো এ শিশিটা বলতে পারেন?'

'কি করে বলবো? আমি কি এ বাড়ির বাজার-সরকার?'

'বাজার-সরকার কেউ আছে নাকি এ-বাড়িতে?'

ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে কৃষ্ণকমল বললে, 'তা অবশ্য নেই। তবে বাবুরাই কেউ নিয়ে আসবেন হয়তো।'

ভানুবাবু আবার ঠাকুরকে সম্বোধন করলো: 'চাটনি দেবার সময় শিশি তুমি পেলে কোথায়?'

'ঐ তাকের উপর।'

'কে বললে তোমাকে?'

'ছোটবাবু।'

'খেতে চাইলো কে?'

'বড়বাবু।'

'তোমার মাথা!' ভানুবাবু দাঁতে দাঁত লাগিয়ে বললে। সোমেনকে সম্বোধন করে বললে, 'এ সব ভাত-তরকারি পরীক্ষা করবার জন্যে নিয়ে যেতে হবে। তার ব্যবস্থা করো।' বলে চাটনির শিশিটা কাগজে মুড়ে পকেটে পুরলো।

সোমেন বললে, 'তার আগে আমি আরেকটা শুধু প্রশ্ন করবো।' বলে

ঠাকুরের দিকে সে অগ্রসর হলো। বললে, 'চাটনি দেবার পরে শিশি আবার ঠিক-ঠিক তাকের উপরে-উঠলো কি করে?'

'বাবুরা অজ্ঞান হয়ে যাবার পর আমিই তুলে রেখেছি নিজে, যাতে পুলিশ বুঝতে পারে কোথায় সত্যি বিষ। যাতে বুঝতে পারে আমি সত্যিই নির্দোষ।'

বাড়ি থেকে বেরুবার আগে আরো কটা সারবান তথ্য ভানুবাবু সংগ্রহ করলো। নৃপতি ও ভূপতির বাপ এখনো বেঁচে আছেন—ভাবা যায় না তাঁর কথা—আর আছেন তিনি দেশের বাড়িতে তাঁর পূজো-পার্বন নিয়ে। এ-বাড়িতে কৃষ্ণকমল ছাড়া আরো দু'জন কর্মচারী, একজন ভবেশ সাহা, আরেকজন নন্দকুমার নন্দী। ভবেশ আজ হাসপাতালে কুড়ি দিন ধরে আটক আর নন্দকুমার আজ ভোরবেলা চিটাগং মেলে বাড়ি গেছে। নন্দকুমারের বাড়ি হচ্ছে চাঁদপুরের কাছে তারাপুর গ্রামে।

দু'জন কনস্টেবল এসে ঠাকুরের কোমরে দড়ি জড়ালো। ভানুবাবু বললে, 'থানায় নিয়ে যাও।'

এত মারেও কাঁদেনি, ঠাকুর এখন যা কাঁদলে। হাপুস চোখে বললে, 'আমি কী দোষ করলাম? বিষ রইলো চাটনির শিশিতে, আর আমি করলাম খুন!'

'বলা যায় না, চাটনির শিশিতে বিষ তুমিও মেশাতে পারো।'

'আমি বিষ মেশাবো তো, যত্ন করে তা আবার আমি তাকের উপর তুলে রাখবো কেন?'

ভানুবাবু নিষ্ঠুর মুখে বললে, 'নির্দোষ সাজবার জন্যে।' পরে কৃষ্ণকমলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'আপনিও প্রস্তুত থাকুন।'

দুই

ঠাকুরকে নিয়ে চললো হাঁটিয়ে, ভানুবাবু আর সোমেন মোটরে উঠলো। সঙ্গে টিফিন-কেরিয়ারে ডাল-ভাত-মাছ-তরকারি, যা পড়ে ছিল খাবার-বাটিতে, আর ভানুবাবুর পকেটে সেই চাটনির শিশি।

সোমেন জিগগেস করলে, 'কোথায় যাবেন আগে?'

ভানুবাবু টিফিন-কেরিয়ারটা লক্ষ্য করে বললে, 'আগে এগুলো পরীক্ষা করতে দিয়ে আসি। পরে হাসপাতাল।'

' "রসামৃতে" যাবেন না?' সোমেন হাসলো।

'পোস্টমর্টেমে আগে বিষ সাব্যস্ত হোক, আর দেখা যাক সেই একই বিষ তোমার এই চাটনির শিশিতে।' ভানুবাবু জামার পকেটটা একবার অনুভব করলো। 'যাক, আছে শিশিটা। পকেটটা হালকা মনে হওয়াতে চমকে উঠেছিলাম।'

'শিশি আর যাবে কোথায়?' সোমেন ভানুবাবুর পকেট থেকে শিশিটা বের করে নিয়ে ল্যাবেলটা দেখতে লাগলো খুঁটিয়ে। বললে, 'যদি যাবার হতো অনেক আগেই যেতে পারতো অনায়াসে, তাকের উপর গিয়ে ফের বসতো না ঠিকঠাক।'

'তাই মনে হয়,' ভানুবাবু চিন্তিতের মতো বললে, 'ঠাকুর নিশ্চয়ই বিষ মেশায়নি।'

'তাকের উপর ফের তুলে রাখার থেকে তার অবিশ্যি প্রমাণ হয় না।'

'তা হয় না, কিন্তু ঠাকুরের খুন করার উদ্দেশ্য কী?'

'উদ্দেশ্য সব সময়ে চোখের উপর ভেসে বেড়ায় না, ভানুবাবু। ও কারু হাতের অস্ত্রও হতে পারে।'

'তা পারে, কিন্তু তা হলে চাটনির শিশিটা সরিয়ে না ফেলে তাকের উপরে রেখে দেবে কেন?'

'হয়তো সরিয়ে ফেলবার সময় পায়নি। মারমুখো হয়ে পাড়ার ছেলেরা ঢুকে পড়েছিলো।'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই। জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে

কোনো বাধা ছিল না নিশ্চয়ই। তা ছাড়া, যেহু'ছুটো খুন করবে বিষ খাইয়ে, সে সোজা বমাল ধরা দেবে—এমন আহাম্মকি আমি ভাবতে পারি না।' ভানুবাবু গম্ভীর গলায় বললে, 'এর মূল অত্যন্ত গভীর।'

'কৃষ্ণকমলের চোখ ছুটো লক্ষ্য করেছেন ? আর তার সেই বোকা-বোকা ভাব ? এই দাবার ছকে কোনো এক ঘরে ও বসে আছে তাতে আমার সন্দেহ নেই। আপনার আছে ?'

'নন্দকুমার নন্দীর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত ঠিক বলতে পাচ্ছি না।' ভানু-বাবু এক চোখ কুঞ্চিত করে হাসলো : 'তারপর ঠাকুরের সঙ্গে আজ রাত্রে একটু নিভৃতে আলাপ করে দেখি।'

রাসায়নিক পরীক্ষাগারে টিফিন-কেরিয়ার আর চাটনির শিশি পৌঁছে দিয়ে ভানুবাবু আর সোমেন চললো হাসপাতালের দিকে। শুনলো কাল ছুপুরের মধ্যেই রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

হাসপাতালে এসে শুনলো আরো রোমাঞ্চকর সংবাদ। নৃপতি আর ভূপতি কারুরই প্রাণবিয়োগ হয়নি। ভূপতির অবস্থা বিশেষ খারাপ ছিল না যখন হাসপাতালে ঢোকে, আর নৃপতির অবস্থা যদিও প্রথমে খুব সাঙ্ঘাতিক ছিল, পরে এখন একটু মোড় ঘুরেছে। বিপদের বাইরে যদিও এখন নয়, তবু একেবারে হতাশ বলা যায় না।

'আর ভূপতি ?' জিগগেস করলে ভানুবাবু।

'সে এখন একটু ঘুমুচ্ছে। তাকে এখন ডিস্টার্ব করাটা ঠিক হবে না।' বললে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার।

'কি, শেষ পর্যন্ত বিষই তো ?'

'নিঃসন্দেহ।' ডাক্তার জোর দিয়ে বললে।

সেই রাত্রে পুলিশের লোক ভূপতির কাছে পৌঁছুতে পেল না। অতএব পুনরায় ঠাকুরেরই তলব পড়লো। এবার ভানুবাবু সোমেনকেও থাকতে দিল না কাছে।

কিন্তু যাই কেন না বলো আর করো, ঠাকুর এক ইঞ্চি টললো না, 'আমিনা'-র উপর রা কাড়লো না এতটুকু।

'যা জানিনা তা বানিয়ে বলবো কি করে? আর, আমি মারবোই যদি ঠিক, তবে আমিই বা নন্দবাবুর মতো পালিয়ে যাব না কেন?'

মোটর নিয়ে ভানুবাবু তক্ষুনি চলে গেল ছেদীলালের গদিতে। অকাট্য প্রমাণ দিলে ছেদীলাল, সকাল এগারোটা নাগাদ নৃপতি তার নায়েব কৃষ্ণ-কমল কুণ্ডুকে তার কাছে পাঠিয়েছিল কিছু টাকা ধার করবার জন্যে। বেশি নয়, হাজার খানেক। সুদের হার কিছু চড়িয়ে চেয়েছিল ছেদীলাল, নৃপতি নাকি তাতে রাজি নয়, তাই কথা আর এগোয়নি তখন। আজ সন্ধের সময় কৃষ্ণকমলের ফের আসবার কথা, কিন্তু এই প্রথম ছেদীলাল শুনছে দুর্ঘটনার কাহিনী। নৃপতির টাকার কেন দরকার হয়েছিলো তা সে বলতে পারে না। মাঝে-মাঝে এমনি ধার সে আরো নিয়েছে আগে, তাই এ বিষয়ে তার কৌতূহলটা অবান্তর। তবে হাইকোর্টে একটা মামলা চলছে তার, এমনি একটা কথা যেন বলেছিল একবার কৃষ্ণকমল।

হতাশ হয়ে ফিরে এলো ভানুবাবু। কিন্তু ভেবে দেখলো, মিছিমিছি ব্যস্ত হয়ে লাভ কী? ভূপতি বা নৃপতির মুখেই তো শোনা যাবে এবার সবিস্তার ঘটনা।

পরদিন দুপুরবেলায়ই রিপোর্ট পাওয়া গেল রাসায়নিকের। চাটনির শিশিতেই বিষ। আর, নৃপতি ও ভূপতির পাকস্থলীতে যে-বিষ পাওয়া গিয়েছে এ-বিষ তাই। অতএব সন্দেহ রইলো না বিষাক্ত চাটনি খেয়েই দু'ভাই অজ্ঞান হয়ে টলে পড়েছিল।

অন্তত সন্ধে পর্যন্ত তাই ছিল অবস্থা। কিন্তু কতক্ষণ পরেই শোনা গেল অকস্মাৎ, নৃপতি আর নেই। সদ্য রোগমুক্তির পর শরীর ছিল তার নিতান্ত দুর্বল, তার উপর বিষের মাত্রাটাও ছিল তার বেশি, শেষ পর্যন্ত ধকল সইতে পারলো না একেবারে। কে, বা, কেন, একটা কথাও সে বলে যেতে পারলো না।

না, ভূপতির সম্বন্ধে কোনো ভয় নেই। তাকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। সেই বলতে পারবে সব আদ্যোপান্ত। কিন্তু এখনো সে বিবৃতি দেবার মতো সুস্থ হয়নি। দাদার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সে অত্যন্ত অভিভূত।

পর দিন, বৃহস্পতিবার, ভানুবাবু আর সোমেন ভূপতির সঙ্গে দেখা করলো। হাসপাতাল থেকে আজ সকালেই সে ছাড়া পেয়েছে।

একটা ইজিচেয়ারে ভূপতি দুর্বল ভঙ্গিতে শয়ান। সুদর্শন, কান্তিমান চেহারা। আর্থিক অবস্থা এদের এখন নেমে এলেও বংশ যে উঁচু তাতে আর সন্দেহ নেই।

'আপনাকে বেশি বিরক্ত করবো না—'

'আমাকে অনায়াসে তুমি বলতে পারেন,' ভূপতি ক্লান্তস্বরে বললে, 'আমার বয়েস মোটে একুশ।'

'তা বলতে পারি, যদি কিছু মনে না করো।' ভানুবাবুর গলা বেশ প্রসন্ন শোনালো।

'এতে কিছুই মনে করবার নেই। আপনারা পুলিশের লোক, সত্যিকারের দোষীকে ধরতে এসেছেন। তাই আপনারা আমার পর নন। কেননা আমারো সেই একই উদ্দেশ্য, সত্যিকারের দোষী কে তাই বের হোক সবাইর চোখের সামনে। আপনারা বসুন,' সামনের দুখানা চেয়ারের দিকে ভূপতি ইসারা করলো: 'সমস্ত বিষয়ে আমি আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

ভানুবাবু আর সোমেন পাশাপাশি দুখানি চেয়ারে বসলো। ভানুবাবু বললে, 'মোটামুটি কটা মোটা কথা শুধু তোমাকে জিগগেস করবো।'

'করুন।'

'চাটনির শিশিতেই যে বিষ ছিল, আর সেই বিষেই যে তোমার দাদা নৃপতিবাবু মারা গেছেন আর তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে তাতে সন্দেহ নেই—'

'না, তাতে আর সন্দেহ কী।' ভূপতির মুখভাব ব্যথাকাতর হয়ে উঠলো: 'ডাক্তার আর কেমিক্যাল য়্যানালিস্টের তাই মত।'

'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই, চাটনির শিশিতে বিষ এলো কি করে?'

পিছন থেকে সোমেন হঠাৎ বলে উঠলো: 'না, প্রশ্ন ও নয়। প্রশ্ন হচ্ছে এই, চাটনির শিশিটা এলো কি করে এ বাড়ি? এনেছিল কে ওটা?'

সোমেনের কথা শুনে ভূপতির পিঠ একটু খাড়া হয়ে উঠলো। সে একটু

ম্লান হাসি হেসে সোমেনের দিকে চেয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আপনারটাই ঠিক প্রশ্ন। কেননা, চাটনির শিশিতে বিষ কে মিশিয়েছে এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি আমি শুধু পরোক্ষ অনুমান থেকে, কিন্তু চাটনির শিশি এ বাড়িতে কে এনেছে এ-প্রশ্নের উত্তর দেব আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে। অনুমান থেকে জ্ঞান বেশি নির্ভরযোগ্য।'

'বেশ, তবে তাই বলো, কে এনেছে এই চাটনির শিশি?' ভানুবাবু জিগগেস করলো।

'আমি এনেছি।' ভূপতি উদাসীনের মতো বললে।

'তুমি এনেছ?' চমকে উঠলো ভানুবাবু: 'তবে তুমি বলতে চাও, দোকান থেকে বিষ মিশিয়েই বিক্রি করছে চাটনি?'

ভূপতি মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো।

সোমেন জিগগেস করলো: 'আপনি কি ওটা কিনে এনেছেন দোকান থেকে?'

'না।'

যেন আলো দেখতে পেলো ভানুবাবু। বললে, 'কিনে আনোনি, তবে পেলে কোথায় শিশিটা?'

'কুড়িয়ে নিশ্চয়ই নয়। আর ছাদ ফুঁড়ে পড়েওনি এসে ভাতের থালায়।' ভূপতি ঢোক গিললো: 'ওটা আমাকে একজন উপহার দিয়েছিলেন।'

'কে?'

'যিনি চেয়েছিলেন আমাদের দুই ভাইকে একই সঙ্গে খুন করতে। যিনি এক ঢিলে দুই পাখির শিকারী।'

'তাঁর নাম কী?'

'নাম?' ভূপতি একটু বিকৃতভাবে হাসলো: 'নাম শুনলে হঠাৎ বিশ্বাস করতে চাইবেন না। তবু, না বলে উপায় নেই। নাম, সুবোধমোহন চৌধুরী।'

'কে সুবোধ চৌধুরী?'

'কি আশ্চর্য, কাঁসারিপাড়ার সুবোধ চৌধুরীকে চেনেন না ?'

'যার 'জনগণ' ব্যাঙ্ক ? সেই লাখপতি এস. চৌধুরী বলতে চাও ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই স্বনামধন্য।'

কয়েক মুহূর্ত কেউই কথা কইতে পারলো না—উদ্ঘাটনটা এমনি অপ্রত্যাশিত। ভানুবাবু আমতা-আমতা করে বললে, 'তিনি—তিনি তোমাদেরকে খুন করতে চাইবেন কেন ?'

'কারণটা অত্যন্ত স্থূল। এক কথায় জমিদারি নিয়ে মারামারি।' তারপর ভূপতি যে-কাহিনী বিবৃত করলো সংক্ষেপে তা এই :

কাঞ্চনপুর জমিদারির আট আনার মালিক ছিলেন সুবোধ চৌধুরীর বাবা ব্রজমোহন আর বাকি আট আনার সরিক ছিলেন নৃপতি-ভূপতির ঠাকুরদাদা পশুপতি। ঠাকুরদাদার আমলে সমৃদ্ধিতেই কেটেছিল তাদের—এখনো ঝাপসা-ঝাপসা মনে পড়ে। কিন্তু তাদের বাবা শ্রীপতি যখন গদি পেলেন তখন চালে ভুল করতে লাগলেন ক্রমাগত। তাঁর ছিল নেশার বাতিক এবং সুবোধের প্ররোচনায় দেখতে-দেখতে তা হয়ে উঠলো সর্বনাশা। যে-আগুন জ্বলছিলো আগে ধিকিধিকি করে সুবোধ তাকে প্রায় একটা দাবদাহ করে তুললো। আর কিছুতে নয়, শুধু কর্জ দিয়ে, হ্যাণ্ডনোট কাটিয়ে। শ্রীপতির তাই বাধলো না কিছুতেই, তাঁর অংশে কাঞ্চনপুরকে তিনি ক্রমে কর্দমপুরে নিয়ে এলেন। আট আনা শীর্ণ হতে-হতে দু' আনায় গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু বেশি দিন নয়, কোনো কিছুই চলে না বেশি দিন। নৃপতি এসে হঠাৎ ঘোড়ার বলগা টেনে ধরলো, নিজের দুই দৃঢ় হাতে তুলে নিল জমিদারির শাসন। সর্বনাশের শেষ প্রান্তে এসে শ্রীপতি তখন পঙ্গু, অবসন্ন, ছেলেকে বাধা দিলেন না, নিজে চলে গেলেন অন্তরালে, তাঁর পূজার ঘরে। কিন্তু সংঘর্ষ বাধলো সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে, এত বড় গ্রাস মেলেও যে সমস্ত কাঞ্চনপুরকে গিলতে পারলো না নিঃশেষে। নৃপতির সঙ্গে সুবোধ চৌধুরীর বাধলো অনেক মারি-মোকদ্দমা যার ফল অনেকাংশেই সুবোধ চৌধুরীর অনুকূল হলো না। রাগে ফুলতে লাগলো সুবোধ চৌধুরী—কী করে প্রতিশোধ নেয়া যায়। এত তার বিত্ত-বেসাত, তবু সুবোধ

চৌধুরী এঁটে উঠলো না নৃপতির সঙ্গে—কী করেই বা উঠবে। নৃপতির দিকে বিত্ত নেই, কিন্তু সত্য আছে, আর জনবল যতই হোক চরিত্রবলের কাছে তা কিছুই নয়। শেষ পর্যন্ত এদের ঝগড়াটা চরমে উঠলো গ্রামের ইস্কুলের পরিচালনা নিয়ে। নৃপতির দল নূতন কমিটি গঠন করে সুবোধ চৌধুরীর দলকে ইস্কুল থেকে উৎখাত করলে। সুবোধ চৌধুরী নূতন কমিটি বাতিল করবার জন্যে নালিশ করলো; কিন্তু হায়, তাকে ফিরতে হলো কানমলা খেয়ে। করলো আপিল, উলটোলো না। শেষকালে এখন হাইকোর্ট করেছে। আর, তারই জন্যে নৃপতি ইদানিং বাস করছিলো কোলকাতায়, শুনানির তারিখ এসেছে কাছিয়ে। সুবোধ চৌধুরী ভাবলে, এই সুযোগ, বাঘ এসে পড়েছে এখন বন্দুকের গণ্ডির মধ্যে, আর ছাড়া যায় না। জানেন তো সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে অপমানের যন্ত্রণাটাই বেশি।

এইখানে সোমেন সামান্য বাধা দিল। বললে, 'এত বড় একটা লোক গ্রামের ইস্কুলের সামান্য কর্তৃত্বের জন্যে লালায়িত—ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগে না?'

'আশ্চর্য! ইলেকশানের সময় কী ভীষণ প্রোপাগাণ্ডা করেছিল সুবোধ চৌধুরী, কাঞ্চনপুরে গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে আসুন।' ভূপতির গলায় ঈষৎ ঝাঁজ ফুটে উঠলো: 'ইলেকশানের ফল পেয়েছিলো সে কাঁচকলা, কাঁচকলাকে যদি অবিশ্যি ফল বলেন। দেশজোড়া নাম, অথচ গ্রামে তার প্রতিষ্ঠা নেই, আসন নেই তার গ্রামবাসীর হৃদয়ে—সেখানে নৃপতি হচ্ছে যাকে বলে একচ্ছত্র সম্রাট—সে কি মশাই কম যন্ত্রণা? প্রতি পদে যে তার পায়ের কাঁটা তাকে উৎপাটন করার মতো আনন্দ কী।'

এততেও যেন সোমেন তৃপ্ত হতে পারলো না, বললে, 'তাই বলে সামান্য ইলেকশানে হেরে গিয়ে সুবোধ চৌধুরী খুন করবে? তাও দু'আনার এক খুদে সরিককে, তার তুলনায় দাঁড়িপাল্লায় যে অনেক অনেক নিচে পড়ে!'

'এর চেয়েও তুচ্ছ কারণে লোকে খুন করে।' রাগে তপ্ত হয়ে ভূপতি বললে, 'পিঠে চড়ের বদলে পেটে লাথি মেরেছে যদি না শুনে থাকেন তবে পুলিশের চাকরিতে মশাই ইস্তফা দিন।'

ভানুবাবু সোমেনকে বাধা দিয়ে বললে, 'তর্ক করে লাভ নেই। মোটামুটি ঘটনাটা শুধু আমাদের জেনে নেয়া দরকার। তা থেকে যা খুসি সিদ্ধান্ত তুমি করতে পারো পরে—সেই স্বাধীনতা তোমার কেড়ে নিচ্ছে না কেউ।'

'আর, অনেক নিচে পড়ে, কাকে বলছেন আপনি?' ভূপতি ঝলসে উঠলো: 'দাদার আমার টাকার জোর না থাকতে পারে কিন্তু ছিল ব্যক্তিত্বের জোর, যে-ব্যক্তিত্ব শুধু মহত্ত্ব থেকে উৎসারিত। একবার কাঞ্চনপুরে গিয়ে দেখে আসুন কোথায় ছিল আমার দাদার স্থান! সিংহের পাশে গাধার মতোই দাদার পাশে সুবোধ চৌধুরী। দুজনের নাম উচ্চারণ করবেন না একসঙ্গে।'

সোমেন লজ্জিত মুখে হাসলো, বললে, 'আমি সে-কথা বলছি না। আমি বলছি শুধু খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। ইলেকশানের হারই যদি তার কারণ হয়, তবে আমি বলছি, হাইকোর্টে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত কি সুবোধ চৌধুরী অপেক্ষা করবে না?'

'করবে না।' ভূপতি জোর দিয়ে বললে, 'কেননা রায় পড়ে রাস্তার একটা লোকও সহজে বলে দিতে পারে সুবোধ চৌধুরীর জন্যে কোনো রাস্তাই আর খোলা নেই। আর, ইলেকশানের হারই খুনের কারণ আপনাকে বললে কে? অর্কেস্ট্রার মধ্যে ওটা একটা উঁচু সুরের বাজনা মাত্র। আওয়াজটা চড়া বলেই সহজে নাড়া দেয়। নইলে ছোটখাটো অনেক সংঘর্ষের ইতিহাসই লুকোনো আছে এই খুনের পিছনে। আর, প্রমাণ যেখানে স্পষ্ট সেখানে উদ্দেশ্য নিয়ে মাথা ঘামানো অবান্তর। আমি যদি এখন পকেট থেকে রিভলভার বের করে আপনাকে খুন করি তবে আমিই যে খুনী তা সাব্যস্ত করতে গিয়ে আপনাকে খুন করায় আমার কি উদ্দেশ্য ছিল তা নিয়ে গবেষণা করার দরকার হয় না।'

'তা হয় না বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য না থাকলে আপনার আমাকে খুন করার কোনো দরকার হয় কি?' সোমেন মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো।

'আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।' ভূপতি ক্রুদ্ধ মুখে গম্ভীর গলায় বললে, 'তবে যান, সুবোধ চৌধুরীকে গিয়ে জিগগেস করুন।'

'না, না, আপনি রাগ করবেন না।' সোমেন অনুতপ্ত হয়ে বললে, 'আপনার দাদার সঙ্গে সুবোধ চৌধুরীর ঝগড়া সম্বন্ধে আমি মোটেই সন্দেহ করছি না। আমার বক্তব্য ছিল কার্যের পক্ষে কারণটা পর্যাপ্ত কি না। অবিশ্যি, কিছুই অসম্ভব নয়। বেশ, ঘটনাটা আগে শোনা যাক।'

'তুমি তা শুনতে দিচ্ছ কই?' ভানুবাবু বিরক্ত কণ্ঠে ঝাঁজিয়ে উঠলো। কণ্ঠস্বরটা শোনালো একটা ধমকের মতো, লজ্জায় ম্লান হয়ে গেল সোমেন। ভানুবাবু উৎসুকের মতো জিগগেস করলো ভূপতিকে : 'তারপর? সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে তোমার দেখা হলো কোথায়? "রসামৃতে"?'

ভূপতি অবাক হয়ে বললে, 'সে আবার কী?'

' "রসামৃত" হচ্ছে দোকানের নাম, চাটনির শিশির গায়ে সেই নামেরই ল্যাবেল আঁটা।'

'ও, হ্যাঁ, অতটা লক্ষ্য করা হয়নি বটে। তা, নাম ওঁরা ঠিকই রেখেছেন।' ভূপতি দুর্বলভাবে একটু হাসলো : 'অমৃত-রসই বটে।'

টিপ্পনি কাটা সোমেনের স্বভাব। তার পক্ষে মুখ বুজে থাকা আর আরশুলার পক্ষে শুঁড় না নাড়া একই কথা। সে বললে, 'বিষ মেশানো যদি সুবোধ চৌধুরীরই কাজ তবে দোকানের নামের মধ্যে দোষ কোথায়?'

'যেই মেশাক, হরে-দরে "রসামৃত" বিষামৃত হয়ে গেল তো? সেই অর্থে নামটা লাগ-সই হয়েছে বৈকি।' ভানুবাবু তাঁর গলায় আবার ঝাঁজ আনলেন। অল্প হেসে সোমেন আবার মিইয়ে গেল।

ভূপতির জন্যে গরম দুধ এল পেয়ালা করে।

ভানুবাবু আবার কথার খেই ধরিয়ে দিল তাকে। বললে, 'হ্যাঁ, কোথায় দেখা হলো সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে? চাটনির দোকানে, না, রাস্তায়, না আর কোথায়?'

মুখ থেকে দুধের পেয়ালা নামিয়ে ভূপতি বললে, 'কোথায় আবার! তার বাড়িতে।'

'তার বাড়িতে যাও নাকি তুমি?'

'যাই মানে? রোজ যাই।'

ভানুবাবু যেন কথাটা সহজে আয়ত্ত করতে পারছে না। বললে, 'রোজ যাও ? শত্রুর বাড়িতে রোজ যাও ? তিনি যেতে দেন তোমাকে ?'

'যেতে দেন মানে ? উলটে মাইনে দেন।'

ক্রমশই যেন ধোঁয়া লাগছে ভানুবাবুর। চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

'সুবোধ চৌধুরীর বাড়িতে চাকরি করেন বুঝি ?' সোমেন উদ্ধার করলো।

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছেন দেখছি। শুধু, গোড়াতে, আমিই বুঝতে পারিনি।' ভূপতি ফেললো দীর্ঘশ্বাস।

'কী চাকরি ? টিউশানি ?' ভানুবাবু গলায় আওয়াজ পেলো।

'না, তার চেয়ে স্থূলকায়। সুবোধ চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারি।'

এর চেয়ে একটা চড় খেলেও যেন ভানুবাবু বেশি স্থির থাকতো। বললে, 'বলো কি ? শত্রুকে তিনি একেবারে তাঁর গোপন মন্ত্রণাকক্ষে এনে বসিয়েছেন ?'

'আধুনিক রণনীতির এইটেই হচ্ছে কৌশল, মিত্রতার আবরণে বিশ্বাসঘাতকতা করা।' ভূপতির গলা শোকাচ্ছন্ন হয়ে এল : 'আমাকে তিনি চাকরি দিয়েছিলেন আমাকে তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সোপান বলে ব্যবহার করবেন বলে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার উদ্দেশ্যে। দাদাকে মারবার জন্যে যাতে করে তাঁর হাতে সহজ একটা অস্ত্র হয়ে উঠতে পারি। তাই বুঝিনি আগে, প্রথম যখন চৌধুরী চাকরি দিতে চেয়েছিলেন। আজ

সোমেনের গলা ফের চুলকে উঠলো : 'আপনিই বা এমন দুষমনের ঘরে চাকরি নিতে গিয়েছিলেন কেন ?'

'দাদাকে সুখী করবার জন্যে।' ভূপতি দুধের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললে, 'ম্যাট্রিকটাও পাশ করতে পারিনি ফাকিলি করে। বেকার বসেছিলাম। ঘুরছিলাম টো-টো করে। দাদার মুখের দিকে তাকানো অসম্ভব ছিল। অসম্ভব ছিল তাঁর কাছ থেকে পকেট-খরচের টাকা চাওয়া—'

'আণ্ডার-ম্যাট্রিক, অথচ প্রাইভেট সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন—'

'মশাই, শুনুন আগে সমস্ত। আণ্ডার-ম্যাট্রিক হলে কি হয়, অধ্যবসায় ছিল, প্রতিজ্ঞা ছিল অনমনীয়। অল্প ক'দিনের মধ্যেই শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখে নিলাম। বেরিয়ে এসেই দেখলাম কাগজে বিজ্ঞাপন—এস. চৌধুরী একজন স্টেনোটাইপিস্ট চান। তখনো বুঝিনি কে এই এস. চৌধুরী?'

'স্টেনোটাইপিস্ট আর প্রাইভেট সেক্রেটারি কি এক?' সোমেন ফোড়ন দিল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, টিকটিকি আর ডিটেকটিভ যেমন এক।'

'তোমার এতটুকু ধৈর্য নেই, সোমেন।' ভানুবাবু ধমক দিল: 'প্রাইভেট চিঠিপত্র যদি ওঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়া হয় তবে ওঁকে প্রাইভেট সেক্রেটারিই বলতে হয় বৈকি।'

'শুধু প্রাইভেট চিঠিপত্র!' ভূপতি উত্তেজিত হয়ে উঠলো: 'দিস্তে-দিস্তে বক্তৃতা, ব্যাঙ্কের যত-রকম করেসপণ্ডেন্স। ইংরিজি একটি লাইনও তিনি নিজ হাতে লিখতেন না। সব আমাকে ডিকটেট করতেন, আর আমি নোট নিতাম আর টাইপ করতাম—রাশি-রাশি কাজ, পর্বতপ্রমাণ। উঃ!' ভূপতি একবার কপালে হাত বুলোলো: 'এই পর্বতের নিচেই অতল সমুদ্র রেখেছিল সে তৈরি করে।'

'কত মাইনে দিত?' ভানুবাবু জিগগেস করলো।

'প্রথমে দিতে চেয়েছিল মোটে ষাট টাকা, কিন্তু আমার পরিচয় পেয়ে যখন জানলো আমি নৃপতি চৌধুরীর ভাই তখন এক কথায় উঠে দাঁড়ালো সে একশোতে।'

'এত দয়া!' ভানুবাবু অবাক হলো।

'প্রথমে সেটা দয়া বলেই মনে করেছিলাম—শত্রুর প্রতি শত্রুর মহত্ত্ব। তখনো বুঝিনি ঐ মাইনেটার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে প্রলুব্ধ করা, আমাকে তার বুড়ো আঙুলের তলায় নিয়ে আসা। যেন বঁড়শিতে বিঁধি, তার জন্যে চার ফেলা। টাকার প্রয়োজনে আমি তখনো ততটা তলিয়ে বুঝিনি। কিন্তু এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি তার দয়াটা ছিল হত্যার ছদ্মবেশ।'

'সুবোধ চৌধুরীর ওখানে চাকরি নেয়ার কথা জানিয়েছিলেন আপনার দাদাকে ?' সোমেন প্রশ্ন করলো।

'না। চাকরি করছি একশো টাকায় এটাই শুধু তাঁকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু চাকরির মালিক যে এস. চৌধুরী সেটা মুখ ফুটে বলতে পারিনি।'

'কেন ?'

ভূপতির চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এলো : 'দাদা সে অপমান সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর চোখের সুমুখে না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাবো তাও ভালো, তবু তিনি সুবোধ চৌধুরীর গোলামি করতে দিতেন না।'

'দাদার এই মনোভাব জেনেও সুবোধবাবুর ওখানে চাকার নিতে গেলেন কেন ?'

'বললাম যে, ঐ একশোটা টাকা। মাইনেটা পেয়ে প্রথম যখন দাদার হাতে এনে টাকা দিলাম, দাদার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ইচ্ছে করলো না সে-আনন্দের ছবিটিকে ধূলিসাৎ করে দি। তাঁর কাছে আমার মূল্য স্বীকৃত হল, তাঁর মনে আমি মর্যাদার আসন পেলাম, সেই আমার জীবনের পরম পুরস্কার। ইচ্ছে করলো না তাকে ধুলোয় ফেলে কলঙ্কিত করি। নইলে আমি জানি, আমি যদি বলতাম ঐ টাকা আমি সুবোধ চৌধুরীর হাত থেকে নিয়ে এসেছি, গোলামির দাম, তা হলে দাদার দুই চোখ আগুন হয়ে উঠতো, দশ টাকার দশখানা সেই নোট তিনি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতেন।' ভূপতি রুমালে চোখ মুছলো।

ঢোক গিলে বললে, 'দাদাও জিগগেস করলেন না ব্যাঙ্ক কার, আমারো বলবার দরকার পড়লো না। আমি ভাবলাম আমার মধ্যস্থতায় হয়তো সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে দাদার একটা বনিবনা হয়ে যাবে। আর, যদি বা তা না হয়, এই ভেবেই আমি তৃপ্তি পাব যে শত্রুকে কিছুটা অন্তত আমি শোষণ করছি। কিন্তু তখন কি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি ডালে-ডালে থাকলেও সুবোধ চৌধুরী আছে পাতায়-পাতায়। চাকরি পেয়ে না যত সুখ, চাকরি দিয়ে তার চেয়ে তার বেশি।'

'কদিন করছেন এই চাকরি ?' সোমেনের প্রশ্নটা কাঠখোট্টা শোনালো।

'এই মাস কয়েক।'

'চাকরিটা তার বাড়িতে না ব্যাঙ্কে?'

'বাড়িতে।'

'কখন যেতে হয়?'

'সকালবেলা।'

'কটা থেকে কটা?'

'ঠিক নেই। আটটা থেকে এগারোটা হচ্ছে কড়ার, কিন্তু কখনো-কখনো এদিক-ওদিক হয়ে যায়।'

খোসা থেকে শাঁসের দিকে ভানুবাবুর নজর বেশি। তাই বাধা দিয়ে ব্যস্তভাবে বললে, 'কিন্তু, আসল কথা হচ্ছে, চাটনির শিশিটা তিনি তোমার হাতে পৌঁছে দিলেন কি করে?'

'সেইটেই আসল কথা। শুনুন।' ভূপতি চেয়ারে একটু নড়ে-চড়ে বসলো। বললে, 'সুবোধ চৌধুরী একজন পয়সাওয়ালা লোক বলে লোকে তার মতামতের দাম দিয়ে থাকে। আজকালকার দিনে গুণীলোকের মতের চেয়ে বড়লোকের মতটাই প্রধান। যে-ওষুধ ব্যবহার করে আমার-আপনার টাক পড়লো, সুবোধ চৌধুরী যদি লিখে দেয় সে-ওষুধে টাক সারে, তা হলেও দেশের লোক সুবোধ চৌধুরীকেই বিশ্বাস করবে। তেমনি—'

'আপনি মশাই বড্ড বেশি বকেন।' সোমেন বিরক্ত হয়ে বললে।

ভূপতি রাগ করলো না। হেসে বললে, 'বেশি করে না বললে বুঝবেন কি করে? অল্পে আপনারা বুঝতে পারেন আপনাদের বুদ্ধি এতটা খোলসা বলে তো শুনিনি।'

ভানুবাবু পিঠে হাত বুলোবার মত করে বললে, 'কিন্তু, সুবোধ চৌধুরীর মতামতের সঙ্গে "রসামৃতের" চাটনির সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্ক গভীর।' ভূপতি পুরোনো হাসির জের টেনে বললে, 'সেই জন্যেই বলছিলাম বেশি করে বুঝিয়ে না বললে আপনাদের বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া পড়ে না। সোজা কথাটা হচ্ছে এই, "রসামৃত" থেকে চাটনির শিশি সুবোধ চৌধুরীর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল তাঁর মতামতের জন্যে।'

'তাঁর মতামতের জন্মে ! তিনি কি—'

'মতামত দেবার জন্মে এক্সপার্ট হতে লাগে না—অন্তত চাটনির বেলায় তো নয়ই। তেমনি চাটনি বলে নয়, বিস্কুট-লজেন্স, দই-রাবড়ি, টাকের-ওষুধ, দাদের-ওষুধ, টুথপেস্ট-সেভক্রিম—অনেক রকমারি জিনিসের নমুনাই তাঁর কাছে আসতো, তাঁর সার্টিফিকেটের জন্মে। কেউ-কেউ টাকা পর্যন্ত দিত। আর সেই সব নমুনার বেশির ভাগই তিনি আমাকে উপহার দিতেন, অবিশ্যি দই-রাবড়ির হাঁড়ি ছাড়া। যা দিতেন সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করতাম, কিন্তু চাটনির মধ্যে বিষ মেশাবেন বা টুথপেস্টে রোগের বীজ, এ আমার কল্পনার ধারে-কাছেও কোনোদিন ছিল না। কিন্তু বিপদ প্রায়ই সদর দরজা ছেড়ে অলি-গলি দিয়ে এসেই দেখা দেয়।'

'চাটনির শিশিটা কি করে এলো—ডাকে, না লোক-মারফৎ ?' সোমেন জিগগেস করলে।

'ডাকে। রেজেস্ট্রি করে। পোস্টম্যান দিয়ে গেল প্যাকেটটা।'

'আপনি তখন সামনে বসেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, টাইপ করা সেরে তখন আমার বাড়ি যাবার সময়।'

'কটা বেজেছে তখন ?'

'প্রায় বারোটা। সেদিন যেতে আমার একটু দেরি হয়েছিল, কাজ আরম্ভ করেছিলুম প্রায় দশটায়।'

'দেরি কেন ?'

'দাদা সবে ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে সেরে উঠেছেন, তাঁকে পথ্য করিয়ে যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল।'

'তারপর ?'

'প্রায় বারোটার সময় পিওন এসে হাজির, হাতে তার প্যাকেট। সুবোধ চৌধুরীর কথায় মোড়কটা আমিই খুললাম, ভেতর থেকে বেরুলো চাটনির শিশি, আর একটা ভাঁজ-করা চিঠি।'

'চিঠি !' সোমেন আর ভানুবাবু একসঙ্গে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো : 'এতক্ষণ বলেননি কেন ?'

ভূপতি হাসলো : 'চাটনির শিশির মোড়ক খুললে পরে তো চিঠি বেরুবে। আগেই তো আর চিঠি উড়ে আসতে পারে না।'

'সে-চিঠি কোথায় ?' ভানুবাবু অস্থির হয়ে উঠলো : 'তোমার কাছে আছে ?'

'আমার কাছে থাকবে কি করে ? সুবোধ চৌধুরীর নামে চিঠি, আমাকে কি কখনো তা সে দেয় ? নেওয়া সম্ভব বলে মনে করেন ?'

'সে-চিঠি পড়েছেন আপনি ?' সোমেন প্রশ্ন করলো।

'পড়ছিলুম, কিন্তু খপ করে আমার হাত থেকে চিঠিটা উনি কেড়ে নিলেন, বললেন, "সেই সার্টিফিকেট চেয়েছে তো ? চাটনির শিশিটা তুমিই নিয়ে যাও, খেয়ে দেখে তুমিই সার্টিফিকেট দিও।" বলে চিঠিটা তিনি জামার বুক-পকেটের মধ্যে রেখে দিলেন।'

'বুক-পকেটের মধ্যে রেখে দিলেন!' সোমেন অবাক হবার ভঙ্গি করলো : 'চিঠি রাখবার ঐটেই ওঁর জায়গা নাকি ?'

'প্রথমটা আমার কিছু মনে হয়নি, কিন্তু এখন সন্দেহ হচ্ছে, ঐ চিঠিটা উনি সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। অমনি ধরনের বাজে চিঠির জায়গা হচ্ছে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট। প্যাকেটের মোড়কটা উনি অনায়াসে ঝুড়ির মধ্যে ফেললেন, অথচ চিঠিটা রাখলেন বুক-পকেটের মধ্যে। ওঁর ইচ্ছে নয় ঐ চিঠি কেউ পড়ে, মনে হয় ঐ চিঠির মধ্যেই আছে কিছু রহস্য। নইলে ও-চিঠিটা আমার হাত থেকে উনি ছিনিয়ে নিলেন কেন ? যেন কে একটা কী ভীষণ ভুল করে ফেলেছে, যেন এ চিঠিটা তাঁকে লেখা উচিত ছিল না—এমনি একটা ভাব। তাড়াতাড়ি তাই বুক-পকেটের মধ্যে তিনি তা রেখে দিলেন লুকিয়ে, যাতে আমি পর্যন্ত না ভালো করে পড়তে পারি।'

'কে লিখেছে চিঠিটা ? তলায় নাম সই কিছু দেখতে পেয়েছিলে ?' ভানুবাবুর ভুরু দুটো কুঞ্চিত হলো।

'যতদূর মনে পড়ে তলায় নাম-সই কিছু ছিল না। শুধু লেখা ছিল—ম্যানেজার।'

'চিঠির ভিতরকার কোনো কথা ?'

'কোনো বিশেষত্ব আছে বলে মনে হয়নি। যতদূর ভাসা-ভাসা মনে পড়ে, নিতান্ত মামুলি, বাজে চিঠি। একটা দু'লাইন প্রশংসাপত্রের জন্যে একটা দু'লাইন অনুরোধ। কিন্তু কে জানে, অন্তরে কিছু এর গূঢ় রহস্য আছে কিনা। রহস্যই যদি কিছু না থাকবে তবে সুবোধ চৌধুরী অমন শশব্যস্ত হয়ে চিঠিটা পকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেলবেন কেন?'

'গায়ে ওঁর সেদিন কি-রকম জামা ছিল মনে আছে?' এটা সোমেনের প্রশ্ন।

'আর জামা!' ভূপতি একটা হতাশার ভঙ্গি করলো: 'সেই জামা পেলেও তার পকেটে কি আর সেই চিঠি পাবেন? সে-চিঠি এতক্ষণে নিশ্চয়ই ছাই হয়ে গেছে।'

'তা যাওয়াই সম্ভব, কিন্তু জামাটার চেহারার কথা আপনার মনে আছে কিনা বলুন।'

'দাঁড়ান ভেবে দেখি।' ভূপতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'হ্যাঁ, একটা কালো ডোরাকাটা সিল্কের সার্ট ছিল তাঁর গায়ে। ঘটনাটা তো ঘটেছে মোটে পশু—মঙ্গলবার। মনে আছে বৈকি।'

ভানুবাবু নোটবইয়ে খুঁটি-নাটি অনেক সংবাদ একে-একে লিখে নিচ্ছিলো, মুখ তুলে হঠাৎ জিগগেস করলো, 'চিঠিটা পকেটে রেখে তিনি কি বললেন তারপর?'

'বললেন, "চাটনির শিশিটা তুমিই নিয়ে যাও, খেয়ে দেখে তুমিই সার্টিফিকেট দিও।"'

'সে তো চিঠিটা পকেটে পুরবার আগে বলেছিলেন।' সোমেন বললে, 'চিঠিটা পকেটে পুরবার পর কিছু বললেন কিনা তাই জিগগেস করা হচ্ছে।'

'ও, হ্যাঁ, বললেন, "তোমার দাদা ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছেন, মুখে রুচি নেই, চাটনিটা তাঁর ভালো লাগবে হয়তো। তাঁকেও দিও কিছুটা।"'

'বলো কি, তাও বলেছিলেন?' ভানুবাবু চমকে উঠলো।

'উদ্দেশ্য এতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' সোমেন বললে অনান্তিকে।

কিছুক্ষণ পরে এরা বিদায় নিলো। ভানুবাবু বললে, 'তোমার অনেক হায়রানি হলো, কিন্তু উপায় কী বলো।'

ভূপতি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'তাতে আর কী হয়েছে। খুনী ধরা পড়লেই আমি খুসি।'

বাইরে বেরিয়ে এসে সোমেন জিগগেস করলে ভানুবাবুকে : 'কি রকম বুঝছেন?'

ভানুবাবু চিন্তিত মুখে বললে, 'চিঠিটা আগে পাই কিনা দেখি।'

তিন

সেদিন দুপুরবেলায়ই ভানুবাবু আর সোমেন সুবোধ চৌধুরীর বাড়িতে এসে চড়াও হল। গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি দাঁড়িয়ে, চৌধুরী আফিসে বেরুচ্ছেন, এমন সময় এই উৎপাত। আগন্তুকদের পেছনে লাল পাগড়ি ও লাঠি দেখে চৌধুরী কেমন ভড়কে গেলেন।

ভানুবাবু এগিয়ে এসে বললে, 'আপনার বাড়ি আমরা একটু সার্চ করবো।'

আকাশ থেকে ভূপতিত হয়েছেন চৌধুরী মুখের এমনি চেহারা করলেন, বললেন, 'সার্চ! সে কি!'

'হ্যাঁ, এই দেখুন সার্চ-ওয়ারেণ্ট আছে আপনার নামে।'

চৌধুরীর গলার কলার ও কোমরের বেল্ট যেন একসঙ্গে ফেটে গেল—এমন ভয় পেয়ে গিয়েছেন তিনি। দিশাহারার মতো দিগ্বিদিকে তাকাতে লাগলেন শূন্য চোখে। এত বড় একজন ধূর্ত ও ধাপ্পাবাজ হয়ে এ রকম একটা মূঢ় ভাব করছেন যে পুলিশেরও কিঞ্চিৎ মায়া হয়। কিম্বা, কে জানে, এক ধূর্ততার সঙ্গে আরেক ধূর্ততার সাক্ষাৎ হয়েছে।

'দেখুন আপনি যদি আমাদের সাহায্য করেন তা হলে সংক্ষেপেই কাজটা সমাধা হয়ে যেতে পারে—আগা-পাশ-তলা ধরে বিস্তারিত সার্চ করবার আর দরকার হয় না। কি বলেন, রাজি?'

'একশো বার রাজি। কী করতে হবে আমাকে বলুন।'

'চলুন আপনার অফিস-ঘরে।'

চৌধুরী তাদেরকে তাঁর অফিস-ঘরে নিয়ে এলেন। সবাই বসলেন চেয়ারে। কেউই কোনো কথা বললে না খানিকক্ষণ। ভানুবাবু আর সোমেন দেখতে লাগলো ঘরের চেহারা, আসবাব-পত্র, আর চৌধুরী দেখতে লাগলেন অপরিমেয় অন্ধকার।

জাঁদরেল চেহারা এই চৌধুরীর। এত বেশি স্থূলকায় যে দৈর্ঘের চেয়ে আয়তন বড় মনে হয়। এমনিতে বজ্রের মতো হুঙ্কার, বাঘের মতো থাবা, কিন্তু কি-একটা অজানা ভয়ে এখন একেবারে শিশুর মতো দুর্বল, অসহায়। চোয়াল দুটো ভেঙে পড়েছে, তাকাচ্ছেন ভাসা-ভাসা ড্যাবডেবে চোখে।

'আপনি পশু মঙ্গলবার দুপুর বারোটার সময় সিল্কের যে ডোরা-কাটা শার্টটা পরেছিলেন সে-শার্টটা আমাদের চাই।' ভানুবাবু বাঁকা চোখে তাকালো চৌধুরীর দিকে : 'যে-ঘরে সেটা আছে সে-ঘরে শুধু আমাদের নিয়ে চলুন।'

'শার্ট ! সিল্কের শার্ট ! পশু !' চৌধুরী একেকটা শব্দ উচ্চারণ করছেন যেন তাঁর মাথায় একেকটা কে হাতুড়ির ঘা মারছে : 'ককৃখনো না। কে বললে আপনাদের ? আমার কোনো সিল্কের শার্টই নেই, কোনোদিন না। যে-ঘর খুসি আপনারা দেখে আসুন গে, যে বাক্স-আলমারি খুসি তছনছ করুন গে ইচ্ছেমতো। শেষকালে, বলতে চান, কারুর সিল্কের শার্ট আমি চুরি করে এনেছি ?'

ভানুবাবু হাসলো। বললে, 'এটা চুরির কেস নয়, খুনের।'

'তার মানে ?' আতঙ্কে চৌধুরীর ঘাড়টা ক্রমশই ছোট হয়ে আসতে লাগলো।

'মানেটা আরো সহজ করে দিতে পারি, যদি অনুমতি করেন।' সোমেন এবার এগিয়ে এলো : 'সিল্কের শার্ট আপনার না থাক, শার্টে আপনার বুক-পকেট না থাক, কিছুই আসে যায় না। ও আমাদের না হলেও চলবে, শুধু "রসামৃতের" চিঠিখানা আমাদের দিয়ে দিন।'

'কার চিঠি ?'

'"রসামৃতের"।'

'আপনারা কি আমার সঙ্গে মশাই ছ্যাবলামি করতে এসেছেন ?' চৌধুরী মুখিয়ে উঠলেন।

'আপনিই বরং ছ্যাবলামি না করে ঠিক-ঠিক আমাদের প্রশ্নের জবাব দিন।' ভানুবাবু গম্ভীর গলায় বললে, 'পশু আপনার নামে একটা চাটনির শিশি আসেনি পার্শেলে ?'

'দাঁড়ান, হ্যাঁ, এসেছে।'

'তার সঙ্গে একটা চিঠি আসেনি ?'

'আসতে পারে।'

'আসতে পারে নয়, এসেছে। ঠিক করে ভেবে দেখুন।'

'এসেছে তো, এখানে টেবিলের উপরই কোথাও পড়ে আছে, কিম্বা হয়তো এই ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে।'

চৌধুরী ব্যস্ত হয়ে টেবিলের স্তূপীকৃত কাগজ-পত্র ঘাঁটতে সুরু করলেন। কিন্তু, অনেক ওলোট-পালোট করেও টেবিলে কোনো চিঠির সন্ধান পাওয়া গেল না, আর ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটটা শূন্য।

'সেই চিঠি রেখেছিলেন আপনি আপনার জামার পকেটে। আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, ঠিক কিনা।' ভানুবাবু তাকালো বাঁকা করে।

বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো কী যেন দেখলেন চৌধুরী তাঁর চোখের সমুখে। বলে উঠলেন: 'ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে এতক্ষণে। আমি তখন ডিকটেট করছিলুম, পার্শেলটা যখন আসে। পড়বার তখন সময় ছিল না বলে তাড়াতাড়ি সেটা পকেটের মধ্যে পুরেছিলুম মনে পড়ছে,—সত্যি, আশ্চর্য, এখনো সেটা পড়া হয়নি। আর, হ্যাঁ, জামা—বলতে এখন সত্যিই লজ্জিত বোধ করছি, সেদিন গায়ে আমার একটা সিল্কের শার্টই ছিল—আর, সেটায় ছিল কালো ডোরা—'

'লজ্জিত হয়তো আরো বোধ করতে হবে আপনাকে।' ভানুবাবু

নিষ্ঠুরের মতো বললে, 'কিন্তু, যাক সে কথা, সেই জামাটা দয়া করে এখন বের করে দিন, তার পকেট থেকে চিঠিটা আবিষ্কার করি।'

চৌধুরী আরো ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন। বললেন, 'সেই জামা তো কাল বিকেল বেলা ধোপাবাড়ি চলে গেছে।'

'তা আমরা জানতুম।' ভানুবাবুর চোখ ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

'জামা ধোপাবাড়ি পাঠিয়েছেন বুঝলুম, কিন্তু ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেটের কাগজের টুকরোগুলো কোথায় গেল? তাও কি ধোপাবাড়ি নাকি?' ওটা সোমেনের প্রশ্ন।

'তা চাকর বলতে পারে। সেগুলো সে হয় পুড়িয়ে নয় ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়েছে বাইরে।'

'পুড়িয়ে ফেলারই বেশি সম্ভাবনা। আপনার বাড়ির দুধ গরম করা হয় কিনা ও-সব কাগজে।'

কথাটা বিদ্রূপের, কিন্তু মর্মভেদী। চৌধুরী তাই ঝাঁজালো গলায় বললেন, 'তা হয়তো হয় না, কিন্তু কেউ এসে জঞ্জাল ঘাঁটিবে বলে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে আবর্জনা জমিয়ে রেখে দেব আগে থেকে, সেটা জানা ছিল না।'

'তা রাখবেন কেন? রাখলে যে খুনের কিনারা হয়ে যেত।'

'তার অর্থ?' চৌধুরী এবার নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, সামনে টেবিলের উপর প্রকাণ্ড কিল মেরে বসলেন।

ঠাণ্ডা অথচ ধারালো গলায় ভানুবাবু বললে, 'আর যার সামনেই দেখান আমাদের সামনে মেজাজ দেখাবেন না, আমরা আপনার কর্মচারী নই। খুনের কিনারা হতো মানে চিঠি কিম্বা প্যাকেটের কভারের কাগজ পেলে আমরা হাতের লেখা থেকে একটা পরিষ্কার হদিস পেতাম, কার এই কীর্তি। সন্দেহের এলেকায় না থেকে বিষয়টা তখন প্রমাণের এলেকায় এসে যেত।'

চৌধুরী তাঁর মুখের সেই পুরোনো মূর্খতা ফিরিয়ে আনলেন। বললেন, 'খুন—কে খুন হয়েছে? তার সঙ্গে চাটনির শিশিরই বা কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক বুঝতে পারবেন এক্ষুনি। নৃপতি চৌধুরী মারা গেছেন তার খোঁজ রাখেন ? আর তার ভাই—'

'সেও মরো-মরো হয়েছিল। খবরের কাগজে দেখেছি বই কি।' নির্বিকার মুখে বললেন চৌধুরী।

'কিন্তু, কেন, কি কারণে নৃপতি-ভূপতির এই দশা বলতে পারেন ?'

'সে তো মশাই টোম্যান-পয়জনিঙ হয়ে।'

'আজ্ঞে না, মাপ করতে হলো। তাদের এই দশা আপনার সেই উপহার-দেয়া চাটনি খেয়ে। চাটনির শিশিতে বিষ।'

'বিষ!' চৌধুরীর বিশাল দেহ নিমেষে এলিয়ে পড়লো।

মুহ্যমান হলেও পুলিশের লোক তাঁকে মার্জনা করলো না। টিপে-টিপে খুঁটিনাটি সমস্ত কথা তাঁর থেকে বের করলে। মোটামুটি চৌধুরী যা বললেন সমস্তই ভূপতির সঙ্গে মিলে গেল—কোথাও এতটুকু অতিবর্ণনা হয়নি। চৌধুরী স্বীকার করলেন নৃপতির সঙ্গে তাঁর বহুদিনের শত্রুতা, এখন তা হাইকোর্টের চূড়ায় এসে ঠেকেছে। স্বীকার করলেন, দুঃস্থ জেনেও শত্রুকে তিনি অবজ্ঞা করেননি, নৃপতির ভাইকে তিনি অতিরিক্ত মাইনেতে চাকরি দিয়েছেন। শুধু চাকরি দেন নি, ভূপতিকে তিনি স্নেহপূর্ণ প্রশ্রয়ও দিয়েছেন অফুরান। যখন খুসি সে আসত, যত কম খুসি সে কাজ করত, মাইনের বেলায় এক তিলার্ধ ঘাটতি সইতো না। ঠিক, তাঁর কাছে নানা জিনিসের নমুনা আসত, সিল্ক আর স্যুতি, সাবান আর স্নো, আচার আর চাটনি, বেশির ভাগ জিনিসই উঠতো গিয়ে ভূপতির পকেটে। ইদানিং কয়েকদিন সে কাজে আসছিল না, বলেছিল দাদার অসুখ, ইনফ্লুয়েঞ্জা। তারপর প্রথম, পশু যখন সে এল, বেশ একটু দেরি করে এল, বললে, দাদাকে পথ্য করিয়ে এলাম। অনেক দিনের কাজ রয়েছে জমে, কিন্তু কাজ বিশেষ এগুচ্ছিল না, এমন সময় চাটনির প্যাকেট এসে উপস্থিত।'

'শিশির মোড়কটা কে খুললো ?' জিগগেস করলে ভানুবাবু।

'ভূপতি।'

'নিজের থেকে খুললো, না আপনি বলেছিলেন খুলতে ?'

'মনে নেই।'

'দেখুন মনে করে।'

'বোধহয় আমিই বলেছিলাম।' চৌধুরীর গলা ঈষৎ কেঁপে উঠলো।

'তারপর বেরুলো একটা চিঠি?'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে।'

'সেই চিঠি তারপর ভূপতি পড়তে সুরু করেছিল আর আপনি খপ করে তার হাত থেকে চিঠিটা কেড়ে নিলেন? কি, ঠিক কিনা?'

'ঠিক।' চৌধুরীর গলা যেন নিবে এল।

'কিন্তু চিঠিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিলেন কেন বলতে পারেন?' ভানুবাবু আগ্রহে ঝুঁকে পড়লো সামনে।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন চৌধুরী। বললেন, 'কাজকর্ম অনেক পড়ে ছিল, তা ছেড়ে ভূপতি হঠাৎ চিঠির উপর ঝুঁকে পড়লো দেখে তাড়াতাড়ি সেটা কেড়ে নিয়েছিলাম তার হাত থেকে।'

'সে কী কথা?' এবার সোমেন এল এগিয়ে: 'ওদিকে আপনার কথায় ভূপতি প্যাকেটের মোড়ক খুললো, আর আপনারই তর সইলো না চিঠিটা তাকে পড়তে দেবার?'

'হ্যাঁ, কাজকর্ম অনেক জমে ছিল যে।' চৌধুরীর নিজেরই কানে ব্যাখ্যাটা কেমন দুর্বল শোনালো।

'চিঠিটা কেড়ে নিলেন না-হয় বুঝলুম, কিন্তু সেটাকে সরাসরি বুক-পকেটে চালান করলেন কেন?' ভানুবাবু জিগগেস করলো।

'ভূপতির দৃষ্টি থেকে সেটাকে সরিয়ে রাখবার জন্যে হয়তো।' চৌধুরী কি বলতে কী বলছেন নিজেই যেন বুঝতে পাচ্ছেন না।

'মানে, চিঠিটা টেবিলে কোথাও ফেলে রাখলে পাছে পুলিশের হাতে পড়ে সেই ভয়ে সরিয়ে ফেললেন সেটা বেমালুম। ভূপতিকে পর্যন্ত জানতে দিতে চাননি চিঠির বিষয়টা।'

'না, সত্যি, ভূপতিকে পড়তে দিইনি। তার কাজে যাতে বিন্দুমাত্রও ব্যাঘাত না পড়ে, এই শুধু চেয়েছিলাম।'

'সে-কথা বলেছেন একবার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই, চিঠিটা আপনার রাইটিং-প্যাডের তলায় রাখলেও তো তার কাজের ব্যাঘাত ঘটতো না। আর-কোথাও না রেখে সটান বুক-পকেটে রাখতে গেলেন কেন? ওটা কি চিঠি রাখবার জায়গা?'

'বুক-পকেটে না রেখে যদি কোনো বইয়র ভাঁজে রেখে দিতাম তা হলেও এমনি জিগগেস করতেন, ওটা কি চিঠি রাখবার জায়গা?'

'তার মানে, আপনার ইচ্ছে নয় সেটা কারুরই চোখে পড়ে।'

'তাই যদি হবে তবে সেটাশুদ্ধ জামাটা ধোপাবাড়ি চলে যাবে কেন?' চৌধুরীর মুখ যেন একটি গোলাকার মূর্খতা।

এবার শব্দ করে হেসে উঠতে হলো ভানুবাবুর। 'সেটা ধোপাবাড়িতে পাঠিয়েছেন শার্টের সঙ্গে, এ বিশ্বাস আপনার হল কিসে?'

'তাও তো ঠিক।' চৌধুরী যেন আরো ধ্বসে পড়লেন। কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে বললেন অনেক কষ্টে, 'কিন্তু ধোপাটাকে একবার ডেকে পাঠাবো?'

'দরকার নেই। শার্টটা তাকে দেবার আগেই যে তার পকেটের জিনিসটা অন্তর্হিত হয়েছে সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। সুতরাং ও নিয়ে পণ্ডশ্রম করে কোনো ফল হবে না।'

'আপনার ধোপার নাম কি?' এটা সোমেনের প্রশ্ন।

'বাবুলাল।'

'থাকে কোথায়?'

'এই উত্তরে খানিকটা এগিয়ে বাঁয়ের প্রথম গলিতেই তার বস্তি— চাকর ঠিক বলতে পারে।'

'কদ্দিন ধুচ্ছে আপনার কাপড়?'

'এটা নতুন ধোপা, মাস-দুয়েক হয়তো লেগেছে, কিম্বা তারো কম। আগের ধোপাটা দেরি করতো বটে খুব কিন্তু পকেটের জিনিস কখনো খোয়া যেত না তার থেকে। সে আজ থাকলে চিঠিটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।'

'খোপাও ইতিমধ্যে বদলেছেন?' সোমেন হতাশার ভঙ্গি করলো।

'চিঠিটা না হয় গেছে, কিন্তু শিশির মোড়কের কাগজটা সরিয়ে ফেলেছেন কেন?' ভানুবাবুর প্রশ্নটা প্রায় তিরস্কারের মত শোনাল। 'ওটা অন্তত খুঁজে এনে দিন।'

চৌধুরী অবশ, অসহায় বোধ করতে লাগলেন। পুলিশদের নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করানো হল, বাড়ির নর্দমা থেকে রাস্তার ডাস্টবিন পর্যন্ত, কিন্তু কোথাও মোড়কের কাগজ পাওয়া গেল না।

'তা কখনো যায়!' সোমেন বললে।

'অন্তত যদি ওটাও পেতাম, আপনাকে হয়তো নির্দোষ ভাবা যেত কিছুটা। হাতের লেখার একটা নমুনা পাওয়া গিয়েছিল, এই খুনের একটা ক্লু, কিন্তু আপনি তা গোপন করে ফেললেন।' ভানুবাবুর গলায় ঘৃণা ঝরে পড়লো।

ধরণী তখন বিদীর্ণ হল না বলেই সেখানে তখনো দাঁড়িয়ে আছেন এমনি মুখভাব করে চৌধুরী সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'আচ্ছা, আপনি কি পড়ে দেখেছেন চিঠিটা?'

'যা উত্তর দেব, বিশ্বাস করবেন না যে।' চৌধুরী বললেন।

'সত্য কথা বললে বিশ্বাস করবো না কেন?'

'পড়ে দেখিনি।'

উত্তর শুনে ভানুবাবু ঠোঁট বেঁকালো, কথাটা যে বিশ্বাস-যোগ্য নয় তারই অভিজ্ঞানে। সোমেন বললে, 'পড়ে দেখবার দরকার কী? ও-চিঠি তো ওঁর আগের থেকেই পড়া। মানে আগের থেকেই লেখা।'

'দয়া করে আরেকটা সত্য কথা বলুন। আপনি ভূপতিকে অনুরোধ করেছিলেন নিজে খেয়ে দেখে চাটনির সার্টিফিকেট দিতে?'

'বলেছিলাম।'

'কেন?'

'ও-সব জঞ্জাল আর সহ্য হত না—ঐ সার্টিফিকেট দেয়া।'

'আর, চাটনির অংশ দিতে বলেছিলেন নৃপতিকে?'

'বলা অসম্ভব নয়।'

সন্দেহের রেখাটার উপর মোটা করে দাগ পড়লো। 'হঠাৎ তার প্রতি এত দয়া?'

'শত্ত শত্রু হলেও অসুস্থ জানলে কেমন তার প্রতি একটা মমতা হয়। আপনাদের কী হয় জানি না, কিন্তু আপনাদের কেউ যদি হঠাৎ এখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তা হলে আপনাদের সেবা করতে আমি ত্রুটি করবো না নিশ্চয়ই।'

'তবে সেই উদার মমত্ববোধের থেকেই নৃপতির নাম করেছিলেন বোধহয়।' ভানুবাবুর স্বর স্পষ্ট বাঁকা।

'হ্যাঁ, ভেবেছিলাম, চাটনিটা তার রুগ্ন, হৃতস্বাদ মুখে রুচিকর হবে।'

'যাতে কিনা খাওয়ার ফলটা আপনার পক্ষে রুচিকর হতে পারে।— কেমন, ঠিক নয়?'

এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে কে-একজন এসে সেখানে দাঁড়ালো। চাকর-বাকর কেউ হয়তো।

চৌধুরী ব্যস্ত হয়ে তাকে জিগগেস করলেন, 'কী হল?'

লোকটা বললে, 'বাবুলাল বাড়ি নেই, ভাটিতে গেছে।'

'আমাদের না জানিয়ে ধোপাবাড়িতে লোক পাঠাবার আপনার কী দরকার ছিল?' ভানুবাবু উত্তেজিত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো এক নিমেষে। 'তার মানে, এই সুযোগে খবর পাঠালেন তাকে, যাতে চিঠিটা যদি ভুলে তার হাতে গিয়ে থাকে তবে যেন সেটা সে নষ্ট করে ফেলে কিম্বা আপনার লোকের হাতে ফিরিয়ে দেয়।'

'আপনার যা খুসি ভাবতে পারেন, যতক্ষণ আমার স্বাধীনতা আছে ততক্ষণ যা খুসি আমিও করতে পারবো।' চৌধুরীও এবার সীমা লঙ্ঘন করলেন।

কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারলেন না। ভানুবাবু এগিয়ে এলো চৌধুরীর অনেক কাছে, সাধারণ ভদ্রতায় যতটা সম্ভব নয়। দৃপ্ত ভঙ্গি করে বললে, 'আপনাকে আমার গ্রেপ্তার করতে হল, মিস্টার চৌধুরী।'

মুহূর্তে সমস্ত বাড়িতে নেমে এল সশঙ্ক, শোকার্ত স্তব্ধতা।

চৌধুরী টলতে-টলতে চেয়ারে বসে পড়লেন।

কিছু জিনিস নিয়ে গেল পুলিশ—কয়েকখানা চিঠি, বক্তৃতার কটা নকল, হিসেবের কটা খাতা আর একটা ইংরিজি টাইপ-রাইটার যন্ত্র। এদের সঙ্গে খুনের কী সম্পর্ক থাকতে পারে বিধাতাও বলতে পারেন না। সার্চের সাক্ষী হল কর্পোরেশানের একটা মিস্ত্রী, রাস্তার একটা বিড়িওয়ালা। ছি, ছি, কী লজ্জা, কী অপমান! রাস্তায় ভিড় জমে গেছে দস্তুরমতো। এবার কোমরে দড়ি পরিয়ে দিলেই চলে।

মোটরেই গেলেন চৌধুরী। সঙ্গে ভানুবাবু আর দু' জন লাল পাগড়ি।

একজন কনস্টেবল নিয়ে সোমেন থেকে গেল। বললে, 'আমার একটু কাজ আছে।'

চার

যা ভেবেছিল সোমেন।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে পাওয়া গেল বাবুলালকে। খবর নিয়ে জানলো চৌধুরীদের কাপড় এখনো ভাটিতে দেয়নি, বাঁধাই আছে বোঁচকা করে।

'খোলো।'

শুনে হয়তো খুলতো না, কিন্তু দেখে খুলতে হলো। বেরুলো একটা কালো ডোরা-কাটা সিল্কের শার্ট।

'এটা সাহেবের?'

'হবে হয়তো।'

কী অমূল্য জিনিসই না-জানি ভুল করে ঐ জামার পকেটে থেকে গেছে—হয়তো নোট, নয়তো চেক—বোকার মতো মুখ করে তাকিয়ে রইলো বাবুলাল—কিন্তু হায়, বুক-পকেট থেকে শেষ পর্যন্ত বেরুলো কিনা একটুকরো একটা চিঠি। আর তা পেয়েই কিনা পুলিশের বাবুর চোখে-মুখে এত খুসি!

সহজেই সোমেন ছেড়ে দিল বাবুলালকে। বখশিস দিলে মানায় না, নইলে বখশিস দিত। নিরিবিলিতে পড়লো আবার সে চিঠিটা :

রসামৃত
৪৯৬ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, এই সঙ্গে আমাদের নূতন আমের চাটনি এক শিশি আপনাকে নমুনা-স্বরূপ পাঠাইতেছি। আমরা জোড় করিয়া বলিতে পারি ইহা খাইয়া আপনি পরিতৃপ্ত হইবেন। ইহা শুধু মুখরোচক নয়, বলকারীও বটে। ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে আপনার স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রশংসাপত্র যদি আমাদের পাঠাইয়া দেন তবে অত্যন্ত উৎসাহিত হইব।

বিনীত
ম্যানেজার

থানায় গিয়ে সোমেন ভানুবাবুকে চিঠি দেখালো। বললে, 'চৌধুরী কখনো খুন করেনি।'

'কি করে প্রমাণ পেলে?'

'প্রমাণ আপনার হাতে। প্রমাণ ঐ চিঠি। চৌধুরী যদি খুন করতো তবে ও-চিঠি শার্টের পকেটে করে ধোপাবাড়ি পাঠাতো না।'

'সেটা একটা য়্যাকসিডেন্ট হতে পারে। কোথাও একটা সামান্য ভুল না থাকলে—আঙুলের দাগ, সিগারেটের ছাই বা ট্রেনের টিকিট—খুন ধরা পড়বে কেন? চিঠিটা সরিয়ে ফেলবে বলেই পকেটে রেখে দিয়েছিল, কিন্তু পরে ভুলে গিয়েছে হয়তো। অনেক চিন্তা করে যখন নিশ্চিন্ত হতে হয় তখন এমনি মানুষের ভুল হয়ে যায়।'

'আমার প্রমাণ সেটা নয়!' সোমেন জোরের সঙ্গে বললে, 'আমার প্রমাণ আরো প্রবল। আমার প্রমাণ চিঠিটা পাওয়ায় নয়, চিঠিটা লেখায়। চৌধুরীই যদি খুন করতো তবে এ-চিঠি লেখবার তার কোনো দরকার হতো না। নিজেকেই নিজে চিঠি লিখে সে নিজেরই বিরুদ্ধে প্রমাণ তৈরি করবে এটা অসম্ভব। আর-আর নমুনার জিনিসের মতো চাটনির শিশিটাও সে অনায়াসে ভূপতির হাতে এমনিই পৌঁছে দিতে পারত। চিঠির দরকার ছিল না।'

ভানুবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো, তলিয়ে ভেবে দেখলো কথাটা। বললো, 'ওটা ভূপতিকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে হতে পারে। চিঠি না থাকলে সে ভাবতে পারতো অন্য কিছু। যেন সত্যি-সত্যি সার্টিফিকেটের জন্যেই শিশিটা এসেছে সে-সম্বন্ধে তাকে নিঃসন্দেহ করা দরকার।'

'নিঃসন্দেহ ভূপতি সব সময়। এ রকম নমুনা সে আরো আগে অনেক নিয়েছে। তার জন্যে চিঠির সে কখনো সন্ধান করেনি। চৌধুরীকে সন্দেহ করবার তার কোনো কারণই ছিল না। সন্দেহ যদি করতো, গোড়াতে চাকরিই নিত না তা হলে।'

'তবে তোমার কী মনে হয়?'

'আমার মনে হয় এর সন্ধান পাওয়া যাবে "রসামৃত" দোকানে। তার ম্যানেজারের কাছে। দেরি না করে সেখানেই আগে চলুন।'

বিকেলবেলাতেই দু' জনে এসে হাজির "রসামৃতে"।

আলমারি-ভরা সারি-সারি চাটনি-আচার, জেলি-জ্যামের শিশি—মাঝখানে গোলগাল চেহারার খর্বাকৃতি একটি লোক চুপ করে বসে আছে। ভঙ্গিটা যেন চিন্তাকুল।

'আপনি কি এই দোকানের ম্যানেজার?' ভানুবাবু জিগগেস করলো।

লোকটা চমকে উঠলো। পরে হেসে বললে, 'ম্যানেজারই বলুন, প্রোপ্রাইটরই বলুন, আর সেলসম্যানই বলুন, আমিই একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি। কী চাই আপনাদের?'

'আমরা পুলিশের লোক। আমরা যা চাই তা হচ্ছে আপনার মুখে খাঁটি সত্য কথা, আমাদের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর।'

লোকটা ঢোঁক গিললো। বললে, 'বলুন।'

'আপনার নাম কী?'

'নাম? আমার নাম নারায়ণদাস ঘোষ। বাড়ি—'

'বাড়ি জিগগেস করা হয়নি। এই দোকান খুলেছেন কত দিন?'

'প্রায় মাসখানেক।'

'দেখুন দেখি—'ভানুবাবু তাঁর য়্যাটাচি-কেস থেকে বিষাক্ত সেই

চাটনির শিশি বের করলো: 'এটা আপনাদের এখান থেকে বিক্রি হয়েছিল? এই চেহারার শিশি, এই ল্যাবেল?'

নারায়ণদাস উৎফুল্ল বোধ করলো হয়তো, বললে, 'হ্যাঁ, এটা আমাদের জিনিস, আমাদের ব্র্যাণ্ড। "রসামৃত" বলতে শুধু আমরাই। কেন, ওরকম চাই আপনাদের?'

'না। এই ব্র্যাণ্ডটা আপনাদের বেরিয়েছে কত দিন?'

'দিন সাতেক। অর্ডারি বোতল ঠিক সময়ে পাওয়া যায়নি বলেই এই দেরি।'

'কটা এ পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে এই চাটনি?'

'ছুটো।'

সোমেন এতক্ষণে কথা বললো, 'আপনাদের হিসেবের খাতা দেখে ঠিক করে বলুন।'

'খাতা না দেখেই আমি বলতে পারবো। আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

'মনে থাকবার কারণ?'

'একই দিনে দশ মিনিটের মধ্যে ছু'-ছুটো বিক্রি হয়ে গেল—তারপর আর বিক্রি নেই—ব্যাপারটা একটু মনে রাখবার মতো বটে।'

'একই দিনে—কবে?'

এক মুহূর্তও না ভেবে নারায়ণদাস বললে, 'গত রবিবার, ছুপুরবেলা।'

'দেখি আপনার ক্যাসমেমো।' বললে সোমেন।

ক্যাসমেমো সমর্থন করলে নারায়ণদাসকে। পাশাপাশি ছুটোতে ছু' শিশি চাটনি, হ্যাঁ, নারায়ণদাসেরই দস্তখৎ ওটা। নারায়ণদাস এক গাল হেসে বললে, 'আমার এমনিতেই সব মনে থাকে, খাতা-পত্র কিছুই দেখতে হয় না।'

'যে ছুজন লোক কিনতে এসেছিল, একসঙ্গে এসেছিল?'

'না—একজনের পর আরেক জন—প্রায় দশ মিনিটের ছাড়াছাড়ি। আমার বেশ মনে আছে।'

'কাউকে চেনেন তাদের?'

'তা কী করে চিনবো বলুন। কত খদ্দের আসছে-যাচ্ছে।'

'তাদেরকে দেখলে চিনিয়ে দিতে পারবেন?'

'তা পারবো আশা করি। একজন খুব ঢ্যাঙা, কালো—আরেকজন, পাংলা ফর্সা,—কিম্বা, না, না, একজন হয়তো কালো মোটা, আরেকজন হয়তো—দেখুন, আমার ঠিক মনে নেই—দুজনেই খুব ব্যস্ত হয়ে ঢুকেছিল কিনা। চেহারার বিষয় কিছু বর্ণনা করতে পারবো না, কিন্তু দেখলে চিনতে পারবো ঠিক।'

'আচ্ছা, সুবোধ চৌধুরীকে চেনেন?'

'কে সুবোধ চৌধুরী?'

'"জনগণ" ব্যাঙ্কের মালিক—লাখপতি—

'রক্ষে করুন মশাই। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার নেই।'

'আপনারা তাঁর কাছে এই চাটনির কোনো স্যাম্পল পাঠিয়েছেন?'

'স্যাম্পল!' নারায়ণদাস আকাশ থেকে পড়লো: 'তাঁকে স্যাম্পল পাঠাতে যাব কেন? কোন দুঃখে?'

'চাটনি সম্বন্ধে তাঁর একটা প্রশংসাপত্র পাবার জন্যে?'

'চাটনির আবার প্রশংসাপত্র কী! যে খাবে সেই প্রশংসা করবে। তার জন্যে নমুনা পাঠাতে হবে পয়সা খরচ করে! আমি কি মশাই পাগল, না, বসেছি আমি এখানে ব্যবসা করতে!'

'দেখুন, এই চিঠি আপনি লিখেছেন?' সুবোধ চৌধুরীকে লেখা সেই চিঠিখানা সোমেন পকেট থেকে বের করে দেখালো।

চিঠি পড়ে নারায়ণদাসের চোখ কপালে উঠলো। 'এ কি, আমার দোকানের ছাপানো চিঠির কাগজ বাইরে বেরুলো কি করে?'

'সে-প্রশ্ন আপনাকে পরে করছি। আগে বলুন, এ চিঠি আপনার লেখা?'

'আমার লেখা! আমার চৌদ্দপুরুষের সাধ্য নেই অমন গোটা-গোটা অক্ষরে অত ভালো বাঙলায় চিঠি লেখে। দেখুন, এই দেখুন আমার সব হাতের লেখার নমুনা।' নারায়ণদাস একগাদা বাঙলা খাতা-পত্র এগিয়ে দিল সোমেনের দিকে।

সোমেন হাসলো। বললে, 'আপনি যে লেখেন নি তা আমরা জানি, কিন্তু বলুন, এ চিঠির কাগজ অন্য লোক পেল কি করে? আপনি যদি না দেন—'

'আমি দেবো মশাই?' নারায়ণদাস উত্তেজিত হয়ে উঠলো: 'কেন, আমার চিঠির কাগজ কেউ চুরি করে নিতে পারে না?'

'তা কেউ নিয়েছে নাকি?'

'নিলেই হলো? আমি তবে সমস্তক্ষণ এখানে বসে আছি কি করতে? আজ চিঠির কাগজ নেবে, কাল শিশি-বয়াম নেবে, পর দিন ক্যাসবাক্স নিয়ে যাবে—চমৎকার!'

ভানুবাবু এইবার ধমক দিল। বললে, 'আপনিই বলছেন চুরি করে নিয়েছে, আবার আপনিই বলছেন, চুরি করা কি মুখের কথা। কী হয়েছে স্পষ্ট করে বলুন। যা জানেন কিচ্ছু লুকোবেন না। এই চিঠির পেছনে একটা খুন আছে।'

'খুন!' নারায়ণদাসের জিভটা কে সজোরে টেনে ধরলো। 'খুনের আমি কিছুই জানি না মশাই।'

'চিঠির কাগজের বিষয় কি জানেন তাই বলুন।'

'তাও জানি না। শুধু এটুকু জানি ঐ কালো ঢ্যাঙা লোকটা—কিম্বা, দাঁড়ান, না, ঐ ফর্সাপানা লোকটাই—আমার কাছে একখানা চিঠির কাগজ চেয়েছিল, কী নাকি লেখার দরকার পড়েছে হঠাৎ। আমি বললাম, চিঠির কাগজ আমার এই সবে ছেপে এসেছে, অন্যকে বিলিয়ে প্রথম বউনি করতে পারবো না। কাগজের দরকার হয় অন্য কাগজ দিচ্ছি আপনাকে। অন্য কাগজ দিতে গেলাম লোকটাকে, নিল না কিছুতেই, বললে, না, দরকার নেই।'

'তবে নিতে পারলো না চিঠির কাগজ?'

'নিক না দেখি! জোর করে ছিনিয়ে নেবে নাকি? একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে না তা হলে?'

'তা হলে এই চিঠির কাগজটা বাইরে বেরুলো কি করে?'

'ভূত—ভূত, নিশ্চয়ই ভৌতিক কাণ্ড।'

'চুপ করুন।' এবার সোমেন এল এগিয়ে : 'কবে ছেপে এসেছে এই চিঠির কাগজ ?'

'হপ্তা খানেক।'

'কোন প্রেস থেকে ছেপেছেন ?'

'আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ধর্মতলা। আমার বন্ধু তার ম্যানেজার।'

'কত ছেপেছেন ?'

'একশো।'

'মোটে একশো!'

'পয়সা দিয়ে তো ছাপতে হয়নি। বন্ধুলোক, লেটারহেড কটা এমনি ছেপে দিয়েছে।'

'প্যাডটা কোথায় ?'

টেবিলের এক ধারে পড়ে ছিল প্যাডটা, নারায়ণদাস এগিয়ে দিল।

সোমেন ফের বললে, 'এটার মধ্যে আছে কটা ?'

'একশো।'

'একটাও খরচ করেন নি ?'

'না। খরচই যদি করবো, বউনিই যদি হবে, তবে একখানা কাগজ সেই লোকটাকে দিতে আপত্তি হবে কেন ?'

'আচ্ছা, গুনছি আমি, দেখি ক'খানা আছে।'

'প্যাডটা তা হলে ছিঁড়ে গিয়ে পাতাগুলি সব খসে যাবে যে।'

'যাবে না, আর যায়ই যদি, উপায় নেই।'

সোমেন বার-বার তিনবার গুনে দেখলো, কাগজ রয়েছে নিরানব্বুইখানা।

'অতএব, সন্দেহ নেই', ভানুবাবু উৎসাহিত হয়ে বললে, 'আপনার এই প্যাড থেকেই এই চিঠির কাগজ নেয়া হয়েছে। যে লোকই আপনার দোকান থেকে চাটনি কিনুক না কেন, চিঠিটা আপনিই লিখিয়েছেন।'

'না, না, ককখনো না।' ভীতিবিহ্বল গলায় নারায়ণদাস বলতে লাগলো : 'একখানা চিঠির কাগজেও আমি এ পর্যন্ত কলম ছোঁয়াইনি। কেউ নিশ্চয়ই

ও-প্যাডের থেকে কাগজ একখানা চুরি করে নিয়েছে—সেই কালোপানা লোকটা চেয়েছিল, সেইই নিয়েছে হাত সাফাই করে। তাই বা কি করে নেবে! আশ্চর্য! আমি সব সময় তাকে চোখে-চোখে রাখলাম, আর আমারই চোখে সে ধুলো দিল? এ হয় না মশাই।'

'নিশ্চয়ই হয় না। কোনো ধাপ্পাই টেঁকে না শেষ পর্যন্ত। অতএব আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম, চলুন আমাদের সঙ্গে।'

নারায়ণদাস বোকার মতো তাকিয়ে রইলো। বুঝলো না, এটা সত্য না রসিকতা। কিন্তু ভানুবাবুর চেলারা যখন চাটনি আর আচারের শিশিতে গাড়ি বোঝাই করে তুললো আর ভানুবাবু নিজে তার চিঠির কাগজের প্যাডটা নিয়ে চললো, তখন তার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে তার "রসামৃত" রসাতলে যেতে বসেছে।

পাঁচ

পরদিন সুবোধ চৌধুরী জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। সকালবেলা ড্রয়িংরুমে বসে তিনি খবরের কাগজ পড়ছেন, বেয়ারা কার্ড নিয়ে এল: সোমেন অধিকারী।

বিরক্ত হলেও চৌধুরী পুলিশের লোককে বিতাড়িত করতে সাহস পেলেন না। ডাকিয়ে আনলেন সোমেনকে।

সোমেন কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'আমি আপনার বেশি সময় নেব না। শুধু আমার গোটাকয়েক প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'বসুন।' চৌধুরী বাঁকা চোখে বললেন, 'কী প্রশ্ন? চাটনিতে কোন জাতীয় বিষ মিশিয়েছি না চিঠি নিচের পকেটে না রেখে কেন বুক-পকেটে রাখলাম!'

সোমেন হাসলো। বললে, 'না, সে সব নয়। প্রশ্নটা আরো স্পষ্ট ও সোজা। প্রশ্নটা হচ্ছে এই, নৃপতি ছাড়া আপনার আর কোন শত্রু আছে কিনা?'

'কেন? শেষকালে আমি না খুন করে খুন করবে আমার শত্রু? গবেষণা করে এই আপনাদের স্থির হয়েছে নাকি?'

'কী স্থির হয়েছে তা জেনে আপনার লাভ নেই। দয়া করে শুধু উত্তর দিন—আপনার আর কোন শত্রু আছে কিনা—'

'কতই তো শত্রু রয়েছে চারিদিকে।'

'খুব নিকট শত্রু কেউ আছে কিনা—'

'এই তো একজন নিকট-শত্রু কাছেই বসে আছে।'

'ভুল, আমি আপনার মিত্র, শত্রু নয়।' সোমেন প্রসন্নমুখে বললে, 'ভানুবাবুর থেকে আমার লাইন সর্বদা আলাদা। সে কথা যাক, এখন শুধু আপনি দয়া করে বলুন এমন কারু সঙ্গে আপনার সম্প্রতি শত্রুতা ঘটেছে কিনা—'

'দাঁড়ান', চৌধুরী একমুহূর্ত চিন্তা করলেন, একটু-বা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঘটেছে। ঘোরতর শত্রুতা। মাসখানেকও হয়নি হয়তো।'

'কী হয়েছিল?' সোমেন উৎফুল্ল হলো মনে-মনে।

'আমার ব্যাঙ্কের এক লেজার-কিপারের চাকরি খেয়েছি। অপরাধ তার সামান্যই, কিন্তু মুখে-মুখে তর্ক করেছিল, তাই সহ্য করিনি। আশি টাকা মাইনের চাকরি, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সমেত তাকে পথে বসিয়ে দিলাম।'

'কাঁদাকাটা করেনি? চাকরিটা ফিরে পাবার জন্যে হাতে পায়ে ধরেনি আপনার?'

'না। বরং চাকরিটা নেবার পর আমার দিকে এমন চোখে সে তাকালো যেন সে আমার উপর এক্ষুনি লাফিয়ে পড়বে। অমন হিংস্র কুটিল চোখ আমি দেখিনি।'

সোমেন উত্তপ্ত হয়ে উঠলো: 'কেমন চেহারা সে লেজার-কিপারের?'

'চেহারা? অত্যন্ত কালো আর অত্যন্ত লম্বা। দাঁতগুলো বেশি রকম ভালো আর সাদা—আমি শুধু ঐ দাঁত দেখেই ওকে চাকরি দিয়েছিলাম—'

'নাম কি বলতে পারেন?'

'অনায়াসে। নাম প্রফুল্লচন্দ্র সমাদ্দার।'

'ঠিকানা ?'

'এবার মশাই অনায়াসে পারবো না। আমাকে একটু তবে অফিস-ঘরে যেতে হবে, ঠিকানার ফাইলটা দেখে আসতে।'

চৌধুরী চলে গেলেন। ঘুরে এসে বললেন, 'বত্রিশ সিকদার পাড়া লেন।'

'আমি তবে উঠি।' সোমেন উঠে পড়লো।

'এক্ষুনি ?'

'হ্যাঁ, বড্ড ব্যস্ত। প্রফুল্ল সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।' সোমেন দরজা থেকে ফিরে এল, নিচু গলায় বললে, 'আচ্ছা, এ আপনি ভাবতে পারেন যে প্রফুল্লই আপনাকে চাটনির শিশিটা পাঠিয়েছিল ?'

'কেন ?'

'মধুরেণ সমাপয়েৎ করবার জন্যে। অম্ল-মধুর খাইয়ে আপনাকে শেষ করবার জন্যে। ভাবা কি খুবই কঠিন ?'

মরুভূমিতে চৌধুরী যেন পিপাসার জল দেখতে পেলেন। বললেন, 'মোটেই না। তার চোখে সেদিন যে চাউনি দেখেছিলাম তাতে ঐ কথাই যেন লেখা ছিল।'

'থাকাই উচিত।' সোমেন হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল।

সটান ভানুবাবুর কাছে। খুলে বললে এই নতুন সংবাদ। বললে, 'আমার থিওরিটা তাতেই আরো জোর পাচ্ছে। আমার থিওরি হচ্ছে, নৃপতিকে চৌধুরী মারে নি, চৌধুরীকে আর কেউ মারতে চেয়েছিল, কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় সেটা ভূপতির হাত হয়ে নৃপতির পাতে গিয়ে পড়লো।'

ভানুবাবু গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি ত খুনের মাঝে দৈবদুর্ঘটনার কিছু মানতে প্রস্তুত নই।'

'তা হলে আপনার সন্দেহ করতে হয় ভূপতিকে নয় চৌধুরীকে।'

ভানুবাবু হাসলো, 'যে খুন করবে, ইচ্ছে করে সে নিজে বিষ খাবে এটা অসম্ভব।'

সোমেন বললে, 'আর যে সহজেই বিষ উপহার দিতে পারে সে বিষের সঙ্গে একখানা চিঠিও লিখে দেবে এটাও বিশ্বাস করা যায় না।'

'তবে তোমার মত কী ?'

'আমার মনে হয়, আসল যে খুনী তার উদ্দেশ্য ছিল চৌধুরী, নৃপতি নয়। ঘটনাচক্রে চৌধুরীর বিষ নৃপতি খেয়ে ফেলেছে।'

নিরুত্তেজ কণ্ঠে ভানুবাবু বললে, 'তবে দেখে এস প্রফুল্ল সমাদ্দারকে, কিছু খুদকুঁড়া পাও কিনা।'

প্রফুল্ল সমাদ্দারকে বাড়ি পাওয়া গেল। যেমনটি চেয়েছিল সোমেন, ঠিক তেমনি। যেমন কালো তেমনি লম্বা! তদুপরি দুর্বৃত্তের মতো দেখতে। দেখলেই কেমন মনে ছাপ বসে যায় এইই খুন করেছে। দাঁতগুলি অসম্ভব সাদা।

'আপনি সুবোধ চৌধুরীকে চেনেন ?'

'"জনগণের" চৌধুরীকে ? কি আশ্চর্য, তাকে চিনি না ? হাড়ে-হাড়ে চিনি।'

'কেমন লোক বলতে পারেন ?'

'কেমন লোক! একটা আস্ত নরখাদক। টাকার গরমে ধরাকে সরাজ্ঞান করছেন সব সময়। কিন্তু হয়ে এসেছে তার। জানেন না বুঝি তার কীর্তি ?'

'নৃপতি চৌধুরীর খুনের কথা বলছেন তো ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু', প্রফুল্ল কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বললে, 'কিন্তু, আপনাকে তো আমি চিনতে পাচ্ছি না। কি জন্যে এসেছেন জিগগেস করতে পারি ?'

'ওঁর ব্যাঙ্কে একটা চাকরি খালি আছে। ভাবছি নেব কিনা—'

'আমার সেই চাকরিটা বুঝি ?'

'হ্যাঁ, তাই আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে এসেছি।'

'নিতে পারেন, যদি বুড়োবয়সেও হামাগুড়ি দেবার অভ্যেস বজায় থেকে থাকে আপনার, সব সময়ে যদি দাসত্বের ভারে বক্র করে রাখতে পারেন মেরুদণ্ড।'

সোমেন মৃদু হেসে বললে, 'চাকরি করতে গেলে মনিবের কাছে আভূমি আনত হয়ে থাকতে হবে বৈকি।'

'সার্থকজন্মা আপনারা, কিন্তু আমার জাত আলাদা। আমি সইতে পারি

না এই প্রভুত্বের স্পর্ধা—পারলে বেঁচে যেতাম হয়তো, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আজ আমাকে পথে বসতে হতো না। কিন্তু আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি, পথে তাকেও শিগগির বসতে হবে। আমার পেছনে সে গুপ্তচর লাগিয়েছে, কিন্তু সে জানে না নিজের ফাঁদেই সে জড়িয়ে পড়বে ক্রমাগত। অত্যাচারিতের সংখ্যা শুধু আমি একা নই।' প্রফুল্লর মুখে কতগুলি ক্রূর রেখা ফুটে উঠলো।

'তার ব্যাঙ্কের অবস্থা কী রকম ?'

'পদ্মপাতায় শিশিরবিন্দুর মতো। ঈশ্বর সহ্য করবেন কেন এই দম্ভ ? এবার হাড়িকাঠে গলা ঢুকেছে, এক কোপেই ব্যাঙ্কফ্যাঙ্ক সব সাবাড়। খালাস পেলেও ব্যাঙ্ককে বাছাধন আর বাঁচাতে পারবেন না।'

সোমেন বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে, 'আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে যদি বাইরে একটু আসেন—'

'তার মানে ?'

'সঙ্গে গাড়ি আছে, আপনার ভাবনা নেই।'

প্রফুল্ল চোখ কচলে চেয়ে দেখলো, পুলিশ।

দ্বিরুক্তি করে লাভ নেই, প্রফুল্ল এল হাজতে, নারায়ণদাসের সামনে।

নারায়ণদাস উল্লসিত হয়ে উঠলো : 'এই লোক সেদিন আমার দোকান থেকে চাটনি কিনেছিল। এই সেই ঢ্যাঙা কালো লোক।'

'হ্যাঁ, কিনেছিলামই তো।' প্রফুল্ল একটুও ঘাবড়ালো না : 'আপনি "রসামৃতের" প্রোপ্রাইটর না ? জিনিস বিক্রি করতে পারেন তাতে আপনার দোষ নেই আর কিনেছি বলে আমার দোষ হল ?'

'কেন, সেই চাটনি খেয়েছেন আপনি, না, প্যাক করে পাঠিয়েছেন চৌধুরীকে ?' সোমেন কড়া গলায় প্রশ্ন করলে।

'বা, খেয়েছি বই কি ! পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস দাতব্য করতে যাব কোন দুঃখে ?'

'খেয়েছেন, বোতলটা ফুরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই ?'

'ককখনো না। এই সেদিন কিনলাম আর এরি মধ্যে ফুরিয়ে যাবে ? আমরা কী রাক্ষস ?'

'আছে, বোতলটা পাওয়া যাবে আপনার বাড়িতে?' সোমেন যেন হতাশের মতো বললে।

'নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এরি জন্যে এত কষ্ট করলেন মিছিমিছি? আমাকে তখন জিগগেস করলেই তো স্বীকার করতাম যে "রসামৃত" থেকে চাটনি আমি কিনেছি, আর দেখিয়ে দিতাম এই সেই বোতল।'

'আচ্ছা, চলুন আপনার বাড়ি।'

কিন্তু প্রফুল্লর বাড়িতে চাটনির শিশি খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রফুল্ল আর তার স্ত্রী খুঁজতে বাকি রাখলো না, আলমারি, মিটসেফ, প্যাঁটরা, ট্রাঙ্ক, বালিশের তলা পর্যন্ত, কিন্তু কোথাও চাটনির শিশি নেই।

সোমেন বিজয়ীর মতো হাসলো আর প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করলে।

ছয়

সোমেন বললে, 'চিঠির কাগজটা প্রফুল্ল ঐ প্যাডের থেকে সংগ্রহ করেনি।'

ভানুবাবু বিরক্ত হয়ে উঠলো: 'কখন যে তুমি কী বলো তার ঠিক নেই। ঠিকঠাক নিরানব্বুইখানা আছে, একখানা যে চুরি হয়েছে তার সন্দেহ কী।'

'গোড়াতেই তাই ভেবেছিলাম বটে, কিন্তু, এখন দেখছি, ভুল হয়েছিল। দেখছেন না, প্যাডের দু'ধার আঠা দিয়ে আঁটা, পাতা ছিঁড়ে নিলে তাতে দাগ পড়তো নিশ্চয়ই। ও-প্যাড দপ্তরি-বাড়ি থেকেই নিরানব্বুইখানা হয়ে বেঁধে এসেছে।'

'সত্যি, আমরা প্রথমে কত ভুল বুঝি বলো দেখি!' ভানুবাবু সমর্থন করলো, বললে, 'তবে কোত্থেকে জোগাড় হল ও-কাগজ? প্রেস থেকে?'

'হতে পারে, কিন্তু কাগজ কোত্থেকে জোগাড় হয়েছে এ-প্রশ্নের চেয়ে কে লিখেছে এ-চিঠিটা সেইটেই বড় প্রশ্ন।' সোমেন বিষণ্ণ মুখে বললে,

'প্রফুল্লর লেখার এত নমুনার সঙ্গে তুলনা করলাম কিন্তু একটার সঙ্গেও বিন্দুতম মিল পাওয়া গেল না।'

'আর কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে নিশ্চয়ই।'

'হবে। কিন্তু সে আর কাউকে খুঁজতেও মন্দ চেষ্টা করা হয়নি, তার ব্যাঙ্কের সহকর্মী, তার ক্লাবের বন্ধু, কিন্তু কোথাও সুফল পাওয়া গেল না।'

'আমি বলি কী জানো? কে লিখেছে এই প্রশ্নের চেয়ে কে কাগজ জোগাড় করেছে এইটেই বড় প্রশ্ন। আর, অপেক্ষাকৃত সহজ। চিঠির কাগজের খোঁজ পেলে খুনীকেও পাওয়া যাবে তার আড়ালে। প্রেসে গিয়েছিলে আর?'

'দু'বার। কিন্তু প্রেসের ম্যানেজার বলছে, সে একশোখানা কাগজই দিয়েছিল দপ্তরিকে বাঁধতে।'

'এ তো মন্দ মুস্কিল নয়।' ভানুবাবু চিন্তাকুল মুখে বললে, 'তবে কি দপ্তরিকে সন্দেহ করবে?'

'কোনো কারণ দেখছি না। সে বলছে, কাগজ সে গুনে দেখেনি বটে, তবে যা পেয়েছিল সবই বেঁধে দিয়েছে।'

এমনি সময় এক কনস্টেবল এসে খবর দিল বুড়ো-মতন এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

কে এই ভদ্রলোক—দুজনেই ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেল।

পরিচয় নিয়ে জানলো ইনিই শ্রীপতি চৌধুরী—নৃপতি-ভূপতির বাবা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে মফস্বল থেকে চলে এসেছেন ঊর্ধ্বশ্বাসে।

'আমি কাঁদবো না আপনাদের সামনে, ভয় নেই। আমার কাঁদার দিন এখনো পড়ে আছে, আমার অন্ধ হওয়া পর্যন্ত। আমি এসেছি আপনাদের কাছে একটা গোপনীয় খবর দিতে।' শ্রীপতি চৌধুরী হাঁপাতে লাগলেন।

'কী বিষয়?'

'কে আমার ছেলেদের খুন করতে পারে—কার পক্ষে সেটা সম্ভব—সেই বিষয়ে আমি আপনাদের কিছু জানাতে চাই।'

'কে—আপনার মতে কে সেই খুনী ?' দুজনে এক সঙ্গেই উৎসুক হয়ে উঠলো।

ভেবেছিল সুবোধ চৌধুরীর নামই বলা হবে, কিন্তু শ্রীপতি চৌধুরী তারস্বরে বলে উঠলেন, 'খুনী হচ্ছে কুণ্ডু—কৃষ্ণকমল কুণ্ডু।'

দু'জনেই থ হয়ে গেল।

শ্রীপতি বললেন, 'দশ হাতে লুটছিল এই কুণ্ডু—আমার ছেলেরা তাই তাকে শাসন করতে গিয়েছিল, এবং তারি এই প্রতিশোধ নিয়েছে সে। নইলে, দেখছেন না, নিজে সে চাটনি না খেয়ে কেমন আলগোছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল টুপ করে—'

আরো অনেক কথাই তিনি বলতে যাচ্ছিলেন সোমেন তাকে বাধা দিল, শান্ত গলায় বললে, 'আপনি এখন বাড়ি যান, বিকেলবেলা আমরা যাচ্ছি আপনার কাছে. তখন কৃষ্ণকমল সম্বন্ধে সমস্ত ইতিহাস শোনা যাবে'খন। ওর থেকে দৃষ্টি আমরা ফিরিয়ে নিইনি।'

'এর মশাই, কোনো ইতিহাস নেই—সোজা স্পষ্ট কথা। সুবোধ চৌধুরী শত্রু হতে পারে কিন্তু সে ছোটলোক নয়। আর এই কৃষ্ণকমল শুধু নেমকহারামই নয়, সে নীচ, পিশাচ। আপনারা আসবেন বিকেলে। আমি তাকে বাবু-বাছা বলে ভজিয়ে-ভুলিয়ে আটকে রাখছি।'

শ্রীপতি চৌধুরী চলে গেলেই বিস্ময়ের শেষ হ'ল না। শোনা গেল কে একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন দেখা করতে, সঙ্গে তাঁর একটি পাঁচ বছরের ছেলে।

শোকার্ত হলেও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা। সবাই হকচকিয়ে গেল।

'কে আপনি ?'

ভদ্রমহিলা ছেলেকে সম্বোধন করে বললেন, 'বাবার নাম বলো, খোকন।'

খোকন বললে, 'আমার বাবার নাম শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সমাদ্দার।'

একটা কান্নাকাটির পালা সুরু হবে এমনি সবাই আশঙ্কা করেছিল, কিন্তু ভদ্রমহিলা পরিষ্কার গলায় বললেন, 'আমার স্বামী সম্পূর্ণ নির্দোষ। তার অভ্রান্ত প্রমাণ নিয়ে আমি এখানে এসেছি। তাকে আপনারা ছেড়ে দিন।'

'প্রমাণ—কী প্রমাণ ?'

'প্রমাণ এই চাটনির শিশি।' বলে ভদ্রমহিলা তাঁর আঁচলের তলা থেকে "রসামৃতের" চাটনির শিশি বের করে ধরলেন।

সত্যিই সেই নমুনার শিশি। সেই ল্যাবেল-মারা। আদ্ধেকটা প্রায় খাওয়া হয়েছে এর মধ্যে।

'কী করে পেলেন ওটা ? কোথায় ?'

'তুমি বলো খোকন, কী হয়েছিল ?' খোকনকে তার মা বললেন।

ভাঙা-ভাঙা কথায় খোকন যা বললে তা সংক্ষেপে হচ্ছে এই যে চাটনির শিশিটা সেই সরিয়ে রেখেছিলো বাড়ির পাশে বাতাবি-লেবুর গাছের তলায়। ওর প্রায় অর্ধেক সে একাই শেষ করেছে। বাবা যখন বাড়ি এসে চাটনির শিশি খুঁজছিলেন সে দুই কারণে শিশিটা বের করে দেয়নি—প্রথম, বাবার কাছে মার খাবার ভয়, দ্বিতীয়, চাটনির শিশিটা নিঃশেষে হারাবার দুঃখ। কিন্তু বাবাকে ধরে নিয়ে যাবার পর মার ও আর-সবাইর কান্নাকাটি শুনে যখন সে বুঝলো যে চাটনির শিশিটার জন্যেই এত কাণ্ড-কারখানা, ওটা ফিরে পেলেই বাবাকে আবার ফিরিয়ে আনা যাবে ও মার কান্না থামবে, তখন সে আর থাকতে পারলো না, চুপি-চুপি বার করে আনলো শিশি বাতাবি-লেবুর গাছের তলা থেকে।

অভ্রান্ত প্রমাণ বই কি! নারায়ণদাসের দোকান সেই থেকেই বন্ধ, সমস্ত মাল পুলিশের হেপাজতে। অতএব এ-শিশি পরে সংগ্রহ করা হয়নি, হতে পারেও না। তা ছাড়া, নারায়ণদাস চিনেছে প্রফুল্লকে তার খদ্দের বলে—দু'জনের মধ্যে একজন। সুতরাং সন্দেহ কী প্রফুল্লর নির্দোষিতায়।

'এ যে বড় জট পাকিয়ে তুললে দেখছি।' ভানুবাবু দু'হাতের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে হেঁট হয়ে বসে রইলো।

প্রফুল্ল ও তার স্ত্রী ও তাদের খোকন একসঙ্গে এক গাড়িতে বাড়ি ফিরে চললো।

'চলুন, চলুন, আপনিও চলুন।' সোমেন ভানুবাবুর গায়ে ঠেলা দিতে লাগলো।

'কোথায় ?'

'নৃপতিবাবুর বাড়ি।'

'সেখানে কী ?'

'সেখানে খুনী আছে লুকিয়ে—কৃষ্ণকমল কুণ্ডু।'

'তোমার যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই! তুমি বিশ্বাস করো ঐ বুড়োর কথা ? কোনো কারণে হয়তো নায়েবের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছে তাই ছেলের খুনের দায় ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে তার।'

'আমি কিছুই বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না। চোখ আর মন শুধু খোলা রাখি। ঐ লোকটাকে আমার খুব সিধে মনে হয়নি গোড়া থেকে। দেখা যাক না হালে কদ্দূর পানি মেলে। চলুন। হয়তো এমনো হতে পারে এক মুহূর্ত দেরির জন্যে মূল্যবান একটা ক্লু হারিয়ে ফেলব। সময়ের চুলের ঝুঁটি আঁকড়ে ধরা চাই।'

সোমেনের উৎসাহের প্রাবল্যে ভানুবাবু স্থির হয়ে বসতে পারলো না।

'আমি পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভাবছি সন্নেসি হব।' বলে সে আড়মোড়া ভেঙে বিশাল একটা হাই তুললো।

সাত

ভূপতিদের বাড়ি গিয়ে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখে ভানুবাবু আর সোমেন অবাক হয়ে গেল।

ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, নীচে, সিঁড়ির রেলিঙের কাছে কান পেতে কৃষ্ণকমল কী শুনছে একমনে।

ভানুবাবু গলা নামিয়ে জিগগেস করলো: 'কী ব্যাপার ?'

কৃষ্ণকমল বিকৃতভাবে হেসে বললে, 'শুনছেন না ?'

'কী ?'

'ঝগড়া।'

'ঝগড়া ? কোথায় ?' ভানুবাবু কান খাড়া করলো।

শুনতে পেল উপরে ভূপতির গলা : 'আপনি শুধু-শুধু এখানে এলেন কেন রোগা শরীরে ? আমি লিখে দিলাম দরকার নেই আসবার, তবু—'

'তুই লিখে দিলেই হল ? আমি বার করে দেব না খুনী কে ?'

'সেটা কি আর দেশের বাড়িতে থেকে বের করা যেত না ?'

'হাতে-নাতে ধরিয়ে দিতে চাই যে।'

'হ্যাঃ, আপনি ধরাবেন ? জমিদারি ছেড়ে তবে পুলিশের চাকরি নিলেই তো পারতেন।'

'পুলিশের চাকরি নেয়া ছাড়া বুঝি খুনীকে খুঁজে বের করা যায় না ! খুনী যে এই বাড়িতেই আছে তা এতদিনেও পুলিশ বুঝতে পারলো কই ?'

সোমেন এগিয়ে এসে কৃষ্ণকমলকে চুপি-চুপি জিগগেস করলে : 'কেমন বুঝছেন ?'

এক গাল হেসে কৃষ্ণকমল বললে, 'বুড়োবাবু পাগল হয়ে গেছেন ! বলছেন কি না খুনী এই বাড়িতেই আছে। ঠাকুরের কথা ভাবছেন হয়তো ! সে আর এ বাড়িতে কোথায় ? সে তো এখনো হাজতে।'

'কেন, ঠাকুর ছাড়া অন্য লোক আর এ-বাড়িতে নেই ?'

পিঠে হঠাৎ কার স্পর্শ পেয়ে কৃষ্ণকমল চমকে উঠলো। দেখলো, পেছন থেকে দু'দুটো পশ্চিমী কনস্টেবল তার দু'হাত সজোরে চেপে ধরেছে।

'য়্যাঁ। আমি ?' কৃষ্ণকমল ভীত-বিবর্ণ গলায় বললে।

'হ্যাঁ, আপনি। কেননা এ-বাড়িতে এখন আপনি ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক নেই। নন্দ গেছে দেশে আর ভবেশ সা হাসপাতালে।'

কৃষ্ণকমল নিচে কনস্টেবলদের জিম্মায় রইলো।

উপরে পিতা-পুত্রে তখনো কথা কাটাকাটি চলছে !

অনেক কথার পর ভানুবাবু জিগগেস করলো : 'আপনি এখানে কার কথায় এসেছেন ?'

'কার কথায় আসব?' শ্রীপতি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন: 'আমার নৃপতি নেই আর আমি স্থির হয়ে বসে থাকব?'

'কে জানালে আপনাকে এই দুঃসংবাদ?'

'কে আবার! বিষকুম্ভ ঐ কৃষ্ণকমল! তার ভীষণ ফুর্তি হয়েছে যে। তাই সে একেবারে টেলি করে জানালে।'

'কই দেখি।'

পকেট থেকে এক গাদা কাগজ বার করে শ্রীপতি টেলিটা বেছে ভানুবাবুর হাতে দিলেন। ভানুবাবু একবার চোখ বুলিয়ে সেটা এগিয়ে দিলেন সোমেনের হাতে।

'টেলিতে সব কথা খুলে বলতে পারেনি বলে বড়ো দুঃখ ঐ কৃষ্ণকমলের। তাই পরদিন দেখুন সে এই লম্বা চিঠি লিখলে আমাকে। সমস্ত ঘটনা ফেনিয়ে-বানিয়ে মস্ত চিঠি। শেষকালে উপদেশ দিলে, ধর্মকর্মে মন দিন। যাতে তাহলে সে আরো ভালো করে লুটতে পারে। নৃপ তার বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছিল বটে কিন্তু বিষধরের দুধ-কলা খেতে দাঁত লাগে না।'

'আপনি তো খুব দুষছেন কৃষ্ণকমলকে', সোমেন মৃদু হেসে বললে, 'কিন্তু প্রমাণ কোথায়?'

ভূপতি একটু ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললে, 'শুধু প্রমাণ নেই, আস্ফালন আছে।'

'এর আবার প্রমাণের অভাব হবে নাকি? খুঁজলেই পাওয়া যাবে ভুরি-ভুরি। তারপর, এই দেখুন ভূপতির লেখা চিঠি, পরের দিনের—'

ভূপতি বললে, 'কৃষ্ণকমল যখন বললে বাবাকে সে আসতে লিখে দিয়েছে তখন আমি ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি লিখে দিলাম তাঁকে, এই শোকের সময় নড়াচড়ার তাঁর দরকার নেই, কদিন পরে একটু সুস্থ হয়ে আমিই যাচ্ছি তাঁর কাছে।'

শ্রীপতিবাবু একেকখানা করে চিঠি বের করে দিচ্ছেন আর সেটা ভানুবাবুর হাত হয়ে সোমেনের হাতে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে।

'আমাকে আসতে লেখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমার সদ্য-সদ্য শোকটা সে

স্বচক্ষে উপভোগ করবে! শোক তো আমি করছিই, কিন্তু তোকেও আমি সুখে রাখবো না। আর, দেখুন আমার নৃপর চিঠি—মরবার সাত দিন আগে আমাকে লিখেছিল—'

সোমেন আর সেখানে দাঁড়ালো না, তরতর করে নিচে নেমে গেল। কনস্টেবলদের বললে কৃষ্ণকমলকে ছেড়ে দিতে।

কৃষ্ণকমল আগের চেয়েও হতবাক হয়ে গেল।

সোমেন বললে, 'চলুন আপনাদের সেরেস্তাগুলি একটু দেখবো।'

কৃষ্ণকমল তাকে রাশীভূত খাতা-পত্রের মধ্যে নিয়ে এল—সিহা, থোকা আর তলববাকির মধ্যে।

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলো সোমেন: 'এই খাতা-পত্র কে রাখে? আপনি?'

'না, নন্দ।' কৃষ্ণকমল শুকনো মুখে বললে।

'সে না-জানি কোথায় গিয়েছে?'

'তারাপুরে। তার বাড়িতে।'

'ভালো কথা।' বলে সোমেন আবার দোতালায় এল। ভানুবাবু তখনো নৃপতির পুরোনো চিঠি-পত্র পড়ছে, যাতে কৃষ্ণকমলের বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ সে বহুবার বর্ণনা করেছে।

ভানুবাবুর তন্ময়তা ভেঙে সোমেন উল্লসিত কণ্ঠে বললে, 'চলে আসুন এখন। আর দরকার নেই। কাল ভোরে আমি তারাপুর যাচ্ছি।'

গাড়িতে যখন ভানুবাবু এসে উঠলো, দেখলো কৃষ্ণকমলের সঙ্গে একগাদা হিসাবের বইও থানায় চলেছে।

তারাপুরে ধরতে দেরি হল না নন্দকে। বিস্তৃতভাবে তাকে সার্চ করা হল, কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু পাওয়া গেল সদ্য-লেখা একটা চিঠি—কে এক সতীশ কর্মকার লিখেছে—১৫ নম্বর সেনপাড়া লেন থেকে। ঠিকানাটা দেখে কেমন তার খটকা লাগলো। ঠিক মনে করতে পারছে না, তাই সে চিঠিটা নিল সঙ্গে।

নন্দকে প্রথমে ভূপতিদের বাড়িতেই এনে তোলা হল। ভূপতি ও তার

বাবা ভয়ঙ্কর অবাক হয়ে গেল—কোথায় কৃষ্ণকমলকে ধরবে, না, ধরলো কিনা পুঁচকে নন্দকে।

সোমেন বললে, 'একে একবার এখন হাজতে নিয়ে যাব।'

'সেখানে কী?' ভূপতি জিগগেস করলে।

'সেখানে একজনে ওকে চিনতে পারে কিনা দেখবো।'

'কে সে?'

'নাম জানি না। নাম জানলে তো জিগগেস করেই জানা যায়।'

'যদি পারে চিনতে?'

'তখন একটু চিন্তা করতে হবে কী করা যায় তারপর। এখনো দেখিনি।' সোমেন হাসিমুখে বললে।

'আর যদি চিনতে না পারে?'

'তখন নিশ্চয়ই জামিনে ছেড়ে দেব। চলুন না, আপনি জামিন হবেন।'

'চলুন।'

ভূপতি আর নন্দকে নিয়ে সোমেন থানায় এল এক গাড়িতে। যাবার পথে সেনপাড়া লেনটা একবার ঘুঁরে গেল। যা ভেবেছিল সে। বুকের ভিতরটা লাফাতে লাগলো। সতীশ কর্মকারের চিঠিটা সে আরেকবার মনে করলে: "জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি দিবেন বলিয়াছিলেন—"

প্রথমে নন্দকে একা একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

কে একটা লোক শীর্ণ-শুষ্ক মুখে একটা টুলের উপর বসেছিল জানলার দিকে চেয়ে। তার কাছে এসে সোমেন বললে, 'দেখুন তো একে চিনতে পারেন কিনা?'

লোকটা জ্বলে উঠলো। বললে, 'না, চিনি না।'

'আহা, ভালো করে দেখুন না একটু আলোয় এসে।'

'এই নিয়ে সতেরো জন দেখলাম।' লোকটা অসীম বিরক্তিতে বললো।

'আর বেশি দেখতে হবে না। আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি পাড়ে। ভালো করে দেখুন একটু দয়া করে। বলুন, এই সেই লোক?'

লোকটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখলো নন্দকে। দৃঢ় ভাবে বললে, 'না।'

নন্দকে ফিরিয়ে নেয়া হল। এবার এল অষ্টাদশতম।

'দেখুন দিকি এই সেই লোক কিনা?'

খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে লাফিয়ে উঠলো নারায়ণদাস। বললে, 'হ্যাঁ, এই—এই লোকই সেদিন কিনেছিল দ্বিতীয় চাটনির শিশি। এই ফর্সা-মতন পাতলা চেহারা—এই সেই, সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় শিশি, মানে শেষ শিশি।'

ভূপতি টলতে-টলতে পায়ের দেয়ালটা ধরে ফেললো।

'আপনার শরীর এখনো দুর্বল আছে দেখছি। এর সাহায্য নিতে পারেন, নির্ভয়ে নির্ভর করতে পারেন একে।' সোমেন ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো।

বলতে-না-বলতেই একটা কনস্টেবল ভূপতিকে জাপটে ধরলো আর একজন সোমেনেরই নির্দেশে পরালো হাতকড়া।

ভূপতিকে বিশ্রাম করতে বলে দুটো আরো কনস্টেবল নিয়ে সোমেন সটান চলে গেল আদিত্য প্রিন্টিং প্রেসে। এখন খুলেছে প্রেস, সতীশ কর্মকারকে পাওয়া গেল। গ্রেপ্তার করে তাকেও নিয়ে গেল থানায়।

পরে, সেখান থেকে সটান ভানুবাবুর বাড়িতে।

ভানুবাবু সানন্দে চীৎকার করে উঠলো: 'আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

হাসিমুখে ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে সোমেন বললে, 'আর দরকার নেই, আমিই এসেছি।'

'কী করে করলে এই অসাধ্য সাধন? ধরলে কী করে?' ভানুবাবু সোমেনের হাত চেপে ধরলো।

'খুব সোজা, জলের মতো সোজা।' সোমেন উৎফুল্ল গলায় বললে, 'এখন যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে ও-লাইনে আগে ভাবিনি কেন?'

'কী, বল না, রহস্যটা কী?'

'এই দেখুন।' বলে সোমেন পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে দেখাল।

গোবিন্দ গোস্বামী লেন
কলিকাতা

কৃষ্ণকমল আপনাকে এখানে আসিতে লিখিয়াছেন শুনিলাম, আপনার আসিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমি সম্পূর্ণ ভাল আছি, শরীরে একটু জোড় পাইলেই বাড়ী রওনা হইব। ইতি।

সেবকাধম
ভূপতি

ভানুবাবু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। 'এর মধ্যে কী আছে?'

'এর মধ্যেই সমস্ত। জিনিসটা সামান্য, বিরাট ইঞ্জিনে ছোট্ট একটা স্ক্রুপের মতো, কিন্তু ঐ ছোট্ট স্ক্রুপটা ঢিলে হয়ে গেলেই সমস্ত ইঞ্জিন বিগড়ে যায়।'

'দেখিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও শিগগির।' ভানুবাবু হাত পা ছুঁড়তে লাগলো।

'দেখুন। এই "জোড়" শব্দটা। "রসামৃতের" চিঠিটার কথা মনে আছে? —"আমরা জোড় করিয়া বলিতে পারি" আর ভূপতির এই চিঠি দেখুন— "শরীরে একটু জোড় পাইলেই—" এরি মধ্যে পেয়ে গেলাম ক্লু।' সোমেন গর্বিত ভঙ্গিতে বললে।

'বুঝলাম না।' ভানুবাবু তেমনি মূঢ় চোখেই চেয়ে রইলেন।

'তখুনি, মুহূর্তের মধ্যে, সন্দেহ এলো ঘনিয়ে। ভাবলাম, এ ভ্রাতৃহত্যা ভূপতির কীর্তি যে নয় তা কে বললে? নিজের উপর যাতে সন্দেহ না আসে তারি জন্যে সেও বিষ খেয়েছে—কিন্তু অত্যন্ত কম পরিমাণে, যাতে বেঁচে উঠতে পারে সে, সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব করতে পারে একা। ডাক্তারের রিপোর্টও তাই ছিল—বেশি পরিমাণে না খেলে এ জাতীয় বিষে প্রাণ যায় না। লক্ষ্য করে দেখেছিলেন কি ভাতের থালা দুটো? নৃপতি খেয়েছিল চাটনিটা ভাতের সঙ্গে মেখে—আর ভূপতি খেয়েছিল আঙুলের ডগায় করে—'

'তা তো হলো, কিন্তু—'

'ভাবলাম, এ যদি ভূপতির কাজ, তবে কে লিখবে সেই "রসামৃতের" চিঠি? ভূপতি নিজে নিশ্চয়ই নয়। লিখবে—লেখাবে সে নন্দকে দিয়ে। চিঠির সে একটা খসড়া করে দেবে আর তাই নকল করে দেবে নন্দ। তাই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলাম নন্দর সেরেস্তা—তার খাতা-পত্র। ভীষণ মিল পেলাম। আর, জানেন তো, যতই ধরে-ধরে লিখুক অক্ষরের আরম্ভ-করা ও শেষ-হওয়ার মধ্যেই মিল ধরা পড়ে।'

'তা পড়ুক, কিন্তু নকল করবার সময় নন্দ খসড়ার "জোড়"কে আসল চিঠিতে "জোর" লিখবে না?'

'লিখবে না।' সোমেন জোরের সঙ্গে বললে, 'কেননা সেও পূর্ববঙ্গীয়। ঐ "জোড়" বানানটা তার চোখে বিসদৃশ লাগবার কথা নয়। তা ছাড়া, ভাবলাম, তাকে দিয়েছে নকল করতে, সাধ্য কী তার যে একটা কমা-দাঁড়ি সে বদলায়।'

'তারপর?'

'নিয়ে পড়লাম কৃষ্ণকমলকে। নৃপতির সঙ্গে ভূপতির কী প্রকার সম্পর্ক ছিল। যা ভেবেছিলাম তাই শুনলাম সবিস্তারে। ভূপতি ছিল উড়নচড়ে, যা কিছু তাই করতে চাইত, কিন্তু নৃপতির কড়া শাসন ও ব্যক্তিত্বের সামনে মাথা তুলতে পারত না। মাইনে যা পেত তার পর্যন্ত হিসেব দিতে হত দাদাকে। দাদা ছিল তার সমস্ত রকম যথেচ্ছাচারের বাধা, তাই সে শেষ পর্যন্ত ঠাওরালে দাদাকে সরাবে, তা হলে পাবে সে সমস্ত সম্পত্তির উপর প্রভুত্ব—হবে সর্বেসর্বা। নন্দকে করলে সে সাকরেদ—কিন্তু পুরোপুরি তাকে বুঝতে দিলে না ব্যাপারটা।'

'বলো কী—এতদূর? ভাই ভাইকে—' ভানুবাবু কপালে চোখ তুললো।

'আর বলো কী! প্রমাণ পেয়ে গেছি হাতে-হাতে। নন্দ আর কর্মকার স্বীকার করেছে।'

'কে, সতীশ কর্মকার?'

'আদিত্য প্রিন্টিং প্রেসের কম্পোজিটর, নন্দর চেনা। সেই চিঠির

কাগজের একখানা সরিয়েছে দপ্তরির বাড়িতে যাবার আগে। নন্দর প্ররোচনায়। নন্দকে দিয়ে বলিয়েছে ভূপতি যে, তাকে শিগগিরই চাকরি দেবে তাদের সেরেস্তায়, এটুকু সামান্য কাজ করে দিলে। তারি জন্যে সতীশ তাগাদা করছে নন্দকে, মুখে আর চিঠিতে। দ্রুত কোনো ফল হচ্ছে না বলে সে অসন্তুষ্ট।'

'আর নন্দ?'

'সে স্বীকার করেছে যে ঐ চিঠি তারই লেখা—ভূপতির প্ররোচনায়। কিন্তু এমনি তার ভুল হয়েছে যে খসড়ার "জোড়"কে সে "জোর" করেনি। চোখে খটকাই লাগেনি তার। আর এমনি ধারা একটু ভুল না হলেই বা চলবে কেন? ঐ ভুলই ঠিক লাইন ধরিয়ে দিল। আর লাইন যখন পেলাম তখন দেখলাম সে একেবারে গন্তব্যস্থানে নিয়ে এসেছে।'

'তুমি বলতে চাও নন্দ কিছু জানত না?' ভানুবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

'না। জানলেও এটুকু শুধু জানত একটা কিছু ফন্দি ভূপতির আছে, কিন্তু সেটা নৃপতিকে খুন করবার তা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি। দেখছেন না, বিষ-প্রয়োগের দিনই সকাল-বেলা লম্বা ছুটি দিয়ে নন্দকে পাঠিয়ে দিয়েছে বাড়িতে। অবিশ্যি, নন্দর পরে যখন সন্দেহ হবে, তখন তা মিটিয়ে দেবার রসদ ভূপতির হাতে এসে যাবে প্রচুর। নৃপতি, মানে বড়বাবু, কর্মচারীদের উপরও কোনদিন শিথিল ছিলেন না, তাই নন্দর মনোভাব ভূপতি, মানে ছোটবাবুর উপরই সদয় ছিল। ভূপতি ভেবেছিল অনেক সময় পাওয়া যাবে, কিন্তু মানুষ ভাবে অনেক কিছুই, ঘটনা ঘটে যায় আকস্মিক।'

ভানুবাবু তেমনি অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠলো: 'কিন্তু "রসামৃতে" গেল কেন?'

'"রসামৃতে" প্রফুল্ল ঢুকল বলে।'

'তার মানে?'

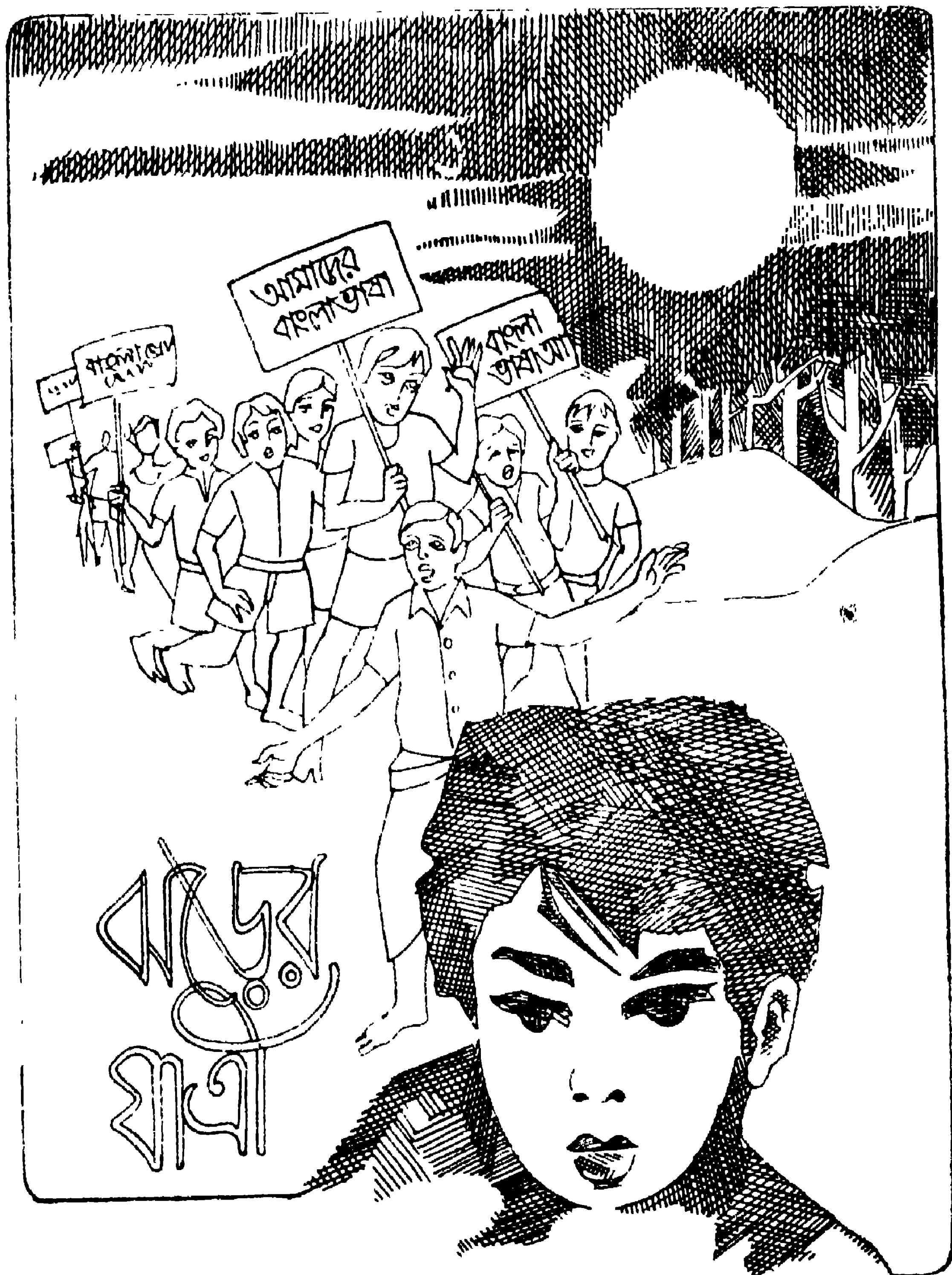
'তার মানে প্রফুল্লকে অনেকদিন ধরেই ভূপতি অনুসরণ করছে, প্রফুল্লর

চাকরি যাওয়ার পর থেকে। সে কেবলই চাচ্ছে যাতে সন্দেহটা কোনক্রমেই তার উপর না আবদ্ধ হয়। নৃপতিকে খুন করেছে সুবোধ চৌধুরী, আর সুবোধ চৌধুরীকে খুন করতে চেয়েছে প্রফুল্ল, আপাতদৃষ্টিতে এই দেখাবার জন্যেই সে মতলব ফেঁদেছিল। এবার, এই চোখে দেখুন ঘটনাটা, দেখবেন সমস্ত ঠিক-ঠিক মিলে যাবে।'

ভানুবাবু স্তব্ধ হয়ে রইলো।

'তাই চাটনির শিশি প্যাক করে পাঠানো চৌধুরীর কাছে, তাই "রসামৃতের" চিঠি, তাই সে চিঠি পড়বার অছিলায় নিজের কাছে রেখে দেবার চেষ্টা। রেজেস্ট্রি প্যাকেটটা নেবার জন্যে পিওনের আসার সময় বুঝে দেরি করে আফিসে আসা নৃপতির ইনফ্লুয়েঞ্জার ওজুহাতে। এবং সব শেষে ভয়ঙ্কর হঠকারিতা, নিজের জিভে সামান্য সে-বিষের স্বাদ নেয়া। ভাবুন একবার, কী জটিল অথচ কী সুশৃঙ্খল চক্রান্ত সে করেছিল, কিন্তু কী সামান্য একটুখানি বানানের ভুলের মধ্যে তার সমস্ত বৈফল্য ছিল সঞ্চিত হয়ে। তার বৈফল্যে আমাদেরই সফলতা। মনে আছে, সে বলেছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারার কথা? কথাটা সে চৌধুরীর সম্পর্কে বলেছিল বটে কিন্তু আমার তখনই খটকা লেগেছিল, ওটা তার নিজের রচনা—চেয়েছিল সে নৃপতি আর চৌধুরীকে একসঙ্গে শেষ করতে। কিন্তু ঈশ্বর থাকুন আর নাই থাকুন, পুলিশ তো আছে, ছাড়া সে পায় কি করে?'

ভানুবাবু উত্তপ্ত উৎসাহে সোমেনকে জড়িয়ে ধরলো। তার পিঠ চাপড়ে বললে, 'কনগ্র্যাচুলেশনস!'


আমাদের
বাংলা ভাষা
বাংলা
ভাষা

এক

—বাবা, এই আমাদের রাম।

মিস্টার ডাট তাকালেন চোখ তুলে। কুণ্ঠিত একটি ছেলে দু' পা কাছে এসে দাঁড়ালো। বয়েস তেরো চোদ্দ হবে। দীপকেরই সমবয়সী।

কিন্তু দত্ত-সাহেবের দৃষ্টিতে তৃপ্তি ফুটলো না। ছেলেটি দেখতে নিতান্ত শ্রীহীন, পরনে মোটা ধুতি, গায়ে খাটো সার্ট, পায়ে ফিতে বাঁধা জুতো। সমস্ত মিলে কেমন যেন ভোঁতা, ফ্যাকাসে। সাহেব চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বিকেলে-পাওয়া খবরের কাগজে মন দিলেন।

পাশেই, আরেকটা সোফাতে বসেছিলেন মিসেস ডট। ডাট-কে তিনি ডাঁটো করেছেন আরো একটু ছেঁটে দিয়ে, যেমন তাঁর আসল নাম লীলাবতীকে তিনি নিয়ে এসেছেন লিলিতে। শুধু উপেক্ষা তাঁর কৌতূহলকে দমন করতে পারলো না। জিগ্‌গেস করলেন—তোমার নাম কী?

—শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—বন্দ্যোপাধ্যায়! হাউ অড্! ইংরিজিতে কী বল? দত্তসাহেব স্থির থাকতে পারলেন না।

—ইংরিজিতেও বন্দ্যোপাধ্যায় বলি।

—লেখবার বেলায়?

—লেখবার বেলায়ও তাই।

—ঐ বন্দ্যোপাধ্যায়? ইম্‌পসিবল! সাহেবের সমস্ত গায়ে যেন স্ঁচ ফুটতে লাগলো। কত সময় নষ্ট হয় ও-কথাটা লিখতে গিয়ে তার খেয়াল আছে? এ-পাশে ও-পাশে কোন্‌খানে ক'টা 'ওয়াই' তা ঠিক করতেই তো প্রাণান্ত। কেন, ব্যানার্জি লেখা যায় না?

—তার চেয়ে আরো সহজ করে ব্যাণ্ডো লিখলেই তো চলে যায়। এ টিপ্পনিটা লীলাবতীর।

—আমাদের সব তাতেই একটা জবড়জঙ্গী ভাব, কিছুতেই স্পীড

আনতে পারি না চেহারায়। বিরক্তিতে দত্ত-সাহেবের মুখে গাম্ভীর্য ফুটে উঠলো—ঐ দেখ না, নামের আগে আবার একটা শ্রী! ক্যাড! ইংরিজিতেও ওটা লেখ নাকি? এস, আই, আর তো লিখবে না কেউ কোনোদিন, তাই নিজেই এস, আর, আই লিখে নি। তাই না?

রাম হাসলো। কিছু বুঝলো কিনা বোঝা গেল না, শুধু সলজ্জ ভাবে একটু হাসলো। নির্দোষ কোনো বোকামি ধরা পড়ে গেলে লোকে যেমন হাসে।

—তোমার বাবার কী নাম?

রাম ঢোঁক গিললো। বললে—পুলিন ব্যানার্জি।

—বাঃ, দত্ত-সাহেব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।—দেখলে, কেমন একটা স্পীড ফুটে উঠলো! নইলে, তার বদলে—শ্রীপুলিনচন্দ্র—উঃ, সাফোকেটিং!

—পুলিনের চেয়ে পলিন অনেক বেশি স্মার্ট। লীলাবতী ফোড়ন দিলেন।

কিন্তু, নামটা হঠাৎ খুব চেনা মনে হলো কী? ব্যস্ত হয়ে দত্ত-সাহেব জিগ্‌গেস করলেন—কী করে তোমার বাবা?

দীপক লাফ দিয়ে বললে—এখানকার সি-এইচ ইনষ্টিটিউশনের সেকেণ্ড মাস্টার।

দত্ত-সাহেব আশ্বস্ত হলেন। আশ্বস্ত হলেন লীলাবতী। কলেজের একটা প্রফেসর শুনলেও বোধ করি কিঞ্চিৎ অস্বস্তি হতো। এ একেবারে তলদেশবাসী।

লীলাবতী সমবেদনাব্যঞ্জক সুরে বললেন—ইস্কুল মাস্টার যখন, অবস্থা তখন নিশ্চয়ই একটা কিছু হৈ-চৈ করবার মতো নয়। তবে তোমার গায়ে উনি অমন লম্বা ধুতি চাপিয়েছেন কেন?

তবে কি তার ন-হাত ছেড়ে আট-হাত ধুতি পরা উচিত? রাম ভ্যাবা-চাকা খেয়ে গেল। তার ধুতির দৈর্ঘ্যটাই দেখবার, স্থূলত্ব নয়?

—এর চেয়ে হাফ্ প্যান্ট পরলে কত কম খরচ পড়ে অথচ কত স্মার্ট হয় দেখতে—লীলাবতী মুখে একটা কারুণ্যের ভাব আনলেন।

লীলাবতীর দৃষ্টি অনুসরণ করে রামও তাকালো দীপকের দিকে। সত্যি দীপক তার চেয়ে কত বেশি চটপটে আর চালাক। কত বেশি প্রিয়দর্শন। তার তুলনায় সে একটি জড়পিণ্ড, কিম্ভূতকিমাকার। এবং এই বৈসাদৃশ্যের মূলে শুধু ঐ পোষাকের বিভিন্নতা। এত বড় কাপড় পরেও যেন তার লজ্জা নিবারণ হয় নি, এই শুধু মনে হতে লাগল বারে বারে।

—ওকে তবে কোন্ পার্টটা দিতে চাও? দত্ত-সাহেব ছেলেকে জিগ্‌গেস্ করলেন।

—যশোবন্ত সিংহের পার্টটাই ওকে ভালো মানাবে, বাবা। দীপক হাসলো।—বেশ মোটাসোটা আছেও দেখতে।

—আশ্চর্য, যাদের ঘরে সচ্ছলতা নেই তাদের ঘরেই স্বাস্থ্য! লীলাবতী বিজ্ঞের মতো মুখ করলেন।

রামের লজ্জা করতে লাগলো, কেন সে যথেষ্ট শীর্ণ নয়। অন্তত ততটুকু শীর্ণ, যেটুকুতে সে সম্ভ্রান্ত হতে পারতো এঁদের কাছে। এক মুহূর্তে সে একটা কঠিন অসুখের থেকে সেরে উঠতে পারে না?

—কেন, নন্দন কী দোষ করলো? ওর তো বেশ হচ্ছিল যশোবন্ত সিং। আসেনি ও?

—এসেছে বৈ কি।

রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের মতো নন্দন দ্রুত আবির্ভূত হলো। নির্ভীক, সচেতন। বুকটা বিস্ফারিত। রামের তখন দুঃখ হতে লাগলো, কেন সে যথেষ্ট মোটা নয়। সে যদি কুঁজো, নন্দন তবে জালা। দুঃখ হতে লাগলো, নন্দন থাকতে তার যশোবন্ত সিং সুদূরপরাহত।

—দেখা যাক, কারটা ভালো হয়। দত্ত-সাহেব উঠে পড়লেন সোফা ছেড়ে।—এসো এবার তোমরা সব রিহার্সেলে। আর সব কোথায় ছেলেরা?

—লনে ওয়েট করছে।

—ডাকো সবাইকে।

হুড়মুড় করে ছেলের দল ড্রইংরুমের মধ্যে এসে পড়লো। পাড়া-বেপাড়ার ছেলে, তিন-তিনটে ইস্কুল থেকে বাছাই করা। সব এই তেরো

থেকে ষোলো'র মধ্যে। ভোরের রোদ্দুরে শিশিরের মতো চক্‌চক্ করছে।

কিন্তু তার বয়সী সব ছেলেরাই হাফ্-প্যাণ্ট পরে এসেছে আর কারুরই পা এমন বাক্স-বন্দী হয়ে নেই—রাম দেখতে লাগলো সবাইর গা ও পায়ের দিকে। এর আগে এমন একটা আশ্চর্য জিনিষ কেন যে সে লক্ষ্য করেনি ভাবলেও আশ্চর্য মনে হয়।

—তারপর, এদিকে এসো, দত্ত-সাহেব রামকে লক্ষ্য করলেন। —পড়ো দিকি যশোবন্তর এই সলিলকিটা।

রামের গলা আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে এলো।

সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেছে। সমস্ত গ্রাম মাটির আশ্রয় ছেড়ে ভেসে উঠেছে জলের ওপর। সঙ্গে ঝড়—দুর্দান্ত ঝড়। কোথায় কার ক্ষেতখামার, লাঙ্গল-গরু, কোথায় কার স্ত্রী-পুত্র। আগাগোড়া জলের— অশ্রুজলের নির্লজ্জতা।

সেই বন্যার্তদের সাহায্যের জন্যে দত্ত-সাহেব ছোট ছোট ছেলেদের দিয়ে একটা নাটক করাচ্ছেন। নাটকটি লিখেছেন লীলাবতী। দেখে দিয়েছেন এখানকার কলেজের বাঙলার অধ্যাপক। সংশোধন করেন এমন তাঁর সাধ্য কী! তবে আওরঙ্গজেবের মুখে My God বা যশোবন্ত সিংহের মুখে Damm it কিম্বা শা'জাহানের মুখে What the blazes—এই জাতীয় ইংরিজি বুকনিগুলো একটু কেটে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ইংরেজ তখনো এদেশে আসেনি।

লীলাবতী ঈষৎ বিনীত ভঙ্গি করে বলেছিলেন—ও-সব কলমের টানে এসে গেছে। কিন্তু যাই বলুন, ওদের মুখে বাঙলা চললে ইংরিজিই বা চলবে না কেন? ওরা কেউ তো আর বাঙালী ছিল না!

কোনো প্রতিবাদ করবেন না এই প্রথমে ঠিক করেছিলেন অধ্যাপক-মশায়। কিন্তু না করে পারলেন না। বললেন—কিন্তু আপনি তো বাঙালী। বাঙলায় লিখছেন।

কথাটা বিশেষ মনঃপূত হলো না লীলাবতীর। মনে করিয়ে দেওয়াতে

তিনি বরং যেন পদচ্যুত বোধ করলেন। কথায় শ্লেষ মিশিয়ে বললেন— ও, হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম আপনি বাংলার মাস্টার!

সে যে কতদূর একটা হেয় কাজ, অধ্যাপকমশায় কোনোই ধারণা করতে পারেননি এতদিন।

নাটকের মধ্যে কি আছে না আছে কিছুই আসে যায় না, রঙ্গমঞ্চে দাড়িয়ে অভিনয় করবে এই রামের কাছে একটা অভিনব ব্যাপার। প্রায় স্বপ্নের মতো।

সত্যি, সে একটা স্বপ্নের জগতে এসে পড়েছে। চোখ খুলে রাখলে বিশ্বাস করা যায় না। একবার মনশ্চক্ষে দেখে নিল সে তার বাড়ি-ঘরের চেহারা, টিনের চাল আর টিনের দেয়াল আর এবড়ো-খেবড়ো মেঝে—আর সে তখন কোথায়, কাদের বাড়িতে! এরি নাম বোধ হয় অমরাবতী, ইন্দ্রের রাজধানী। জ্বলছে বিদ্যুতের চোখ, গাই গাইছে বিদ্যুতের তরঙ্গ। এর সঙ্গে তুলনায় তাদের বাড়ির লণ্ঠন, তাদের বাড়ির গোলমাল। যে গালচের উপর সে এই বর্বর জুতো নিয়ে দাঁড়িয়ে তার উপর শুতে পেলে সে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করত, কত সব দামা আসবাব চারিদিকে, শুধু বসবার আসবাব, ছড়িয়ে বসবার, ডুবে বসবার, ভেঙে বসবার, আধখানা হয়ে বসবার। আর তাদের বাড়িতে কিনা তক্তপোষ ছাড়া পা ঝুলিয়ে বসবার জায়গাই নেই। দত্ত-সাহেবের সঙ্গে তার বাবার কোনো তুলনার কথা সে মনে আনতেই পারলো না, কিন্তু দীপকের মার সঙ্গে নিজের মাকে গেল সে মিলিয়ে দেখতে। অনেকখানি সে টেনে এনেছিল মাকে, কিন্তু গয়নার ঔজ্জ্বল্যের কাছে সজ্জার ঐশ্বর্যের কাছে এসে তিনি হেরে গেলেন! বড্ড ম্লান দেখালো মার মুখ।

নন্দনকে যশোবন্ত সিংহ থেকে টলানো গেল না। সে রামকে হারিয়ে দিলে গায়ের জোরে তত নয়, যত গলার জোরে। তার আরো একটা জোর ছিল। তার বাপ এখানকার ডিপটি।

যশোবন্ত সিংহ কেন, অযশঙ্কর মুষিকও তার কপালে জুটলো না। তার উচ্চারণেই কি-একটা ত্রুটি থেকে গেছে যেটা সূক্ষ্মভাবে পূর্ববঙ্গীয়।

—ঐ বাঙালে টান থাকলে চলবে না কিছুতেই ! লীলাবতী নাকের উপরে ভাঁজ ফেললেন।

স্বয়ং সাজাহান বদ্ধ বাঙাল মুরাদ তো—চোর'কে 'চুর' ও—বোকাকে 'বুকা' বলছে, তাদের বেলায় লীলাবতীর সঘৃণ কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না, বলছেন সেরে যাবে আস্তে-আস্তে, কিন্তু রামের বেলায়ই তাঁর নাকটা বেঁকে বসছে। তার কারণটা অত্যন্ত স্পষ্ট, সাজাহানের বাপ জজ আর মুরাদের বাপ সিভিল সার্জন।

কিন্তু—মেন-পার্টের একটাও না হোক কোনো অপ্রধান চরিত্রেও কি রামকে ঢোকানো যায় না ? রাম তাদের ক্লাশে মাননীয় ছেলে, প্রায়ই প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় থাকে পরীক্ষায়, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ছেড়ে সেও আসুক এই বন্ধুতার ক্ষেত্রে, এই ভারি ইচ্ছে দীপকের। কিন্তু কিছুতেই মাকে নরম করা যাচ্ছে না। প্রায়বারই যে রাম প্রথম হয় দীপককে ডিঙিয়ে ; রামের এই স্পর্ধাটাই তাঁর কাছে সহনাতীত।

অবশেষে জহ্লাদের পার্টটা ছেড়ে দিতে রাজী হলেন লীলাবতী। বললেন—যেমন চেহারা, মানিয়ে যাবে ঠিক।

কোনো একটা পার্টের সঙ্গে মানিয়ে যেতে পারবে এতেই রাম কৃতার্থ মনে করছে নিজেকে। হোক সে জহ্লাদ, হোক সে মৃত সৈনিক। তার ভারি ভালো লাগছে এই পরিবেশ, এই ধনৈশ্বর্যের উত্তাপ, রোমাঞ্চময় লাগছে রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতরণের স্বপ্ন।

—চমৎকার মেক-আপ হবে কিন্তু। দত্তসাহেবের মাথায় একটা পরিকল্পনা এলো।

—ও-সব মামুলি মেক-আপ নয়, আগাগোড়া কালী-মাখা, ঠোঁট আর চোখ সাদা-করা, কানে জবাফুল গোঁজা, রুমাল দিয়ে কপাল বাঁধা—ও-সব নয়।

—না না, তার চেয়েও হিডিয়াস। দত্ত সাহেব হাসলেন।

সেই হাসির অনুকরণ করে রামও হাসলো। বীভৎসকে সত্যি করে-বীভৎস ও নৃশংসকে সত্যি করে নৃশংস দেখানোর মধ্যেও বা কম কৃতিত্ব

কী! কিন্তু সে ভাবলো কেমন না-জানি মজাদার দেখতে হবে তাকে। আর তাকে দেখে মেমসাহেব কত না-জানি সুখী হবেন! বাবা বলেন, পরের সুখকে নিজের বলে ভাবো। মেমসাহেবের সেই সুখে নিজেকে সে কৃতার্থ মনে করলে।

বিকেলের ছায়া আসছে দীর্ঘ হয়ে। দত্ত-সাহেব এবার টেনিস খেলতে উঠবেন। আর লীলাবতী টেনিস ঠিক না খেললেও র‍্যাকেট হাতে করে স্বামীকে এগিয়ে দিয়ে আসবেন কোর্ট পর্যন্ত। তাই উঠতে হলো এঁদের।

ছেলেদের জন্যে আইস-ক্রীম এলো নীল কাঁচের বাটিতে। সবাইকে দিলে একেক করে, রামকেও। সে তো প্রায় বরফের মতোই জমে উঠলো বিস্ময়ে। জীবনে কোনোদিন সে এখনো চামচ দিয়ে কিছু খায়নি, হাতে চামচ নিয়ে সে ভাবলে সে একজন কৃতকীর্তি!

হাতে চামচ তো নয় গাঁইতি। চামচ ফেলে দিয়ে সে সরাসরি আঙুল ডোবালো তুষার-ননীর তালের মধ্যে। ছিটকে খানিক তার কাপড়ের উপর পড়লো বা গোঁফ গজিয়ে গেল ঠোঁটের উপর, কিছু আসে যায় না; ছেলের দল হাসছে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে, তাতেও সে নির্বিকার। শেষ বিন্দুটি অবধি সে খাবে। বাবা বলেন—উদ্দেশ্যটাই আসল, সোপানটা কিছু নয়। খাওয়া নিয়ে হচ্ছে কথা আঙুল না চামচে, জিভ তা জানতে চাইছে না, পাকস্থলী তাতে নিশ্চেতন।

হঠাৎ বাইরে একটা তুমুল চেঁচামেচি শোনা গেল। যেন অনেক লোক হৈ-হৈ করতে করতে এদিকে ছুটে আসছে। যেন আক্রমণ করতে আসছে—এমন তাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের তেজ।

কারা এরা? আসছে তো আসছেই, পিঁপড়ের জাঙালের মতো। স্ত্রী, বুড়ো, শিশু। কাপড়ের ক'টা আঁশ ঝুলছে গায়ে। পেট-পিঠ সমান।

—কারা এরা? ভীত মুখে লীলাবতী জিগ্‌গেস করলেন।

কে একজন বললে—হাঙ্গার মার্চার্স। বানে বাড়ি-ঘর সব ভেসে গেছে বলে খেতে এসেছে সহরে এবং প্রথমেই খোদ কর্তার দুয়ারে।

—কী সর্বনাশ! গেট খুলে ঢুকে পড়লো যে লনের মধ্যে! লীলাবতী আঁতকে উঠলেন।

— যাই, দেখি, ঠাণ্ডা করিগে। দত্ত-সাহেব ভঙ্গিতে দৃপ্তি এনে এগিয়ে গেলেন জনতার সম্মুখে।

—বন্দুক নিয়ে যাও। লীলাবতী চেঁচিয়ে উঠলেন।

—এদের জন্যে এই টেনিস-র‍্যাকেটটাই যথেষ্ট। হাসলেন দত্তসাহেব।

উত্তেজিত কণ্ঠস্বরটা আস্তে আস্তে শোকাকুল আর্তনাদে নেমে এলো, শেষকালে একেবারে নির্জলা কাকুতিতে। তাদের এই দুর্দশা দেখে দয়া কি হবে না বড়লোকের? শেষকালে এই হলো তাদের বুলি।

সাহেব ওদেরকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করলেন, মিষ্টি করে কথা কইলেন, সরকার থেকে টাকা ধার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ক্লান্ত জনতা আস্তে আস্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে মিলিয়ে গেল।

—মিষ্টি কথায় শত্রুকে পর্যন্ত নিরস্ত্র করা যায়, এ তো সামান্য খিদে ভোলানো।

সাহেব র‍্যাকেটটা দোলাতে দোলাতে হাসতে-হাসতে ফিরে এলেন ড্রয়িংরুমে।

রামের কাছে খিদে জিনিষটা খুব সামান্য বলে মনে হলো না, লোক-গুলো চলে গেলেও দু' একটা ক্ষুধাক্লিষ্ট কুৎসিত মুখ সে যেন দেখতে লাগলো জানলার আশে পাশে। রাম তাকালো ছেলেদের দিকে। সবারই প্লেট সমান শূন্য।

দুই

বাড়ি ফিরে এসে নিজেকে রামের ভারি দুঃখী মনে হতে লাগলো, ভারি অকৃতার্থ। একি একটা বাড়ি, না গুহা? না কেঁচোর গর্ত? আট টাকা ভাড়ার বাড়ির আর কী খোলতাই হবে! আর, পঞ্চাশ টাকা মাইনের যে মাস্টার তার বাড়ি এমনি হবে না তো কী! মেঝে যেন নদীর ঢেউয়ের

মতো, খেতে বসলে ঠিক মতো থালা বসে না; আর গোঁজা দিয়ে তক্তপোষের চার পায়া খাড়া করে রাখতে প্রায়ই একটা ময়দানবের মেহনৎ লাগে! একলা ঘরে একলা খাটে দীপকের বিছানা। চোখ দিয়ে ছোঁয়া যায় তার ধবল কোমলতা। আর তাদের তিন ভাইয়ের জন্য যে তক্তপোষ তাতে মল্লযুদ্ধ না করে সুচ্যগ্র তোষকও পাওয়া যায় না। দীপকের আলাদা টেবিল-চেয়ার আর সে কিনা মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে পড়ে, কুলুঙ্গিতে রাখে তার বই-খাতা। আর, রাত্রে সে খাবে কী? মনশ্চক্ষে সে দেখতে পাচ্ছে, জোলো কড়াইয়ের ডাল আর কুমড়ার ঘ্যাঁট! দীপকের বাড়িতে নিজের কানে শুনেছে সে মুরগির আর্তনাদ! কোনো একটা প্রাণীর আর্তনাদে যে এত আনন্দ থাকতে পারে এই বা কে জানতো!

কোনো নিয়মে কি বদ্‌লে যেতে পারে না এই বিশ্ববিধান?

রাম একবার ভাবলো তার অপরিণত কল্পনায়। ভাবলো, কোনো কৌশলে সে কি দীপকে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে না? জ্বলতে পারে না সেই আলাদিনের বাতি?

দেখলো, লণ্ঠনের আলোতে বাবা তাঁর পুঁথি-পত্রের স্তূপ নিয়ে বসে ঘাড় নীচু করে কাজ করছেন। যত নিঃশব্দেই সে আসুক আর যত গভীরেই তিনি মনোনিবেশ করুন, রাম কিছুতেই তাঁর প্রশ্নের স্পর্শ এড়িয়ে যেতে পারলো না।

—এত দেরি হলো কেন রে, রাম? পুলিনবাবু জিগ্‌গেস করলেন।

—দেরি হয়ে গেল, বাবা। রামের জিভের ডগায় একটা জ্বলন্ত মিথ্যে কথা শেষ পর্যন্ত নিবে গেল।

যাক, বেঁচেছে। বাবা চোখ তুলে তাকান নি তার দিকে! মুখোমুখি কিছু জিগ্‌গেস করে আট্‌কে রাখেননি সামনে! ভয়ে রামের বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, এ আশ্বাসে তার শান্তি নেই, কেননা বাবা চামড়ার উপর চোখ রেখে হাড় পর্যন্ত দেখে নেন।

একমাত্র মা ভরসা। মা তাকে বুঝবেন নিশ্চয়ই।

—কিছু খাচ্ছিস না কেন ? পুলিনবাবু জিগ্গেস করলেন খেতে বসে।

—ভালো খিদে নেই, বাবা।

—তবে খাসনে।

কিন্তু মা উঠলেন ফোঁস করে।—খিদে নেই কী! সেই কখন ইস্কুল থেকে এসে ছাতুর দুটো মোয়া খেয়ে বেরিয়েছিস, পেটে তো এখন খাণ্ডবানল জ্বলবার কথা! নে, সামনের ভাত ফেলতে পারবি না একটাও।

অগত্যা কুমড়োর ঘ্যাঁট দিয়ে গরস পাকাতে হলো। মা যে কত কম বোঝে।

—খিদে নেই যখন, তখন জোর করে খাওয়াতে গেলে অসুখ করবে। বাবা কেমন বিচক্ষণ। কেন খিদে নেই তার কারণটা পর্যন্ত জানতে চাইছেন না।

—তাই বলে, ভাত ও ফেলে দেবে নাকি ? লোকে একমুঠো ভাতের জন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে! এই তো গাঁ থেকে দলে-দলে ক্ষুধার্তরা এসেছিল মিছিল করে—মা সুধাময়ী, ঝংকার দিয়ে উঠলেন, যাতে ক্ষুধার্তের প্রতি বেদনার চেয়ে ক্ষুধাহীনের প্রতিই রাগ বেশি।

—হ্যাঁরে কী হলো রে ওদের, জানিস কিছু ? পুলিনবাবু তাকালেন রামের দিকে।—শুনলুম, প্রথমেই নাকি গিয়েছিল সাহেবের কুঠিতে!

—কিচ্ছু হলো না বাবা। যেমনি এসেছিল তেমনি চলে গেল ওপারে। কিচ্ছু না জুটলেও কিচ্ছু গোলমাল করেনি। সেইজন্যেই তো আমাদের—একটা মারাত্মক স্বীকারোক্তির পারে এসে রাম প্রাণপণে বল্গা টেনে ধরলো।

পুলিনবাবু তাকালেন জিজ্ঞাসু চোখে।

সেইজন্যেই আমাদের ফিরতে দেরি হয়ে গেল। দেখছিলুম এতগুলি লোক কী করে নদী পার হয়! বিস্তর নৌকা নিয়ে এসেছিল, বিস্তর লাঠিসোটা। টলতে টলতে সামলে নিয়েছে রাম।

—এত সাজ-সরঞ্জাম করে এসেও খালি হাতে ফিরতে হলো ওদের ? সাহেব কী বললে কিছু শুনেছিস্ ?

যেন নিজের কর্ণে শুনেছে এমনিভাব করে অথচ পরমুহূর্তেই বিপদ স্মরণ করে গম্ভীর হয়ে রাম বললে—কিছুই বলতে হলো না ওদেরকে। শিগ্‌গিরই তোমাদের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এই আশ্বাসেই ওরা বিশ্বাস করে চলে গেল।

—আর কী বা করবে! অসহায়ের মতো বললেন সুধাময়ী।

—আমাদের এই আপাতদুঃখের দেশে পরকালের আশ্বাসই তো একমাত্র সান্ত্বনা। পুলিনবাবু বললেন করুণ মুখে।

অন্য সময় হলে রামেরও মন হয়তো সহানুভূতিতে সিক্ত হয়ে উঠতো; বলতে কি, নীল কাচের প্লেটে সাদা আইস-ক্রীম খাবার সময়ও সে যেন জানালার ওপারে ক্লিষ্ট ও লুব্ধ কতগুলি কাতর মুখের ছায়া দেখছিল, কিন্তু এখন তার চোখের পর্দা গিয়েছে সরে, পরের শূন্য উদরের চেয়ে নিজের পূর্ণ উদরের চিন্তাটাই তার এখন বেশি! আর উদর যখন পূর্ণ থাকে তখন পরের ক্ষুধার পরিমাপ করে, লোকের এমন সাধ্য কী!

সুধাময়ী যেন অঘটনের একটা আভাস পাচ্ছিলেন মনে-মনে, পাছে ছেলে বিব্রত হয় তার বাপের সামনে তাই কিছু সরাসরি জেরা করছিলেন না—সত্যি মাদের কী কোমল পক্ষপাত—রাম যেন আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছিল তার মার চোখে, তার দৌর্বল্যের প্রতি দয়া, তার স্পৃহার প্রতি একটু প্রশ্রয়।

—যা, খিদে নেই যখন, ভাতগুলো চটকাতে হবে না আর। সুধাময়ী বললেন স্নিগ্ধভাবে।—শরীর ভালো না থাকে, ঘুমো গে যা।

উঃ, কতক্ষণে যে মার কাজ ফুরোয়—বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করে বিনিদ্র অপেক্ষা করতে লাগলো রাম। খুঁটিনাটি কত কাজ যে তাঁর হাতের স্পর্শ পাবার জন্যে উঁকিঝুঁকি মারছে তার লেখা-জোখা নেই। রাত এখন নিঃশব্দতায় পাথর হয়ে রয়েছে। পাশের ঘরে বাবার লণ্ঠন গিয়েছে নিবে, ছোট ভাইবোনগুলো কখন কোন্‌টা ধনুকের মতো গিয়েছে বেঁকে, বিড়ের মতো উঠেছে পাকিয়ে, কোনটার বা রোডস-দ্বীপের পিত্তলমূর্তির চেহারা।

ঠিক, মা এসেছেন কাছে। বললেন—ঘুমুতে পাচ্ছিস না কেন, রাম? অসুখ করেছে?

রাম হাসলো, বললে—তোমার সঙ্গে কথা আছে বলে জেগে আছি, মা।

ছেলের গলার স্বরটা অস্ফুট দেখে সুধাময়ী কৌতূহলী হলেন। বললেন—কী কথা?

—বাবা ঘুমিয়েছেন?

—অনেকক্ষণ। কিছুটা যেন শঙ্কা ফুটে উঠলো সুধাময়ীর কণ্ঠস্বরে।—এমন কী কথা?

রাম উঠে বসলো। উত্তেজনাকে যথাসাধ্য চেপে রেখে বললে—আগে একটা সামান্য জহ্লাদ ছিলাম মা, তারপর পোষাক বদলে সম্ভ্রান্ত একজন সেনাপতি হয়েছি, আর একটু যদি মা ফিনিশিং টাচ দেওয়া যায় তা হলেই রাজপুত্র কিংবা স্বয়ং রাজা হয়ে যেতে পারি। ম্লান আলোতেও রামের চোখের উৎসাহ সুধাময়ী স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

সত্যিই তো, মাকে সব বলতে হবে বুঝিয়ে। জহ্লাদ পর্যন্ত ঘটনাটা কারণ ততক্ষণ পর্যন্ত সে পরিত্যক্ত অবহেলিত। নিঃসম্পদ শোভাহীন। কিন্তু হাঙ্গার-মার্চার্সরা যখন প্রত্যাখান হয়ে ফিরে গেল শান্তিতে, আর সাহেব যখন তাঁর মিষ্টি কথার শক্তি দেখে উৎফুল্ল হয়ে বললেন ছেলেদের ভাত খেয়ে যেতে তখন থেকেই সুরু হলো রামের সৌভাগ্যসূচনা। অবিশ্যি প্রথম বাছাইয়ে তাকে অনিচ্ছুকদের দলে ঠেলে ফেলে মেমসাহেব প্রায় তাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছিলেন কিন্তু দীপক তাতে রাজী হলো না। সে এসে তার হাত ধরলো, বললে—আমাদের বাড়িতে খেতে কি তোমার আপত্তি আছে? মোটেই তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু মেমসাহেব বলে উঠলেন—এ তোমার জিগ্‌গেস করতে যাওয়াই ভুল, দীপু! দেখছ না, বামুন-পণ্ডিতের ঘরের ছেলে, পুরুত-ঠাকুরের মতো হাঁটু-অবধি কাপড়ের ঝুল! দীপক বিমর্ষ হয়ে জিগ্‌গেস করলে—তুমি জাতি-ভেদ মানো? হঠাৎ দাঁড়াবার জায়গা পেয়ে রাম সোল্লাসে বলে উঠলো—কক্ষুখনো না।

তাকে আর তখন ঠেকায় কে! দীপক তাকে টেনে নিয়ে এল তার আভিজাত্যের কোটরে, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সিভিল সার্জন এস-ডি-ওর ছেলেদের পঙক্তিতে। নিয়ে গেল তাকে তার নিজের ঘরে, তার অন্তরঙ্গতার নিভৃতিতে। সে মোটেই খুসি নয় যে রাম হবে শুধু একটা হত্যাকারী, রামকে সে চায় তার বিরুদ্ধ চরিত্রে, তার সংঘর্ষের প্রতিবেশিতায়—দীপক যদি আওরঙ্গজেব তবে রাম শিবাজী! কিন্তু সে-পথ বন্ধ করে দিয়েছে তার পোষাকের দীনতা। তাই দীপক তার বাক্স খুলে একটা হাফ্‌প্যান্ট বের করে দিল তার জন্যে। ওদের জামা-কাপড়ের অর্ডার হয় ডজন অনুসারে, তাই যে কটা বের করলো রামের পছন্দের জন্য, সব কটাই নতুন, আর কী আশ্চর্য একটুখানি এঁটে বসলেও মানিয়ে গেল তার গায়ে। সত্যি, রাম প্রথমে নিতে চায়নি, কিন্তু দীপক বললে হেসে, এ দিয়ে যদি মেন পাট একটা হয়, তো মন্দ কী। তা ছাড়া, অতগুলি একসঙ্গে তার রাখবার কোন অধিকার নেই। প্যান্টের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের সংখ্যা তো-কই তার বৃদ্ধি পাচ্ছে না?

তারপর বলবো কি মা, ভোজবাজি হয়ে গেল। মেমসাহেব চোখ রগড়াতে লাগলেন। বললেন—এ কী, জোনাকী যে চাঁদ হয়ে উঠেছে!

—তবু কলঙ্ক এখনো আছে খানিকটা। সাহেব বললেন হাসিমুখে—পায়ে মোজা নেই, জুতোয় কালি পড়েনি তিন কালে, আর মাথার চুলগুলো যেন শজারুর কাঁটা। যাক, জহ্লাদের থেকে তুমি প্রমোশন পেয়ে গেলে রাম, তুমি এখন সেনাপতি মীরজুমলা।

ছেলের দলের সঙ্গে রামও খোলা গলায় হেসে উঠলো।

রাত্রে জুতোয় কালি লাগানোর অর্থ হয় না, নাপিতও হাতের কাছে হাজির নেই। কিন্তু দীপকের মোজা নিয়ে অনেক সে টানা-হেঁচড়া করেছিল কিন্তু কিছুতেই গোড়ালির বিন্ধ্যাচল সে অতিক্রম করতে পারলো না। তাই এখন, মা, তিনটে বিষয়ে যদি কিছু সংস্কার করা যায় তবে মীরজুমলা থেকে নির্ঘাৎ সে দারা কিম্বা সুজায়, এমন কি সাজাহানে পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে। মা কি তাকে সাহায্য করবে না একটুও?

সুধাময়ীর বিস্ময়ের মাত্রাটা প্রায় যায়-যায়। রামের কাঁধের উপরে হাত রেখে জিগ্‌গেস করলেন—এ সব কী, কিছু বুঝতে পারছি না যে!

—ও হরি, আসল কথাটাই যে তোমাকে বলা হয় নি! আমাদের 'ছেলেদের সাজাহান' নামে যে একটা নাটক হচ্ছে! এমন করে লেখা যাতে মেয়ে-টেয়ে না ঢুকতে পারে। আর নাটকটা হচ্ছে কোথায় জান? টাউন হলের স্টেজে। সামিয়ানা খাটিয়ে নয় বাঁশের মাচা বেঁধেও নয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, দস্তুরমতো টিকিট লাগবে দেখতে। কে কিনবে বলছো? সাহেব আর মেম সাহেব জোর করে কিনিয়ে ছাড়বেন।

সুধাময়ী রামের চুলে হাত বুলুতে-বুলুতে বললেন—তোর প্লে দেখতে আমাকেও টিকিট করতে হবে।

যাতে না হয় তারি জন্যেই তো পাট নিচ্ছি মা। কথা উঠেছে মেন পাটওয়ালাদের পাশ দেয়া হবে। মেডেলও তাদের জন্যে, তারই জন্যেই তো আগের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। তারই জন্যেই তো তোমার কাছে একজোড়া মোজা চাই মা!

—মোজা চাই, কিন্তু দীপকের প্যাণ্ট তুমি নিয়ে এসেছ নাকি, সত্যি? কই কোথায়?

—এই যে রেখে দিয়েছি বালিশের নীচে। আমার তো আর আলাদা ট্রাঙ্ক নেই!

সুধাময়ী খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, বললেন—প্লেটা হচ্ছে কেন?

—কী আশ্চর্য, গোড়ার কথাগুলিই আমার খালি ভুল হয়ে যাচ্ছে। ঐ যারা বন্যায় ভেসে গেছে মা, ঝড়ে গেছে ভেঙে, ঐ যারা আজ মার্চ করে হেঁটে গেল সহরের মধ্য দিয়ে, তাদেরই অবস্থার কিছুটা উপশম করবার জন্যে। ওদের জন্যে আমাদের সবাইরই কি কিছু-না কিছু করা উচিত হবে না? তারি জন্যেই তো এত আয়োজন আমাদের।

—কিন্তু ওদের না খাইয়ে খেলে তো শুনি তোমরাই। সুধাময়ীর কণ্ঠস্বর কেমন করুণ শোনালো।

—কিন্তু অত লোককে তো আর রাইস-কারি খাওয়ানো যায় না। আর

দায়িত্ব তো শুধু একলা সাহেবের নয়, সমস্ত সহরবাসীর। আর ভগবান যাদের মেরেছেন—

সুধাময়ী বুঝলেন রাম যেন কার প্রতিধ্বনি করছে। বললেন—তোমরা সবাই রাইস-কারিই খেলে বুঝি ?

—হ্যাঁ মা, মাংস। সেই পরেশ ঘোষালের মেয়ের বিয়েতে একবার খেয়েছিলাম, মা। আর এ তোমার পাঁঠা নয় মা, পাখি। আমার নামের পাখি। রামের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই নিষ্প্রভ হয়ে গেল —মার মুখে তার সমর্থনের আভাস না পেয়ে। বললে—দোষ করেছি কি মা ? বাবা বকবেন শুনলে ?

—কি, মুরগি খেয়েছ বলে ? মুরগি সম্বন্ধে ওঁর রাগ আছে বলে তো শুনিনি।

—কিন্তু যদি শোনেন, দীপকের প্যান্ট পরেছি আমি।

—তাতেও তো রাগের কোনো কারণ দেখছি না।

নিশ্চিন্ত প্রসন্নতায় রাম বললে—আমাকে যদি কোনো বন্ধু কোনো জিনিস উপহার দেয় তা গ্রহণ না করাটাই তো দোষ।

—যদি অবিশ্যি তাতে তোমার দারিদ্র্যের প্রতি না কোনো কটাক্ষ থাকে, তোমার মনে না ঘা পড়ে।

—কিন্তু দীপকের এ-দেয়াতে ও-সব কিছুই নেই, মা। ও চায় আমাকে বন্ধু বলে, ওর পাশটিতে। ওর বাবা-মা মাঝখানে যে-বেড়াটা রাখতে চান তুলে সেটা ও ভেঙে দিতে চায় শুধু।

—তাই মনে হয়।

—কিন্তু বাবাকে তবু বড্ড ভয় করছিলো আমার। প্যান্টের উপর মোটা ধুতিটা বাবার চোখে পড়লে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যেতাম। উনি তো তোমার মতো এতক্ষণ কথা বলেন না আমার সঙ্গে, তাই ওঁকে কিছু বোঝানোও যায় না ভাল করে। প্যান্ট তো আমিও পরতাম আরো ছেলেবেলায়, এখনো না-হয় পরলামই আরো কটা দিন, আর তা নিখরচায়। তুমি বলো, আপত্তি থাকবার কিছুই কারণ হতে পারে না।

—হওয়া উচিত নয়। তবে একটা কথায় ঘাবড়াচ্ছি একটু।

—কি? রামের মুখ কালো হয়ে গেল।

—উনি হয়তো বলবেন—হাফ-প্যাণ্টে নবাব বাদশা হওয়ার চেয়ে মোটা ধুতিতে জহ্লাদ হওয়াও ভাল।

—কিন্তু নবাব বাদশা না হতে পেলে যে পাশ পাওয়া যায় না। পাশ না পেলে মাকে দেখানো যায় না আমার অভিনয়। আর, মা না দেখলে তো আমি কার দিকে চেয়ে ইনস্‌পিরেশন পাবো?

সুধাময়ী রামের মাথায় হাত বুলুতে লাগলেন।

—জুতোয় কালি আমি লাগিয়ে নেব যে করে হোক, চুল ছেঁটে নেয়াটাও কঠিন হবে না, তুমি শুধু আমাকে এক জোড়া মোজা কেনবার পয়সা দাও।

তিন

সবাই এসেছে সাজ-ঘরে, কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময় প্লে আরম্ভ, কিন্তু রাম কোথায়? রামকে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে!

কী ভয়ানক কথা! রাম ছাড়া প্লে হবে কি ক'রে? সবাই এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। পোষাকে-আসাকে আরো বেশি তার উন্নতি হওয়াতে সে যে এখন যশোবন্ত সিংহ। তাকে ছাড়া প্লে আর রাম ছাড়া রামায়ণ প্রায় এক কথা।

সাহেব একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।—সবাইকে দু'ঘণ্টা আগে আসতে বলে দিয়েছি, এখন দেখ দেখি কাণ্ডটা! পাঁচশো টাকার উপরে টিকিট বিক্রি করেছি ঘুরে-ঘুরে—এমনিভাবে পণ্ড হয়ে যাবার জন্যে?

কর্মকর্তার দলের একজন বললেন—হঠাৎ কোনো অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

ছেলেদের দলের কে বললে—না, সকালে দেখেছি তাকে বাজার করতে।

—খোঁজ নাও, খোঁজ নাও শিগ্‌গির। সাহেব নিজের হাত কামড়াবেন, না, হাতের কাছের কাউকে আচমকা কামড়ে দেবেন বুঝতে পারছেন না। —আর, অসুখ সত্যি হ'লেই বা লাভ কী? আচ্ছা, হোক্ অসুখ আমি দেখে নিচ্ছি কী ক'রে তা সারে। তোমাদের কারুর মুখস্থ আছে যশোবন্ত সিংহের পার্ট?

ছেলেরা কেউ এগুলো না।

—তবে যে অসুখই হোক, নিয়ে এস ছোঁড়াকে চ্যাং-দোলা করে। আর যদি অসুখ না দেখ, চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আনবে। জায়গায়-জায়গায় লোক চলে যাও এখুনি। সাহেব হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেন।—যেমন ক'রে পারো যশোবন্ত সিংহকে আনতেই হবে স্টেজের উপর। পারের কাছে এনে আমার ভরাডুবি করবে নাকি?

—সে আসবে না, সার। প্রথম দৌবারিক পার্টের নিরীহ ছেলেটি বললে।

—আসবে না? সাহেবের মাথায় প্রায় বজ্রাঘাত হলো।—কেন? হয়েছে কী?

—তার বাবা তাকে আসতে দেবে না।

—কে তার বাবা?

—কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ বললেন, ইস্কুল-মাস্টার, নলিন না পুলিন বাঁড়ুয্যে তার নাম!

No objection if he is fool-in সাহেব ছেলেটির প্রতি মুখিয়ে উঠলেন—কেন আসতে দেবে না শুনতে পাই?

ছেলেটি ভয়ে মুখ কাচুমাচু ক'রে বললে—আমি ঠিক জানি না, তবে যা শুনেছি—

—তাই বলো না—সাহেব ধমক দিয়ে উঠলেন।

—ওর বাবা নাকি বলেছেন যে রাজা-রাজড়ার পার্টের চেয়ে জহ্লাদের পার্ট নেওয়াই ওর উচিত ছিলো।

—তা না হ'লে আর ইস্কুল মাস্টার হবে কেন? বলি, ব্যাখ্যাটাও কিছু শুনেছ?

—শুনেছি। ছেলেটি শুষ্ককণ্ঠে বললে—রাজা-রাজড়ার পার্ট নিতে তাকে অনেক হীনতা স্বীকার করতে হয়েছে, নিজের যা পোষাক তা ছেড়ে অন্যের পোষাক পরতে হয়েছে, অনাবশ্যক জুতো-মোজা কিনতে হয়েছে, চুল ছাঁটতে হয়েছে চুল বড় হবার আগেই। মাস্টারমশাই বলেন, এগুলি ওর আত্মসম্মানকে ছোট করেছে। তাঁর মতে, ওর উচিত ছিল প্লেতে একদম না ঢোকা—যেখানে পয়সা বা পোষাক দিয়ে যোগ্যতার বিচার চলে; কিম্বা একবার জহ্লাদের পার্টে মনোনীত হবার পর সেই জহ্লাদের পার্টেই লেগে থাকা। সে মুখেই কালি মাখাতো, কিন্তু এখন সে তার মনুষ্যত্বে কালি মাখিয়েছে। সে কালিমা তিনি বার করতে দেবেন না লোকের সামনে। রামকে তিনি আটকে রেখেছেন বাড়ির মধ্যে।

সাহেব বেছে-বেছে ঠিক করলেন বিহারীবাবুকে। বললেন—যে ক'রেই হোক, রামকে উদ্ধার ক'রে আনতে হবে, সঙ্গে তার বাপকেও। দরকার হ'লে গ্রেপ্তার করতেও পেছপাও হবে না।

পুলিন তাঁর বাড়ির সামনেকার খোলা জমিটুকুতে পাইচারি করছিলেন। সানুচর বিহারীবাবু তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন। কোনো ভূমিকা না করেই সরাসরি জিগ্‌গেস করলেন—আপনার ছেলে কোথায়?

তপ্ত শলাকার মতো প্রশ্নটা পুলিনকে বিঁধলো। কিন্তু তিনি গলার স্বরে একটুও উত্তাপ ফুটতে দিলেন না। বললেন—আমার কোন্ ছেলের কথা বলছেন?

—আপনার অতশত খবর কে রাখতে গেছে মশাই? নাম যদি আপনার দশরথ হতো, তবে না-হয় বলতে পারতাম, বড় ছেলে।

—রামের কথা বলছেন? হ্যাঁ, আমার বড় ছেলেই বটে।

—কৃতার্থ করলেন। দয়া করে এখন তাকে একবারটি ডেকে দেন দেখি।

পুলিন সহজেই আঁচ করতে পারলেন। কিন্তু মুখের নির্লিপ্ততা এতটুকু নষ্ট হতে দিলেন না। বললেন—তাকে আপনার দরকার?

—আমাদের দরকার নয় মশাই, স্বয়ং দত্তসাহেবের দরকার। আজ যে তাদের প্লে, খবর রাখেন না কিছু? বিহারীবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

—হ্যাঁ, রাখি বৈ কি। টিকিট পর্যন্ত একখানা কিনেছি। এই দেখুন। পুলিন তাঁর সার্টের পকেটে হাত রাখলেন।

—টিকিট কিনেছেন, কিন্তু আপনার ছেলে কোথায়? বিহারী তাঁর হাতের লাঠিটা একবার ঠুকলেন মাটির উপর!—তার যে যশোবন্ত সিংহের পার্ট!

—জানি। পুলিনের চেহারায় বিস্ময় বা উদ্বেগের এতটুকু আভাস নেই।

—জানেন, কিন্তু ছেলে যে আপনার এখনো পৌঁছয়নি টাউন-হলে। ঠিক সাতটার সময় আরম্ভ, কিন্তু এখনো তার টিকির দেখা নেই। কোথায় আছে সে?

—কোথায় আবার থাকবে! বাড়িতেই আছে।

—বাড়িতেই আছে? বিহারীবাবু যেন নিমেষে উবে গেলেন। দম নিয়ে বললেন—তার অর্থ? থিয়েটারের কথা ভুলে গেছে সে।

—তেমন তো মনে হয় না!

—তবে?

—তাকে আমি যেতে বারণ করে দিয়েছি। সে যাবে না।

—যাবে না? বিহারীর হাত থেকে লাঠিটা খসে পড়লো। মুহূর্তে লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে আক্রমণোদ্যত ভঙ্গিতে বললেন—কেন যাবে না শুনি?

—এই তো বললাম—আমি তাকে যেতে নিষেধ করে দিয়েছি।

বিহারী লাঠিটা আবার ঠুকলেন সরোষে।—কেন নিষেধ করেছেন শুনি?

—তার জবাবদিহি আপনাকে আমি দিতে পারবো না। ছেলে আমার, আমি তার অভিভাবক, আমি যা বলবো তাই সে শুনবে। এতে আর কারুর কর্তৃত্ব ফলাবার জায়গা নেই।

বিহারী হঠাৎ তাঁর গলার স্বর নরম করে আনলেন। বললেন—একটু অনুনয়ের ভঙ্গিতে—কিন্তু সে না গেলে প্লে যে বন্ধ হয়ে যায়।

—প্লে বন্ধ হয়ে যাক এই তো আমি চাই।

—বন্ধ হয়ে যাবে? এতদিন এত হৈ-চৈ সব ব্যর্থ হয়ে যাবে? টিকিট কিনে দেখতে এসে ফিরে যাবে সবাই?

—যাক না ফিরে, যাওয়াই তো উচিত। বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্যে চাঁদা দিয়ে তার বিনিময়ে সবাই নিজের নিজের স্ফূর্তি চান, এই তো যথেষ্ট লজ্জা। বন্যার নামে, মানব-হিতের নামে কারুর মুঠ খুলবে না, খুলবে শুধু এই থিয়েটার জলসার নামে? এমন নাট্যলীলা বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত।

বিহারী কী করবেন বা বলবেন ঠিক করতে পারলেন না।

—তাই রামকে আমি ঠেকিয়েছি যাতে ঐ লজ্জাকর ঘটনাটা না ঘটতে পারে চোখের উপর। তাতে ওর নিজের যতই অপমান থাক না কেন, বেশি আছে সমস্ত জাতির অপমান। পরের দুঃখ দূর করবার অছিলায় নিজেরা বসে আনন্দ করছি, নিজের সুখের বাইরে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছিনে সংসারটাকে, এ দুর্নীতি যদি বন্ধ হয় তো হোক। আপনি আমায় সাহায্য করুন। গিয়ে বলুন, রামের দেখা পেলাম না। বলুন, সবাইকে চলে যেতে। বলুন, থিয়েটার হলো না বটে কিন্তু আপনাদের দান সার্থকতর হলো।

—ভীষণ দাঙ্গা বেধে যাবে মশাই। চেয়ার ভাঙবে, ছুঁড়বে ইট পাটকেল, ফাটবে সোডার বোতল। পয়সা ফিরে পাবার জন্যে টিকিট-ঘরটা এক পলকে তাসের ঘর হয়ে যাবে। বিহারী চোখে একটা খণ্ড-প্রলয়ের বিভীষিকা দেখতে লাগলেন।

—যদি পয়সা কেউ ফেরত চায়, ফেরত দিয়ে দেবেন। ঠকিয়ে, ভুলিয়ে বা উৎপীড়ন করে কারু কাছ থেকে এক কণা সাহায্য চাই না আমরা। আর, সত্যি করে দেখতে গেলে, টিকিটের টাকাটা ফিরিয়েই তো দেওয়া উচিত।

—বেশ উপদেশ চালিয়েছেন। থিয়েটারও হবে না, টাকাও ফেরত দেব, ইজ্জৎটা তাহলে আমাদের থাকবে কোথায়?

—আরো উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। পুলিনের চোখের তারা দুটো অন্ধকারে জ্বলে উঠলো—আমি জানি, কী পরোক্ষ চাপ দিয়ে আদায় হয়েছে ঐ টিকিটের টাকাটা। তাই যখন ফেরত দিয়ে দেবেন টাকাটা, লোকের মন

আপনার প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠবে। আর, অমনি যে হাতে ফেরত দিয়েছেন সেই হাতই আবার ভিক্ষার ভঙ্গিতে প্রসারিত করে দেবেন। আর ভয় বা প্রলোভনের দিক থেকে নয়, স্পর্শ করবেন তাকে তার অন্তর্নিহিত মহত্বের দিক থেকে—যে মহত্ব ছোট বড় সবার ভিতরেই ঢাকা পড়ে আছে। দেখবেন ভয়ের পয়সা, স্নেহের পয়সা ও সেবার পয়সা হয়ে ফিরে এসেছে। আপনারা না পারেন, আমাকে নিয়ে চলুন। আমি এগিয়ে নিয়ে যাব জনতাকে।

বিহারী ধারালো দাঁতে হাসলেন। বললেন—সস্তায় আপনাকে সে কৃতিত্ব অর্জন করতে দিতে আমরা প্রস্তুত নই। আপনি রামের বাপ বলে প্রাধান্য পাবেন বা থিয়েটারের পয়সাটাকে বক্তৃতার পয়সা করে তুলবেন; এ আমরা হতে দেব না।

—কিন্তু আমিও হতে দেব না, বহু লোকের চাঁদায় দত্ত সাহেব তাঁর মেডেল বা খেতাব কিনে গরিমান্বিত হবেন। টিকিট কিনবো আমরা, ছেলেরা করবে থিয়েটার, আর নাম করবেন দত্ত আর তাঁর স্ত্রী—এ অনিয়ম অসহ্য।

—আপনার আস্পর্ধাও সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। বিহারী এবার বাইরের খোলসটা খুলে ফেলতে চাইলেন। বললেন—রামকে যদি ভালোয়-ভালোয় বের করে না দেন তবে বাড়ির ভিতর ঢুকে তাকে ধরে নিয়ে যাবো। ড্রপ ওঠবার আর সময় নেই। বিহারী এগিয়ে গেলেন দু'পা।

—আপনি কি মনে করেন, আমার বাড়িতে ঢোকবার আপনার অধিকার আছে?

—তেমনি আপনারো এমন একটা অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেবার অধিকার নেই। ছাড়ুন, ঢুকতে দিন ভিতরে।

—আপনার সঙ্গে ওয়ারেণ্ট আছে? বিহারীকে যেন এতক্ষণে চিনতে পেরেছেন পুলিন।

—দরকার হয় না।

—আমাকে ঠেলে ফেলে গায়ের জোরে আপনি আমার বাড়ি ঢুকবেন ভেবেছেন? পুলিন তার শরীরে একটা পেশল কাঠিন্য আনলেন। বললেন

—যদি পারেনও বা ঢুকতে, পাবেন না রামকে। তার জিভ আমি আড়ষ্ট করে দেব, অভিশাপ দিয়ে, তার মুখ থেকে একটা শব্দও আসবে না বেরিয়ে। বলে পুলিন অকস্মাৎ চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন—রাম!

তার আগেই কে যেন তাঁর কণ্ঠনালীটা কর্কশ দৃষ্টিতে চেপে ধরেছে। বিহারী এক মুহূর্ত দ্বিধা করছিলেন হয় তো, এমন সময় তাঁরই দলের কে একজন লোক সাইকেলে ছুটতে-ছুটতে এসে বলেন—দরকার নেই আর রামকে। সাহেব নিজেই যশোবন্ত সিংহের পার্টে নামছেন। আপনাকে বলেছেন ফিরে যেতে।

যাক, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। বিহারী বাড়ানো হাতটা নামিয়ে আনলেন চট করে। বললেন—এখন স্বচ্ছন্দে হ্যাণ্ডসেক করা যায়। চলুন না, দেখবেন একবার দত্ত সাহেবকে। নামেই তালপুকুর ঘটি ডোবে না। একটা ট্রাজিডি কি করে প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়, দেখা উচিত আপনার। আচ্ছা, নমস্কার!

সদলবলে চলে গেলেন বিহারী।

পুলিন আরও খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর সোজা নেমে পড়লেন রাস্তায়। কিসের কৌতূহলে ক্রমে ক্রমে দাঁড়ালেন গিয়ে টাউনহলের বারান্দায়।

দুই দৃশ্য হয়ে গেছে এরি মধ্যে। তৃতীয় দৃশ্যের সুরুতেই ঢুকে পড়লেন পুলিন। তিল ধারণের স্থান নেই, স্তব্ধ হয়ে আছে বিরাট জনসমুদ্র। একপাশে কষ্টে দাঁড়ালেন কোনোমতে।

কিন্তু এ কী! যশোবন্ত সিংহের পার্টে দত্ত কোথায়? এ যে রাম—তাঁর রাম, যাকে তিনি ঘরের মধ্যে আটক করে রেখেছেন, যার কাছে তাঁর না রামচন্দ্রের সমুদ্রশাসনধৃত কার্ম্মুকটংকারের মতো। সেই রাম? পুলিন চোখ কচলালেন। সেই তাঁর রামের কণ্ঠ।

—রাম! বজ্রনির্ঘোষের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন পুলিন। কিন্তু গলা থেকে শব্দ নির্গত হলো না। মনে হলো কে যেন সবল মুষ্টিতে তাঁর টুঁটি চেপে ধরেছে। যেন তাঁর নিশ্বাস গেছে নিঃশেষ হয়ে।

হঠাৎ যেন একটা ঝড় উঠলো আর সেই ঝড়ের ধাক্কায় তিনি বাইরে এলেন বেরিয়ে। কিন্তু সেটা ঠিক ঝড় নয়, সমবেত করতালি। যশোবন্তের যশোগান। কিন্তু পুলিনের কানে শোনালো সেটা একটা বীভৎস ধিক্কারের মতো।

চার

রাতের অন্ধকারে পুলিন চুপচাপ বসেছিলেন বাইরে। থানার ঘড়িতে বারোটা বেজে গেল। তবু এখনো তাঁর ঘুম আসছে না। ভিতরে সুধাময়ীও বিনিদ্র বসে। সমস্ত শূন্য পাথরের মতো স্তব্ধ।

একটা ছ্যাকড়া গাড়ী এসে দাঁড়ালো রাস্তার উপর। প্রথমে নামলেন বিহারীবাবু, পরে রাম। পুলিন শুধু তাকালেন একবার বিন্দুমাত্র চঞ্চল হলেন না।

গাড়ির ভিতরে আরো একজন কে আছেন যেন, তিনিই বললেন বিহারীবাবুর উদ্দেশ্যে—পুলিনকে বলে দিন যেন না মারে রামকে। বাপের আদেশের চেয়ে দেশের ডাক যে বড়ো এ সে বুঝেছে বলে কিছু প্রশংসাও তো তার পাওয়া উচিত।

স্পষ্ট দত্ত-সাহেবের গলা। আশ্চর্য, তিনি তার মোটরে না এসে, এসেছেন কিনা একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে। আর কিনা তাঁরই বাড়ির দরজায়! তবু এতটুকু চাঞ্চল্য দেখালেন না পুলিন।

রাম কিছুতেই একলা বাড়ি ফিরতে রাজি হয়নি। বাপের নিষ্ঠুরতার চেহারাটা সে একটু উৎকট করেই চিত্রিত করেছিলো। তাই তাকে আবৃত করে দত্ত-সাহেব স্বয়ং এসেছেন তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে। একটু ভূমিকা করে বিহারীবাবু হেসে টিপ্পনি কাটলেন—যদি কাউকে মারতে হয় তো আপনাকে। আপনি শুধু শুধু কেন গেছলেন বলুন তো থিয়েটর-হলে?

—কেন, আমার তো টিকিট ছিল! পুলিন প্রায় গর্জে উঠলেন।

—তাতো ছিল, কিন্তু স্থির হয়ে সহানুভূতি নিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখলেন

কই ? যেই স্টেজের উপর রামের সঙ্গে আপনার চোখাচোখি হলো, আপনি দুই চোখে বিষুবিয়স জ্বেলে পাগল একটা সাইক্লোনের মতো বেরিয়ে গেলেন। সেই থেকে রামের পার্টের ভুল হয়ে যেতে লাগলো বারে-বারে। কোথায় তাকে দেখে সবাই ভয় পাবে, উল্টে সেই কিনা কুঁকড়ে গেল ইঁদুরের মতো, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুতে লাগলো চিঁ চিঁ করে। কারণ কিছু জিগ্‌গেস করলেই বলে—বাবা! বাবা কি এখনো দেখছেন থিয়েটার ? যদি বলি—না, তখনো তার সেই ভয়, বাড়ি ফিরবো কি করে ? সব ম্যাসাকার করে দিলেন, মশাই। বিহারীবাবু তার কণ্ঠস্বর বাষ্পাচ্ছন্ন করে তুললেন—যশোবন্ত একেবারে অশোভন্ত হয়ে গেল।

রাম কুণ্ঠিত-কুঞ্চিত হয়ে পুলিনের সমুখ দিয়ে বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। পুলিন তার দিকে ফিরেও তাকালেন না।

গাড়ির ভিতর থেকে দত্ত-সাহেব বললেন বিহারীকে লক্ষ্য করে—ওঁকে একদিন বলবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।

পুলিন নিজেই স্বকর্ণে শুনলেন বলে বিহারী আর কথাটার পুনরুক্তি করলেন না। কিন্তু সন্দেহ কী, কথাটা পুলিনের অভিমুখেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। স্বকর্ণে শুনেও যেন পুলিন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

তবে কি নিরঞ্জন চিনতে পেরেছে তাকে ? বুকের মধ্যিখানে ছেলেবেলার একটা পুরোনো রোমাঞ্চ ঠেলা দিয়ে উঠলো। ইচ্ছে হলো গাড়ি থেকে তাকে নামিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু মন উঠলো না, মনে হলো ওটা বুঝি অশরীরী কোন স্বপ্নের ভাষা।

বাইরে আরো খানিকক্ষণ বসে রইলেন পুলিন। কোন্ অর্ধবিস্মৃত দিনের কোমল একটি কাহিনীর সুর তাঁর মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তাঁর কলেজের প্রথম বছরের ছবি, উৎসাহে উজ্জ্বল, দুরাশায় দুর্বিষহ। তিনি আর নিরঞ্জন এক হস্টেলে, এক ঘরে, পাশাপাশি তক্তপোষে। তাঁদের মধ্যে যত না প্রতিযোগিতা তত বন্ধুত্ব। একের জয়ে অন্যের ছিল না ঈর্ষা, একের পরাভবে অন্যের ছিল না গোপন পরিতৃপ্তি। দুজনে কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন বই পড়ে আর আলোচনা করে, যা চক্ষে দেখবার নয়

তেমন স্বপ্ন দেখে, মুক্ত আকাশে উদ্ধত কেতন উড়িয়ে! চার বছর চলেছিলো এই সান্নিধ্য, একে অন্যের অন্তরের অঙ্গ হয়ে থাকা। তারপর বি-এ পাশ করে নিরঞ্জন চলে গেলেন বিলেত আর পুলিন অবস্থার দোষে নেমে চলে এলেন ওঁচা মাস্টারিতে। সে আজ কত বছরের কথা, কিন্তু মনে হয় যেন সন্ত সে দিনের ঘটনা। তবু বহু যোজনের ব্যবধান তাদের মধ্যে। নিরঞ্জন দত্ত আজ পর্বতের শৃঙ্গে আর পুলিন গুহার নিশ্চল অন্ধকারে। অত দূর থেকে ডাক কি কখনো পৌঁছায়?

কিন্তু স্পষ্ট বললেন যে পুলিনকে দেখা করতে। এর কি কোনো শোভন ব্যাখ্যা নেই? সেই আহ্বানের মধ্যে নেই কি একটু বন্ধুতার নম্রতা, হৃদয়ের লালিত্য? কেবলি কি প্রভুত্বের তেজ, মর্যাদার চেতনা? ভঙ্গিটা কি শুধুই শাসনের, সুভাষণের নয়? কিছুতেই মন সায় দিতে চাইলো না পুলিনের।

হঠাৎ পুলিনের হৃৎপিণ্ড মন্দিরের ঘণ্টার মতো বেজে উঠলো। ঠিক, চিনতে পেরেছেন নিরঞ্জন, আর চিনতে পেরেছেন বন্ধু বলে। পুলিন পাইচারি করতে লাগলেন।

এখানকার কলেজে যিনি বাঙলার অধ্যাপক ছিলেন তিনি বেশি মাইনেতে অন্যত্র চাকরি নিয়েছেন, তাই তাঁর জায়গায় নতুন লোক নেবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। আর-আর অনেকের মতো পুলিনও একজন পদপ্রার্থী। আর চাকরি দেবার কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিরঞ্জনও একজন, এবং কে না জানে, সেই হচ্ছে মণ্ডলের প্রধান। সে ইচ্ছে করলে পুলিন অনায়াসেই পেয়ে যান চাকরিটা। সন্দেহ কী, এই চাকরির ব্যাপারেই নিরঞ্জন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। নিরঞ্জনের সব মনে পড়ে গিয়েছে।

পুলিন বাড়ির ভিতর ঢুকে দেখলেন, রাম ঘুমিয়ে পড়েছে। বলতে কি, তার উপর এখন আর রাগ নেই, বরং নিরঞ্জন ও তাঁর মাঝে সে সূক্ষ্ম একটি সেতুর কাজ করেছে এ কথা মনে করে তিনি স্নেহার্তই বোধ করলেন হয়তো। সুধাময়ী জেগে ছিলেন, তাঁকে বললেন কে এসেছিলো। আর বলে গেল কী!

সুধাময়ী শোয়া ছেড়ে উঠে বসলেন।—বলো কী, দত্ত-সাহেব তোমার বন্ধু ?

যেন আকাশের সূর্য এসে জ্বলছে তাদের ঘরের প্রদীপ হয়ে, এমনি বিস্ময় সুধাময়ীর চোখে। পুলিন শুধু একটু হাসলেন। বললেন—ছিলেন বটে একদিন। আর সে-বন্ধুতা সবাইর কাছে একটা উদাহরণের জিনিষ

যেন অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য এসে পড়েছে নাগালের মধ্যে এমনি ব্যগ্রতায় সুধাময়ী বললেন—কই বলোনি তো এতদিন!

যেন কী একটা বলবার কাহিনী! যা আর নেই, যা আর ফিরে আসবে না, তার দিকে চেয়ে তৃষ্ণা প্রকাশ করবার মতো দীনতা আর কী আছে! পুলিন বললেন—তার এখন আমাকে চেনবারও কথা নয়। সে কত উঁচুতে আর আমি কোন অতল অধস্তলে। তারা কি কখনো চেনে জোনাকিকে ?

—এ তোমার মিথ্যে অভিমান। তিনি বড়লোক আর তুমি গরিব, তিনি বৃহৎ আর তুমি নগণ্য মাত্র—এই বিভেদটুকুই বিচ্ছেদ আনবে বন্ধুতায় ? সামান্য ঘাসের যে ফুল, তার সঙ্গে সূর্যের কি সৌহার্দ থাকে না ? দারিদ্র্যের সঙ্গে বাস করে তোমার মনও তুমি দরিদ্র করে ফেলেছ, তাই ঐ বন্ধুতাকে স্বীকার করে নেবার মতো তোমার ঔদার্য নেই। কিন্তু দেখলে, দেখলে তো তাঁকে ? তিনি নিজে যেচে তোমার বাড়ির দরজায় এসেছিলেন। আর এমনি তোমার দারিদ্র্যের অভিমান যে তুমি গেলে না তাঁকে একটু অভ্যর্থনা করতে। শক্তি আর সম্পদেই মানুষের মন চিরদিন ছোট হয় না, বুঝলে ?

—আর উল্টে আমাকে নিমন্ত্রণ করে গেল তার বাড়ি।—পুলিনের কণ্ঠে যেন কৃতজ্ঞতার ছায়া।

—এর পরও তুমি বলতে চাও, তুমিই মহামনা ?

'এর পর থাকা যায় না আর নির্জন অগোচরে। পরের রবিবার ভোরবেলা পুলিন চললেন নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে। কত দিন পরে দেখা, সময়-সমুদ্রের কত ঢেউয়ে উঠে পড়ে, ভেসে-তলিয়ে, কেমন না জানি দেখাবে তাকে মুখোমুখি।

প্রকাণ্ড হাতা-ওয়ালা বাড়ি, পিছনে গা ঘেঁসে নদীর শীর্ণ একটি আনন্দরেখা। অজস্র ফুল ফুটে আছে বাগানে, রঙের পাগল প্রগলভতা। কোথাও যেন কিছুর ছোঁবার নয়, কথা কইবার নয়। সমস্ত যেন কেমন বিদেশী, অন্য জগতের। তবু সাহস করে এগিয়ে এলেন পুলিন, সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দায় এলেন উঠে।

এত সকালে আর কেউ দর্শনপ্রার্থী আসেনি এখনো। প্রথম অভ্যাগতের চেহারা দেখে স্বয়ং বেয়ারাই উঠলো চমকে। ভাবলে বুঝিবা কোনো ভদ্রবেশধারী ভিক্ষুক। একে প্রথম ঢোকালে সাহেবের আজকের নিদ্রাভঙ্গ শেষ হবে গিয়ে তার নিজের শান্তিভঙ্গে, তাই বেয়ারা পুলিনকে বললে খানিক অপেক্ষা করতে।

পুলিন বললেন কুণ্ঠিতের মতো—তা বসছি, কিন্তু আমার নামের এই কাগজের টুকরোটা শুধু ওকে পৌঁছে দাও তুমি।

পুরোপুরি একটি ভিজিটিং কার্ডও নয়, ছাপানো তো দূরের কথা। পাতলা একটা কাগজের কোণ ছেঁড়া। ওটাকে পিতলের পাতে করে নেবে না শুধু হাতেই নেবে, বেয়ারা কিছু ভেবেই পেল না।

পাঁচ

—আরে, এস, এস। নিরঞ্জন দ্রুত পায়ে প্রফুল্ল মুখে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।—তোমার আবার কার্ড কী! তোমার পরিচয়-পত্র কি কার্ডেই লেখা আছে, নেই কিছুই আমার মনের পৃষ্ঠায়? আর কিছু আমার না থাক, স্মরণশক্তিটাও থাকবে না বলতে চাও? কী ভেবেছ আমাকে বলো তো?

নিরঞ্জন হাত ধরলেন পুলিনের। আশ্চর্য, এখনো লেগে আছে যেন সেই পুরোনো সহৃদয়তার স্পর্শ। চেহারাটা দেখতে এমনি কঠিন, গর্বিত, সমস্ত মুখের ব্যঞ্জনায় দুর্দান্ত পারুষ্য ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, দেখলে মনে হয় না নিরঞ্জন কখনো কারু কল্যাণ-চিন্তা করেছেন, দৃষ্টির আভাসে নেই এতটুকুও করুণা বা কোমলতার লেশ; চোখের তীক্ষ্ণতায়, নাকের

ঔদ্ধত্যে ও চোয়ালের রূঢ়তায় ফুটে উঠছে শুধু পীড়ন ও পেষণের আনন্দ। মনোভাবের মতো পোষাকটাও বিজাতীয়—হাফ-সার্ট ও হাফ-প্যান্ট—যাতে শুধু একটা প্রাখর্য আর ক্ষিপ্রতাই রয়েছে উল্লিখিত। যতই ইংরেজ হবার সাধনা করুন তিনি, বসনে আর ভাষণে, ধ্যানে আর ধারণে, অর্ধেক এখনো তিনি থেকে গেছেন বাঙ্গালী, তাঁর চামড়ায়, তাঁর চুলে আর চোখের কালিমায়, হয়তো বা এই স্নিগ্ধভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দেওয়ায়। সত্যি, সজ্ঞানে ভাবাও যেত না, নিরঞ্জন পুলিনকে গ্রহণ করবেন সেই পুরোনো স্নেহে আর সৌহার্দে, গলায় ঝরবে তার বাঙলা ভাষার মাধুরী, শোনা যাবে সেই অন্তর্ঘন আত্মীয়তার সুর! তৃপ্তিতে বুকটা উছলে উঠলো পুলিনের।

—না, না, ওদিকে অফিস-ঘর, ওটা যত সব ছোট কাজ, ছোট স্বার্থ, ছোট ষড়যন্ত্রের জায়গা, ওখানে বসবো না তোমাকে নিয়ে। তুমি এস আমার ড্রয়িংরুমে। নিরঞ্জন পথ দেখিয়ে নিলেন।

অনেক পর্দা, কার্পেট আর সোফা-কুশানের জটিল ভিড়। নিজেকে পুলিনের মনে হতে লাগলো স্খলিত অপভ্রংশের মতো, কি করে যে তার ওই তালি ফোলা দুর্ধর্ষ জুতোজোড়া রাখবে সে এই গোলাপ-গালিচার উপর, ভেবে পেল না।

—তোমার একেবারে আমাকে মনে নেই। নিরঞ্জন দুঃখিতের মতো বললেন—একবার খোঁজ নিতেও আস না, কেমন আছি আমি। ডাকলুম বলে পায়ের ধূলো দিলে।

—জুতোর কাদা দিলুম বলো! পুলিন খুব সহজ হয়ে উঠলেন এক নিমেষে।—কোন্ সাহসে আসি বলো তোমার কাছে! আপনি কে, কী চাই, কোত্থেকে আসছেন—পাছে এই জাতীয় প্রশ্ন করে বসো তারি ভয়ে দূরে-দূরে ছিলাম।

—রাস্তায় যত দূরেই দাঁড়িয়ে থাক, তুমি আছ আমার মনের পাশের ঘরে। জীবনে যত সম্পদই পাই না কেন আমাদের সেই প্রথম যৌবন আর সেই বন্ধুত্বের কাছে তা কিছুই নয়। আর যে যা যাই বলুক, আমাকে তুমি ভুল বুঝোনা, পুলিন। অর্থ বা মান, প্রভাব বা প্রতিপত্তি কিছুতেই মানুষের

অন্তরের ক্ষুধাকে শান্ত করতে পারে না। মানুষ আসলে চায় স্নেহ, সহানুভূতি, একটু বা সহৃদয় সমবেদনা।

পুলিন উচ্ছল কণ্ঠে বললেন—তুমি আমার বন্ধু, এটাকে আমি ঐশ্বর্য বলে মনে করি।

তারপর দু' বন্ধুর দূর হয়ে গেল দূরত্ব, খুলে গেল যত অবরুদ্ধ বাতায়ন। নিশ্বাসে এসে লাগলো চেনা দিনের বাতাসের গন্ধ, খোলা বইয়েব মতো পৃষ্ঠা চেনা দিনের আকাশের ছবি, আর ঝরলো কেবল কথার নির্ঝরিণী। আর পুলিন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, প্রত্যেকটি কথা নিরঞ্জন বাঙলাতে ব্যবহার করছেন, কোনো জায়গায় ইংরাজির কলুষ স্পর্শের ছায়াপাত হয়নি। সেই তাদের প্রথম কলেজ-জীবনের প্রতিজ্ঞার কথাটি পর্যন্ত নিরঞ্জনের মনে আছে। প্রত্যেটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের জন্য এক পয়সা করে জরিমানা। আজ নিশ্চয়ই জরিমানার ভয়ে নয়, শুধু বন্ধুতার খাতিরেই সে প্রতিজ্ঞার সম্বন্ধ রাখছে।

শুধু এক জায়গায় এসে একটু বাধা পেলেন পুলিন। বুক-কেশটা ঘোরাতে ঘোরাতে পুলিন বললেন—একখানাও বাঙলা বইও রাখোনি ঘরে!

নিরঞ্জন হেসে বললেন—আমাদের ইংরাজি কথা সম্বন্ধেই প্রতিজ্ঞা ছিল, ইংরিজি বই সম্বন্ধে ছিল না।

—নিশ্চয়ই। তবু বাঙলা বইকে অপাঙ্‌ক্তেয় ভেবে দূরে ঠেলে রাখলে ভালো লাগে না।

—কিন্তু আমার বই দেখেছ, কোনটাই বই হিসেবে ব্যবহার হয় না, ব্যবহার হয় আসবাব হিসেবে; তোমাদের দেশে এমন মোটা বই, এমন ঝকঝকে বাঁধাই, পাওয়া যাবে কোথায় বলতে পারো?

—আসবাব হিসেবে রাখো ওগুলো আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বই হিসেবেও রাখো দু'একখানা, তোমার নিজের দেশের চিন্তা, তোমার নিজের দেশের সাধনা—

—তেমনি কিছু আছে নাকি বাঙলা দেশে?

—কেন, রবীন্দ্রনাথ—

—ও সব কবিতা আমি বুঝি না। নিরঞ্জন একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন।

—রবীন্দ্রনাথ কি শুধুই কবি ?

—না হয় হলেনই একজন মস্ত বড়, খুব মোটা আর রঙচঙে বই না হলে কিনে এনে ঘর সাজাতে মন ওঠে না। আর জানোই তো, বাঙলা বইয়ে বাড়ে না আমাদের সামাজিক মর্যাদা, কি রকম খেলো অসার দেখায়—

—কিন্তু তেমন দিনের হয়তো আর দেরি নেই যখন আমাদের সামাজিক মর্যাদার বিচার হবে অন্য মানদণ্ডে। কথাটা পুলিনের মনে ফণা তুলে উঠেছিলো, কিন্তু কী মন্ত্রে কে জানে শান্ত করলেন সেই বিষধরকে।

আরো এক জায়গায় এসে একটু ঠেকতে চেয়েছিলো, কিন্তু পুলিন এড়িয়ে গেলেন সেই খোঁচাটুকু !

—তুমি একটু চা খাবে ?

—না।

—কেন, পানীয়টা বিজাতীয় ?

হাসলেন পুলিন।

—তবে এক পেয়ালা গরম দুধ খাও। বাড়িতে গরু আছে আমার। তাকে তো স্বজাতীয় ভাবতে তোমার আপত্তি নেই।

—কিছুমাত্র না। স্বয়ং তোমাকেই স্বজাতীয় ভাবছি।

দু'জনেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন তারপর।

—অন্তত একটা সিগারেট খাও।

—না।

কেন, এখানেও বিদেশীত্ব ? তবে বিড়ি ?

—সেটা আরো উৎকট ! কেননা সেটা বিদেশীকে অনুসরণ করছে। সুতো বাঁধা মানে নেকটাই বাঁধা, সাপও হয়নি ব্যাঙও হয়নি। সাপ-এর 'স' আর ব্যাঙের 'ঙ' নিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে সঙ ! তার চেয়ে মৌলিক জিনিষ দাও—ডাবা হুঁকো আর পোড়া কলকে, টেনে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি।

—উঃ, তোমাদের দেশ কোথায় ! কোথায় বসে আছে !

তারপর, আরো অনেক পরে পুলিন বলতে পারলেন কথাটা।

—তোমার সঙ্গে আমার একটা ছোট্ট কথা ছিল, নিরঞ্জন।

—ট্‌., ? তবে কাইগুলি এস আমার অফিস-রুমে। নিরঞ্জন লাফিয়ে উঠলেন! এক মুহূর্তে খোলস বদলে দেখা দিল যেন তার ভিতরকার প্রতাপান্বিত মূর্তি!

পুলিন বিমর্ষ হয়ে গেলেন, কেন পাড়তে গিয়েছিলেন কথাটা।

তবু যা হোক পাড়লেন কথাটা, অনেক কষ্টে, নিজের বিবেকের হাতে অনেক লাঞ্ছনা সয়ে। যদি তাতে দিন একটু ফেরে, পথ একটু বা সমতল হয়।

—ও! সেই মাস্টারিটা? নিরঞ্জন এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন যেন বিষয়টাই অতি নোংরা।

তা অমন একটু দাম্ভিকতা গায়ে না-মাখাই উচিত, বিশেষত ভাগ্যের বদান্যতায় এমন যাঁর অন্যায় প্রাচুর্য। পুলিন তাই আহত বোধ করলেন না; বললেন হ্যাঁ, কলেজে সেই বাঙলার প্রোফেসারি—

—অধ্যাপকি বললে বুঝি বাঙলাটা শুদ্ধ হতো না? নিরঞ্জন হাসির একটি ফোড়ন দিলেন।

এটাও পুলিন হজম ক'রে নিলেন সহজে। বললেন—সেই চাকরিটার জন্যে আমিও আবেদন করেছি।

—বাঙলায়ই করেছ তো? দেখো।

এ ঠাট্টাটাও পুলিন পাশ কাটিয়ে গেলেন। বললেন—তুমি আছ নাকি কমিটিতে, আর কে না জানে, তোমার মতটাই আসল। নিতান্ত তো অনুপযুক্ত নই, যদি তুমি একটু চেষ্টা করো—গলাটা কাঠ হয়ে আসছিলো পুলিনের, মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছিলো। তবু, কথাটার মধ্যে যথেষ্ট তিনি কাকুতি আনতে পেরেছেন, ভঙ্গিতে আনতে পেরেছেন যথেষ্ট দীনতা। শেষকালে এসে ভেঙে পড়লেও এতদূর টেনে আনতে পারবেন ভিক্ষার সুরটা, নিজের কানে শোনবার আগে বিশ্বাসই করতে পারতেন না। তবু যদি জীবনের পরের ভোরবেলাগুলি একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে দেখা দেয়, সন্ধ্যাবেলাগুলি স্নেহে ও শান্তিতে সুখস্পর্শ হয়ে ওঠে।

—আছি বইকি কমিটিতে। নিশ্চয়, নিশ্চয়, তুমি যখন ক্যাণ্ডিডেট।

নিরঞ্জন উদারতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—একশো বার, তোমার মতো উপযুক্ত কেউ আছে ব'লে তো ভাবতে পারি না। তবে আসল কে জানো? আসল হচ্ছে ব্যাট-বল।

—ব্যাট-বল? পুলিন একেবারে হতভম্ভ হয়ে গেলেন।

ঐ একই কথা। বটব্যাল। মিস্টার বটব্যালই হচ্ছেন আসল কর্তা, যাঁর ঐ কলেজ; মানে যিনি বসিয়েছেন কলেজটাকে। বসিয়েছেন যখন, তখন, বুঝতে পারো, তিনিই ঘোরাচ্ছেন। আর সব নাম-কা-ওয়াস্তে। উনি তুষ্ট হলেই জগৎতুষ্ট।

—তবু তুমি যদি বলো—

—উনি নিজে ইণ্টারভিয়ু করবেন সব ক্যাণ্ডিডেটদের, যদিও আমরা কমিটির আর-আর মেম্বাররাও থাকবো। তবু ওঁর মতটাই প্রথম ও শেষ। আমরা, যদ্দুর মনে হয়, সায়ই দিতে পারি, বাদ সাধতে পারি না।

—কিন্তু উনি গুণই তো দেখবেন!

—মনে হয় না। নিরঞ্জনের মুখ ঘোরালো হয়ে উঠলো।

পুলিন প্রায় ফাঁপরে পড়লেন, এমন কথার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না একেবারে। বললেন—সে কি, কলেজের অধ্যাপক—

—বাঙলায় এম-এ, সে তো আছেই! চণ্ডীদাস ক'জন, এই নিয়ে তো বাঙলা! তা একজন ওঁর হ'লেই হলো। আসলে হচ্ছে ওঁর কাছে, চেহারা, হাবভাব, ডিপোর্টমেণ্ট।

—বলো কী?

এক কথায় বলতে পারো, পোষাক। তোমাকে আমি খুব সংক্ষেপে টিপ্‌স্ দিচ্ছি, পুলিন। শোনো আমার কথা, কষ্ট ক'রে অন্তত দুটি ঘণ্টার জন্যে। দেখবে বাজি ঠিক মেরে দিয়েছ।

—পোষাক? পুলিন যেন ভূত দেখলেন।

—হ্যাঁ, প্যাণ্ট-কোট, টুপি-টাই, যাকে এক কথায় সাহেব বলে আর-কি। তা—এরঙ্গ'ই হোক বা—ফেরঙ্গ'ই হোক। কোন রকমে একবার

সাহেব সেজে ইন্টারভিয়্যু ক'রে যাও, দেখবে প্রথম বলেই একেবারে ওভারবাউণ্ডারি।

—বাঙলার প্রোফেসারিতে ইংরাজি পোষাক!

—তা শুনছে কে! কলেজের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তাঁর আদর্শকে তো মেনে চলতে হবে! উনি এমন প্রচণ্ড সাহেব যে নিজের হিতেন নামটাকে হিটিং আর বটব্যাল পদবীটাকে ব্যাটবলে নিয়ে গেছেন। আমি তো দেখছ কতক্ষণ পাইপ খাচ্ছি না!- নিরঞ্জন কাঠি দিয়ে পাইপ খোঁচাতে লাগলেন। —আর উনি পাইপ মুখে ক'রে ঘুমোন, পাছে খসে পড়ে যায় সেইজন্যে চিৎ ছাড়া কাৎ হন না। আমার জিভের ডগাটা শুধু পুড়েছে, আর ওর আলজিভ পর্যন্ত।

—করেন কী উনি?

—আর করেন কী! ব্যারিষ্টারি! আই-সি-এস না হতে পেরে যা হয়ে আসতে হয় শেষ পর্যন্ত! নিরঞ্জন প্রায় স্বগতোক্তি করলেন।

—এতদূর বিটকেল!

—সমালোচনা করতে পারো না যখন তোমার চাকরিটা ওরই হাতে। উনি যেমনই হোন, চাকরিটা ভালো, তোমার পক্ষে অন্তত। এখন যদি একটা সাহেব সাজলেই দাঁওটা মারা যায়, তখন না সাজাটাই মূর্খতা।

—যতই সাহেব সাজি না কেন, সেই গোলামের মতোই দেখাবে, তাতে তাসের পিট পাবো না।

চিমটিটা লাগলো হয়তো নিরঞ্জনকে। তাই একটু ঝাঁজ লুকিয়ে রেখে বললেন—একেবারে মাঝি-মাল্লার চেয়ে খালাসী উনি পছন্দ করেন বলে ওকে দোষ দিতে পারো না।

—খুব অদ্ভুত লাগছে, যাই বলো! বিষয় বাঙলা, পড়াবো বাঙালী ছেলেদের, নিজে বাঙালী, যিনি মালিক তিনি মর্মে যাই হোন চর্মে অন্তত বাঙালী—অথচ এ তাঁর কী বন্য বিকৃতি বলো দেখি। ওকে একটু বুঝিয়ে শান্ত করতে পারো না তুমি?

—ওঁর ধূমন্ত মুখের জ্বলন্ত পাইপই ওঁকে শান্ত করতে পারলো না, আমি

তো কোন্ ছার ! আর এতে এমন পরিশ্রমটাই বা কী হে ? ছ'ঘণ্টার তো মামলা ! ঠেকায় পড়লে ঢেঁকি পর্যন্ত গিলতে হয়, এতো গলায় শুধু একটা গেরো বাঁধা !

—না, তা নয়, তবে—

কোথায় পুলিনের আটকাচ্ছে যেন বুঝতে পারছেন নিরঞ্জন। যেন ব্যাপারটা কত সহজ এমনি উপেক্ষার সুরে, পাইপের গহ্বরে অগ্নিসঞ্চার করতে করতে বললেন—তোমার না থাকে আমার থেকে নিয়ো না এক প্রস্ত। তাতে কী! কোন রকমে কাজটা উদ্ধার করা শুধু। বেশ তো, সেদিন না হয় এখান থেকেই ছ'জনে একসঙ্গে যাওয়া যাবে ! কিছু ভেবো না, আমি ঠিক সাজিয়ে দেব তোমাকে, গোঁজামিলের দরকার হয় এমন তাপ্পিতুপ্পি দিয়ে দেব, ব্যাটবল ছেড়ে ফুটবলেরো সাধ্যি নেই তোমাকে হোঁচট খাওয়ায় ! আচ্ছা, তোমার জুতো আছে তো ? ফিক-ফিক করে নিরঞ্জন ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন—স্যু ? হ্যাঁ, ফিতে-বাঁধা, জিভওলা জুতো ? কিম্বা, কাবলি-স্যাণ্ডেল একজোড়া ?

দুর্বলভাবে হাসলেন একটু পুলিন।

—তা ও-ও চালিয়ে নিতে পারবোখন ন্যাকড়া ঠুসে। মাথায় তোমার টিকি আছে নাকি ? দেখো। ওটা তা হ'লে কিন্তু ছেঁটে ফেলতে হবে। চাকরির জন্যে আরো কত অমানুষিক ব্যায়াম মানুষের করতে হয়, সমস্ত জীবন ভরে করতে হয়। আমাকে দেখছ না ? আর এ তো একবার বিছানার চাদর থেকে পাশ-বালিশের ওয়াড় হয়ে যাওয়া শুধু। আর, হ্যাঁ, কদিন অন্তর দাড়ি কামাও বলো দেখি ? এ ক'দিন স্বচ্ছন্দে গজিয়ে যেতে পারো, গামছা চুরি যাওয়া ছাড়া আর কেউ কিছু ভাবতে পারবে না, কিন্তু ইন্টারভিয়ুর দিন সকালে ওগুলিকে একেবারে নির্মূল করে দিতে হবে। ব্যাট্‌বলের চোখে একবার ধাঁধা লাগিয়ে দি, দেখবে চাকরিটা তোমার। এখন পাও কত ? পঞ্চাশ—ষাট ? আর কলেজের চাকরিটা, যদিও আপাতত দিচ্ছে পঁচাত্তর, লেখাচ্ছে, একশো। শুনতে তো ভালোই, তা ছাড়া—

—অনেক সম্ভ্রান্ত।

—তবে? হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে ফসকাতে দেবে চাকরিটা? কেউ দেয়? পনেরো কুড়ি টাকাটা কি কম? সাধ থাকে তো যাও না তালতলার চটি পরে, খালি গায়ে উড়নি ঝুলিয়ে টিকিতে জবাফুল বেঁধে, বিদ্যাসাগর সেজে। একটা দারোয়ানি পর্যন্ত দেবে না ব্যাটবল। হেট হেট করে হাটিয়ে দেবে। তাই তো, এই টিপস্‌টা দেব বলেই তো সেদিন তোমার বাড়িতে গিয়ে গায়ে পড়ে ডেকে এলাম তোমাকে। জানতাম তো আগেই যে তুমি একজন ক্যাণ্ডিডেট—

আবেগের আতিশয্যে পুলিন নিরঞ্জনের হাত ধরে ফেললেন। বললেন —আর আমিও জানতাম তুমি ফেলতে পারো না তোমার বন্ধুকে!

কিন্তু বাড়ি ফেরবার পথে শ্লথ গতিতে চলতে-চলতে পুলিনের হঠাৎ মনে পড়ে রামের কথা। নিরঞ্জনের ছেলের হাফ-প্যান্ট প'রে থিয়েটারের অভিনয়ে চাকরি নেয়া। তাঁর মনটাও কি আজ সেই চাকরি সেই প্রতিপত্তি সেই প্রতিষ্ঠার জন্যেই ছেলেমানুষের মতো আঁকুপাঁকু করে উঠছে না?

কৌতূহলে সূচীবিদ্ধ হয়ে সুধাময়ী জিগ্‌গেস করলেন—কেমন দেখলে বন্ধুকে?

—চমৎকার। ঠিক তেমনটিই আছে ভিতরে। বাইরেটা কিছুই বোঝায় না মানুষকে।

—আমি বলেছি না? এত আলু-পটল ছিলে আজকে একেবারে আদা-কাঁচকলা হয়ে যেতে পারো? তারপর—চাকরির কথা কী বললে?

—বললে চেষ্টা করে দেখবো।

—তা হলেই দুর্গ জয় হয়েছে ভাবতে পারি। ওঁর চেষ্টাতেই তেষ্টা মিটে যাবে নিশ্চয়। সিদ্ধিমান পুরুষ, লাঙল ছুঁয়ে দিলেই ক্ষেতে শস্য আসবে সৌভাগ্যের মতো। সুধাময়ী সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখলেন।

পুলিন ভাবলেন, স্ত্রীর এই আনন্দটুকুই আজ তাঁর দিনের উপার্জন। বললেন—কিন্তু জানো, কোট-প্যান্ট পরে সাহেব সাজতে হবে। খুলে খুলে বললেন ব্যাপারটা।

হালকা খুসিতে উছলে উঠলেন সুধাময়ী। বললেন—ওমা, কী মজা! মোটরে করে বন্ধুর বাড়ি থেকে যাবার সময় এ পথটা দিয়ে ঘুরে যেও দয়া করে, দেখবো ব্যাটবলের কাছে চলেছেন কেমন ডাণ্ডাগুলি!

ছয়

খবর এল, বটব্যাল আসবেন না কমিটির মিটিঙে। দাড়ি কামাতে গিয়ে গালের পাশটায় খানিক কেটে গেছে, সেই ক্ষতচিহ্নটুকু সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যাবার আগে বাইরে তিনি মুখ দেখাতে পারবেন না, তাঁর সাহেবিয়ানায় সইবে না সেই অপরিচ্ছন্নতা।

পুলিনের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। যেন কয়েদখানার ফটক খুলে বাইরে এলেন বেরিয়ে, খোলা মাঠের মুক্তিতে। সুধাময়ীকে বললেন—তোমাকে একটা হৃৎকম্পের ভয় থেকে বাঁচিয়ে দিলাম।

—আমার তো মনে হচ্ছে, সার্কাসের রোমাঞ্চ থেকে বঞ্চিত করলে আমাকে।

যেমন-কে-তেমন, সাদাসিধে বাঙালী পোষাকেই পুলিন রওনা হলেন।

সাহেবি-সংস্কার সেরে দু'বন্ধু এক মোটরেই যাবেন কলেজে, এমনি কথা ছিল আগে থেকে। সংস্কারের আর দরকার না থাকলেও এক সঙ্গে যাবার দরকার তেমনিই আছে। তাই পুলিন চললেন নিরঞ্জনের কুঠিতে।

—কতক্ষণ ধরে তোমার জন্যে বসে আছি। নিরঞ্জন উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।—দেখ চট করে কোন্‌টা ফিট করে। আগে পাঁকাটি ছিলাম, পরে চিচিঙ্গে থেকে গোল আলু হয়েছি, সব রকম ঢপেরই আছে—

কী দরকার! বটব্যাল তো আসছেন না—পুলিন হাসলেন নিশ্চিন্তের মতো।

—আসছেন না, তাতে কী? নিরঞ্জন এমন ভাবে তাকালেন যেন সূর্য অস্ত গেলেও দিনের অবসান ঘটবার কথা নয়।

—বটব্যাল আসছেন না, তার মানে আমাকে বটগাছে উঠে আর বেল পাড়তে হবে না। অর্থাৎ দাঁড়কাক হয়ে পাখনা গুঁজতে হবে না ময়ূরের।

—ও! তা হলে তুমি এই পোষাকেই ইন্টারভিয়ু দেবে? ততক্ষণে যেন ধাতস্থ হলেন নিরঞ্জন।

—হ্যাঁ, আর কোথাও তো বাধা দেখছি না এখন তো শুধু তুমি আর আমি। পুলিনের গলার আওয়াজটা ঈষৎ নীচু ও আচ্ছন্ন শোনালে।

ও! তাহলে তুমি একটু বোসো! আমি তৈরি হয়ে নি।

পুলিন বসতে যাবেন, নিরঞ্জন ফিরলেন দুয়ার থেকে। বললে—কিন্তু, হ্যাঁ, দেখ, আমাদের এক সঙ্গে যাওয়াটা হয়তো উচিত হবে না।

—কেন বলো তো?

—তুমি যে আমার বন্ধু, তোমার প্রতি যে আমার পক্ষপাত আছে এটা কাউকে সন্দেহ করবার সুযোগ দেওয়াটা ত বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তোমাকে-আমাকে যদি সবাই একসঙ্গে মোটরে দেখে আর শেষ পর্যন্ত চাকরিটা যদি তোমারই হাতে আসে তবে সবাই ছু'য়ে ছু'য়ে চার করবে! আমার পক্ষে শোভন হবে না সেটা।

কথাটাতে যুক্তি আছে নিঃসন্দেহ। পুলিন বললেন—হেঁটেই যাবেন তিনি।

পায়ে-হাঁটা সমস্ত পথটা পুলিনের মনে হলো ঠিক বাঁশির সুরের মতো। সমস্ত আকাশ যেন আশা দিয়ে আঁকা। এই যে নিরঞ্জন তাকে এত দূরে সরিয়ে রাখলেন এর মাঝে কত বড় বন্ধুতার স্বীকৃতি।

আরো অনেককেই ডাকা হয়েছে ইন্টারভিয়ুতে। বাইরের লোকও আছে কয়েকজন, কয়েকজন আনকোরা কলেজ-ফেরৎ। কিন্তু কাউকে দেখেই বুক ধুকধুক করবার মতো নয় পুলিনের। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন শক্ত মাটিতে, ছায়ার নিচে।

একে একে ডাক পড়লো সবাইর। এক সময়ে পুলিনেরও।

কমিটিতে একজন বুড়ো উকিল ছিলেন, রায়বাহাদুর, নাকের থেকে কপালের উপর চশমা তুলে চিনতে পারলেন পুলিনকে। বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে

বললেন—আরে, আপনি নাকি? আমি ভেবেছিলুম কে না-জানি আর কেউ। নলিন পুলিনের তো অভাব নেই বাঙলা দেশে। বলে তিনি দৃষ্টি ঘোরালো করে তাকালেন নিরঞ্জনের দিকে। বললেন—কী হবে আর প্রহসনে? এঁর মতো লোক যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন আর কী চাই আমাদের? হিমালয় দেখে এসে কী হবে আর পূবে-পশ্চিমে তাকিয়ে? এখানেই শেষ করে দিন ইণ্টারভিয়ু।

নিরঞ্জনকে যথেষ্টরূপে প্রভাবিত করতে পেরেছেন কিনা নির্ণয় করতে না পেরে রায়বাহাত্বর আবার বললেন—জানেন, উনি কি নিয়ে গবেষণা করছেন এতদিন?

নিরঞ্জন তরল গলায় বললেন—জানি। ধুতির উপকারিতা নিয়ে।

—ঠিক তা নয়। গম্ভীরমুখে বললেন রায়বাহাত্বর—আমি দেখে এসেছি ওঁর পাণ্ডুলিপির খানিকটা। বিষয়টা হচ্ছে, বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন। অনেক দূর লেখা হয়েছে, অনেক যত্ন, অনেক শ্রম, অনেক সাধনার জিনিস। ওঁকে এই চাকরিটা দিলে আমাদের নিজেদেরই উপকার হবে, বাঙালীর উপকার।

নিরঞ্জন চেয়ারে গা শিথিল করে দিয়ে নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে বললেন—আপনাদের সবাইর যখন এই মত তখন পুলিনবাবুকেই নির্বাচন করা যাক। বলে কৃতজ্ঞ-নম্র পুলিনের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন, যেন সমস্ত কৃতিত্বটা পুলিনেরই।

আবার পরবর্তীর ডাক পড়লো, নিরঞ্জন বললেন—আরো যারা এসেছে মুখ দেখাতে, আগে থেকেই তাদের মুখ অন্ধকার করে দিই কেন? তীর্থে যখন এসেছে, চৌকাঠ পেরিয়ে মন্দিরেও একবার ঢুকুক।

আর সবাইরও তাই মত। শুধু রায়বাহাত্বর মাথা নেড়ে বললেন—পুলিনের কাছে সব মলিন মশাই।

—শুধু মলিন নয়, বিলিন একেবারে। তবু লোক-দেখানো সৌষ্ঠবটা নষ্ট করা মোটেই ঠিক হবে না।

'দুদিন পরে ফল বেরুলো নির্বাচনের। বিশ্বাস করতে রুচি হলো না

পুলিনের যে, পশুপতি সমাদ্দারকে চাকরি দিয়েছে কমিটি। পশুপাত নীচের ক্লাশের বাঙলা মাস্টার, মাত্র বি-এ পাশ। 'পিতা' বানান করতে মাঝে মাঝে এখনো সে প-য়ে দীর্ঘ ঈ-কার লেখে।

শেষ পর্যন্ত একমাত্র রায়বাহাদুরই পুলিনের পক্ষে ছিলেন, আর সবাই পিছলে-পিছলে চলে গেলেন নিরঞ্জনের তাঁবুতে, পশুপতির পাল্লায়। কি করে যে পশুপতির ওপর নিরঞ্জনের নজর পড়তে পারে, ভাবতে গিয়ে পুলিন দিশেহারা হয়ে পড়লেন। অকস্মাৎ দেখতে পেলেন যেন ব্যাখ্যার বিদ্যুৎ। আর কিছু নয়, পশুপতি সেজে এসেছিলো ইংরেজের পোষাকে। একে ভুঁড়ি, তায় প্যাণ্টের নীচে কাপড়ের মাল-কোঁচার দরুণ দেখাচ্ছিলো তাকে প্রায় ঘটোৎকচের মতো (বা উৎকট ঘটের মতো), ফলে প্যাণ্টের শেষ ও মোজা আরম্ভের মধ্যে অনাবৃত থেকে গেছে পায়ের দু'ইঞ্চি কাঁচা চামড়া। কোটের দু'পাশ একসঙ্গে এসে মেলে মনে হচ্ছিলো যেন পশুপতির বুকে এতটুকু দয়া নেই, বোতাম আর ছিদ্রের মধ্যে চন্দ্র আর সমুদ্রের ব্যবধান। যেন কোন ফাঁসুড়ে তার গলায় টাই বেঁধে দিয়েছে; যাই-যাই করে গলাটা নিঃশব্দে লম্বা হয়ে চলেছে উপরের দিকে। মাথায় তার একটা টুপিও ছিল, অটল ও অবিচ্যুত, আর সেই টুপি মাথায় দিয়েই সে ঢুকেছিলো কমিটি-রুমে! পারিপাট্য থেকে একচুল ভ্রষ্ট হয়েছে, এমন অভিযোগের সে অবকাশ রাখেনি।

একেই মনোনীত করলেন নিরঞ্জন। পশুপতি নাকি কথা দিয়েছে, দু'বছরের মধ্যে সে বাঙলায় এম-এ পাশ করবে ; আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা, তার সভ্যতা, তার শালীনতা—দু'বছর কেন, এক মুহূর্তের জন্যেও পিছিয়ে থাকেনি। আর যাই হোক, নিরঞ্জনের মান রেখেছে সে পোষাকে।

শুধু ব্যর্থতা নয়, লাগলো যেন একটা কুৎসিত অপমানের মতো। যেন কিছুতেই সইতে, মেনে নিতে পারছেন না পুলিন। প্রথম যেদিন গিয়েছিলেন নিরঞ্জনের বাড়ি, সেদিন যদি নিরঞ্জন তাঁকে অবনত বা অধোগত বলে তাড়িয়েও দিতেন, তবু যেন এত অমর্যাদাকর মনে হতো না। জীবনে অনেক আকাঙ্ক্ষাই তো মেটে না, পারে এসে বারে-বারেই তো নৌকাডুবি

হয়—তবু নিজেকে কেন এত ক্লান্ত ও নিঃস্ব মনে হবে—কিছু ভেবেই মনে তিনি পরিপূর্ণ সন্তোষ বা বৈরাগ্য আনতে পারছিলেন না। কেন হঠাৎ নিজেকে এত কর্মহীন ও আশ্রয়হীন মনে হবে? সব সময়ে গুণের স্বীকৃতি হয় না সংসারে, সাধনা উপহসিত হয়, অধম ও অক্ষমেরাই অভিনন্দন পায়। এ কে না জানে? তারি জন্যে নিজেকে এমন শক্তিশূন্য বলে মনে করবেন কেন? সুধাময়ীর মুখের দিকে পর্যন্ত তাকাতে পারেন না, এমন কী লজ্জা তিনি লাভ করেছেন! বাইরে থেকে প্রতিবিধানের যদি কোনো উপায় নেই, সে তেজ সে শক্তি তিনি তাঁর কর্ম থেকে কেন আহরণ করবেন না? কেন তাঁর কাছে ম্লান মনে হবে জীবনের স্বাদ?

পুলিনের এই নীরব লাঞ্ছনার জ্বালা একজনকে শুধু আন্দোলিত উদ্দীপিত করে তুললো। সে রাম। কিছুতেই সে উপেক্ষা করতে পারছে না বাবার এই চুপ করে যাওয়াকে, নিজেকে নিঃসহায় মনে করার চেষ্টাকে। সংসারে সবই তেমনটি আছে, দু'বেলা খাওয়া আর ইস্কুলে যাওয়া, আর খেলা-করা আর ঘুমোনো—কিছুতেই সে মেনে নিতে পারছে না। কী যেন হঠাৎ চলে গেছে এই বাড়ির আকাশ থেকে—বাবার উপস্থিতির ঔজ্জ্বল্য, মা'র মুখের নির্মল প্রসন্নতার আভা। যেন প্রতারিত, অপমানিত, নির্যাতিতের বেদনার ছায়া পড়েছে তাঁদের মুখে! তাঁদের আর্তি তাঁদের বিষণ্ণতায়। শত মুখে নিজেকে তার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হলো, সে এই দরিদ্র, ভূ-লুণ্ঠিতদের দিকে না তাকিয়ে—অপহৃত যাদের সর্বস্ব, অস্বীকৃত যাদের মহিমা—চোখ পাঠিয়েছিল কিনা ধনমদের দিকে, যাতে শুধু অধোবাসীদের প্রতি রূঢ় ঘৃণা আর নিষ্ঠুর তুচ্ছতাবোধ। যেন তারই কাছে বাবার চক্ষু প্রতিকার খুঁজছে, যেন তারই কাছে মিনতি করছে মা'র ম্লানিমা।

রামের সেই পুঞ্জিত আক্রোশ সেদিন সেই ইস্কুলের সভায় বিদীর্ণ হয়ে পড়লো। কোলকাতা থেকে একজন বিদ্বান গুণী লোক—একসঙ্গে অধ্যাপক ও সাহিত্যিক—এ-সহরে এসেছেন ক'টা বক্তৃতা দিতে—তার মধ্যে একটার আয়োজন হয়েছে এই ইস্কুলে, কিশোর-সম্মেলনে। ইউরোপের অনেক দেশ তিনি ঘুরে এসেছেন, অনেক বিদেশী ভাষাতেই তিনি পণ্ডিত, কিন্তু বর্জন

করেননি স্বদেশের এতটুকু বিশেষতা। পরণে তাঁর যে ধুতি-চাদর তা শুধু শুভ্রই নয়, শুচিস্মিত, আগাগোড়া খদ্দরের তৈরী। সমস্ত আকৃতিতে, আবির্ভাবে নম্র শালীনতা। শান্ত ও নিরহঙ্কার। যেন বাঙলাদেশের সংস্কৃতির খাঁটি প্রতীক। কী অপূর্ব কণ্ঠে তিনি বক্তৃতা দিলেন, আর কি অপূর্ব বাঙলায় ছেলের দল মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রইলো।

সভাপতির বক্তৃতা দিতে উঠলেন এবার নিরঞ্জন। এমন কোন বিখ্যাত সভা হতে পারে যাতে নিরঞ্জন না সভাপতি? বক্তৃতা দিতে উঠলেন তিনি তাঁর নিজস্ব পোষাকে নিজস্ব ভাষায়—ইংরিজিতে। যে পোষাক আর ভাষায় তিনি মর্যাদাবান মনে করে থাকেন নিজেকে।

ছেলের দলের এক অংশ হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো—বাঙলা, বাঙলা! কেউ কেউ উঠলো আরো চেঁচিয়ে—ধুতি-পাঞ্জাবি, ধুতি-পাঞ্জাবি!

বিপক্ষদলও ছিল প্রস্তুত হয়ে। তারা বলে উঠলে—ইংরিজি, ইংরিজি! ইংরিজি পৃথিবীর ভাষা! কেউ কেউ বললে—স্বাধীনতাটা বক্তার, শ্রোতার নয়।

মুহূর্তে আগুন জ্বলে উঠলো, একের সঙ্গে অপরের সংঘর্ষ। তর্ক থেকে হাতাহাতি, হাতাহাতি থেকে টেবিল-চেয়ার নিয়ে ছোড়াছুড়ি। দেখতে দেখতে প্রায় একটা খাণ্ডবদাহনের চেহারা হয়ে দাঁড়ালো। সবাই ছেলেদের মধ্যে গিয়ে পড়লেন, স্বয়ং নিরঞ্জন পর্যন্ত, কিন্তু যেখানে এসে কলহের সমাপ্তি হলো, নিরঞ্জন স্বচক্ষে দেখতে পেলেন, সেখানে তাঁরই ছেলের রক্তাক্ত কপাল।

হাসপাতাল থেকে ছেলেকে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন, দেখতে পেলেন রাস্তা দিয়ে ছাত্রদের একটা শোভাযাত্রা চলেছে। গান গেয়ে চলেছে তারা—'আ মরি, বাংলা ভাষা, মোদের গরব মোদের আশা!' আর সেই দলের অগ্রণী রাম।

সাত

আবার মিটিং বসলো নিরঞ্জনের সভাপতিত্বে। এবার স্কুল-কমিটির মিটিং। বিষয়, সেদিনকার সভার গোলমাল। সভার চেয়ে শোভাযাত্রাটাই ছিল নিরঞ্জনের মর্মশূল।

সন্ধান করবার আর কী-ই বা আছে! দলসুদ্ধ সবাইকে কখনো শাস্তি দেওয়া যায় না, টান দিতে হবে দলপতিকে। একা থাকলেই পেছনে একশো থাকে। যে এক কেটে ফেললে পেছনের শূন্যগুলো ঝরে পড়ে একসঙ্গে। অতএব রামের তলব পড়লো।

আজকে রামের আবির্ভাব একেবারে অন্য রকমের। দ্বিধাহীন, নিধারিত। ভীষণ সহজ, এবং অত বেশি সহজ বলেই সতেজ। পরণের ধুতিটা খাটো, বাঁ পায়ে তার জুতো নেই—সে কেন, পৃথিবীর কেউ-ই তাকিয়ে দেখছে না, সমস্ত ভঙ্গিতে সেই নিশ্চল উপেক্ষা।

যত না রাগ হবার কথা, তার চেয়ে যেন বেশি চমকালেন নিরঞ্জন। শীতল স্থৈর্যের নিচে তপ্ত রাগ লুকিয়ে রাখবার কেরামতি তাঁর বহুদিনের। তাই তিনি স্নিগ্ধ সুধাস্রাবী কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলেন—কী নাম তোমার?

উত্তরটা বিশেষত্বহীন, কিন্তু শোনালো কাঠখোট্টার মতো—শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—বন্দ্যোপাধ্যায়? জিভের ডগাটা ঠাট্টায় চুলকে উঠলো নিরঞ্জনের।

—হ্যাঁ, ব্যাণ্ডো নয়, নয় বা নিশানজি।

—নিশানজি মানে? নিরঞ্জন ভুরু কুঁচকোলেন।

—Banner-ji। কেউ-কেউ বা বনের মেয়ে বা বনের ঝি' হয়েই খুসি!

নিরঞ্জনের কাণ দুটো গরম হয়ে উঠলেও গলায় সে ঝাঁঝ আনলেন না। নিস্পৃহের মতো জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বাবার নাম কি?

এবার রামের চমকাবার পালা।—চেনেন না আমার বাবাকে? সে প্রায় লাফিয়ে উঠলো।

—কেন এর বাবা কোনো সেলিব্রিটি নাকি? নিরঞ্জন পার্শ্বোপবিষ্ট

হেডমাস্টারকে জিগ্‌গেস করলেন ;—এমন একখানা ভাব করছে যেন প্রাতঃস্মরণীয় কেউ। মন্দ নয় এমন পিতৃভক্তি। না বাপু—বহুকষ্টে এতক্ষণে যেন টেবিলের থেকে মুখ তুলে তাকাতে পারলেন রামের দিকে, সৌভাগ্য হয়নি, চিনি তোমার পিতা-স্বর্গকে।

—সত্যিই তো। আমার বাবার নাম ভিতরে টানো বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবার আর সহ্য হলো না রমেনবাবুর ! চেঁচিয়ে, ধমকে উঠলে ;—কার সঙ্গে কথা বলছ ভুলে যাচ্ছ নাকি ?

—কখ্‌খনো না। কথা বলছি আমারই পিতৃবন্ধুর সঙ্গে। শুধু পুলিন বললে পাছে না চিনতে পারেন তাই Pull-in বলছি।

—ও ! তুমি Fooll-in-এর ছেলে সেই র‍্যাম ? উৎকট হাসিতে ফেটে পড়লেন নিরঞ্জন।

—কিন্তু আপনার ছেলের সঙ্গে লড়াই করবার সময় আর ভেড়া থাকিনি, কোনো লড়াইয়েই আর থাকবো না। রামের গলা অসম্ভব গম্ভীর শোনালো।

নিরঞ্জন এবার তাঁর অভ্যস্ত শীতলতায় নেমে এলেন। বললেন—ডাকাতের সর্দারের মতো বাবরি রেখো ঘাড়ের ওপর, সিংহ বলে নিজেকে মনে করে সান্ত্বনা পেতে পারবে। যাক, কথাটা তা নয়। কথাটা হচ্ছে সেদিনের সেই মারামারি বিষয় কী বলতে চাও তুমি ?

—যা বলতে চাই তাতো সেদিনের সেই মারামারিতেই বুঝিয়ে দিয়েছি। রাম এতটুকু দমলো না।—আর যেখানে হাত বাড়ানো নিষেধ সেখানে তার জ্ঞানের জন্যে গানের গলা ছেড়েছি। আর কিছুই আমার বলার ছিল না, নেইও।

—সাবধান হয়ে কথা বলো, রাম। হেডমাস্টার রমেনবাবু আবার সজাগ হয়ে উঠলেন।—তোমার আজকের ভঙ্গিটা অত্যন্ত কদাকার।

—নিশ্চয়ই পেছনে কারু প্ররোচনা আছে। নিরঞ্জন টিপ্পনি কাটলেন।

—যদি কারু থাকে তবে তা বাবার নয়, মার।

—মার ?

—হ্যাঁ, যাঁর কোলে শুয়ে প্রথম কথা বলি, সে আমার ভাষার মাতৃ-ভাষার। যে ভাষা আমার মা, যে মা আমার ভাষা।

—প্রি-টেস্টে কত নম্বর পেয়েছ বাঙলায়? সমস্ত গাম্ভীর্যটা নিরঞ্জন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু রাম থরথর করে কাঁপতে লাগলো ভিতরে।

ঢোঁক গিলে নিরঞ্জন বললে—সেদিনের সেই গোলমালটা ঘটানোর জন্যে তোমাকে কী শাস্তি দেওয়া যায় তুমিই নিজেই সাজেস্ট করো, আমরা ঠিক করতে পারছি না।

—বা, আমি কী বলবো! দীপককে যে শাস্তি দেবেন আমাকেও সেই শাস্তি দেবেন। পারে থাকলে এক সঙ্গেই থাকবো, ডুবলে এক সঙ্গেই।

—এ যে প্রায় ডেনিয়েল-এর বিচার। রমেনবাবু প্রতিবাদ করে উঠলেন; —মার খেল দীপক, আর শাস্তিও হবে তার!

—হ্যাঁ, নিশ্চয়! যে মারে তার তুলনায় যে মার খায় তার অপরাধটা কম নয়। রাম এমন একটা ভঙ্গি করলো যেন পুরাকালেরই কোনো অভ্রান্ত ও অপক্ষপাত বিচারক অবতীর্ণ হয়েছে।—ব্যাপারটা যখন হাতাহাতি তখন শুধু হাতাকে না মেরে হাতীকেও মারা উচিত। যে হারে আর যে মারে দুয়েরই সমান লজ্জা।

—খুব যে অভিনয় করতে শিখেছ! রমেনবাবু তীব্র খোঁচা মারলেন।

—আর সেটা 'সাজাহান' নাটকে যশোবন্ত সিংহের পার্ট। যশোবন্ত সিংহ হেরেছে, কিন্তু আশীর্বাদ করুন, আমি যেন না হারি।

—বেশ, সেই আশীর্বাদ করা যাবে, যদিও আপাতত তোমার সাজেশ্‌শানটা নিতে পারছি না। কী বলেন? নিরঞ্জন তাকালেন কমিটির আর আর সভ্যদের দিকে যারা সাপের কাছে কেঁচোর মতো আছে সর্বক্ষণ।—এক বছরের জন্যেই রাসটিকেট করা যাক।

—রাসটিকেট! রামের গলা ফেটে একটা ক্ষীণ আর্তনাদ বেরুলো।

এখনো কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা চাও—রমেনবাবু ডুবন্ত লোকের কেশাগ্র ধরে যেন শেষ টান মারলেন।

—ক্ষমা ? কার কাছে ?

—দীপকের কাছে, দীপকের বাবার কাছে।

রমেনবাবুর কথাটা দ্রুত চাপা দিয়ে নিরঞ্জন বললেন—না, ও কথা বলবেন না। ধনুক ভাঙ্গে বটে, কিন্তু ওদের মেরুদণ্ড বেঁকে না। কথা বলতে বলতে তার নিচের পাটির উপর, উপর পাটির দাঁত জোরে চেপে বসলো।

—কিন্তু দীপকের কি শাস্তি হবে ?

—তার আরো শাস্তি চাই ? কপালে তার তিন ইঞ্চি ঘা--

আমার কপালে আমি হাসিমুখে ছ'ইঞ্চি ঘা নিতে পারি—কিন্তু রাসটিকেট !

--তবে ক্ষমা চাও। ওটা রমেনবাবুর প্রলেপন।

—দীপক চাইবে ?

—কার কাছে ?

—আমার কাছে, আমার বাবার কাছে।

--তোমার বাবার কাছে ?—হো হো করে হেসে উঠলেন নিরঞ্জন।

—হ্যাঁ, পিতার ঋণ সুপুত্রই শোধ করে থাকে। আপনার ভিক্ষের থালা না-হয় ও-ই নিয়ে গেল। আমার আপত্তি নেই, দাঁড়ি-পাল্লা ঠিক সোজা করে ধরুন।

—রমেনবাবু! নিরঞ্জন সংক্ষেপে গর্জন করে উঠলেন।

—আর কোনই প্রতিকার নেই। তুমি এবার চলে যেতে পারো। সংক্ষিপ্ত গর্জনের ব্যাখ্যা করে দিলেন রমেনবাবু।

রাম উদ্বেল হয়ে উঠলো।—চলে যাবো ? আমার ঐ অপরাধের জন্যে এত বড় শাস্তি ?

—নিজের দোষ কেউ বড় করে দেখে না।

—তার জন্যে মারুন না হয় আমাকে বিশ ঘা, দীপক চায়, দীপক মারুক, কিন্তু আমার জীবন—আমার ভবিষ্যৎ—

—বিশেষ অপরাধের জন্যে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে।

—কিন্তু আমার অপরাধ কি সেই মৃত্যুর চেয়েও বড় শাস্তির যোগ্য? এই জীবন্মৃত্যু?

—তোমার অপরাধ সেদিনের সেই সভাতেই শেষ হয়নি, আজকে পর্যন্ত তোমার সেই বিদ্রোহের ভঙ্গিটাকে টেনে এনেছে। কাপড়টা পরেছ যেন কুস্তি লড়বে, পায়ে জুতো নেই—রমেনবাবু কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

—সেদিনের সেই যুদ্ধে শেষ অস্ত্র হিসাবে ওটা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো—শত্রুপক্ষ সেটা বেমালুম আত্মসাৎ করেছে।

নিরঞ্জনের ঘোরতর মুখভাব দেখেই রমেনবাবু হাসতে পারলেন না। বললেন—কথাবার্তায় এতটুকু বিনয় নেই, এমন একটা চেহারা করে এসেছ, যেন ফিরছ দিগ্বিজয় করে।

—তার জন্যে এতটা আমার অনিষ্ট করবেন আপনারা? এই বিচার আপনাদের?

—তবে অনুতপ্তের মতো ক্ষমা চাও পায়ে পড়ে! রমেনবাবু নিরঞ্জনের দিকে হাতের ইসারা করলেন! আর অলক্ষ্যে আরেকটা ইসারা করলেন চোখে, সেটার অর্থ হচ্ছে এই, তুচ্ছ একটা মুখের কথায় যদি ত্রাণ পাওয়া যায় তবে বুদ্ধিমান রাম মিছিমিছি তাতে পেছ-পা হচ্ছে কেন?

যতটুকু সময় দেওয়া সম্ভব তার একচুল ওপারে চলে গেলে হয়তো রামের দ্বিধা। নিরঞ্জন হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।—উপায় নেই রমেনবাবু, সফ্‌ট্ স্পর্ট্‌স্ সব দূর করে দিতে হবে, স্কুলের ডিসিপ্লিনটা ঢের বড় কথা।

আর-আর সবাই একবাক্যে সম্মত হয়ে সম্মানিত করলেন নিরঞ্জনকে। রমেনবাবুও হ্যাঁ করলেন বটে, কিন্তু তার পেছন থেকে গেল যেন অনেকখানি স্তব্ধতা।

ছেলের দল রামকে ঘিরে ধরলো। রাম বললে—তোদের থেকে আমাকে বিদায় নিয়ে যেতে হচ্ছে, হয়তো বা চোখের সামনে জীবনের যে পথ দেখেছিলুম সেই পথ থেকে—কখন কোন্ দিকে কার ডাক পড়ে কেউ বলতে পারে না।

—কখনো না। ছেলের দল উত্তাল হয়ে উঠলো। যারা বিপক্ষে ছিল তারাও যেন মিশে গেল ঢেউয়ের মধ্যে। আমাদের ছেড়ে কক্‌খনো যেতে দেবো না তোকে।

এতে একবিন্দু আশ্বাস নেই রামের, কেননা ব্যাপারটা ছেলেদের সাময়িক উত্তেজনার চেয়ে অনেক বেশি সাংঘাতিক। বাবা না-জানি কি ভাবে নেবেন ঘটনাকে। কে জানে, হয়তো তার ক্ষমা চাওয়াই উচিত ছিল, ভঙ্গিতে একটু বশ্যতা, কণ্ঠস্বরে একটু মিনতি। শত হলেও বাবার বন্ধু, গুরু-স্থানীয়—আর দীপকের আঘাতে একটু মনোবেদনা জানাতে কী বা এমন আপত্তি! না, ভীষণ গোঁয়ারের মতো কাজ হয়েছে তার। তার উপরে বাবার যত আশা, মার যত স্বপ্ন, সংসারের সমস্ত নির্ভর, আর সেই কিনা ছন্নছাড়ার মতো কেটে পড়বে এখুনি! চোখের সামনে সে পথ খুঁজে পেলো না, সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন তালগোল-পাকানো একটা মৃত অন্ধকার!

সমস্ত শুনে সুধাময়ী একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। মার মনের যেখানটায় বেশি মোচড় লেগেছে সেখান থেকে তিনি বলে উঠলেন—আর দীপকের কী হলো?

—দীপকের কী হবে? যেহেতু সে হেরেছে সেহেতু তার জয়। আর তার জয়, যেহেতু সে বড়লোক।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সুধাময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন—তবু ক্ষমা চাইলেই পারতিস।

—শুধু পুত্রের কাছে নয়, পিতার কাছেও। যে দারোয়ানটা দীপককে রোজ স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যায়, তার কাছেও বা কেন যে ক্ষমা চাওয়া হবে না তা কে বলবে।

সুধাময়ীর চোখ ছলছল করে উঠলো। রাম গাঢ় স্বরে বললো—অবিচারটা একবার ভেবে দেখ, মা। গোলমালটা আমি একা করিনি, গানে শুধু আমার একার গলা ছিল না, তবু সমস্ত পাপের বোঝা আমার উপর চাপানো হলো। আর কী অপরাধের জন্যে কী শাস্তি!

—না, না, ছি, তবু ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে, রাম। ওঁরা শক্তিমান মর্যাদাবান লোক, ওঁদের কাছে নীচু হলে কোনো অপমান হয় না।

—বাবাও কি তাই বলবেন?

—নিশ্চয়, তোর জীবনটা ছারখার হয়ে যাক, এ তিনি কখনোই চাইতে পারেন না। আর তুই যদি না চাস, তোর হয়ে আমি চাইবো গিয়ে মিসেস্ ডটের কাছে।

—তুমি? শেষকালে তোমাকে ঠেলে দেব ঐ অপমানের মধ্যে? রাম আকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু পালাবার তার পথ কোথায়? কোথায় তার জন্যে সেই স্বাধীন আকাশ? ধীরে-ধীরে সেই কি আবার গলা বাড়িয়ে দেবে যূপকাষ্ঠে?

সুধাময়ী স্বামীর কাছে গিয়ে দুর্দিনের পৃষ্ঠা খুলে ধরলেন। হৃতমান ভিক্ষুকের মতো রাম দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

পুলিন একমনে লিখছিলেন তাঁর বই. সুধাময়ীর উপস্থিতে তাঁর মনযোগ বিন্দুমাত্র শিথিল হলো না। পাশে বসে সুধাময়ী বললেন—শুনেছ, রামকে স্কুল থেকে রাসটিকেট করেছে!

বইয়ের থেকে চোখ না তুলেই পুলিন বললেন—শুনেছি। রাস্তা দিয়ে ছেলেরা বলাবলি করতে করতে যাচ্ছিল।

—এখন উপায় কী হবে?

পুলিন মগ্ন হয়ে গেলেন নীরবতায়!

—দত্ত সাহেব আর তাঁর ছেলের কাছে ক্ষমা চাইলেই নাকি ওটা খণ্ডানো যেতে পারে। রামকে বলে কয়ে—

যেন কি একটা অশুচি প্রস্তাব করা হচ্ছে এমনি ভাবেই চমকে উঠলেন পুলিন। বললেন—কী বললে? কলম খসে পড়লো তাঁর হাত থেকে!

—রামকে বলে-কয়ে যদি পাঠাতে পারো ক্ষমা চাইতে –

—না। একেবারেই না। মাত্রা ছাড়িয়ে গেল পুলিনের গলার আওয়াজ।

—তবে রামের উপায় হবে কী ?

—উপায় ? পৃথিবী বিশাল, আকাশ অসমাপ্ত। উপায় হবেই। পুলিন আবার কলম তুলে নিলেন।

রামের মনে হলো, তার মতো শক্তিমান ও মর্যাদাবান আর কে আছে ? বুক ভরে নিশ্বাস নিলো সে নির্মুক্ত আকাশের।

সাত

পরদিন ছেলেরা কেউ প্রায় এলোনা ইস্কুলে। যে কয়জন কী ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে ঢুকছিলো আগে-ভাগে, তাদেরকে হাত ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে বার করে দেয়া হল রাস্তায়। যারা পরে এসে ঢুকতে চাইলো গেট দিয়ে, দেখলো সারি সারি ছেলেরা শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। তবু যারা তাদের বেড়া টপকে এড়িয়ে গেল পাহারা, বাকি কম্পাউণ্ডটুকু পার হবার আগেই তাদের মাথায় আর পিঠে ঢিল পড়লো। তবু পথচারী যারা কৌতূহলের শেষ না পেয়ে জিগ্‌গেস করলো—কী ব্যাপার ! ছেলেরা সানন্দে, উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো—ধর্মঘট।

হেডমাস্টার রমেনবাবু সাত হাত জলের নীচে পড়লেন। প্রবোধ বা প্ররোচনা, শাসন বা স্বস্ত্যয়ন কিছুতেই ছেলেরা বিচলিত নয়, রামের রাসটিকেশন বাতিল না হলে তারা যাবে না ইস্কুলে, তাদের এক কথা।

রমেনবাবু অনেক চেষ্টা করলেন, সোজা পথে ও খিড়কিতে অভিভাবকদের দ্বারস্থ হলেন, ঘুসি পাকিয়ে শাসালেন পর্যন্ত। ফলে যারা খায়ের খাঁ তারাই শুধু রাজি হলেন ছেলে পাঠাতে। কিন্তু পাঠালে কি হয়, ঢোকে কি করে ; যদি বা ঢোকে, পরদিন রাস্তায় বেরোয় কোন্ সাহসে !

অগত্যা রমেনবাবু নিরঞ্জনেরই শরণাগত হলেন। নিরঞ্জন ফেটে পড়লেন শতচির হয়ে। —ছোঁড়াদের মেরে ঢোল করে দিতে পারেন না ? নিয়ে যান

আমার হাণ্টারটা, ড্রিল-মাস্টার কোথায়, বলুন তাকে, পা থেকে, মুখ পর্যন্ত চাবকে ছিবড়ে করে দিক ছোড়াদের।

মৃদুস্বরে রমেনবাবু বললেন—এর পর আবার মারতে গেলে ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠবে।

—আপনারা সব বুড়ো-হাবড়া, ইমবেসিল ফুল্‌স্! কটা পুঁচকে ছেলেকে ঘায়েল করতে পারেন না? বলুন আমাকে, আমি নিজে যাচ্ছি চাবুক নিয়ে, ঘা কোথায় কাকে বসাতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি।

চাবুকের মতোই কথাটা লাগলো যেন রমেনবাবুর মুখের উপর। তিনি মুখ গরম করে মাথা নিচু করে বসে রইলেন।

—মার, মারই হচ্ছে একমাত্র ওষুধ, এলোপাতাড়ি মার। দেখবেন, দু' মিনিটেই সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ওরকম পুতুপুতু করে পণ্ডিতি করা ছেড়ে দিন। ঘৃণার তীব্র ঝাঁজে নিরঞ্জনের মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো।

রমেনবাবু মুখ না তুলেই বললেন—আপনিই তবে যাহোক একটা ব্যবস্থা করুন।

—নিশ্চয়। টেবিলের উপর নিরঞ্জনের ঘুসিটা বজ্রের আকারে নেমে এলো।

পশুপতি সমাদ্দারও এসেছিলো সুপারিশে, এবং বলা বাহুল্য, তার নবধৃত সাহেবি খোলসে, খর্ব কোট ও শীর্ণ প্যাণ্টালুনে। যদিও সে এখন কলেজে, ইস্কুলের উপর-তলায়, তবু তার পরামর্শ কাজে লাগতে পাবে বলেই তার গায়ে-পড়ে-আসা। আর, যা সে বললে তা একবাক্যে বাতিল করে দেবার মতো নয়। কেননা নিরঞ্জনের রক্তহীন বিরক্ত মুখ আস্তে-আস্তে উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো।

এমন একটা আটঘাট-বাঁধা ধর্মঘটের পিছনে নিশ্চয়ই কারু প্রেরণা আছে, কারু প্রশ্রয়, আশ্চর্য গঠনশক্তি। শুধু ছেলেরা মিলে এতদিন ধরে এমন সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যেতে পারে না ধর্মঘট। শুধু তাদের মাথায় দুর্বুদ্ধি ঢুকিয়েই সে ক্ষান্ত হয় নি, রক্তে মিশিয়েছে উত্তেজনা। কোথায় কি ফন্দি আঁটতে হবে, কোন ঝোপে কী কোপ বসাতে হবে,

সেই তাদের পরামর্শ জুগিয়েছে। মূলে সেই বিদ্রোহীকেই শাসন করা দরকার।

—কে সে? নিরঞ্জন গর্জে উঠলেন।

শুধু চাকরি নিয়েই পশুপতির জ্বালা মেটেনি, তুলনায় সে যে অযোগ্য এ জ্বালা তার চিরদিনের। তাই সে নিশ্চেষ্ট ভাবেই বললে—পুলিন বাঁড়ুয্যে!

—বলেন কি? শূন্যে-ছোঁড়া আন্দাজী গুলিতে পাখি শিকার হয়েছে, নিরঞ্জন তেমনি আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

—তা ছাড়া আবার কী। পশুপতি গুপ্তচরের গলায় বললে—স্কুলের কাছেই পুলিনের বাসা, সেইখানেই তো আড্ডা ছেলেদের। সেখান থেকেই তো ছেলেরা জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে এসে ফের নতুন করে চ্যাঁচানো সুরু করে। সেখানে তারা খেতে পায় পর্যন্ত! দপ্তরিকে যে মেরেছিলো সেও বেশ দু'ঘা খেয়েছিলো ফেরাফিরতি। তাকে পুলিন নিজের হাতে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে দেখছি। কী মনে হয় এসব থেকে? সমস্ত আন্দোলনটার সেই হচ্ছে নেতা।

—কথাটা সত্যি? রমেনবাবুকে নিরঞ্জনের প্রশ্নটা তীক্ষ্ণ শলাকার মতো বিদ্ধ করলো।

রমেনবাবু মাথা তেমনি নিচু করে রইলেন। তার মৌনই যে সম্মতির লক্ষণ তা নিরঞ্জনকে শেখাতে হবে না।

তবে আর কথা নেই। যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন নিরঞ্জন।—তবে এক কাজ করা যাক, রামের রাসটিকেনটা উঠিয়ে নিই—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিজেরো অলক্ষে রমেনবাবু বলে উঠলেন—রাম খুব ভালো ছাত্র। তার উপর অনেক আশা স্কুলের, হয়তো অনেক গৌরব।

—না, সেজন্য নয়! যখন রাখব বোয়াল পাচ্ছি, তখন চুনোপুঁটিতে বঁড়শি গাঁথবো না। যখন পাওয়া যাচ্ছে ঘুঘু তখন শুধু শুধু কে ছুঁচো মারতে যাবে?

রমেনবাবু যেন বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা।

কিন্তু পশুপতি বুঝেছে। অতি উৎসাহে স্ফীত হয়ে উঠতেই পেটের কাছের প্যাণ্টের বোতামটা এমন সবলে ছিঁড়ে ও সশব্দে ছিটকে পড়লো, মুহূর্তের ভুলে মনে হোল নিরঞ্জনের, যেন ঘরের মধ্যে কে একটা বুলেট ছুঁড়ে মেরেছে।

পশুপতি বোতামটা কুড়িয়ে নিয়ে আসতেই তিনি ধাতস্থ হলেন। পশুপতি বললে—পালের গোদাকেই বধ করা উচিত। ডাক্তার হয়ে রুগীকে আত্মহত্যার জন্যে বিষ দেওয়াও যা, এও তাই, মাস্টার হয়ে ছেলেদের ইনডিসিপ্লিন শেখানো।

—তার চেয়েও বেশি। প্রবলতর কণ্ঠে নিরঞ্জন বিঘোষিত হলেন।—তাই রামের চেয়েও বেশি চাই আমাদের, দশরথ। আপনি নিয়ে যান আপনার ভালো ছাত্র, আমরা দেখে নেব তার বাপকে।

—যদি প্রমাণ হয়—রমেনবাবু বললেন ভয়ে ভয়ে।

—প্রমাণ হয় মানে? আপনি কী বলতে চান? পেটের উপর পশুপতি তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিল বলেই দ্বিতীয় বোতামটা উৎক্ষিপ্ত হলো না, —পুলিন জগে করে জল ঢেলে দেয়নি ছেলেদের আঁচলায়? বাতাসা খেতে দেয়নি? আইডিন লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেয়নি কপালে? আপনি জানেন না, শোনেননি এ সব? ছেলেরা যখন হৈ-চৈ করতে করতে এসেছে ওর বাড়ির সামনে তখন দরজা-জানালা বন্ধ করে বাড়ির মধ্যে না থেকে ও বেরিয়ে আসেনি ওর দাওয়ায়? তার মানে কী?

—তার মানে হচ্ছে, বেশ, বেশ করেছ, আরো করো, সল্‌তের পেছনে আমি আছি উস্কে দেবার কাঠিটি। নিরঞ্জন দাঁতে দাঁত চেপে বললেন।

—বলুন,—যে ছেলেটা রোদ্দুরে ভিরমি খেয়ে পড়লো তাকে পুলিনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়নি? নিজের বিছানায় শুইয়ে পুলিন তাকে হাওয়া করেনি অনেকক্ষণ?

এ-সব কথা তো সত্যি। রমেনবাবু প্রতিবাদ করবেন কোন সাহসে?

—তবে? কথা রইলো। খুব দ্রুত ও খুব সহজ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুনো গেছে এমনি স্থির ভাবে নিরঞ্জন বললেন—আপনি আপনার রামকে নিয়ে

গিয়ে স্কুলের আরাম করুন, আর যার হা-রাম হা-রাম করার কথা, তারো ব্যাধির আমরা বিরাম করি।

একটা চুণকাম-করা রিপোর্ট লিখলো কমিটি। যেহেতু রাম স্কুলের একজন ভালো ছাত্র যেহেতু তার অতীত নিষ্কলঙ্ক ও যেহেতু বর্তমানে সে অনুতপ্ত সেহেতু তার রাসটিকেশনের আদেশ পরিত্যাগ করা হল। আশা করা যাক, কমিটির এই ক্ষমা ও উদারতা তার ভবিষ্যত-জীবনে অনুপ্রেরণা দেবে।

—কী, সত্যি অনুতপ্ত তো? নিরঞ্জন জিগ্‌গেস করলেন নিরুদ্দেশে।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়, কে না জানে! পশুপতি যদিও কমিটিতে নয়, তবু কলেজে, ইস্কুলের উপর-তলায়, তাই একটা সে ফাঁকা সমর্থন হাঁকলে।—রাসটিকেশনে রাস্তায় বার হয়ে যাচ্ছিল, অনুতাপ করবে না সে? কী যে জিগ্‌গেস করেন তার ঠিক নেই।

ছেলেদের দল একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেল। বই-খাতা নিয়ে রাম আবার ফিরে এসেছে বলে নয়, তাদের উপর এতটুকু একটাও আঁচড়ও লাগলো না বলে। এত বড় একটা ঝড় বয়ে গেল তবু এতটুকু একটা ডাল ভাঙ্গবে না এ যেন তাদেরই কাছে অন্যায় মনে হতে লাগলো। কারণটা তাদের কাছে যতই মহান হোক রণে তারা খুব নির্মল ছিল না, তাই সন্ধি না হয়ে একেবারে একটা নির্জলা জয় হওয়াতে কেবলই তাদের মনে হতে লাগলো, কোনো অভিসন্ধি নেই তো পিছনে!

ব্যাপার বুঝতে একদিনের বেশি দেরি হলো না। কমিটি পরদিনই পুলিনের বিরুদ্ধে প্রসিডিং রুজু করেছে। সে কারণ দর্শাক কেন তার শাস্তি হবে না। অপরাধ? তাও সে জানতে চায়? এ সমস্ত ধর্মঘটটা তার রচনা। প্রমাণ? সে শুধু ছেলেদের উত্তেজিতই করেনি, স্বহস্তে পরিচর্যা করেছে।

দোষ অস্বীকার করলেন না পুলিন, যতটুকু অবিশ্যি দূষনীয়। ছেলেরা উত্তেজনা সংগ্রহ করেছে তাঁর স্তব্ধতা থেকে নয়, তাঁদের শাসনেরই লুব্ধতা থেকে। হ্যাঁ, যে-ছেলে এসে জল চেয়েছে তাঁর কাছে, সে-পিপাসার্তকে

তিনি জল দিয়েছেন, আর শুকনো জলকে আতিথেয়তায় সামান্য মিষ্টি করে দিয়েছেন বাতাসা দিয়ে ; আর যে আহত, সে স্বপক্ষই হোক আর বিপক্ষই হোক, তিনি পক্ষপাত করতে শেখেননি। তাঁর ধর্মঘটের সঙ্গে সহানুভূতি ছিল না, ছিল ধর্মঘটীদের সঙ্গে।

ঘট ও ঘটির প্রভেদ বুঝলো না কমিটি। পুলিনকে অন্যত্র চাকরি জোটাবার সৎ পরামর্শ দিয়ে ও শুভেচ্ছা জানিয়ে কমিটি তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ক'রে দিলে। ছেলেদের কাছে তিনি একটি কদর্য কুদৃষ্টান্ত, বিদ্রোহ-বিদ্বেষের প্রতীক।

ছেলেদের দল আবার তুলে উঠতে চাইলো। রাম কাছে এসে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ডাকলে—বাবা!

—কেনরে—পুলিন বললেন স্নেহস্বরে।

—আমি তবু পড়বো ঐ ইস্কুলে ?

—পড়বিনে ? তোর জন্যেই তো এত! পুলিন শান্তমুখে হাসলেন।

—আমার জন্যে তোমার চাকরি চলে যাবে, বাবা ?

—চরিত্রের কাছে চাকরিটা কত তুচ্ছ। বাঁচার মান শুধু মনুষ্যত্বে। তুই যদি মানুষ হোস, তবে কী হবে আমার চাকরি দিয়ে ?

—আমার জন্যে এত তোমাকে ত্যাগ করতে হবে, বাবা ? রামায়ণে ছেলে তার বাপের জন্যে—

আর বাপ-মা ছেলের জন্যে তিল-তিল ক'রে অহর্নিশ ত্যাগ করছে সে-কথা যে এক রামায়ণে লিখে ফুরানো যাবে না।

—কিন্তু ছেলেদের দল কিছুতেই মানতে চাইছে না, বাবা। রামের চোখে একটা কালো বিদ্যুৎ হঠাৎ ঝলসে উঠলো।

—খবরদার রাম, আমাকে নিয়ে ছেলেমানসি করিসনে তোরা। আমার অভাবের তুচ্ছতাটা তোরা কাঁধে বিজ্ঞাপন এঁটে শোভাযাত্রা করে প্রচার করিসনে বলে দিচ্ছি। আমাকে ভুলতে দে, যে, আমার অভাব শুধু একটা স্কুল-মাস্টারি।

ছেলেদের কাছে, জনে-জনে, নিজেই গেলেন তিনি। শান্ত সুহৃদের

মতো বললেন, নিজের কর্তব্য করো, একচিত্ত হয়ে পড়ো-শোনো, যখনকার যা কাজ। আমার দায়িত্ব আমি একাই নিতো পারবো। তোমরা খেলো করে দিওনা এর পরাজয়কে। একটা চাকরি যদি যায় তো গেছে, কাটুক না-হয় দিন অনটনে বা অনশনে, তবু বুঝতে দাও আমাকে যে আমি বেঁচে আছি, বাঁচবার ক্ষমতা, বাঁচবার যোগ্যতা আছে আমার মধ্যে। কী আমার গেছে, তার বদলে কা আমি পেতে পারি তার দিকেই আমাকে তাকাতে দাও। পড়োনি—দুই বিঘে জমি ?—'তাই লিখে দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।' অত্যাচারটাকে তুমি যেভাবে নেবে সেভাবেই বিস্ফারিত করবে নিজেকে।

নিরঞ্জন দেখলেন, পুলিন বেঁকলেন না একটুকুও। বরং, যেন আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। স্কুলের চাকরি খোয়ালেন বটে, কিন্তু অযাচিত পেয়ে গেলেন কতগুলি টিউশনি গোপনে খোঁজ নিয়ে দেখলেন তা প্রায় তাঁর মাইনের দ্বিগুণ। লাভ হলো কি তবে ? এখনো মেরুদণ্ড তার সোজা, মুখে প্রসন্নতা, জীবন-সম্বন্ধে চেতনার ভঙ্গিটা অত্যন্ত ঋজু। আর যাদেরকে তিনি মুক্ত রাখতে চান তাঁর প্রভাব থেকে তাদের মধ্যেই তাঁর গতিবিধি। ঠিক পথ না পেয়ে ডেকে পাঠালেন তিনি পশুপতিকে।

কিন্তু তার আগেই ঘরে ঢুকলো দীপক। মাথায় তখনো তার ব্যাণ্ডেজ।

—য়্যাডিশ্যনাল অঙ্কটা আমার ভালো হচ্ছে না, বাবা। মনে মনে যেন অনেক সংগ্রাম করে কথাটা সে ব্যক্ত করলো।

—সে কী কথা ? মাথায় চোট পেয়ে ব্রেন নষ্ট হয়ে গেল নাকি তোমার ?

—তা নয়, বাবা। মৃদু হেসে দীপক বললে—অঙ্কের নতুন যে মাস্টার এসেছেন, তিনি কিছু বোঝাতে পারেন না।

—নাচের অক্ষমতাকে উঠোনের অপরাধ বলে ঢাকতে চেয়োনা। বেশ, স্কুলে পড়া যথেষ্ট না হয়, বাড়িতে একজন টিউটর রাখো।

—সেকথাই তোমার কাছে বলতে এসেছি। দীপকের চোখে উৎসাহ

জ্বলে উঠলো।—বলতে এসেছি, পুলিনবাবুকে রাখো আমার মাস্টার। এমন সুন্দর করে শিখিয়ে দেবেন যে এক নম্বরও আমার ফসকাবে না।

নিরতিশয় গম্ভীর হয়ে গেলেন নিরঞ্জন। মনে হলো তাঁর আচরণের প্রতিবাদ যেন তাঁর নিজেরই ছেলের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। প্রার্থনার মধ্যে যতই আন্তরিকতা থাক, ভালো লাগলো না এই প্রার্থনার ভঙ্গিটা। মুখের গাম্ভীর্য পুরোমাত্রায় বজায় রেখেই তিনি বললেন—মাস্টার চাই, কলেজের প্রফেসর রেখে দিচ্ছি।

—সে অনেক মাইনে! স্কুলের ছেলের জন্যে স্কুলের মাস্টারই ভালো। যখন মাস্টার রাখবো বাবা, তখন আর কোনো দিকে না তাকিয়ে তার শিক্ষকতার গুণটাই শুধু আমরা দেখবো। মাথায় ব্যাণ্ডেজ সত্বেও দীপক বললে এভাবে।

যেন অনেকখানি উদারতা অনেকখানি ন্যায়বোধ সে পরোক্ষে প্রত্যাশা করছে বাবার কাছে। প্রায় বাচালতা মনে হলো নিরঞ্জনের। এবার তাঁর স্বরে সামান্য রুক্ষতা এলো।—কিসে তোমার ভালো হবে তা বোঝবার শক্তি তোমার চেয়ে আমার বেশি। খরচ বেশি কি কম, এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোটা কোনো কাজের কথা নয়।

যদিও বার-বার একই পোষাকে আসতে হয় পশুপতিকে, তবু সেটা বিলিতি পোষাক বলে সে শুধু নিজেকে নিরাপদই মনে করে না, মনে করে সম্ভ্রান্ত বলে। বিশেষত এখন একপেট খেয়ে সামনের দিকে ভুঁড়িটা ঠেলে দিয়ে এক মুখ পান চিবোতে চিবোতে যখন সে আসছিলো রাস্তা দিয়ে, সমস্ত পৃথিবীকে মনে হচ্ছিল তার পায়ের তলায় সামান্য মৃৎপাত্র।

—সব ঠিক করে এলাম। যুদ্ধের সেনাপতির মতো দৃপ্ত ভঙ্গি পশুপতির।

—কি ঠিক করে এলেন? নিরঞ্জন প্রশ্ন করলেন।

—আপনার সঙ্গে কালই সে দেখা করতে আসছে।

—কে?

দীপক তখনো সেখানে দাঁড়িয়েছিলো একধারে, ভাবছিলো, অদ্ভুতভাবে ভাবছিলো, হয়তো শুনতে পাবে পুলিনের নাম।

কিন্তু নাম যা শুনলো তাতে কি জানি কেন একটা অজানা ভয় মেশানো।

—হরেকৃষ্ণ প্রজাপতি।

নয়

হরেকৃষ্ণ প্রজাপতি পুলিনের বাড়িওয়ালা। প্রকাণ্ড শরীর, তৃতীয়-চতুর্থাংশই পেট, প্রায় চিবুকের নীচে থেকেই যার আরম্ভ! চোখ দু'টাতে অথচ শিশুর সরলতা।

—পুলিনের কতদিনের ভাড়া বাকি? জিগ্‌গেস করলেন নিরঞ্জন।

অনেকগুলি বাড়ির মালিক হরেকৃষ্ণ, এককথায় কোন সাফ জবাব দিতে পারলেন না।। কিন্তু উত্তরের অপেক্ষায় অপরপক্ষের নিঃশব্দতাটা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠেছিলো দেখে বললেন আমতা-আমতা ক'রে—তা, দু'-একমাস বাকি থাকতে পারে, বলতে পারছি না খাতা না দেখে।

—বাকি ভাড়ার জন্যে নালিশ করেন না কেন?

—সমান্য ভাড়া, তার জন্য নালিশ করবো কী হুজুর? আমি কি তেমন ছোটলোক? মানুষের বিপদ-আপদ আছে, সুবিধে-অসুবিধে আছে, দু-এক মাস ভাড়া বাকি পড়লেই অমান মামলা ঠুকতে হবে? ধর্ম বলবে কী! রামায়ণে, রাম রাজা হবে শুনে কৈকেয়ীও প্রথমটা এমনি ভাবেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলো।

—ও আপনি বুঝি ছোটলোক নন! নিরঞ্জনের চক্ষু কুটিল ও কণ্ঠ বক্র হয়ে উঠলো।

সে-বক্রতাটা বুঝেও যেন বুঝলেন না হরেকৃষ্ণ। বললেন—তা ছাড়া ভাড়া ঠিক বাকি আছে কিনা বলা যায় না! যদি থাকেও, তাগাদা করা মাত্রেই দিয়ে দেবেন। লোক বড়ো খাঁটি আছেন পুলিনবাবু।

—আপনার মাসতুতো ভাই বুঝি ?

এবার যেন মাথা কিছুটা খুললো হরেকৃষ্ণের! মাথা চুলকোতে-চুলকোতে তাই বললেন—তা তো জানিনা।

—আমি আপনাকে বলছি, পুলিন লোক মোটেই সিধে নয়, ইস্ক্রুপের মতো প্যাঁচালো, স্কুলের ছেলেদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব আনছে, তা জানেন ?

—তা তো জানি না!

—আর, তারি জন্যে তার চাকরি গেছে, তা জানেন ?

—কই, শুনিনি তো!

—এমন লোককে এ সহরে থাকতে দেওয়াই উচিত নয়, তা বোঝেন ?

বহুকষ্টে সেই সরল ভাসা-ভাসা চোখদুটোকে গোল করলেন হরেকৃষ্ণ। —নিশ্চয়ই। এ কথা কে না বোঝে ? আপনি বোঝালে না বুঝে উপায় কী বলুন ?

—তবে কুমীরের মতো কাঁদছিলেন কেন ভাড়াটের জন্যে ? মহাজন হয়ে মহৎ জন হবার এই অপচেষ্টা কেন ? বলি, বন্দুকের লাইসেন্স আছে তো আপনার ?

হরেকৃষ্ণ হাসলেন এবার তাঁর সহজাত হাসি। বললেন—সহর থেকে তাড়িয়ে দেয়াই যদি ঠিক মনে করেন তবে ভাড়ার নালিশ করে কী ফল হবে ? সমন জারী হবার আগেই হয়তো ফেলে দেবে টাকা কটা। তার চেয়ে উচ্ছেদের নালিশ ঠুকে দি এক নম্বর।

—এই তো কথার মতো কথা। সামনেই মন্থরাকার পশুপতি ছিল দাঁড়িয়ে, লাফ মেরে উঠলো।—এতক্ষণে খুলেছে যা হোক দিব্যদৃষ্টি। বাস্তুসাপকে মায়া করতে গিয়ে শেষকালে নিজেই যে উদ্বাস্তু হতে পারেন, বুঝেছেন তা হ'লে সেই পরিণামটা। হবেন কোথায় গজপতি, তা না হয়ে হয়েছেন কিনা প্রজাপতি! হরেকৃষ্ণ এবার ধাতে এলেন, হৃদয় থেকে দাঁতে।

বাড়ি-ছাড়ার নোটিশ পেয়ে মনে-মনে হাসলেন পুলিন, এতদিন, এত

বৎসর ধরে তিনি এখানে আছেন, এ বাড়িতে, কোনদিন মনেই হয়নি এ-বাড়িটা তাঁর নয়। মাস-মাস আট টাকা ভাড়া তিনি দিয়ে গিয়েছেন বটে, ভেবেছেন জীবনধারণের পক্ষে ও একটা অনিবার্য খরচ, যেমন চাল-ডালের, ধোপা-নাপিতের! মনেও হয়নি পৃথিবীর এক কোণে নগণ্যতম একটি কুঁড়ে ঘরে তিনি যে আকাশ দেখেন, রাতের আকাশ, তারায় ভরা ওড়া-পাখির আকাশ, তার জন্যেই তাঁকে ট্যাক্সো দিতে হয় মাস-মাস। যেমন তাঁর স্ত্রী-পুত্র এমনিই মনে হতো এ-বাড়িঘর, এর আকাশ-অবকাশ। যেমন তাঁর বুকের পাঁজর তেমনি যেন এই ঘরের বেড়া। এর প্রতিটি আনাচ-কানাচ, ঘুঁজি-ঘুপচি—সমস্ত তাঁর নিজের জিনিস, চালের বাতা আর ছাঁচ, এবড়ো-খেবড়ো মেঝের প্রতিটি ঢিপি আর খোদল। সহসা বুকের মাঝখানটায় টান পড়ে, যখন মনে প'ড়ে যায়, এ বাড়ি তাঁর বাড়ি নয়, এ মাটি তাঁর মাটি নয়, এ দেশ নয় তাঁর দেশ।

—ঝড়ের নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে। সুধাময়ীর দিকে পুলিন বাড়িয়ে ধরলেন নোটিশটা।

সুধাময়ীকে ব্যাপারটা বিশদ করে বুঝিয়ে দিতে হলো। আগুন-ধরা কাগজের মতো আস্তে-আস্তে তার সমস্ত মুখ বেদনায় মুচড়ে-মুচড়ে কালো, বিকৃত হয়ে গেল। কাতরে উঠলেন—চাকরি গেল, তারপর এখন গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে?

—কে জানে, সেই গাছতলার মাটিটুকুতেও স্বত্ব আমাদের আছে কিনা—

—তুমি সইবে এ-সব? সুধাময়ী ঝংকার দিয়ে উঠলেন।

—সইবো না তো ভাবি, কিন্তু করি কী বলো?

—প্রতি মাস ঠিক সময় ভাড়া দেওয়া হচ্ছে, তবুও উৎখাত করে দেবে বাড়ি থেকে? এ কী জুলুম?

—মাসিক ঠিকে প্রজা আমরা, পনেরো দিনের নোটিশ দিলেই বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের। বাড়িওয়ালার মর্জি।

—এই মর্জি হঠাৎ এই অসময়ে চাড়া দিয়ে উঠলো কেন?

—অর্থাৎ বাড়িওয়ালারো যিনি বাড়িওয়ালা তিনি এই কথাটাই বোঝাতে চান যে দুঃখ একাকী আসে না, ঝাঁক বেঁধে আসে।

—এখন উপায় কী হবে ?

—তুমিই বলো। শান্ত, স্নেহার্দ্র মুখে হাসলেন পুলিন।

—একবার বাড়িওয়ালাকে বলো না গিয়ে বুঝিয়ে।

—বাড়িওয়ালা বুঝবে না। পুলিনের গলা নিরাশায় নিষ্ঠুর।

—তবে ?

—তবে এক উপায় শুধু আছে।

—কি ? সুধাময়ী যেন টলতে-টলতে সামলে নিয়েছেন।

—কিন্তু তুমি কি আমাকে সেই উপায় অবলম্বন করতে বলবে ?

—বলোই না শুনি।

—এক উপায় শুধু আছে, পশুপতি সমাদ্দারের মতো সাহেব সেজে নিরঞ্জনের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মিনতি করা—

—মরে গেলেও না। সুধাময়ী বন্দী পাখির মতো পাখা ঝাপটে উঠলেন।

—তাই বলো। আমাকে সাহস দাও বাঁচতে। ভাবতে দাও আমিও কম বলশালী নয়। ঘরের ছাদ ওরা কেড়ে নিতে পারে, নিক, কিন্তু আমার আকাশ ওরা কাড়বে কি করে ?

মুখ ম্লান করে সুধাময়ী বললেন—কিন্তু আমি ভাবছি, আর ভেবে কিছুতেই তল পাচ্ছি না, আমরা কী অপরাধ করেছি নিরঞ্জন বাবুর কাছে।

—শক্তির মত্ততা শুধু অপরাধী নির্বাচন করেই আত্মপ্রকাশ করে না। আর যে শক্তিমান তার অপরাধবোধটাও অসাধারণ।

—তা তিনি তোমার উপর রুষ্ট হয়েছেন হোন, কিন্তু আমরা, তোমার স্ত্রী ও সন্তানরা ; কী দোষে দোষী হলুম তাঁর কাছে ?

পুলিন তাঁর মুখের হাসিটিকে অস্ত যেতে দিলেন না। বললেন—তোমাদের উপর তাঁর প্রত্যক্ষ কোনো আক্রোশ আছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। নাদির শা যখন সহর-কে-সহর, গ্রাম-কে-গ্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছিলেন,

ভাববার তাঁর সময়ও ছিল না কোথাকার কে ছুতোর বা চামার, চাষী বা মজুর কী অপরাধ করেছে। ধ্বংসের মধ্যে একটা অতিকায় মাদকতা আছে। একবার সুরু করলে সহজে থামতে ইচ্ছে করে না, যতক্ষণ তলোয়ারে থাকে ধার আর তার বাঁট থাকে তোমার হাতে ধরা। আগুন ততক্ষণই জ্বলে যতক্ষণ বাতাস থাকে। কিন্তু তোমার ভয় নেই, আমিও লড়বো। বিনা যুদ্ধে আমিও সুচাগ্র মেদিনী ছেড়ে দেব না।

লেজ গুটিয়ে তখুনি-তখুনি বাড়ি ছেড়ে দিলেন না পুলিন। তিনিও উকিল লাগালেন, উচ্ছেদের নোটিশটা আইনের চোখে নিখুঁত হয়নি তুললেন সেই তর্কে ধূলিজাল, মোকদ্দমা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে উঠলো। যা ভাবা গিয়েছিলো একমাসের ব্যাপার, প্রায় এক বছরেও তার নিষ্পত্তি হচ্ছে না। খুব সুযোগ পাওয়া গেল হরেকৃষ্ণকে উত্তেজিত করে তুলতে, পিপের মধ্যে একটু-একটু করে পরিপূর্ণ বারুদ ঠুসতে, যাতে বিদারণটা অভ্রভেদী হয়ে ওঠে।

হলোও তাই। মোকদ্দমায় হরেকৃষ্ণই জিতলো, আর তখনই লোক-লস্কর পাইক-পেয়াদা নিয়ে গেল সে পুলিনকে খেদিয়ে বাড়িতে দখল নিতে। প্রকাশ্য দিবালোকে হরেকৃষ্ণের লোক বাড়ি-ঘর জিনিষ-পত্র সব তছনছ ওলোট-পালোট করে ফেললো, তোষক-বালিশ থেকে সুরু করে হাতা-বেড়ি পর্যন্ত। সুধাময়ী শুধু তখন খেতে বসেছিলেন, বাড়া ভাত ফেলে এঁটো হাতেই নেমে দাঁড়ালেন রাস্তায়। ভয় পেয়ে ছোট ছেলেরা আঁকড়ে রইলো তাঁর চারপাশে।

শুধু ভিড়ের থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে রাম আর পুলিন দেখতে লাগলেন এই সুশৃংখল বিশৃংখলা। যে জিনিষটা আস্তে নামিয়ে রাখা যায়, সেটাকে জোর করে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলা; যেটাকে ধূলোয় নামিয়ে রাখতে পর্যন্ত মায়া হয় সেটাকে টান মেরে ফেলে দেয়া নর্দমায়। শ্রদ্ধা বা বিনয়ের সম্মান রাখে না এমন একটা অখণ্ড তাণ্ডব।

কদিন আগে থেকেই আরেকটা বাড়ি ঠিক করে রেখেছিলেন পুলিন। কিন্তু এখন খোঁজ নিয়ে দেখলেন যে সেটা নাকি আগেই ভাড়া হয়ে গেছে।

—ভাড়া হয়ে গেছে কি মশাই ? লোক কই ?

—এখনো আসেনি। পরে আসবে।

—পরে আসবে ! কে সে লোক ?

—যেই হোক, তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি ভাড়া দিতে পারবো না।

পুলিনের বুঝতে বাকি রইলো, কার আঙুলের হেলনে এ বাড়ির দরজাও বন্ধ হয়ে গেল তাঁর মুখের উপর।

অবশেষে অনেক সাধ্য-সাধনা করে বাজারের মধ্যে এক ময়রার দোকানের পাশে সংকীর্ণ একটা খুপরিতে এসে উঠলেন সপরিবারে। চারিদিকে চাপা, ঝুঁকে-পড়া, ফাট-ধরা বিবর্ণ খাঁচা। এমনিতে ভাড়া হতো যার আড়াই টাকা, বিপদের সময় তাই দাঁড়িয়েছে ছয় গুণ। কে জানে এরো পিছনে নির্দেশ আছে কিনা নিরঞ্জনের।

কি-কি জিনিস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আর কি-কি জিনিস ভেঙে বা নষ্ট হয়ে গেছে সকরুণ স্বরে তারই একটা তালিকা দিচ্ছিলেন সুধাময়ী।

—যত জিনিস, তত বাধা তত ভার। যা গেছে তা গেছে। কী নেই না ভেবে কী আছে তাই দেখ। তাই যথেষ্ট। পুলিন বললেন উদাসীনের মতো।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন সুধাময়ী—তোমার খাতা কই, তোমার সেই লেখা, নতুন যেটা লিখেছিলে এতদিন ধরে ?

—নেই ?

—কই, দেখতে পাচ্ছি না তো !

পুলিন অসহায়ের মতো হাতড়াতে লাগলেন অন্ধকারে, কান্নার মতো কী কতগুলি শব্দ করতে লাগলেন ভাষায় যার উচ্চারণ নেই, অর্থও নেই ; দুর্নিবার উত্তেজনায় বাইরে বেরিয়ে গেলেন একবার, আবার ফিরে এলেন তখুনি, শান্ত হয়ে বসে বললেন সুধাময়ীকে, তাঁর মুখের দিকে না চেয়ে—তার জন্যে তুমি দুঃখ কোরো না। ও আমি ফের নতুন করে আরম্ভ করবো।

রাত গভীর হয়েছে, কয়েকটা কুকুরের ডাক ছাড়া কোথাও আর শব্দ নেই। নতুন পরিবেশে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে পুলিন স্থির মনে ভাবতে

চেষ্টা করলেন, এ তাঁর কি হয়ে গেল দেখতে-দেখতে। চাকরি নেই, আশ্রয় নেই, মর্যাদা নেই, কোথায় তিনি চলেছেন ভাগ্যের হাত ধরে। জীবনে কোনদিনই কখনো একটা তাঁর আবর্তময় ফেনিল আকাঙ্ক্ষা ছিল না, দারিদ্র্যকে ভয় করেননি, তাই নিরীহ, স্কুলমাস্টারিতেই পরিতৃপ্ত ছিলেন, পরম সুখী ছিলেন সুধাময়ীর সহধর্মিতায়। সেই সহজ প্রসন্ন শান্তিটুকু বিধাতা এমন করে বিপর্যস্ত করে দিলেন কেন? কেন সহসা তাঁকে ডাক দিলেন তিনি দিগন্তহীন প্রান্তরের উপর, সর্বহারাদের সীমান্তে?

—রাম!

—কী বাবা—

—বিছানায় ছারপোকা উঠেছে? মশা খুব?

—না বাবা।

—তবে?

—ঘুমুতে পাচ্ছি না।

—কেন?

—জানি না, ঘুম আসতে চাইছে না কিছুতেই।

—কেন শরীরটা খারাপ?

—বুঝতে পাচ্ছি না। হয়তো খারাপ। জ্বর হয়েছে।

—জ্বর হয়েছে? পুলিন ব্যস্ত হয়ে রামের গায়ে হাত রাখলেন।

—কই, গা তো ঠাণ্ডা।

—এ ভিতরের জ্বর, বাবা। ভিতরটা আমার জ্বলে যাচ্ছে।

পুলিন চুপ করে রইলেন।

রাম জিগ্‌গেশ করলে—রাত অনেক হয়েছে বাবা?

—হবে।

—ভোর হবার আর দেরি কত?

পুলিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—অনেক।

দশ

—আচ্ছা, আমার কাছে পড়বে তুমি মাস-মাস ?

প্রশ্ন শুনে রাম তো অবাক। চোখের সামনে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে প্রোফেসর শীতলবাবু।

—ম্যাট্রিকটাতে তেমন কিছু ব্রিলিয়্যাণ্ট করতে পারলে না, যেমন আমরা সব আশা করেছিলুম। আর কী করেই বা করবে? কী বিশ্রী ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে গেল তোমাদের সে দিনগুলো। কিন্তু তাই বলে আই-এ পড়লে না কেন ?

—ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। চোখ নত হয়ে এলো রামের।

—বা, অনায়াসে তোমাকে ফ্রি করে দেওয়া যেত কলেজে।

—যেত না। লাগত অনেক ধরাধরি, অনেক অনুরোধ-উপরোধ, তাতে আর আমরা রাজি নই। তা ছাড়া কলেজের মাইনে থেকে ছাড় পেলেই সব খরচ চুকে যায় না—বই আছে, জামাজুতো আছে—রাম আবার চোখ নোয়ালো।

শীতলবাবু দেখতে পেলেন রাম যেন কোন দুরপনেয় দারিদ্র্যের দেশ থেকে এসেছে, দুঃখ-দুর্দিনের প্রত্যক্ষ প্রতীক হয়ে। পায়ে জুতো নেই, পরনের ধুতির ছিন্নতাটা দুঃসাহসীর মতো উদ্ঘাটিত, মাথার চুলগুলি যেন বহন করেছে একটা অবাধ্য ঝটিকা। যেন কী দুঃসহ দুঃস্বপ্নের জ্বালা তার দৃষ্টিতে।

হঠাৎ এই নমনীয় ভঙ্গিটা নিজের কাছে রামের খুব অস্বস্তিকর লাগছিলো, এই দীন ভাবে মাটির দিকে চোখ নামানো। প্রায় একটা ভিক্ষার্থীর ভঙ্গি। তাই সে বললে চোখ তুলে—ও-সব ধরা-বাঁধা পড়া পড়ে কী আর হবে ? দেশ তো অনেক দিন ধরেই পড়লো এখন আই-এ, বি-এ, বাছাই-করা বিদ্যের বোঝা বইলো পুরুষানুক্রমে, ভিটামিন নাই শুধু ভুষি, কিন্তু হয়েছে কি, পেয়েছি কি আমরা মোটমাট? যেখানে ছিলাম, সেখানেই আছি, বিদ্যের বোঝা টেনে-টেনে আর এগুতে পাচ্ছি না—

বিস্ময়ে তাকালেন শীতলবাবু। এ সব কারুর শেখানো কথা নয়, যেন নিজের নির্জ্জন আত্মসম্ভাষণ। তবু স্বরটাকে একটু বাঁকা করে জিগ্‌গেস করলেন—তবে এখন কী করতে হবে আমাদের?

—জানি না। তবে একবার নতুন পড়া পড়তে হবে এই কেবল জানি। পৃথিবীকে দেখতে হবে নতুন দৃষ্টিকোণে। জীবনের সার্থকতাটা বুঝতে হবে অন্য অর্থে, কী আমি পেলাম, তাতে নয়, কী আমি দিলাম, তাতেই কষতে হবে আমাদের জীবনের মূল্য। আর দেশের দরিদ্রতম, নগণ্যতম যে লোক সে-ও কত দিতে পারে, তাই আজ দেখাতে হবে আমাদের—

—ভালো কথা। তবু যেন একটু বক্রতা রইলো প্রচ্ছন্ন হয়ে। কিন্তু নিজে এখন কী করবে শুনি? ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াবে?

—ভব—সমস্ত পৃথিবী যদি ঘুরতে পেতুম তা হলে হতুম না হয় ভব-ঘুরে। তা নয়, আমাকে এই ছোট সহরেই তার অলি গলি ধরে ধূলো পায়ে ঘুরে বেড়াতে হবে—যা হোক কোনো একটা চাকরির সন্ধানে। যে কোনো চাকরি, মাঠে হোক, কলে হোক, গোয়ালে হোক, আস্তাবলে হোক—

—এখনি তুমি চাকরি করবে?

—হ্যাঁ, এখন থেকেই। জীবনকে নেব এবার ভাসিয়ে, ঢেউয়ে আছড়ে-আছড়ে। বে-নোঙর নৌকা। হাল গিয়েছে ভেঙে, মাস্তুল গিয়েছে বেঁকে, উত্তীর্ণ হবে এসে ভাঙা জাহাজের দেশে। অগণন জনগণের রাজ্যে। যারা পড়ে আছে—মরে আছে—সরে আছে। সেই ঝরা-মরাদের মাঝখানে। অনেক পোড় খাবো, অনেক টোল খাবো, অনেক চোট খাবো, দুমড়ে মুচড়ে থেঁৎলে যাবো বারে-বারে, তবু ছাড়বো না কখনো নিজের এলাকা, যারা অধম—যারা অক্ষম তাদের জাতিধর্ম।

—কী পাগলামি করছ তুমি, রাম! শীতলবাবু তার কাঁধে হাত রাখলেন।—বেশ তো, মন দিও তুমি দুর্গতদের উন্নতিতে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের উন্নতি করে নেয়াতে দোষ কী! আচ্ছা আমি যদি তোমাকে পড়াই, তোমার আই-এর পড়া আমার অবসর মতো, তাতে তোমার আপত্তি আছে?

—আপনি আমাকে পড়াবেন, আপনাকে আমি মাইনে দেব কোত্থেকে ? চলতে-চলতে রাম যেন প্রচণ্ড হোঁচট খেল।

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

—বা, ভাবতে হবে না কি-রকম ? আপনি আমার জন্যে আপনার দামী সময় অকারণে অপচয় করবেন, তা কখনো হতে পারে ?

—অপচয় করবার মতো অজস্র সময় আমার নেই—তবু তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তোমার লাভ নেই। তুমি যদি আমার থেকে একটা ফ্রি কোচিং পাও, মায় দরকারী সব বই খাতা, তা হ'লে তোমার অসম্মতি থাকার কোনই কারণ থাকতে পারে না—

—কিন্তু, কেন, কেন, আপনি আমার জন্যে এত স্বার্থত্যাগ করবেন ?

শীতলবাবু একটি শীতল হাস্য করলেন। বললেন—ও-সব ত্যাগ-ফ্যাগের আমি ধার ধারি না। বাজারে আমার টিউশনির দাম আছে। আমার পাওনাটা অন্য জায়গা থেকে মিটে যাচ্ছে বলেই আমার পোষাচ্ছে। বুঝলে ? বার কতক তিনি রামের কাঁধ চাপড়ে দিলেন।

—পাওনাটা অন্য জায়গা থেকে মিটে যাচ্ছে। রাম যেন কোন কিছুর দিশপাশ খুঁজে পেলো না। তবে, সে ভবিষ্যতে মানুষ হবে, হবে জননেতা, দেশের রথবাহ, তাতেই পর্যাপ্ত প্রাপ্তি হবে তাঁর, শীতলবাবুর ইঙ্গিতটা কি এইখানে ?

—ভবিষ্যতে কী হবে, বা তুমি পরে বড়লোক হয়ে আমার এ ঋণ শোধ করে দেবে তারই ফাঁকা আশায় আমি কিছু করছি ভেবো না। আমি গরীব মাস্টার, ছাপোষা লোক, আমার চোখ সর্বদা বর্তমানে। বর্তমানেই আমার পাওনাটা মিটে যাচ্ছে বলে আমি অগ্রসর হয়েছি।

—বর্তমানেই মিটে যাচ্ছে ? রাম হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে রইলো শীতলবাবুর চোখের দিকে। তারপর অস্ফুট যন্ত্রণার সুরে বললে—কেউ দিয়ে দিচ্ছে আপনার মাইনেটা ?

—দিয়ে দিচ্ছে। শীতলবাবু খুব সরল হবার চেষ্টায় উদার ভঙ্গিতে হেসে

উঠলেন—এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ যা হোক। মাইনেটার কোথাও ব্যবস্থা না হলে আমার সাহস কী, আমার সময় অমন উ।ড়য়ে দিই!

—কে দিয়ে দিচ্ছে আপনার মাইনে?

—সে তোমার বন্ধু—

—দীপক!—বুঝেছি। কিন্তু তাকে গিয়ে বলবেন, তার ধনমদের স্পর্ধা থেকে আমার এই দারিদ্র্যের স্পর্ধাটা কম বলবান নয়!

—তুমি বলো কী, রাম? তার এই দান এই দয়া—একে তুমি ছোট বলতে চাও?

—কিছুই বলতে চাই না, স্যার। দেখাতে চাই উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান-টাও কোন অংশে ছোট নয়। তাকে গিয়ে বলবেন, রাম এখন আর পড়বে না, পড়াবে।

—পড়াবে? তার মানে? কাকে পড়াবে? শীতলবাবু হাসলেন আবার সেই বাঁকা হাসি।—এই ম্যাট্রিকের বিদ্যে নিয়ে?

—হাঁ, যাদেরকে পড়াবো, তাদের পক্ষে আমার এই ম্যাট্রিকের বিদ্যেটাও অনেক।

—কাদের পড়াবে?

—নির্জ্ঞান নিরক্ষরদের। ঐ সব জেলে-জোলা মুচি-মুদ্দা-ফরাসদের। যে প্রচণ্ড জড়পিণ্ড পড়ে আছে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারে, তার মাঝে জ্ঞানের, বোধের অনুভবের আগুন জ্বালাবো। যেখানে ছিল নিশ্চল বদ্ধ জল সেই-খানেই জাগাবো জোয়ারের উচ্ছলতা। দীপক যদি আমার বন্ধু হয়, তবে তাকে বলবেন, আমার জ্ঞানবৃদ্ধি করবার চেষ্টা না করে অন্তত বাড়ির সইস-বেয়ারা চাকর-চাপরাশির যেন জ্ঞান বাড়ায়। বলে উত্তরের প্রতীক্ষা না করে সে হনহনিয়ে চলে গেল অন্য দিকে।

তারপর—

আরো কিছুদিন পর রামের মুখোমুখি দেখা হলো দীপকের সঙ্গে, সেই রাস্তার উপর। প্রায় অপ্রত্যাশিত। এই নোংরা ঘিঞ্জি পাড়ার রাস্তায় দীপক হাওয়া খেতে আসবে, এ কল্পনার বাইরে।

যেন কিছুই ঘটেনি মুখে এমনি ঔজ্জ্বল্য এনে দীপক বললে—এত ব্যস্ত ?

যেন কিছুই ঘটোন মুখে এমনি ঔদাসীন্য এনে রাম বললে—বসন্ত যে।

—বসন্ত ?

—হ্যাঁ, ও তোমাদের বাড়ির গেটের উপরে ঘন মাধবীলতায় রঙীন ফুলের গুচ্ছ-গুচ্ছ বসন্ত নয়, এ হচ্ছে গায়ের বসন্ত, ডুমো ডুমো, গুটি-গুটি—সূঁচ রাখবারো জায়গা নেই এতটুকু। আর এ জোলো নয় একেবারে আসল।

বন্দুক উঁচিয়ে কে যেন রাস্তার মাঝে দাঁড় করিয়ে দিল দীপককে। বসন্ত কথাটার যে এমন একটা বিরুদ্ধ ও বিকৃত অর্থ হতে পারে এ যেন একটা নৃশংস নিষ্ঠুরতা।

মূঢ়, নিশ্চেতন গলায় সে জিগ্‌গেস করলে—কার ?

—ছোট ভাই তুটোর। মারও গা টাটিয়ে জ্বর এসেছে—তাঁরও হলো বলে। চেষ্টা করেও স্বরের ছলছলানিটুকু রাম গোপন করতে পারলে না।

—তোমার বাবা কোথায় ?

—বাবা ? বাবা গেছেন সভায় বক্তৃতা করতে।

—বক্তৃতা ?

—হ্যাঁ, লোকে পাগল হলে হয় প্রলাপ বকে, নয় বক্তৃতা দেয়।

—কিসের বক্তৃতা ?

—আর কিসের ? স্বদেশী।

—স্বদেশী ? দীপক যেন চোখের সামনে ভূত দেখলো।—কী বলো, সর্বনাশ !

—সর্বহারার আবার সর্বনাশ কী ! জলে ডুবেই যে মরবে সে কুয়োয় নেমে মরবে না, সে মরবে সমুদ্রের অতলে।

—তোমার বাবা তো কোনো দিন ছিলেন না এ সবের মধ্যে !

—আর বলো কেন ? মানুষ যখন জীবনে খুব বেশি অপমান ও দুঃখ

পায় তখন সর্বাগ্রে হয়তো তার দেশের কথা মনে পড়ে, যে দেশ পরাধীন, দুঃখ ও অপমানের যার অবধি নেই। তখন সে হয়তো কিছু করতে চায় দেশের জন্যে, আর কিছু করতে না পেরে বলতে সুরু করে।

—আর তুমি কোথায় চলেছ?

—আমি? আমি চলেছি খাটিয়ার সন্ধানে।

--সে কি কথা?

—উপায় নেই তা ছাড়া। ছোট ভাই দুটোকে হাসপাতালে রিমুভ করতে হবে।

দীপক এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে রইলো। বলল—আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো না।

—কোথায়?

—যেখানে তুমি যাচ্ছ, তোমার ভাইয়ের সেবায়। দীপকের মুখে মমতার ঠাণ্ডা ছায়া পড়লো।—একা-একা নিশ্চয়ই নিজেকে তোমার ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছে। আমি কী কাজে লাগবো জানি না, তবু তোমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকলে কিছুটা তোমার ভালো লাগতে পারে।

—বসন্তের ছোঁয়া লেগে তুমিও পাগল হয়ে গেলে দেখছি। সত্যি—পাগলই তোমাকে সবাই ভাববে, নোংরা বাজার-বস্তির গলিতে গলিতে বেড়াতে এসেছেন কিনা রূপার দেশের রাজকুমার। শিগ্‌গির বাড়ি পালাও। এ বদ্ধ গলির হাওয়াটা পর্যন্ত বিষাক্ত।

পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলো রাম, তার একখানা হাত চেপে ধরে দীপক তাকে বাধা দিল। বলল—তুমি আর আমাকে বন্ধু বলে মেনে নিতে রাজি নও?

—বন্ধু? ও কথাটার কোনো মানে আছে নাকি?

—থাকা তো উচিত। সব কথার আছে, আর ও-কথাটার মানে থাকবে না? আমার বাবা, তোমার বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন বলে আমি অপরাধী হবো, রাম?

—জানি না। কিন্তু এতটুকু জানি, অট্টালিকার সঙ্গে পর্ণকুটিরের বন্ধুতা

হয় না, বন্ধুতা হয় না ফুলন্ত বসন্তের সঙ্গে জ্বলন্ত ধসন্তের। যাও বাড়ি যাও, বন্ধু যদি চাও, খোঁজো গে বড়লোকদের মধ্যে, যারা তোমার সমান, সমধর্মী, যাদের সঙ্গে তোমার চিন্তার সমতা, আকাঙ্ক্ষার সমতা। টবের ফুল হয়ে ঘাসের ফুলের দিকে তাকিয়ো না। বলেই রাম উত্তরের অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল।

দীপকের আর কোনো দিন এত নিঃস্ব, এত শক্তিশূন্য বলে মনে হয়নি নিজেকে। যেন সর্বাঙ্গে সে একটা প্রখর প্রহারের জ্বালা অনুভব করছে, প্রত্যেক রোমকূপে যেন তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মাগ্র সূচীমুখ! মনে হলো সমস্ত গা ভরে যেন তার বসন্তের গুটি উঠেছে। যেন এইবার, এতক্ষণে পাচ্ছে সে রামের সমতা, রামের সমভাগিতা। নোংরা, বন্ধ গলির মধ্যে ময়রার দোকানের ছোট্ট রোয়াকটুকুর উপর সে বসে পড়লো।

অনেক ঘোরাঘুরি করে, ইনভ্যালিড চেয়ার নয়, দড়ির একটা কেঠো খাটিয়া জোগাড় করে এনেছে রাম। অন্তত পাল্কি পেলেও চলতো তার, কিন্তু পাল্কির যা দাম তা জমিয়ে রাখতে পারলে ভাই ছুটোর সৎকার হতে পারবে। সঙ্গে বাহক নিয়ে এসেছে সে ছুতোরের দোকানের কাঙালীকে, জন-খেটেল খলিল আর গোপাল মোল্লাকে। এখনও ভাই ছুটো বেঁচে আছে বলে জাতের প্রশ্ন উঠতে পারেনি রামের মনে। হয়ত, মরে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে জাত আবার প্রশ্ন গজিয়ে উঠবে, খলিল আর গোপাল মোল্লা তখন কাঁধে করে বইতে পারবে না খাটিয়া। ওদের কাঁধ তখন অশুচি হয়ে যাবে।

কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে দেখে, এ কী ব্যাপার? দীপক মাকে জল গড়িয়ে দিচ্ছে, পাখা করে ছোট ভাই ছুটোর গা থেকে মাছি দিচ্ছে তাড়িয়ে। আরও কত কী যেন করতে চাইছে, করতে পারছে না।

—এ কি, তুমি এখানে? রাম একেবারে ফেটে পড়লো।

একচুলও পিছু হটলো না দীপক। বিনয়স্নিগ্ধ গলায় বললে—না এসে করি কী বলো? তোমার বাবা গেছেন বক্তৃতা দিতে, তুমি গেছ হাসপাতালের আশ্রয় খুঁজতে। এতক্ষণ এদের দেখে কে শুনি? কে জল দেয় মাকে, কে একটু হাত বুলিয়ে দেয় ছোট ভাই ছুটোর দগ্ধ যন্ত্রণায়।

—সে তুমি ? তুমি ? কখনোই নয়। রাম প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

সুধাময়ী আর্ত, কাতর গলায় বললেন —তুমি এখানে কেন, এ ভীষণ সংক্রামক রোগের মধ্যে ? এই পঙ্কিল দারিদ্র্য ও অসহ্য অসহায়তার মধ্যে ? নির্মল ফুলে কেন এই কীট বয়ে নিয়ে যাবে বলো ?

পীড়িত স্বরে দীপক বললে—আমি কি আপনাদের একটু সেবাও করতে পারবো না, মা ?

—এ সেবা নয়, স্পর্ধা ঔদ্ধত্য। রাম প্রদীপ্ত কণ্ঠে বললে—সুনাম কেনবার ফিকির। বাপের অমানুষতা ঢাকবার জন্যে মিথ্যে কারচুপি। ঢের হয়েছে, গরু মেরে ফেলে তারই চামড়ায় জুতো আমরা উপহার নেব না। দেব না তোমাকে এই সেবার নাম করে হৃদয়ের বাবুগিরি করতে।

—আমাকে বন্ধু না ভাবো, যারা তোমাকে সাহায্য করতে এসেছে, ঐ বাইরে আছে দাঁড়িয়ে, আমাকে তাদের একজন বলেও কি ভাবতে পারো না ? দীপকের গলা ভারী হয়ে এলো।

—তা। তাদের একজন হতে পারলে তো তুমি আমার বন্ধুই হতে।—তুমি—তুমি আমার—কথাটা রাম প্রাণপণে প্রতিরোধ করলো—তুমি আমার কেউ নও। তুমি চলে যাও এখান থেকে।

—চলে যাবো ?

—হ্যাঁ, চলে যাবে। এখানে তোমার স্থান নয়। এত মহান একটা বেদনার তীর্থস্থানে তোমার আসবার অধিকার নেই।

—নেই ? শূন্য কণ্ঠে দীপক প্রশ্ন করলো।—তবে আমি যাবো কোথায় ?

—যাবে কোথায় ? অন্তত এখন একবার ঐ কালীতলার মাঠে যাও যেখানে বাবা উন্মত্তের মতো বক্তৃতা দিচ্ছেন—আমার বাবা, যিনি কোন দিন মুখ ফুটে একটাও কথা বলেন নি জীবনে, তাঁর মুখ থেকে আজ গলিত লাভা বেরুচ্ছে। যাও, শোনো গে, দেখবে একটা কথাও তিনি মিথ্যে বলছেন না। ঐ, পাচ্ছ শুনতে তাঁর গলা ? হ্যাঁ, একটা দুটো কি তিনটে মৃত্যু নয়—একত্রীভূত মৃত্যু, জীবন্মৃত্যু। যাও, চলে যাও এখান থেকে। বলে প্রায় ধাক্কা দিয়েই রাম দীপককে ঘর থেকে বের করে দিল।

এগার

এই হলো গিয়ে মন্ত্রীবর পুলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পূর্বকাহিনী।

খবরটা হঠাৎ শুনে খুব চমকে উঠছ নিশ্চয়ই, কিন্তু জীবনে যা ঘটে তা অনেক সময় গল্পের চেয়েও আজগুবি শোনায়। রাস্তার ছেলে হয়ে রাজার আসনে গিয়ে বসেছে এ তো জানা কথা! দরিদ্র মুচির ছেলে একদিন দুর্ধর্ষ স্ট্যালিন হয়ে দেখা দেয়। পুলিন তো তবু মাস্টার, গণতন্ত্রের যুগে মন্ত্রী হতে হলে মোক্তার বা মুচ্ছুদি বা নিবেদন মুহুরি হবারও দরকার করে না। মাল্লা-মেছুয়া সবারই সমান অধিকার।

তবু মাঝখানকার খবর আরো একটু বলা দরকার। নইলে ফাঁকটা নিতান্ত ফাঁকা মনে হতে পারে।

ঘোরতর বসন্তে একে-একে নাবালক শিশুগুলি মারা গেল, আর পুলিনের কণ্ঠের আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগলো অগ্নিস্রাবী বক্তৃতার আকারে—কালীতলা থেকে চণ্ডীতলা, জতুদাহ থেকে খাণ্ডবদাহে। সমস্ত কিছু রিক্ততা যেন আর কোন বৃহত্তর শূন্যতার নির্দেশ। যত দুঃখ, যত দারিদ্র্য—সব যেন আর কোন ব্যাপকতার দীনতার কাহিনী। সন্তান-শোকবেদনাও যেন কোন্ অত্যাচারেরই স্মৃতিচিহ্ন।

—কি হবে এ সব পাগলামি করে? শোকশ্রান্ত স্বরে সুধাময়ী বলেন। যেন স্বামীর ব্যর্থতাটা বুঝতে পারেন হৃদয়ের মধ্যে।

—টিকতে পাচ্ছি না। ভিতরটা সব জ্বলে যাচ্ছে। মনে হয় যেন বিষ খেয়েছি। পুলিনের আর্তস্বরে কেমন একটা উল্লাস জেগে ওঠে।

—সংসার থেকে এখনো অমৃত হারিয়ে যায়নি। চলো, আর কোথাও পালিয়ে যাই আমরা। ছোটোখাটো চাকরি একটা নিশ্চয়ই তোমার জুটে যাবে, আবার নিরিবিলিতে ঘর বাঁধবো। সুধাময়ীর চোখ সজল হয়ে আসে।

—অসম্ভব। বজ্র যাকে দগ্ধ করে সে আর বর্ষার শ্যামশোভা দেখে মুগ্ধ

হয় না। যে একবার বিদ্যুতের খবর পেয়েছে সে চায় না আর ঘরের কোণের দীপশিখার সঙ্গে মিতালী পাতাতে।

ফল যা হবার তাই হল। গিরিবর্ত্মের উপর উদ্দাম ঘোড়া ছুটিয়ে দু'হাতের বল্গা দিলেন ছেড়ে, সটান পড়লেন এসে এসে গহ্বরে, জেলখানায়।

দীর্ঘদিনের কারাবাস। রাম আর তার মা আরো আবর্জনার মধ্যে নেমে এল, এবারে একেবারে একটা ছোটলোকের বস্তির মধ্যে। এ-পাশে ও-পাশে মুচি, ছুতোর, দিন-মজুর, ছত্রিশজাতের ছত্রাকার।

—এ কোথায় এলাম আমরা?

—ঠিক এসেছি, মা। মহামানবের দেশে।

—কী যে বলিস্। সুধাময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

—হ্যাঁ মা, জীবনের এই পঙ্ককুণ্ডেই মহামানবেরা বাস করেন। আমরাও যে ওদের প্রতিবেশী, এটাই এখন জানানো দরকার।

বাবা যা স্বপ্ন দেখেন তার আভাস যেন রামেরও চোখে এসে ছায়া ফেলে। কিন্তু বিস্তীর্ণ মরুভূমির মাঝে কেমন যেন সেটাকে মরীচিকার মতো মনে হয়। মনে হয় যার পিছনে ওরা ছুটেছে তা জল নয়, তা বালি; পিপাসার্ত বলে রোদটাই রূপালি জল বলে ভুল হচ্ছে।

জেল পুলিনের জীবনে নতুন জেল্লা নিয়ে এল। যেন ললাটে জ্বলছে জয়তিলক। সঙ্গে-সঙ্গে সনাতন ধর্মের দণ্ডধর হয়ে দাঁড়ালেন। নম্র, নিরীহ, নিঃশব্দ এক শিক্ষক রূপান্তরিত হয়ে গেলেন এক বাগ্মী, বিদ্রোহী, বৈরাগী দেশনেতায়। চৈত্রের মৃদু-মন্থর বাতাস যেন বৈশাখের করাল প্রভঞ্জনে হাওয়া বদল করলে।

বিদ্বানের চেয়েও বাগ্মী 'সর্বত্র পূজ্যতে'—চাণক্যের প্রথম শ্লোকের পুনর্লিখন দরকার। জিভ কলমের চেয়ে দ্রুত, তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ। তবু যদি কলমকে বলা হয় তলোয়ারের চেয়ে প্রবলতর, জিভকে বলতে হয় আগ্নেয়গিরির চেয়েও দুর্নিবার্য। যে বলতে পারে সে ভূমিকম্পে টলিয়ে দিতে পারে; বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে যে ভস্ম নিস্তেজ করে রাখে আগুনকে, উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই ভস্মজাল। সেই বাগডম্বরু বেজে

উঠলো পুলিনের কণ্ঠে, সেই মিতভাষী, গৃহকোণউৎসুক পুলিন, বেজে উঠলো আদিগন্ত প্রান্তরে, গহন জনারণ্যে। এক জেলা থেকে আর এক জেলায়, পুলিনের নাম অগ্নি-অক্ষরে জ্বলে বেড়াতে লাগলো।

জেলখানায় আবার জুড়ুতে গেলেন পুলিন।

রাম, মুচি-মেথরদের মধ্যে বসে তাদের অক্ষর শেখায়, আর যার ক্ষয় নেই, বিকার নেই, সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট যেন দেখতে পায় শুধু বাবা পথ হারিয়ে ফেলেছেন। যে জগৎ তিনি কল্পনা করছেন সেখানে শুধু অল্পসংখ্যকের সুখ, অগণনের মুক্তি নয়, শ্রান্তি ও শোষণ থেকে, অপচয় ও অবসরহীনতা থেকে। মনে হয়, দ্বেষ নয়, দ্রোহ নয়, শুধু শান্তি আর সাম্য আর বন্ধুতা। আমরা এক আকাশের নীচে, এক বায়ুর বেষ্টনীতে, প্রাণবতী এক পৃথিবীর অঞ্চলব্যজনে। আমাদের এক ঈশ্বর। আমরা একে অন্যের প্রতিবেশী, দেশে-দেশে হৃদয়ে-হৃদয়ে! আমরা একে অন্যকে স্পর্শ করে আছি—আমাদের সভ্যতায়, আমাদের সংস্কৃতিতে, আমাদের শিল্পে-সাহিত্যে। এত বড় একটা স্থায়ী ও স্থির মুক্তির স্বপ্ন দেখবেন না কি দেশপালকেরা? আর-সবাই তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণে আছে এমন দয়াবান অভিভাবকের ভাব থেকে শুধু সামান্য পকেট-খরচা বাড়িয়ে দেবেন এ প্রতিশ্রুতিতেই কি তাঁদের দায়মোচন হল? রাম ঠিক উত্তর পায় না, শুধু অনুভব করে নেতৃত্বের বদলে ভ্রাতৃত্বের দিন হয়েছে সমাগত। তুমি আমার পক্ষে এসো, না, আমি তোমার পথে যাই। পৃথিবীময় আমরা ভাই-ভাই।

এবার যখন জেল থেকে বেরুলেন পুলিন, তখন নতুন হাওয়া, নতুন হালচাল। তখন শুধু তৈরী করো, গঠন করো, নতুন বইয়ের নতুন পৃষ্ঠা ওলটাও—এই রব পড়ে গেছে চারিদিকে। পুলিনও ধুয়ো ধরলেন, বললেন, দেশকে এগিয়ে যেতে হবে নব সংগঠনের পথে, ধ্বংসে নয়, নির্মাণে। বাজ-পাখির মতো নোখ করে থাকলে হাঁড়ি-কুঁড়িও গড়া যাবে না। অতএব পুলিনও গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—ভোট চাই, ভোট দাও।

পুলিন তখন সবাইর মাথার মণি, ছেঁড়া কাথায় সেলাইয়ের সান্ত্বনা। তাঁর যে প্রতিদ্বন্দ্বী তার সঙ্কেত ছিল 'লণ্ঠন' আর পুলিনের ছিল 'কাস্তে'।

কাস্তের ঘায়ে লণ্ঠন চুরমার হয়ে গেল, দৌড়ের মাঠে পুলিন সবারই আগে এসে দড়ি ধরলেন। সহজেই বোঝা গেল পুলিনের জায়গা সকলের স্নেহচ্ছায়ায়। এত যার যোগ্যতা, এত যার প্রভাব-প্রতাপ সর্বোপরি এত যার সেবার আগ্রহ তিনি মন্ত্রী হবেন না তো হবে কে!

দেখতে-দেখতে কি করে চাকা ঘুরে গেল ঘটনার। কেউ উঠে আসে সিঁড়ির এক ধাপের পর আর এক ধাপ, আবার কেউ বা আসে বেলুনের বেগে। আজ যে চাকার নিচে কাল আবার সেই চক্রধর।

নিরঞ্জন তখন আরেক জেলায়। ঘটনার স্রোত তিনি দূরে দাঁড়িয়ে অনুসরণ করছিলেন, কিন্তু দূরের স্রোত হঠাৎ বিপুলকায় ঢেউয়ের মত তাঁর গায়ে এসে লাফিয়ে পড়বে, তিনি যেন প্রস্তুত ছিলেন না। খবর এলো, পুলিন শিগ্‌গিরই আসছেন পরিদর্শনে।

বারো

সকলে ভাবলে সাহেব পাগল হয়ে গেছেন। বজ্রাহতের মত চেহারা, ঢিলে পা-জামা পরে খালি পায়ে ঘরে বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন খালি।

সামনে দিয়ে যাচ্ছিল রেফাজতুল্লা, হেড বেয়ারা, নিরঞ্জন হঠাৎ তাকে এক হাতে লম্বা সেলাম ঠুকলে। বললে, আদাব। সেলাম আলেকুম। তারপর একেবারে কুর্নিশের ভঙ্গিতে—বন্দ্‌গি জাহাঁপনা।

রেফাজতুল্লা তো হতভম্ব। চরণ মাইতি বাড়ির চাকর। ড্রয়িংরুমের ব্রাসো দিয়ে পিতলের ডাবোর ঘসছিল। হঠাৎ তার সামনে গিয়ে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নিরঞ্জন বললে—নমস্কার। সুপ্রভাত। অভিবাদন। চরণের চক্ষু চড়কগাছ।

খইনি টিপতে টিপতে খোট্টাই দারোয়ান সুচিত চোবে আসছিল

কম্পাউণ্ডের দিকে। তাকে দেখতে পেয়েই নিরঞ্জন সোল্লাসে বলে উঠল—নমস্তে। নমস্তস্মৈ। নমস্তস্মৈ নমো নমো।

সুচিত পালাতে পারলে বাঁচে। পাগল—বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন নিরঞ্জন। পাইচারি করছেন আর দাঁত কিড়মিড় করে বলছেন—কোন্ শালা কখন মন্ত্রী হয় কে জানে? আগেই সেলাম বাজিয়ে রাখি।

—শুনছ—শুনছ? I see-র বাঙলা কি? খাতা পেন্সিল হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে মিসেস্ ডট এসে হাজির।

নিরঞ্জন ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—তুমি শেষকালে বলতে চাও। see-র বাঙলা জান না?

—সত্যিই, guess করতে পারছি না কিছু।

—আমি দেখি, দর্শন করি, অবলোকন করি, আরো ভালো করে বলতে চাও, নয়ন গোচর করি—

—না, না, সেই see না। কথার মাঝে-মাঝে প্রায়ই যে গালে আঙুল ঠেকিয়ে বলে উঠি, I see,—তার বাঙলা কি?

—তার বাঙলা হচ্ছে, সমুদ্র, আমি সমুদ্র, আমি সমুদ্রে তলিয়ে গেছি। বলতে-বলতে নিরঞ্জন একটা সোফার মধ্যে ভেঙে পড়লেন।

—তুমি আমারই মত পণ্ডিত। মিসেস ডট আরেকটা সোফায় বসলেন। —আচ্ছা,Good God-এর বাঙলা বল। হামেশাই ওটা আমার ব্যবহার করতে হয়।

—এ কে না জানে! এ তো নিতান্ত সোজা। Good God-এর বাঙলা হচ্ছে, ভালো ঈশ্বর।

—ভালো হলো না।

—খুব ভালো। ধলো-ঈশ্বর কালো-ঈশ্বর, দুই-ই দেখলাম, এখন ভালো ঈশ্বর যদি দেখাতে পারো তো আলোয়-আলোয় চলে যাই।

—তারপর, By Jove? ওটা তো আমার মুখে লেগেই আছে।

—দেবেন্দ্র দোহাই।

—দেবেন্দ্র কেন?

—দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলে। দেবেন্দ্র না পছন্দ হয় মহেন্দ্র করতে পার। মহেন্দ্র পছন্দ না হলে—

—আমার এখনো আরো অনেক বাঙলা শব্দ শিখতে হবে। গার্লস স্কুলের আমি প্রেসিডেন্ট, সেখানে একটা address না মানপত্র না পানপত্র, দেয়া হবে, আর সেটা পড়তে হবে নাকি আমাকেই ; ইংরিজি ঢঙে বাঙলা উচ্চারণটা নাকি ভালো শোনায়।

—লিখছে কে ?

—স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা একত্র হয়ে। এ পর্যন্ত ছাব্বিশটা বিশেষণ দেয়া হয়েছে। এই যে—মিসেস ডট খাতা খুলে পড়তে লাগলেন।—সৌম্য, সুদর্শন, অমায়িক, মহানুভব, মতিমান, ভ্রাম্যমাণ, শান্ত, দান্ত—দান্ত মানে তো যার দাঁত আছে—শ্যামকান্ত—

- থাক, থাক, ঢের হয়েছে। আর একটা শুধু যোগ করে দাও, “পথভ্রান্ত”।

—ঠিক ঠিক। মন্দ হবে না। মেয়েদেরকে সেই গানই শেখানো হচ্ছে —আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি। কিন্তু, তুমি—করছ কি ? মিসেস্ ডট স্বামীর শৈথিল্যকে শাসন করতে চাইলেন।

আমি ? ছাব্বিশটা বিশেষণ নয়, ছাব্বিশটা গেট, তোরণদ্বার। তার মধ্যে দুটো সালুর, চব্বিশটা দেবদারুপাতার। দু'দিনে ছটা খোলা হাওয়ার সভা, বারোটা টি-পার্টি, চারটে ডিনার, আটটা লাঞ্চ। সব, যাকে বলে, ও-কে। আমি লম্বা দিলেও আমার গোল-কর্মচারীরা গোল করবে না।

—গোল-কর্মচারী মানে ?

—সার্কেল অফিসার। কিন্তু আমার মাথা ছেড়ে পা গোল হয়ে যাচ্ছে, আমি এখন ধুতি-পাঞ্জাবি পাই কোথা ?

—Good God ! ধুতি পাঞ্জাবি ?

—তা ছাড়া আবার কি ! আমাকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরাবার জন্যেই তো ও মন্ত্রী হয়েছে ! আমি ধুতি-পাঞ্জাবী পরবো ; তুমি অনর্গল বাঙলা কথা কইবে, আর আমরা মাটিতে পাত পেতে বসে ডালে-ঝোলে হাত ডুবিয়ে-

ডুবিয়ে খাব, এই প্রতিশোধের আশা নিয়েই তো ও বেঁচে এসেছে এতদিন—

—আমার জন্যে তুমি ভেবো না। সহানুভূতির স্বরে বললেন মিসেস্ ডট—আমি বাঙলা শিখে ফেলব এরি মধ্যে। আর এই কটা মানে শুধু বাকি। তিনি খাতা খুললেন, পড়া তৈরী করার সুরে বলতে লাগলেন আপন মনে, 'Lovely' মানে মনোজ্ঞ, 'delightful' মানে প্রীতিপদ, 'superb' মানে অত্যুৎকৃষ্ট—তা তুমি এক কাজ করোনা, ধুতি পাঞ্জাবি কিনে নাও না দোকান থেকে।

—ধোয়া সুতোর ধুতি যা পাওয়া গেছে তা হাঁটুর নিচে আর নামতে চায় না, আর রেডি-মেড পাঞ্জাবির যা চেহারা, পরলে মনে হয় আমি যেন ঠেসান দেবার তাকিয়া হয়ে গেছি। নিরঞ্জন হতাশায় হাত-পা ছেড়ে দিলেন।

—পাঞ্জাবিতে তবে কাজ নেই। খাটো ধুতিটা ভালোই হবে মনে হচ্ছে—ধুতি যত খাটো স্বদেশীও ততই খাঁটি। আমি বলি কি, খাটো ধুতির উপরে কোট পরো, পায়ে as usual জুতো-মোজা, আর গলায় দড়ি পাকানো চাদর। ঠিক typical বাঙালী aristocrat। আর যদি চাদর না পাও—

—তা হলে গামছা। নিরঞ্জন লাফিয়ে উঠলেন। কেউ টানছে টাই ধরে, কেউ গলায় গামছা বেঁধে।

কিন্তু শুধু পোষাকের ব্যবস্থা করলেই চলবে না। বাড়ি-ঘরের হাল-চাল পাল্টাতে হবে। বিলিতি ড্রয়িং-রুমটাকে নিয়ে যেতে হবে বাঙালী বৈঠকখানায় এর জন্যে নিরঞ্জন ডেকোরেটার লাগালেন। মালখানায় চলে গেল সব সোফা-কৌচ, ডাবোর-ডেকচি, টেরাকোটা আর পামগাছ, কার্পেট আর কুশন—তার বদলে এলো নিচু তক্তাপোষ, ঢালা ফরাশ, আর গোল তাকিয়া। এখানে-ওখানে ক'খানা জলচৌকি, পিড়ি আর হরিণের চামড়ার আসন। বিলিতি ল্যাণ্ডস্কেপের বদলে দিশি পট—লঙ্কাকে পায়ের নীচে পদ্মের কুঁড়ি বানিয়ে ও হিমালয়কে চুল করে ও শাড়ির পাড়কে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র করে ভারতমাতার ছবি, একখানা—দুর্বাসা শকুন্তলাকে শাপ দিচ্ছে,

আরেকখানা—রামের রাজ্যাভিষেকের খবর পেয়ে মন্থরাকে গলার হার খুলে দিচ্ছে কৈকেয়ী। নিজের লেজে আগুন লাগিয়ে হনুমান লঙ্কা পোড়াচ্ছে—এমনি একখানা ছবির জন্যে নিরঞ্জন খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাওয়া গেল না কোথাও।

—উনি আসছেন কিসে ? জিগ্‌গেস করলেন মিসেস্ ডট।

—নিজের মোটরে।

—তুমি যাচ্ছ কখন ?

—আধ ঘণ্টার মধ্যে। নাপিত এসেছে, মাথায় একটা কদমফুলি ছাঁট দিয়ে নি। আর ভাবছি, গলায় তুলসীর মালা আর নাকে-কপালে রসকলি দেব কিনা। হাসছ কি, ইতিমধ্যে আমিও তো বৈষ্ণব হয়ে যেতে পারি।

—হতে পারলে আজকে আর কিছু ভাবনা ছিল না। মুখ গম্ভীর করে বললেন মিসেস্ ডট।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিরঞ্জন বললেন—আমার তাঁতীকুলও গেল, বৈষ্ণবকুলও।

তেরো

শহরের ফটকের কাছেই নতুন ঝকঝকে ও মাল্যবিভূষিত মোটর এসে দাঁড়াতেই হোমরা-চোমরারা তাকে ছেঁকে ধরল। দলাধিপতি নিরঞ্জন।

কিন্তু চিনতে পারেন না কেউ কাউকে। দু'জনেই চোখ কচলান আর জাগ্রত একটা দুঃস্বপ্ন দেখেন। যেন কাউকে কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না এমনি নির্লিপ্ত চোখে পুলিন জিগ্‌গেস করলেন—মিষ্টার ডট কোথায় ?

—এই যে, আজ্ঞে, এই যে আমি। বুকের কাছে দু'হাত জোড় করে অধমাধমেতর মতো নিরঞ্জন বিনয়ের বিগলিত ভঙ্গি করলেন।

—এই আপনি ? পুলিন একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন।

—আর এই আপনি ? বিস্মিত জিজ্ঞাসাটা জিভের ডগার থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন নিরঞ্জন।

নিরঞ্জনের এ কি পোষাক ! জাল খদ্দরের জ্যালজেলে পাঞ্জাবি গায়ে,

পরনে হেঁটো মোটা ধুতি, কাঁধের উপর বৃন্দাবনী উড়ুনি। মাথাটি একটি নিটোল কদমফুল, পায়ে তালতলার চলকো চটি। পুলিন এবার ক্রুদ্ধ বক্র চোখে দেখে নিলেন মাথার পশ্চাদ্দেশে জবাফুল বাঁধা গুচ্ছীকৃত একটা টিকি ঝুলছে কিনা। রাগে অপমানে সমস্ত শরীর তাঁর রি-রি করে উঠল।

আর, পুলিনেরই বা একি অদ্ভুত পরিবর্তন। খোল-নলচে বদলে ফেলেছেন রাতারাতি। তাঁকে দেখে কে বলবে তিনি একজন নিরীহ স্কুলমাস্টার ছিলেন, ছিলেন তেজস্বী দেশকর্মী, কৃচ্ছ্র ও ক্লেশের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন সমস্ত জীবন। পরনে দামী বিলিতি স্যুট, নিখুঁত ও নিভাঁজ. প্যান্টলুনের ক্রিজ ছুরির ফলার রেখার মতো সিধে ও ধারালো, জুতো এমন যত্নে পালিশ করা হয়েছে যে মুখ দেখা যায়। মুখের মধ্যে দাঁতে-চাপা একটা পাইপ—সমস্ত সংসারের প্রতি নির্মম উপেক্ষার একটি কঠিন ও জ্বলন্ত নিদর্শন, আর গলার টাইটা নিদারুণ রঙিন, দর্প ও ঔদ্ধত্যের গ্রন্থি তার বন্ধনীতে। আগে চুল তাঁর উস্কখুস্ক উদাসীন ছিল, এখন ঘাড়টা প্রায় চাঁদি পর্যন্ত চাঁছা। গর্ব, প্রভুত্ব ধনমদের প্রতীক এখন এই পুলিন। যেন অনেক আয়াসের পর পৌঁছেছেন তার নিজের জায়গায় এমনি একটা প্রতিষ্ঠার আরামে স্ফীত হয়ে আছেন।

গার্ড অফ অনার কই? বিউগল বাজছে না কেন? না, স্বদেশী প্রথায় তাঁকে সংবর্ধনা করা হবে! মালা চন্দনে। গাল ফুলিয়ে মেয়েরা কেউ কেউ শাঁখ ফুঁকতে লাগল, কেউ কেউ বা থালায় করে আনল চন্দনের বাটি, ধানের মঞ্জরী আর রাইবেলের মালা, ওজনে কয়েকটা প্রায় এক ভরি।

'ড্যাম, রট।' হাতের একটা নির্মম ঝাঁকুনিতে থালা সরিয়ে দিয়ে পুলিন ঘাড় মোটা করে বসে রইলেন।

টাউনহলে গিয়ে মানপত্র নিতে হবে অনেকগুলি।

কিন্তু, কি আশ্চর্য, যে যেটা পড়ছে, সব বাঙলাতে পড়ছে। কোনোটা গুরুগম্ভীর বিদ্যাসাগরী বাঙলায়, কোনোটা বা হালের হেলে পড়া ভাঙা ভাঙা আধো বুলিতে। নিরঞ্জন যে নিরঞ্জন, সেও বাঙলাতে বক্তৃতা দিলে, থেমে থেমে ঢোঁক গিলে, মর্মান্তিক কুস্তি করতে করতে। একেকটা ইংরিজি

শব্দ মুখে আসে আর সেটাকে হটিয়ে দেবার জন্যে তিনি ক্ষিপ্তের মত শূন্যে ঘুসি ছোঁড়েন, চুল ছেঁড়েন আর লাফালাফি করেন। আর, একেকটা প্রতিশব্দ যা, কুড়িয়ে আনেন তা যেমন অদ্ভুত তেমনি সাংঘাতিক।

শোধ তুললেন পুলিন ইংরাজীতে ঘোড়া ছুটিয়ে। অবিশ্যি, ওঁর যা বক্তৃতা তা আগেই ছাপা হয়ে বিলি হয়ে গেছে, সেটাই এমন মহিষমর্দন ভাবে পড়লেন যে সমস্ত হল্ গমগম করতে লাগল। স্বদেশী যুগে যেমন বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই গলা, শুধু মুডটাই বদলে গেছে। ভঙ্গিটা সেই, কিন্তু ভিতরটা ফোঁপরা।

লিখিত বক্তৃতার শেষে তিনি মুখেও খানিকটা জুড়ে দিলেন। বললেন —যে জায়গা এখনো এই বিংশ শতাব্দীতেও, বাঙলা ভাষা ও বাঙালী মনোভাবকে আঁকড়ে আছে, তার অধঃপাত অনিবার্য।

নিরঞ্জন মুখ কালো করে রইলেন। বুঝলেন, দীর্ঘ দিন ছুটি নিতে হবে।

পুলিনের চিত্তদাহ এখানেই শেষ হল না। বললেন, তারপর ?

এই দীনাতিদীনের কুটিরে—মুখে না বললেও এমনি একটি ভক্তি-আপ্লুত ভঙ্গী করে নিরঞ্জন তাঁকে বাড়ি নিয়ে এলেন।

এ সব তাঁকে অপমান করবার জন্যই—এই শুধু বারে বারে মনে হতে লাগল পুলিনের। নইলে একি হাল চাল ? নিরঞ্জনের ড্রইংরুম কি হল, কোথায় গেল তার সব সোফা-সেটি, কার্পেট-কুশান। তার বদলে কিনা ফরাস তাকিয়া, জলচৌকি ? যদি জামা-কাপড় ছেড়ে এখন তিনি একটু হাত মুখ ধোন, তার জন্যে কিনা গাড়ু-গামছা ? সাবানের বদলে কিনা বেসন ! এ সব অপমান করা ছাড়া আর কি !

তারপর কি রকম যে বন্য হয়ে গেয়েছেন নিরঞ্জন, তা স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। ঘর সাজিয়েছেন কিনা কতকগুলি বীভৎস ছবিতে, কৈকেয়ী আর মন্থরা, সাপের মাথায় ধিনিকেষ্ট ! এক ট্রে বিড়ি রেখে দিয়েছেন ফরাসের উপর, দড়ির মুখে আগুন রেখেছেন ঝুলিয়ে। ছেলে-মেয়েগুলোকে পর্যন্ত কুশিক্ষা দিচ্ছেন। একের পর এক তাঁর জুতোর ডগায় হাত দিয়ে তাঁকে নুয়ে নুয়ে প্রণাম করছে। মিসেস্ ডট, যাঁর কিনা

অত পেখম আর পাখনা ছিল, তিনি হঠাৎ পর্দানশিন হয়ে গেছেন। খাটো গলায় ফিসফিস করে কথা কইছেন চাকর-বাকরের সঙ্গে, মাথায় কাপড় টেনে লজ্জিত কুলবধূর মত চোখ এড়িয়ে যাচ্ছেন বারে বারে।

পুলিন কি এ হিং-টিং-ছটের দেশে এসে পড়লেন নাকি ?

—এবার হাতমুখ ধোবেন ? দন্ত্য ন-টা বলতে গিয়ে নিরঞ্জনের প্রায় দাঁত ভেঙে গেল।—গুণচট বা খদ্দরের কাপড় আছে আমার।

—ইম্‌পসিবল্। বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন পুলিন।

এখন তিনি বসেন কোথায় শুনি ? শিঙ্গ ভেঙে প্যাণ্টালুনকে দলামোচা করে তিনি এখন বসবেন নাকি ফরাসে ?

—চেয়ার—একটা চেয়ার নেই তোমার বাড়িতে ? পুলিন আবার হাঁক পাড়লেন।

—চেয়ার ? নিরঞ্জন এমন মুখ করলেন যে জানেন না সেটা কি জিনিস ?

—কেদারা—কাষ্ঠাসন। নেই একখানা ?

সার্কাসে যেমন চেয়ার থাকে তেমনি একটা গোদা পায়ের ও খাড়া পিঠের চেয়ার আনা হল।

এততেও প্যাণ্টলুন বাঁচলো না। খেতে বসবার সময় আসন পিঁড়ি হয়ে বসতেই হল হাঁটু দুমড়ে। ডাইনিং টেবিল নাকি ওরা নদীতে ফেলে দিয়েছে, ছুরি-কাঁটা বিক্রি করে দিয়েছে শিশিবোতল্-ওলাদের কাছে। অগত্যা, হাত না ডুবিয়ে নিস্তার নেই। আর, তা বেশির ভাগই গ্রেভি, ডাল-ঝোল, অম্বল। এমন সব নোংরা খাবারও হতে পারে দুনিয়ায়। পুলিন খান আর নাক সিটকান। লাঞ্চ হচ্ছে অথচ এক বোতল বিয়ার নেই।

যদি পুলিনের এই ডিগবাজীতে সত্যি কেউ অপমানিত হয়ে থাকে তবে সে রাম। যেন নিজের কাছেই নিজে সে মুখ দেখাতে পারছে না। কি অদ্ভুত ভাবে যে বাবা বদলে গেছেন ভাবলে শুধু অবাক নয়, অসহ্য লাগে। এ শুধু সাপের খোলস বদলানো নয়, সাপের ব্যাঙ হয়ে যাওয়া। একেবারে জাত বদলানো। যেন এরি জন্যে তিনি এতদিন এত সংগ্রাম আর সাধনা

করে এসেছেন, শুধু নিজের অবস্থা ফেরাবার জন্যে। যেন নিজের অবস্থা ফেরাতেই দেশেরও অবস্থা গিয়েছে ফিরে। আর কোথায় এখন দেশ! এখন নিজের স্বার্থ ও সমৃদ্ধির বাইরে সমস্ত পৃথিবীই সংকুচিত হয়ে। দ্বাররক্ষী কুকুরকে বিষাক্ত মিষ্টি খাইয়ে বশ করে ডাকাতরা যেমন ঘরে ঢোকে, তেমনিই যেন হয়ে গিয়েছেন বাবা। মিষ্টিটা যত খাচ্ছেন ততই যেন ঢুলে পড়ছেন। আর, মা যে মা, তিনিই বা কেমন করে বদলে গেলেন ভাবতে বুকটা ফেটে যায়। এখন শুধু তাঁর মোটামোটা গয়না, সাজগোজের ঘটা, আর সময়-অসময়ে শুধু ঘুরে বেড়ানো। যেন কাঙালকে কে শাকের ক্ষেত দেখিয়েছে। রামের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, সমস্ত বাড়িটাকে জেলখানার মত মনে হয়, শুধু মনে হয় কবে বেরুতে পারবে সে বাইরে, দাঁড়াতে পারবে সে সব মূক বধির নিঃস্ব-নিঃস্বত্ব জনগণের পাশে, যাদেরকে বাবা পরিত্যাগ করে স্বার্থের শিখরে এসে উঠে বসেছেন!

নিরঞ্জনের চরিত্রেও দীপক কম বিরক্ত হয়নি। যেদিকে জল পড়ে সেইদিকেই ছাতা ধরেন। যেন কোন ব্যক্তিত্ব, কোন স্ব-অধীনতা নেই! সব চেয়ে হতাশ হয়েছে বাবার এই বিষম বৈষ্ণব সাজায়। বাবা বলেন,—গোলামি করতে এসেছি, মোলায়েম ভাবে গোলামি করে যাব। কিন্তু তাই বলে এতদূর হীনতা! দীপক শুধু ভাবে, বাবার এই কলুষ ও কলঙ্কের প্রক্ষালন হবে কিসে!

পুলিন মুখ্যত যে জন্যে এসেছিলেন পরিদর্শনে, খাওয়া-দাওয়ার পর তার কথা উঠল। সম্প্রতি এ অঞ্চলে প্রকাণ্ড ঝড় হয়ে গিয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে বিপুল বন্যা। ত্রিশ-চল্লিশখানা গ্রাম গিয়েছে ভেসে, মানুষ গরু সব একসঙ্গে করেছে জলযাত্রা, আকাশে কেবল শকুনের পাকসাট।

সে অঞ্চলে বেরুতে হবে এবার, লঞ্চে করে। একটু এদিক-ওদিক দেখে আসা, জুতোয় কাদা না লাগিয়ে, পরে চুনকাম করে রিপোর্ট ঝাড়া।

নিরঞ্জন বিনীত ভঙ্গীতে বললেন—আমি রাধিকা বেশে যাব।

পুলিন হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন! এ আবার কী বলছে!

দেখলেন, নিরঞ্জন হাঁটুর উপর মালকোঁচা এঁটে হাতে লাঠি নিয়ে গুণ্ডা সেজে দাঁড়িয়ে আছেন।—এই কি রাধিকার বেশে যাওয়া নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, রাই-বেশে। নিরঞ্জন দিশি কায়দায় অভিবাদন করলেন।

বিকেল হতেই অল্প-অল্প করে মেঘ উঠল। আবার ঝড় আসবে নাকি ? এলেই বা কি। তাঁদের লঞ্চের তাতে কি হবে ?

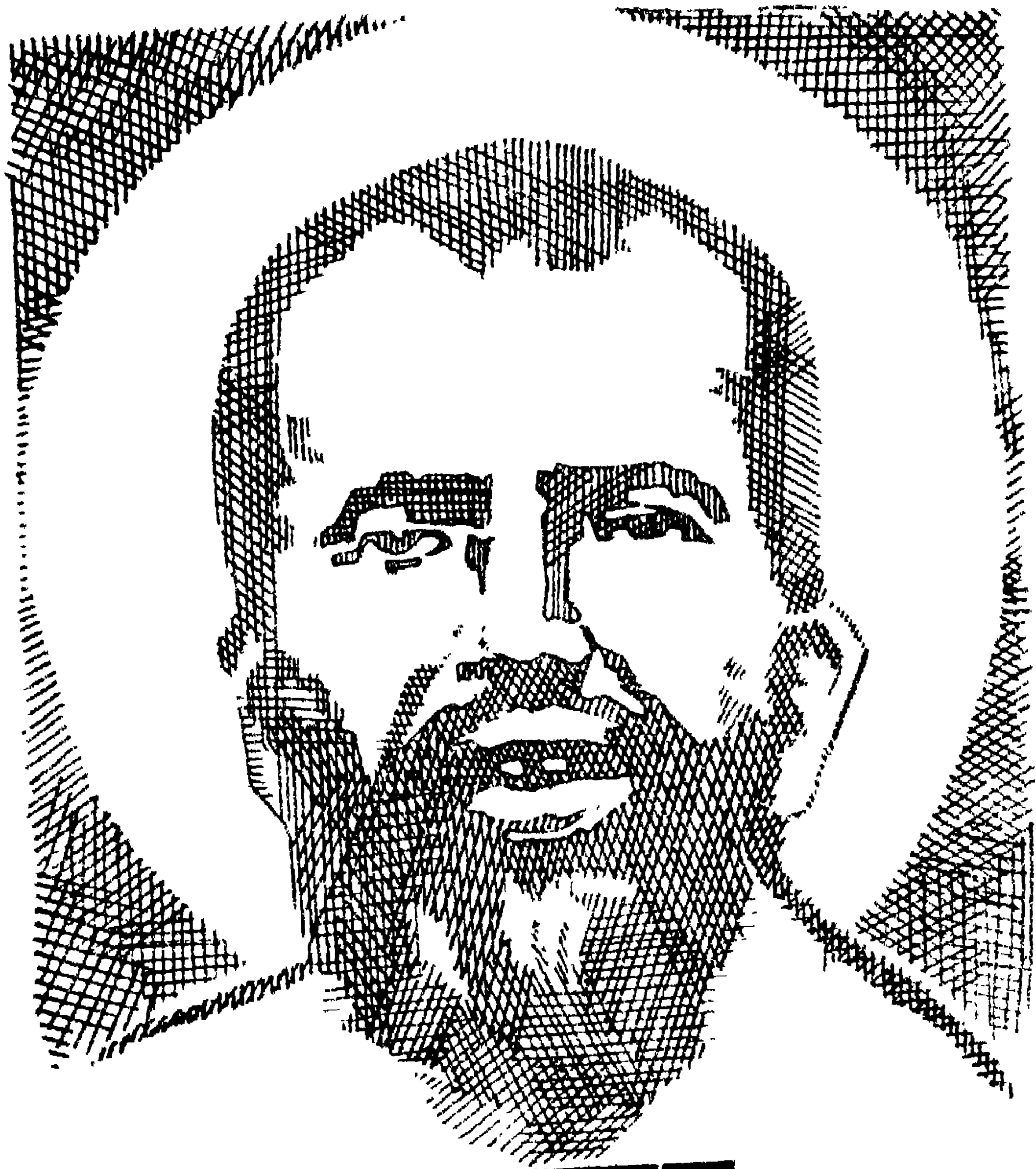
এমনি নিশ্চিন্ততার বর্মই আঁটা এখন পুলিনের গায়ে। দেশে আসুকই না কেন দুঃখ-দুর্দিন, তাতে তাঁর গায়ে কে আঁচড় ফোটায় !

বন্যার জায়গায় এসে দেখেন আকাশ কাকের পাখার মত কালো হয়ে গিয়েছে। সে পাখা হঠাৎ ঝাপটাতে সুরু করেছে, উঠেছে ঝড়, বানের মত দীর্ঘ রেখায় শন্‌শন্‌ করে ঝরছে বৃষ্টির ধারালো ধারা। লঞ্চ তাড়াতাড়ি পারে ভিড়ল। সে-অঞ্চলে নৌকা করে চলে এসেছে অনেক সেবাব্রতীর দল, সবাই ভয় পেয়ে পারে এসে কাছি বাঁধলো। শুধু একখানা নৌকো ঝড়জলকে তুচ্ছ করে গ্রামান্তরে যাবার জন্যে উদ্যোগ করেছে।

কারা অমন হঠকারী! মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেলেন পুলিন আর নিরঞ্জন। যেন দেখতে পাবেন, ঈশ্বর বলে রেখেছেন আগে থেকে। দেখতে পেলেন, নৌকার মধ্যে কয়েকটা চালের বস্তা, কতগুলি ছেঁড়া কাপড় আর ক'টা ওষুধের বাক্স নিয়ে বসে আছে রাম আর দীপক—দুই বন্ধু।

এ কী সর্বনাশ ! সব বেয়ারা-চাপরাশি, সাঙ্গোপাঙ্গ খয়ের খাঁরা উদ্‌ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন তাদের নিরস্ত করতে। কিন্তু ঝড় যেমন বাধা মানে না পাহাড়ের, তেমনি করেই ওরা বেরিয়ে গেল নদী-মেঘকে তুচ্ছ করে।

যেন বলে গেল, আমরা পারের নই, আমরা ঝড়ের। যাঁরা পার পেয়েছেন তাঁরা পারে থাকুন কিন্তু আমাদের সামনে পথ তখনো দুর্গম, পারাপার দুরতিক্রমণীয়।



সকলের রামকৃষ্ণ

বাংলা বারোশো বিয়াল্লিশ সালের ছয়ুই ফাল্গুন, ইংরেজী আঠারো শো ছত্রিশ খৃস্টাব্দের সতেরোই ফেব্রুয়ারী, বুধবার, ব্রাহ্মমুহূর্তে আবির্ভূত হলেন রামকৃষ্ণ।

বাপ ক্ষুদিরাম। মা চন্দ্রমণি। থাকেন কামারপুকুরে, হুগলী জেলার ছোট্ট অখ্যাত পল্লীতে।

রামকৃষ্ণ জন্ম নিলেন ঢেঁকিশালে। কিন্তু, এ কি, ছেলে কই ? ধাই ধনী কামারণী চেঁচিয়ে উঠলো। দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে গেলো নাকি ?

ও মা, দেখেছো ? পিছল মাটিতে হড়কে হড়কে ধানসেদ্ধর উনুনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। উনুনে আগুন নেই এখন, কিন্তু ছাই আছে গাদা করা। ছেলেকে কোলে টেনে নিলো ধনী। ছাই-মাখা ছেলে। ভাস্বর ভস্মভূষণ।

গয়ায় গিয়ে ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখেছিলেন, গদাধর তাঁর ঘরে পুত্র হয়ে জন্মাবে, তাই ছেলের নাম রাখলেন গদাধর। ডাক নাম গদাই।

বড়ো-সড়ো হয়ে উঠেছে গদাধর। চন্দ্রমণি তাকে নতুন ধুতি পরিয়েছেন। ফালা ফালা করে গদাধর তা ছিঁড়ে ফেলেছে। এক ফালা নিয়ে দিব্যি পরেছে ডোর কপনি করে।

'এ কি, এ তুই কী হয়েছিস ?' চন্দ্রমণি আঁৎকে উঠলেন।

'অতিথি হয়েছি।'

'অতিথি ? সে আবার কী ?'

বুঝিয়ে দিলো গদাধর : 'লাহাবাবুদের অতিথিশালায় যারা আসে তাদেরকে অতিথি বলে না ?'

'তারা তো সব সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর বেশ তুই পছন্দ করলি ?' মার মন হুহু করে উঠলো। 'আস্ত কাপড় দিলাম, তা ছিঁড়ে কৌপীন বানালি !'

পাঁচ বছরের ছেলে গদাধর, পাততাড়ি বগলে করে ঢুকলো পাঠশালায়।

শুভঙ্করীটাই গোলমেলে। দু'চক্ষে ওটা দেখতে পারে না গদাধর। তারপর কষ্টেস্যষ্টে যোগ যদি বা হলো, বিয়োগ কিছুতেই বাগে আনতে পারলো না।

কী করেই বা পারবে? যোগে আছে সর্বক্ষণ, তাই যোগ করায়ত্ত। কিন্তু বিয়োগ আবার কী! কোথাও লয়-ক্ষয় নেই, বিয়োগ-বিচ্ছেদ নেই। কিছু থেকে কিছুই এখানে বাদ যায় না।

তার চেয়ে প্রহ্লাদ চরিত্র পড়তে দাও, মাথুর গাইতে দাও, সবাইকে মাতিয়ে দেবে গদাধর। শিবরাত্রিতে পাইনদের বাড়িতে যাত্রা হবে. কিন্তু শিব যে সাজবে সে ছোঁড়ার দেখা নেই। যাত্রা বন্ধ হলে রাত্রি জাগরণ হয় না, সবাই ধরাধরি করে গদাধরকে শিব সাজিয়ে নামিয়ে দিলো আসরে।

বালক গদাধর কোথায়, অবিকল শিব। মাথায় রুক্ষবর্ণ জটাভার, গায়ে বিভূতির আচ্ছাদন। এক হাতে শিঙা অন্য হাতে ত্রিশূল। কণ্ঠে ও বাহুতে নাগ খেলা করছে ফণা তুলে, শিখরে খেলা করছে শশধর।

অভাবনীয় আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো চারিদিকে। মেয়েরা উলু দিয়ে উঠলো। কেউ কেউ শাঁখ বাজালো। হরিধ্বনি করে উঠলো পুরুষেরা। স্বয়ং অধিকারী শিবস্তুতি শুরু করলেন।

ধানক্ষেতের সরু আল ধরে চলেছে গদাধর। কোঁচড়ে মুড়ি, তাই তুলে তুলে চিবুচ্ছে থেকে থেকে। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে, তাকালো চোখ তুলে। দেখলো, এক ঝাঁক সাদা বক সেই কালো মেঘের গা ঘেঁষে উড়ে যাচ্ছে দূরে দূরান্তরে। কালোয় আর সাদায় এক দিব্য কাব্য রচিত হয়েছে আকাশের বুকে। গদাধরের সারা শরীরে শিহরণ জাগলো। প্রাণ-মন উড়ে চললো পাখা মেলে। দেহ পিঞ্জর লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। এই প্রথম ভাব সমাধি গদাধরের।

সাত পেরিয়ে আটে পড়েছে, পৈতে দিতে হয় ছেলেটাকে। দাদারা কোমর বেঁধেছেন।

পৈতে তো হলো, কিন্তু ভিক্ষে দেবে কে? গদাধর গোঁ ধরলো, 'ধনী কামারণী ছাড়া আর কারুর হাতে ভিক্ষে নেবো না।'

সে কি কথা! ধনী ছোটো জাতের মেয়ে, সে কী করে ভিক্ষে দেবে? কুলাচার লঙ্ঘন হয়ে যাবে যে!

কিসের কুলাচার? কিসের জাত-বেজাত? প্রাণ চাইছে ধনীকে মা বলবো, তার কাছে কোনো বিধিনিষেধ মানবো না। তোমরা তোমাদের বাম্‌নাই নিয়ে থাকো, আমি না খেয়ে উপোস করে থাকবো। এই খিল দিলাম দরজায়।

কতো জনের কতো কাকুতি-মিনতি, তবু দরজা খোলে না গদাধর। বালক অথচ বিপ্লবী গদাধর।

শেষকালে বড়দা রামকুমার বললেন, 'বেশ, ধনী কামারণীই ভিক্ষে দেবে। খোল্ দরজা। কুলাচার নষ্ট হয় হোক, তবু তোকে উপোসী দেখতে পারবো না।'

দরজা খুলে দিলো গদাধর।

গ্রামে বিশেষ লেখাপড়া হচ্ছে না, গদাধরকে তাই কলকাতায় নিয়ে এসেছেন রামকুমার। নিজে পুরোতগিরি করে বিশেষ উপার্জন করতে পারছেন না, তাই টোল খুলেছেন। ইচ্ছে গদাধরকে সেই টোলে ভর্তি করে দেন।

'এবার একটু লেখাপড়া কর্।'

'লেখাপড়া?' গদাধর সরল চোখে তাকিয়ে রইলো।

'হ্যাঁ, এবার বাড়ি গিয়ে দেখলাম লেখাপড়ায় তোর একেবারে মন নেই। পাড়ার ছোঁড়াদের সঙ্গে গাঁ-ময় ঘুরে বেড়াস, নয়তো যাত্রাদলে গিয়ে শিব সাজিস। ও-সবে পেট ভরবে না। লেখাপড়া করতে হবে।'

'কিন্তু শিখবো কী?'

'শাস্ত্র—ব্যাকরণ—'

'দাদা, চাল-কলা বাঁধা বিদ্যে শিখে আমার কী হবে?'

'তার মানে?'

'অর্থকরী বিদ্যে, ঘর সাজানো বিদ্যে আমি চাই না।'

'তবে তুই কী চাস্?'

'আমি চাই জ্ঞান।'

'সে আবার কী?'

'এক জানার নাম জ্ঞান, আর অনেক জানার নামও জ্ঞান।' বললে গদাধর, 'যদি জানতে হয় আমি এক—পরমেশ্বরকেই জানবো।'

রাসমণির কালীমন্দিরে, দক্ষিণেশ্বরে, ঠাঁই পেলো গদাধর।

মাতৃভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ

মাকে ঠাকুর নিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের দুই মা। ঘরের মা চন্দ্রমণি আর বিশ্বের মা ভবতারিণী। ঘরের মা থাকেন ঘরে, আর বিশ্বের মা মন্দিরে।

ঘরই মন্দির, মন্দিরই ঘর।

ঘরের মাকে তিনি মহিমান্বিত করেন জগজ্জননীতে, আবার জগজ্জননীকে রূপান্তরিত করেন ঘরের মায়ে। যিনি প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের মুকুট পরে রাজেন্দ্রাণী সেজেছেন তিনিই আবার রুগ্ন সন্তানের শিয়রে দীনবাস ম্লানমুখী বিনিদ্র জননী।

ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে চন্দ্রমণিকে প্রণাম করেন। তারপরে ভবতারিণীর দুয়ারে। আগে ধারিণী, তারপরে তারিণী।

'কোথায় তোরা ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস কোন্ গহন কাননে, কোন্ পথে-পর্বতে?' ঠাকুর ডেকে বললেন বিশ্বজনকে: 'ঈশ্বর তোর ঘরে তোর সংসারেই বিরাজ করছেন। শুধু ভাবের ঈশ্বর নয়, জীবন্ত ঈশ্বর। অজানা ঈশ্বর নয়, অন্তরঙ্গ ঈশ্বর। নির্বাক বধির ঈশ্বর নয়, দয়াময় দ্রব্যময় ঈশ্বর! সে ঈশ্বর তোর বাপ-মা।

তোর সীতা-রাম। তোর হর-গৌরী। তোর লক্ষ্মী-নারায়ণ। তোর আদিত্য আর চন্দ্রমা।'

'বাপ-মা কতো বড়ো বস্তু।' বললেন ঠাকুর, 'বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে তার ছাই হবে।'

যখন তোতাপুরী এলো দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরকে দেখে লাফিয়ে উঠলো। বেদান্ত-সাধনের এই তো যোগ্য লোক! বেদান্ত সাধন মানে ভাবাতীত অরূপের সাধন। নির্বিকল্প সমাধি।

'সাধন-ভজন কিছু করবে?' জিগ্যেস করলো তোতাপুরী।

'তার আমি কি জানি!' সরল চোখে তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ।

'তুমি কী জানো মানে! তবে কে জানে?'

'আমার মা জানে।'

এ আবার কি রকম কথা! কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলো তোতাপুরী, 'কে তোমার মা? কোথায়?'

'ঐ যে, মন্দিরে পাষাণময়ী আছে, ঐ আমার মা।' ভবতারিণীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন রামকৃষ্ণ।

'তবে যাও, তাঁর মত নিয়ে এসো।'

ভবতারিণী আদেশ দিলেন। কিন্তু আরেক মা আছেন। তাঁরও মুখের দিকে চাইতে হবে। তাঁর কথাও ভুলতে পারছেন না রামকৃষ্ণ।

শিখা-সূত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিতে হবে, এই হচ্ছে তোতাপুরীর সাধনা। পরতে হবে গেরুয়া। নাম বদলাতে হবে, পদবী বদলাতে হবে। ছিন্ন করতে হবে জাগতিক সম্পর্ক। ত্যাগ করতে হবে সাংসারিক পরিচয়।

'সব করবো, কিন্তু গোপনে।'

'গোপনে কেন?' আশ্চর্য হলো তোতাপুরী।

'সব ত্যাগ করতে পারবো কিন্তু মাকে ছাড়া। আমার দুই মা। মন্দিরে যে পাষাণময়ী ঘরে সেই করুণাময়ী'—ভাবের লাবণ্যে রামকৃষ্ণের চোখ ছলছল করে উঠলো।

যেন সবটা বুঝতে পারলো না তোতাপুরী।

রামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমার মা, আমার ঘরের মা,

বছরখানেক হলো আছেন আমার সঙ্গে। যদি দেখেন সন্ন্যাস নিয়েছি, দুঃখে তাঁর বুক ফেটে যাবে।'

এক মা বলেন, সন্ন্যাস নে। আরেক মা বলেন, তোর সোনার অঙ্গে ভস্ম দেখলে সইতে পারবো না।

নিষ্কাম ছেলের নির্লোভ মা এই চন্দ্রমণি।

রামকৃষ্ণকে বিষয় দিতে চেয়েছিলেন মথুরবাবু, রামকৃষ্ণ অবহেলায় ছুঁড়ে দিয়েছেন। শাল দিয়েছিলেন গায়ে, গায়ের শাল ধুলোয় ফেলে দিয়েছেন। তাঁর মা চন্দ্রমণিকে ভজাতে এলেন এবার। বললেন, 'আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি তো কোনো সেবা নিলে না আমার থেকে?'

'আমার অভাব কিসের?' খুশি মুখে বললেন চন্দ্রমণি।

'তবু কিছু তুমি আমার কাছ থেকে নাও—এই বড়ো ইচ্ছে। কিছু নাও না চেয়ে।'

'কী চাইবো? খাবার-পরবার এতোটুকু কষ্টও তো রাখোনি।'

তবু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন মথুরবাবু। তোমার তো নেবার প্রার্থনা নয়, আমার শুধু দেবার ব্যাকুলতা।

'যা মন চায় একটা কিছু নাও না।'

'যদি নেহাৎই কিছু দেবে, আমাকে চার পয়সার দোক্তা কিনে দাও।'

চার টাকা নয়, চার আনা নয়, চার পয়সার দোক্তা!

মা এমন লোভশূন্য বলেই তো ছেলে এমন সর্বজয়ী। অমন বৃহদ্‌ব্রত ব্রহ্মচারী। নির্বাসনাই তো সন্তোষ। সর্বদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি।

কথা রাখলো তোতাপুরী। চন্দ্রমণির চোখের আড়ালে সন্ন্যাস দিলো রামকৃষ্ণকে। সাঙ্গ করলো বিরজা হোম।

কিন্তু বেশীদিন কাষায়-কৌপীন পরেননি রামকৃষ্ণ। পাছে মার চোখে পড়ে। পাছে মা আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদেন অনুপায়ের মতো।

শুধু তাই? খালি গায়ের ওপরে কোঁচার খুঁটটি কেন তুলে দিয়েছেন রামকৃষ্ণ? যে মুক্তসমস্তসঙ্গ তাঁর গায়ের ওপরে ভদ্রতার ঢাকা কেন?

ওটি মার জন্যে। গলার পৈতে ফেলে দিয়েছেন এ বুঝতে পেলে মা

ধুলিশয্যা নেবেন। তাই মার চোখে যাতে ধরা না পড়েন তারই জন্যে এই একটু ছদ্মধারণ। যাই বলো, সব সইতে পারবো, মার চোখের জল সইতে পারবো না।

প্রতাপ হাজরা দক্ষিণেশ্বরে এসেছে ঠাকুরের সংস্পর্শে থেকে সাধন করতে। কিন্তু তার বুড়ো মা দেশের বাড়ি থেকে খবর পাঠিয়েছে—তার মরণাপন্ন অসুখ, প্রতাপ যেন একবার দেখে যায়।

'বুড়ো মা, একবার দেখা দিয়ে এসো।' অনুনয় করলেন ঠাকুর।

প্রতাপ পাথর হয়ে রইলো। বললো, 'ঈশ্বরসাধন করতে এসে পিছটান ভালো নয়।'

'পিছটান কিরে? মার সর্ব-টান। দশদিক থেকেই মা। দশদিকে দশ বিদ্যা।'

তবু নড়লো না প্রতাপ। তার মা কেঁদে কেঁদে মরে গেলো।

'এবারে হাজরা দেশে যাবে।' নরেন এসে বললো ঠাকুরকে।

'এখন দেশে যাবে! দূর—দূর—' ছি ছি করে উঠলেন ঠাকুর। 'বাপ-মা কতোবড়ো গুরু! রাখাল আমায় জিগ্যেস করে, বাবার পাতে কি খাবো? আমি বলি, সে কি রে? তোর কি হয়েছে যে, তোর বাবার পাতে খাবি না?'

একজন রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলো, 'বাপ-মা যদি কোনো অপরাধ করে থাকেন—'

'তা হোক। তবুও ত্যাগ করা চলবে না। অমুক গুরু খারাপ বলে কথা হলো তার ছেলেকে গুরু করা যাক। আমি বললুম, সে কি গো? ওলকে ছেড়ে ওলের মুলি নেবে? নষ্ট হলো তো কি? নষ্টকেই ইষ্ট বলে জেনো। যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

মা-বাপ কি কম জিনিস? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্মটর্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব তো প্রেমে উন্মত্ত, তবুও সন্ন্যাসের আগে কতোদিন মাকে বোঝান, বলেন, মা, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিয়ে যাবো।

বৃন্দাবনে এসেছেন রামকৃষ্ণ। এইখানে গঙ্গাময়ীর সঙ্গে দেখা।

নিধুবনের কাছে কুটির বেঁধে একলাটি থাকে গঙ্গাময়ী। ষাট বছর বয়স, তা হোক, ললিতাসখী হয়ে রাধিকাভজন করে।

পরস্পরকে দেখে চিনে ফেললো ছ'জনে। রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি ললিতা।' গঙ্গামযী বললো, 'আর তুমি রাধিকা ভাবভক্তিবিনোদিনী।'

রামকৃষ্ণ ঠিক করলেন দক্ষিণেশ্বরে আর ফিরবেন না। বাকী জীবন এই ব্রজধামেই কাটিয়ে দেবেন। কাটিয়ে দেবেন গঙ্গামযীর স্নেহাশ্রমে।

মথুরবাবু প্রমাদ গুণলেন। দক্ষিণেশ্বর কি অন্ধকার হয়ে যাবে? যিনি নিজে সুদক্ষিণ তিনি কি পরাঙ্মুখ হয়ে থাকবেন? হৃদয়কে বললেন, 'এখন ব্যবস্থা করো।'

হৃদয় অনেক সাধ্যসাধনা করলো, কিন্তু কিছুতেই নরম হলেন না রামকৃষ্ণ। এখানে এমন মধুবনচারিণী যমুনা, এমন পরম পবিত্র লীলাধাম, এ ছেড়ে আমি পাদমেকং ন গচ্ছামি।

হৃদয় ধমকে উঠলো, 'তোমার এতো পেটের অসুখ, তোমাকে এখানে দেখবে কে?'

'কেন, আমি দেখবো সেবা করবো।' বলে উঠলো গঙ্গামযী।

কিছুতেই কিছু হবার নয়। বাইরের যুক্তিতর্কের কোনো ধার ধারবেন না রামকৃষ্ণ। অন্তরে যে ভাবটি এসেছে সেইটির পূরণ চাই।

গায়ের জোর ছাড়া আর পথ নেই। মহাবীর হনুমানের মতোই দুর্ধর্ষ সেবক এই হৃদয়রাম, তেমনি দুর্দান্ত তার শক্তি। সে ঠাকুরের হাত চেপে ধরলো। বললে, 'ওসব চলবেনা চালাকি। ওঠো, চলো।'

গঙ্গাময়ীও চেপে ধরলো আরেক হাত। বললো, 'কখনো না। কিছুতেই যেতে দেবো না। তুমি পারবে গায়ের জোরে?'

ঠাকুরের সমস্ত জোর গঙ্গাময়ীর দিকে। তাই তাঁকে টলায় হৃদয়ের সাধ্য কি। দু'জনের টানাটানিতে ঠাকুরের হয়রানি। যেন সাতেও নেই পাঁচেও নেই এমনি ভাব। দু'জনের হাতে দু'হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যে পারো রাখো, যে পারো টেনে নাও।

হৃদয়ের গর্ব চূর্ণ হলো। ঠাকুর সুমেরুর মতো অটল।

এখন উপায় কি ?

উপায় মা। উপায় চন্দ্রমণি।

মার মুখখানি হঠাৎ মনে পড়ে গেলো রামকৃষ্ণের। স্নেহলাবণ্যময় কোমল করুণ মুখখানি। ব্যস্ত হয়ে ঘর-বার করছেন। উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দুয়ার ধরে। দিনান্ত হয়ে গেলো, ছেলে এখনো ফিরলো না। জল ছলছল চোখে জিগ্যেস করছেন পথচলা পথিককে, আমার গদাইকে দেখেছো কোথাও ? নিশীথ রাতে উঠে পড়েছেন ঘুম থেকে। আতঙ্কিত অন্ধকারকে শুধোচ্ছেন শূন্য স্বরে, আমার গদাই কোথায় গেলো ?

মার সেই উদ্বেগচঞ্চল চক্ষু দু'টি। সেই মার ভীত চমকিত ব্যাকুলতা।

মনস্থির করতে আর দেরী হলো না রামকৃষ্ণের। উড়ে গেলো সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। পড়ে রইলো বৃন্দাবন। পড়ে রইলো গঙ্গাময়ী। পড়ে রইলো নীল যমুনা। নিমেষে গঙ্গাময়ীর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'চল্, মার কাছে ফিরে যাই।'

মার মতো কেউ নয়। মার বড়ো কেউ নেই।

সকল তীর্থের সার, সকল তীর্থের উর্ধ্বে মা। মা স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী।

'টানাটানিতে মার কথা মনে পড়ে গেলো।' বললেন ঠাকুর অমনি বদলে গেলো সমস্ত। ভাবলুম মা বুড়ো হয়েছেন, মার চিন্তা থাকলে ঈশ্বর-ফিশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছেই যাই। গিয়ে সেখানেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরচিন্তা করি।'

মার মাঝেই ত্রিভুবন। মাকে প্রদক্ষিণ করলেই হলো।

অহেতুক কৃপা চাই ঈশ্বরের। কিন্তু শুধুই চাই, বিনিময়ে কিছু দেবো না ঈশ্বরকে ? দেবো বৈ কি। কিন্তু কি দিতে পারি ? দেবার মতো আমার কী আছে ? আছে, এক অমূল্য সম্পদ আছে। শুধু আমার নয়, সকলের আছে। পৃথিবীতে যে দীনতম হীনতম তারও আছে। অহেতুক কৃপার বদলে দেবো অহেতুক ভালোবাসা। ভালোবাসা কার নেই ? কে এমন আছে সংসারে যে ভালোবাসতে পারে না ? আর কাউকে না হোক, অন্তত

নিজেকে ভালোবাসে ? ঈশ্বরকে দেবো সেই ভালোবাসা। কিছু চাই না তবু ভালোবাসি। কিছু পাই না তবু ভালোবাসি। দেবো সেই অকারণ ভালোবাসা। সেই অকারণ ভালোবাসার বদলে পাবো তোমার অবারণ করুণা।

ঈশ্বরের উপর যাতে এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আসে তারই জন্য ঠাকুরের মাতৃসাধনা। মাকে ভাবতেই মন ভরে ওঠে, চোখে জল আসে, প্রাণ আনচান করে। সন্তান ভালোবাসবার আগে মাকে জিগ্যেস করে না, মা তুমি কি রূপসী, বা, তুমি কি বিদুষী, বা তোমার ক্যাশবাক্সে কতো টাকা আছে, বা, তোমার স্বামী কি চাকরি করে ? তার মা আছে এই তার ঐশ্বর্য। তার মা আছে এই তার ভুবনজোড়া শান্তি।

মার অনন্ত ক্ষমা, অনন্ত দয়া, অনন্ত সহিষ্ণুতা।

মা কখনোও পুরোনো হয় না। মা নামের জরা-মৃত্যু নেই। মা-নামের আকার দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। মা-নামের বাণী নির্মল মুক্তির নির্ঝরিণী।

দুঃখেও মা-নাম, আনন্দেও মা-নাম। মা সর্বসম্পৎস্বরূপা।

মা সর্বংসহা ধরিত্রী। ধান্যদা, ধনদায়িণী।

'কী হবি ? ধ্রুব হবি না প্রহ্লাদ হবি ?' জিগ্যেস করলেন ঠাকুর : 'ধ্রুব বড়ো না প্রহ্লাদ বড়ো ?'

হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য ধ্রুব তপস্যা করেছিলো। কাঁচ কুড়োতে এসে মণি পেয়ে গেলো। কিন্তু প্রহ্লাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। ঈশ্বরকে কেন ডাকছে তাও জানে না। ডাকতে ভালো লাগছে বলেই ডেকে যাচ্ছে। হাতীর পায়ের তলায় ফেলছে, তাতেও ঈশ্বর। তপ্ত তেলের কটাহে ফেলছে তাতেও ঈশ্বর। মুক্তি চাই না, সিদ্ধি চাই না, শুধু তোমাকে ভালোবাসতে চাই।

কি·চায় ছেলে তা ছেলে জানে না, তার মা জানে। ছেলের শুধু মা-মা বলে কেঁদে যাবার কথা। মা এসে বিচার করবেন কোথায় ছেলের উপশম। আর কিছু না দিন যদি তাঁর উত্তপ্ত উৎসঙ্গটুকু পাই সেই আমার জগজ্জয়।

'মা একটা পয়সা দে।' ছেলে কাঁদছে মার কাছে। 'ঘুড়ি কিনবো।'

মা বললে, 'না, উনি বারণ করে গেছেন—'

তবু ছেলের কান্নার বিরাম নেই। শত বারণ ধুয়ে যাচ্ছে সে কান্নার ব্যাকুলতায়। অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে মা। ছেলের কান্না কানে তুলছে না। ততোই ছেলে টানছে আঁচল ধরে। বলছে, 'শুধু একটা পয়সা। ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াবো।'

'এক্ষুনি একটা কাণ্ড বাধাবি আর কি।' মা ধমক দিয়ে উঠলেন।

কিছুতেই নিরস্ত হবার নয়। আবার কান্না। আবার আঁচল টানা।

'রোসো গো, ছেলেটাকে শান্ত করে আসি।' পাড়ার মেয়েদের বসতে বলে ঘরের মধ্যে চলে আসে মা। বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয় ছেলেকে।

তেমনি ছড়ানছোড়ান নেই। কৃপার পয়সাটি ফেলে দাও বাক্স থেকে। প্রাণের সুতোয় সচ্চিদানন্দের ঘুড়ি ওড়াবো।

'বাপ-মা পরমগুরু!' বললেন রামকৃষ্ণ: 'কেবল ঈশ্বরের জন্যে বাপ-মার আদেশ লঙ্ঘন করা চলে—আর কিছুতে নয়। বাপের কথায় প্রহ্লাদ ছাড়েনি কৃষ্ণনাম। মা বারণ করলেও ধ্রুব তপস্যা করতে বনে গিয়েছিলো। কৈকেয়ীর কথায় ভরত ছাড়েনি রামসেবা। রামের জন্যে রাবণের কথা শোনেনি বিভীষণ। ভগবানের জন্যে বলি তার গুরু শুক্রচার্যকে অমান্য করেছে—'

নইলে বাপ-মা যা বলবেন তাই বেদবাক্যে। তাই শিরোধার্য।

চন্দ্রমণি মাঝে মাঝে রেঁধে দেন রামকৃষ্ণকে।

'তুমি মা দেশের মতন করে বেশ ফোড়ন-টোড়ন দিয়ে দুটো একটা তরকারি করোনা। খেতে বড়ো মন চায়।'

রেঁধে দেন চন্দ্রমণি। তরকারিতে এমন একটি ফোড়ন দেন, যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। সেটির নাম মাতৃস্নেহ।

মার কাছটিতে বসে খান রামকৃষ্ণ। এমন একটি আস্বাদ পান যা রান্নার মধ্যে নেই। আছে তাঁর অন্তরের মধ্যে। সেটির নাম মাতৃভক্তি।

শেষের দিকে কেমন জবুথবু হয়ে পড়লেন চন্দ্রমণি। জরায় আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগলেন। তবু তাঁকে আঁকড়ে রইলেন ঠাকুর।

বাইরে জরা কিন্তু অন্তরে সেই ঋদ্ধিশালিনী মহালক্ষ্মী।

আলমাবাজারের চটকলের বাঁশি না বাজলে চন্দ্রমণি খেতে বসেন না। সেই বাঁশি বাজলে বলে ওঠেন, 'ঐ বৈকুণ্ঠের বাঁশি বাজলো। লক্ষ্মী-নারায়ণের ভোগ হলো এতোক্ষণে।'

রবিবার তাঁকে নিয়ে বড়ো বিপদ। সেদিন কলের ছুটি, বাঁশি নেই। সেদিন কিছুতেই খাবেন না চন্দ্রমণি। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণ উপোস করে থাকলো আর আমি ভাত খাবো? এ কখনো হতে পারে?

মাকে নিয়ে ঠাকুরের মহা ভাবনা।

এখন উদ্ধারের পথ কি? আহা, বুড়োমানুষ, শরীর বেজায় কহিল হয়ে পড়বে যে।

'মা এইবেলা খেয়ে নাও, রাধাকান্তের পেসাদ।' মার কাছে গিয়ে অনুনয় করেন ঠাকুর।

সরলা বালিকার মতো বলেন চন্দ্রমণি: 'কি করে খাই বলো? লক্ষ্মী-নারায়ণের যে এখনো ভোগ হয়নি।'

হৃদয় বললো, 'তুমি মামা, অতো ভেবোনি। বুড়ির খিদে পেলে আপনিই খাবে।'

'না রে দেখতে হয়। খাওয়াতে হয় ভুলিয়ে-ভালিয়ে।'

তখন হৃদয় জলের জালার মধ্যে চোঙা ঢুকিয়ে বাঁশির আওয়াজ করলো। বললো, 'এই নাও তোমার বাঁশি বাজলো। এবারে খাও।'

এদিকে জরা, কিন্তু বুদ্ধি টনটনে। বললেন চন্দ্রমণি, 'না রে। ও তো শুধু চোঙে শব্দ করছিস।'

তখন সকলের হাসি।

ঠাকুর তখন মার গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। বললেন, 'দেখো মা, আজকাল গঙ্গায় বড়ো বড়ো সব জাহাজ চলে। তার অনবরত শব্দ হচ্ছে। আর যা জোর হাওয়া। তাই বাঁশির আওয়াজ হয়তো তুমি শুনতে পাওনি আজ।'

'তাই হবে হয়তো।' তখন ঠাকুরের কথায় খেলেন।

এমনি করে মাকে ঠাকুর রেখেছেন চোখে চোখে। সেবা ও শুশ্রূষার অজস্রতায় যত্ন ও জিজ্ঞাসার আবেষ্টনে।

সেই চন্দ্রমণি মারা গেলেন একদিন। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন ঠাকুর। নিঃস্বের মতো লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

এ কি সন্ন্যাসী পুত্রের ব্যবহার? সন্ন্যাসী পুত্রেরা কি মার খোঁজ রাখে, মার খবর করে, মার মৃত্যুর সংবাদ পায়, পেলেও বা কি কাঁদে মাটিতে লুটিয়ে?

ঠাকুর সন্ন্যাসীর শিরোমণি হয়ে গৃহীর মধ্যমণি। তাঁর ঘর-বন সবই সমান।

অন্তর্জলি করতে চন্দ্রমণিকে নিয়ে এলেন গঙ্গায়। যাবার আগে ফুল আর চন্দন দিয়ে মার পায়ে অঞ্জলি দিলেন ঠাকুর।

পুত্রকে শিয়রে রেখে মা চোখ বুজলেন।

মার পা দু'খানি গঙ্গা জলে ধুয়ে তাতে ঘন করে চন্দন মাখালেন ঠাকুর। এ জল চোখের জল, এ চন্দন ভক্তির চন্দন, ভালোবাসার চন্দন।

সন্ন্যাসী, তাই শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ ঠাকুরের। রামলাল শ্রাদ্ধ করলে। অশৌচ পর্যন্ত পালন করলেন না ঠাকুর। তারও বিধি নেই।

'ছেলের মতো কোনো কাজই করতে পেলুম না। কিছুতেই তৃপ্তি দিতে পারলুম না মাকে। আমার মতো দুঃখী আর কে আছে সংসারে।'

একটু অন্তত তর্পণ করি মাকে। একটু অন্ততঃ জলাঞ্জলি দিই।

গঙ্গায় নেমে জলে হাত ডোবালেন ঠাকুর। অঙ্গুলিবদ্ধ হাত যেই তুললেন উপরে, সব জল পড়ে গেলো আঙুল গলিয়ে। শিথিল অসাড় হয়ে গেলো আঙুল, এক বিন্দু জলও ধরে রাখা গেলো না।

তেমনি ধরে রাখা গেলো না চোখের জল।

সঞ্চয় বা সংগ্রহ করা চলে না ঠাকুরের। এক বিন্দু জল পর্যন্ত নয়। কিন্তু দুই নয়নে এতো জল কি করে সঞ্চিত হলো? দুই হাতে এতো সুধাস্পর্শ? অন্তরে এতো দয়া-ক্ষমা!

নিরঞ্জন চাকরি করছে, জেনে ঠাকুর বিরক্ত হলেন। পরে যখন শুনলেন

মার ভরণ-পোষণের জন্যে চাকরি নিয়েছে তখন ঠাকুর সমর্থন করলেন। বললেন, 'তুই মার জন্যে চাকরি স্বীকার করেছিস, বেশ করেছিস। মা ব্রহ্মময়ী স্বরূপা।'

বিদ্যাসাগরকে বললেন, 'তুমি তো সিদ্ধ গো।'

বিদ্যাসাগর হাসলেন। বললেন, 'আমি সিদ্ধ? কই আমি তো সাধন-ভজন করি না কিছু।'

'নাই বা করলে! আলু পটল সিদ্ধ হলে কি হয়?' গভীর চোখে তাকালেন ঠাকুর: 'নরম হয়। তুমিও তেমনি নরম হয়েছো। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে। তোমার ব্রত দয়া। যে পরের জন্যে কাঁদে সে তো ভগবানের জন্যেই কাঁদে।'

এ কান্নাটুকুই তো ভালোবাসা। নিঃস্বার্থ পরোপকার। এই তো অহেতুক ভক্তি।

'আরেক অর্থেও তুমি সিদ্ধ। তুমি মাতৃভক্ত। আর তোমার মার নামও ভগবতী সর্বসিদ্ধিপ্রদা ভুবনেশ্বরী।'

'আর সব ডাক ফুরোয়। মা ডাক ফুরোয় না।'

এই 'মা'-ই ঠাকুরের একমাত্র মন্ত্র। একাক্ষর মন্ত্র।

বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ

ঘাসবনে কি কামড়েছে রামকৃষ্ণকে।

সাপ বোধহয়!

কি হবে!

কে একজন বলেছিলো রামকৃষ্ণকে, দ্বিতীয়বার যদি কামড়ায় তবে বিষ ঠিক তুলে নেয় সাপ। এখন সেই সাপ পাই কোথায়!

সেই সাপ না হোক, আরেকটা হলেই তো চলে। সাপের গর্ত খুঁজতে লাগলেন রামকৃষ্ণ। এ গর্ত না ও গর্ত।

'কি করছেন?' কৌতুহলী হয়ে কে একজন জিগ্যেস করলো।

'সাপ খুঁজছি।'

'সে কি কথা!'

তখন তাকে সব কথা বললেন রামকৃষ্ণ। দ্বিতীয় দংশনে বিষে বিষক্ষয় দরকার। নইলে এ যাত্রাই শেষ যাত্রা।

সব শুনে লোকটি চিন্তিত হবার ভান করলো। বললো, 'শুধু আরেকবার কামড়ালেই তো চলবে না। ঠিক প্রথম জায়গাটিতেই কামড়ানো চাই।'

সত্যি? এ তো বড়ো ঝামেলার কথা। দ্বিতীয় সাপ প্রথম দংশনের জায়গা যদি ঠিক না ঠাহর করতে পারে।

উঠে পড়লেন রামকৃষ্ণ। দরকার নাই সাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

কৈ, কিছু হলো না তো! বিছে-টিছে কামড়েছিলো হয়তো।

'শরতের হিম খুব ভালো।' একদিন বললো এসে রামলাল।

'ভালো?'

'হ্যাঁ, মাথা ঠাণ্ডা থাকে।' সংস্কৃত একটা শ্লোক ছাড়লে রামলাল।

হবেও বা! শ্লোকের আমি কি জানি! যখন বলছে, তখন গুরুগম্ভীর হয়ে, বিশ্বাস না করে উপায় কি!

কলকাতা থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে ফিরছেন দক্ষিণেশ্বর। আশ্বিন মাসের রাত। হাওয়াতে ঠাণ্ডার একটু আমেজ লেগেছে। মনে পড়ে গেলো, যাতে হিমটুকু বেশ লাগে, তাই গাড়ি থেকে মাথা বাড়িয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ।

তারপরেই পড়লেন অসুখে।

বালকস্বভাব রামকৃষ্ণ। সরল, অলজ্জ, নিরাসক্ত।

লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়। একমাত্র বালকেরই লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, ভয় নেই। একমাত্র বালকই অবন্ধন।

ঈশ্বরও বালকস্বভাব।

যেমন কোনো ছেলে কোঁচড়ে রত্ন নিয়ে বসে আছে। বসে আছে রাস্তার ধারে। যে রাস্তা দিয়ে দিন-রাত্রি হেঁটে চলেছে যাত্রীদল। আমায়

দাও না, আমায় দাও না, বলে রত্নের জন্য কতো লোক সাধাসাধি করছে। কিন্তু রত্নের মালিক সেই ছেলে কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলছে, না—দেবো না, কখনো না। কিন্তু এমন কেউ হয়তো চলে যাচ্ছে সুমুখ দিয়ে, রত্নের জন্য একবিন্দু যার প্রার্থনা নেই, চলে যাচ্ছে উপেক্ষা করে, তারই পিছে পিছে ছুটে যাচ্ছে সেই রত্নেশ্বর। বলছে, সকাতরে বলছে, ওগো, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও এই স্পর্শমণি। তোমাকে আমি অমনি দিয়ে দিচ্ছি।

এমনি ঈশ্বরের কৃপা। ঠিক বালকের যেমন খামখেয়াল।

কার উপর কখন তাঁর কৃপা হবে কেউ বলতে পারে না।

হনুমানকে দড়ি-দড়া দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছে লবকুশ। মাকে গিয়ে বলছে, 'মা, মহাবীরকে বন্দী করেছি।'

'মহাবীরকে?' সীতা তো অবাক।

'হ্যাঁ মা, এই যে বেঁধে এনেছি তোমার সামনে।'

মহাকায় হনুমান তখন ছোট্টটি হয়ে গিয়েছে। কুঁকড়ে-সুকড়ে এতোটুকু! কে বলবে এই সেই সমুদ্র লাফানো গন্ধমাদন-বয়ে-আনা বীর-বলী হনুমান!

দুই ভাইয়ের মহাফুর্তি। অসাধ্য সাধন করেছি। ধরে-বেঁধে টেনে এনেছি ঘরের দুয়ারে। তখন হনুমান বললো হাসিমুখে :

'ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব,
ধরা না দিলে কি পারিস ধরতে?'

রাম তনয়দের কাছে হনুমান ইচ্ছে করেই ধরা দিয়েছে। নইলে সাধ্য কি বাঁধে তারা পবন তনয়কে!

তেমনি, ভগবান যদি কৃপা করে ধরা দেন তবেই তাঁকে ধরা সম্ভব। নচেৎ কিছুতে নয়, কিছুতে নয়। কিন্তু কেমন করে তাঁর কৃপা পাবে?

বালকের মতো সরল হও, অকপট হও; সেয়ানা বুদ্ধি ছাড়ো।

ছেলেকে মা বলছেন, 'ও তোর দাদা।'

ছেলের অমনি বিশ্বাস যে, ও আমার দাদা। তা সে হয়তো বামুনের ছেলে, আর দাদা হয়তো ছুতোর কি কামার।

মা বলেছেন, 'ও-ঘরে জুজু আছে।'

ষোলোআনা বিশ্বাস—ও-ঘরে জুজুর আস্তানা।

জটিল বালকের গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'জটিল বালক বনের পথ দিয়ে পাঠশালায় যেতে বড়ো ভয় পায়। মাকে বলতে মা বললেন, ভয় কি, মধুসূদনকে ডাকবি।

'কে মধুসূদন ?' জিগ্যেস করলো জটিল।

'মা বললেন, তোর দাদা।'

'পরদিন নির্জন পথ দিয়ে দিয়ে যেতে যেতে যেমনি ভয় পেলো অমনি মার কথা মনে পড়লো : দাদা মধুসূদন, দাদা মধুসূদন, বলে ডাকতে লাগলো জটিল। কারো সাড়াশব্দ নেই, সব নিশ্চুপ। তখন গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলো জটিল : কোথায় দাদা মধুসূদন, দেখা দাও, আমার হাত ধরো, আমার যে ভয় পেয়েছে!

'মধুসূদন আর থাকতে পারলেন না লুকিয়ে। কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, এই যে আমি, ভয় কি ? হাত ধরে পাঠশালার রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিলেন জটিলকে।'

আরো একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঠাকুরসেবা ছিলো। সেদিন ব্রাহ্মণের আর কোথাও কাজ পড়েছে। ছোটো ছেলেটিকে বললো, তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিস, বুঝলি ? ফিরতে আমার রাত হবে।

'কি করতে হবে জানতে চাইলো ছেলে। বাপ বললো, আর কিছু নয়, খাওয়াবি শুধু ঠাকুরকে। ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া মানে ঠাকুরকে খাওয়ানো।

'বাপ চলে গেলো। পুজোর ঘরে গিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিলো ছেলে। কিন্তু ও কি, ঠাকুর যে চুপ করে বসে আছেন! কথাও কন না, খানও না। অনেকক্ষণ বসে বসে দেখলো ছেলে, কিন্তু ঠাকুরের আর গা তোলবার নাম

নেই। তখন সে বারবার বলতে লাগলো, ঠাকুর খাও, অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমি আর বসতে পাচ্ছি না।

'ঠাকুর তবুও অনড়, অচল। তখন ছেলেটি কান্না শুরু করলো। বলতে লাগলো, ঠাকুর, বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন, তুমি কেন আমার কাছে খাবে না? বাবা এলে তবে কি বলবো?

'ব্যাকুল হয়ে যেই অনেকক্ষণ কেঁদেছে, ঠাকুর অমনি হাসতে হাসতে আসনে এসে বসে খেতে লাগলেন। ঠাকুরকে খাইয়ে সবে ঘর থেকে যখন ছেলেটি বেরিয়ে এলো, বাড়ির লোকরা বললো, ভোগ হয়ে গেছে? এখন সে সব নামিয়ে আন্।

'ছেলেটি বললে, নামিয়ে আনবো কি, ঠাকুর সব খেয়েছেন।

'বাড়ির লোকেরা বললো, সে কি রে? কি বলছিস তুই!

'সরল, তরল চোখ তুলে ছেলেটি বললো, কেন, ডাকলুম, কাঁদলুম, ঠাকুর তো এসে খেয়ে গেলেন!

'তখন ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখে সকলে অবাক।'

ছোটো ছোটো ছেলের সঙ্গে খেলা করেন রামকৃষ্ণ। ছোটো ছেলেদের কাছাকাছিই ভগবানের বাসা। ধুলো-বালিমাখা ছন্নছাড়া শিশু-ভোলানাথ। যতোক্ষণ শিশুর সঙ্গে আছো—ততোক্ষণই আছো ঈশ্বরের প্রতিবেশী হয়ে। শিশুই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতীক। ঈশ্বরের প্রতিভূ। শিশুর প্রধান গুণটিই হচ্ছে সরলতা। পেটে মুখে এক হওয়া! আর সরল হলেই ঈশ্বর-লাভ!

'ছোকরাদের অতো ভালোবাসি কেন?' বললেন রামকৃষ্ণ: 'ওরা যে খাঁটি দুধ—একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়—ঠাকুর সেবায় চলে। জোলো দুধ অনেক জ্বাল দিতে হয়, অনেক কাঠ পুড়ে যায়। ঈশ্বর বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেক দূর। তা না হলে একেবারে হাতের ভেতর।'

যদি ঈশ্বরের কৃপা পেতে চাও, সরল হয়ে যাও। অন্তরে যতোক্ষণ গরল আছে ততোক্ষণ সরল হওয়া যায় না। অন্তরের গরল ধুয়ে ফেলতে হলে চাই শুধু তরল অশ্রুজল। আর সরলতার সঙ্গে চাই একটু ব্যাকুলতা।

হৃদয়রামের ছেলের চার-পাঁচ বছর মোটে বয়স। সারাদিন থাকে

রামকৃষ্ণের সঙ্গে। খেলা করে। কিন্তু যেই সন্ধ্যা হয়, অমনি কেঁদে ওঠে। মা যাবো! কতো তাকে ভোলাবার চেষ্টা করেন রামকৃষ্ণ, কিছুতেই শোনে না। পয়সা দেবো, খাবার দেবো, কোনো কিছুতেই রুচি নেই। খেলা-টেলা সব তেতো লাগে। শুধু অবিরাম কান্না, মা যাবো!

তখন তার অবস্থা দেখে রামকৃষ্ণ কাঁদতে বসেন। তাঁরও মুখে সেই কথা : মা যাবো।

চাই এই বালকের ব্যাকুলতা। এই বালকের মতো ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে হবে ঈশ্বরের জন্য।

মেঝেতে বসে আছেন রামকৃষ্ণ। এক ভক্ত এক চ্যাঙাড়ি জিলিপি নিয়ে এসেছে তাঁর জন্য। জিলিপি দেখে তো রামকৃষ্ণ ভারী খুশি : 'দেখছো, আমি মায়ের নাম করি বলে এ-সব জিনিস খেতে পাচ্ছি—'

একটি ছ-সাত বছরের ছেলে এসে ঘরে ঢুকলো। রামকৃষ্ণের তখন বালকের অবস্থা। এক ছেলে যেমন আরেক ছেলের কাছ থেকে খাবার লুকিয়ে রাখে—ঠাকুরেরও এখন সেই ভাব। জিলিপির চ্যাঙাড়ি হাত ঢেকে লুকোবার চেষ্টা করছেন। তাই নয়, একেবারে সরিয়ে ফেললেন। পাছে আরেক বালকের চোখে পড়ে। পাছে সে ভাগ বসায়।

এই বালক-ভাবে থাকতে থাকতে, হাত দিয়ে জিলিপি ঢাকতে ঢাকতে সমাধিস্থ হলেন রামকৃষ্ণ।

'মা, পরমহংস তো বালক। বালকের মা চাই না? তাই তুমি মা, আমি ছেলে। মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন করে থাকে?'

বালকের সব নির্ভর যেমন মার ওপর, রামকৃষ্ণেরও তেমনি সমস্ত সমর্পণ ঈশ্বরে।

দাসীর যে ছেলে, সেও বাবুর ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে বলে, মাকে বলে দেবো।

ছোটো ছেলে মা ছাড়া আর কিছুই জানে না। রামকৃষ্ণও তেমনি।

রঙিন চুষি-কাঠি ফেলে দিয়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছে মার জন্য। বালিশ চাপা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে গিয়েছিলো মা। বালিশ ছুঁড়ে ফেলে শুরু করেছে চেঁচাতে। সাধ্যি কি—মা থাকবে কর্মান্তরে? ছুটে এসে কোলে নেবে। মার ঐ উত্তপ্ত উৎসঙ্গকুটুই সমস্ত জীবনের উপশম।

মাকে পাবার জন্যই ঐ বালক-ভাব।

চিৎ হয়ে শুয়ে শিশুর মতো নিজের পায়ের বুড়ো আঙুল চুষছেন রামকৃষ্ণ। হাসছেন নির্গলিত শুভ্রতায়। কখনো বা বাৎসল্যে বিভোর হয়ে বালিশকে সন্তান ভেবে দুধ খাওয়াচ্ছেন। কখনো বা কাপড় বগলে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন উদাসীনের মতো।

বালকই তো সন্ন্যাসী। বালকই তো ঈশ্বর। এই খেলা ঘর তৈরী করছে, এই আবার ভেঙে দিচ্ছে অবলীলায়। এই ঝগড়া করছে, পরের মুহূর্তেই আবার গলায় গলায় ভাব।

অহঙ্কার খারাপ। কিন্তু 'আমি বালক' এই আমিত্বটুকুই মধুর।

'হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'তেমনি, আমি বালক, আমি সন্তান, এটুকু অহঙ্কারের মধ্যে নয়। এ আমিত্বে বরং উপকার আছে। যেমন হিঞ্চে শাকে পেট ঠাণ্ডা হয়। মিছরিতে অম্ল যায়। অন্য শাকে, অন্য মিষ্টিতে অসুখ করে।

কিন্তু এ বালক-ভাবটি আনি কি করে?

দিনে রাতে যখন যতো পারো মেশো এই বালকদের সঙ্গে। মিশতে মিশতেই রসিয়ে উঠবে। ভিতরে রস না এলে বাইরে কি রং ধরে?

ভক্তেরা ফুল দিয়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণকে। বলকের মতো ফুল নিয়ে খেলা করছেন রামকৃষ্ণ। কখনো ফুল নিজের মাথায় দিচ্ছেন, কখনো গলায়, কখনো বুকে, কখনো নাভিতে। বলছেন, 'এখন আমার বালক-স্বভাব। তাই ফুল নিয়ে এরকম করছি। কি দেখছি জানো? শরীরটা যেন বাঁকারি-সাজানো কাপড় মোড়া, সেইটে নড়ছে। ভেতরে একজন আছে বলেই নড়ছে। তাই নয়?'

শিবুর সঙ্গে ভাব খুব, শিবু রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ। বয়স চার-পাঁচ বছর।

মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুৎ দেখে শিবুর খুব আনন্দ। চোখ বড়ো বড়ো করে বলছে রামকৃষ্ণকে, 'খুড়ো, ঐ চকমকি ছাড়ছে।'

যেমনটি শুনেছে তেমনিটি বিশ্বাস করেছে। অন্য কথা বলো, কিছুতেই স্বীকার করবে না। যেমন গ্রামোফোন শুনে বললো, খোলের মধ্যে বসে গান গাইছে কেউ।

ফড়িং ধরতে যাচ্ছে শিবু। অন্যমনে, প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। পাতা নড়ছে গাছে। তাই দেখে ভারী বিরক্ত। বলছে পাতাকে, চুপ চুপ, নড়িসনে, আমি ফড়িং ধরবো।

সব চৈতন্যময় দেখছে বালক। চাই সেই বালকের দৃষ্টি।

বাপের সঙ্গে নেমন্তন্নে যাচ্ছে ছোটো ছেলে। কতোদূর গিয়ে ছেলে বলছে, বাবা আমার প্যাণ্টের বোতাম নেই। বাবা বললেন, তোর বোতাম লাগবে না। বাপের কথা অকাতরে মেনে নেয় ছেলে। বাবা যখন বলছেন তখন আর ভাবনা কি।

তেমনিধারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন রামকৃষ্ণ। পরনে ধুতি, পায়ে চটি, গায়ে ফতুয়া। সঙ্গে মহেন্দ্র গুপ্ত—মাষ্টারমশাই। গেট দিয়ে ঢুকবেন, বলে উঠলেন রামকৃষ্ণ, 'ওহে মাস্টার, ফতুয়াতে বোতাম নেই যে।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'আপনার বোতাম লাগে না।'

'লাগে না নাকি?'

'না'—অভয় দিলেন মাস্টারমশাই।

তাই মেনে নিলেন রামকৃষ্ণ। মাস্টারমশাই জ্ঞানী-গুণী লোক। তিনি যখন বলছেন তখন আর সন্দেহ কি।

থিয়েটারে পার্ট নিয়েছে বাপ, সেনাপতির। মার কোলে বসে প্লে দেখছে ছেলে। সেনাপতিকে সেনাপতি বলে ভাবতে পারছে না, বাপ বলেই দেখছে। থিয়েটারে শত্রুপক্ষের লোক সেনাপতিকে তলোয়ারের ঘা মারলো। তাই দেখে ছেলের নিদারুণ কান্না। আমার বাবাকে মারলে, বাবাকে মারলে! মা তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না, ওটা অভিনয়, ওটা

ছলনা, যাকে মেরেছে সে নাটকের সেনাপতি, বাস্তবের পিতা নয়। কিন্তু কিছুতেই বুঝ মানছে না ছেলে।

তেমনিধারা স্টার থিয়েটারে 'দক্ষ-যজ্ঞ' প্লে দেখছেন রামকৃষ্ণ।

গিরীশ ঘোর দক্ষের পার্ট নিয়েছেন। স্টেজে নেমে বলছেন ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে: 'শিবনাম ঘুচাইব ধরাতল হতে।'

উপরে, বক্সে আছেন রামকৃষ্ণ। গিরীশের হুঙ্কার শুনে তিনি তো স্তম্ভিত। তিনি গিরীশকে দক্ষরূপে দেখতে পাচ্ছেন না, গিরীশরূপেই দেখছেন। গিরীশের দম্ভোক্তি শুনে তিনি হতবাক্। আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন: 'শিবনাম ঘোচাবি কি রে!' বলতে বলতে নেমে এলেন নীচের স্টেজের ধারে। গিরীশকে লক্ষ্য করে ভৎর্সনা করে উঠলেন: 'তোকে এতোদিনে তবে শেখালাম কি! তুই শিবনাম ঘোচাবি?'

গিরীশ করজোড়ে বললেন, 'প্রভু, এ-কথা তো আমি বলছি না, দক্ষ বলছে।'

'তুই বলছিস না!' কিঞ্চিৎ যেন আশ্বস্ত হলেন রামকৃষ্ণ।

'না। ও দক্ষের কথা। আর দক্ষও শেষকালে ধরবে শিবনাম।'

'ধরবি তো? দেখিস! ভুলিসনে।'

বালকস্বভাব রামকৃষ্ণ। অষ্টপাশ আর তিন গুণের বাইরে।

ছোটো ছেলে শুধু তার মাকে ডাকে। রামকৃষ্ণেরও তাই। ঈশ্বরকে ডাকাই তাঁর পূজা। শুধু ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর সাধন-ভজন।

এবার বালগোপাল হয়েছেন রামকৃষ্ণ।

কামারহাটীর অঘোরমণি, বাষট্টি বছরের বুড়ি। গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। বিশ্বের যিনি অধীশ্বর তাকে ছোট্ট শিশুরূপে, সন্তানরূপে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করেছে। মাতৃস্নেহাতুর নিষ্কিঞ্চন শিশু।

রাত তিনটের সময় জপে বসে অঘোরমণি।

সেদিন জপে বসেছে, হঠাৎ কে এসে বসলো তার পাশটিতে। গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। কে, কে তুমি? চমকে চোখ চেয়ে দেখলো—এ কি, এ যে

সেই দক্ষিণেশ্বরের সাধু! রামকৃষ্ণ! মুখে সেই আনন্দ ভরা শিশুর হাসি, এতো রাতে এখানে কি করে?

পাছে আবার চলে যান, সহসা নিজের হাত বাড়িয়ে ধরলো রামকৃষ্ণের বাঁ হাত। অঘটন ঘটে গেলো তক্ষুণি। প্রৌঢ় রামকৃষ্ণ চকিতে একটি দশমাসের শিশু হয়ে গেলো। শিশু হয়েই হামা দিয়ে একেবারে অঘোরমণির বুকের কাছে চলে এলো। হাত তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'মা গো, ননী দে।'

অঘোরমণি দিশাহারা হয়ে গেলো। কেঁদে উঠলো অঝোরে। বললো, 'বাবা, আমি কাঙালিনী। চির দুঃখিনী। ননী কোথা পাবো? আমি খুদ খাই, পাতা কুড়োই। আজ আনি তো কাল খাই। ক্ষীর-সর-ননী আমি কোথায় পাবো, বাবা!'

ওসব শোনবার মতো ছেলে নয় গোপাল। অঘোরমণির হাত থেকে জপের মালা কেড়ে নিলো, আঁচল টানতে লাগলো সজোরে। বায়না ধরা অবুঝ ছেলের মতো বললো, 'ওসব আমি জানি না। খেতে দিতে না পারিস তো মা হয়েছিস কেন, খেতে দিতে হবে। মা হয়ে সন্তানকে তুই অনাহারী রাখবি?'

তখন কি করে, শিকে থেকে নারকেল নাড়ু পেড়ে আনলো অঘোরমণি। গোপালের ছোটো হাতখানি ভরে দিলো। বললো, 'বাবা গোপাল, এ বাসি নাড়ু। তোমাকে দিতে বুক ফেটে যাচ্ছে।'

কিসের বাসি নাড়ু। তৃপ্তি করে তাই খেতে লাগলো গোপাল। গোপালবেশী রামকৃষ্ণ।

সকাল হতেই অঘোরমণি ছুটলো দক্ষিণেশ্বরে।

গোপাল! গোপাল! মুখে শুধু এই স্নেহার্দ্র আকুলতা।

ঘরে ঢুকে পড়লো, কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, বসলো রামকৃষ্ণের পাশ ঘেঁষে। মুখে শুধু সেই বিগলিত কান্না: গোপাল! গোপাল!

ভাবাবেশে রামকৃষ্ণ অঘোরমণির কোলে চড়ে বসলেন। বাষট্টি বছরের বুড়ির কোলে আটচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়।

আসলে যশোদার কোলে গোপাল।

ঈশ্বর সন্তানরূপে অবতীর্ণ। শিশুরূপে অবতীর্ণ।

হে ঈশ্বর, শিশুর মতো সরল করো, সহজ করো, স্বচ্ছ করো। নির্মল করো, নিরাময় করো। তোমার খেলার সঙ্গী করে নাও। রিক্ত করো, যাতে মুক্তির আনন্দে খেলতে পারি তোমার সঙ্গে।

ছোটো ছেলেটি হলেই তো তুমি আমাকে ধরবে। আমার ভার নেবে। আর তুমি যদি আমাকে ধরো, আমার ভার নাও, তবে আর আমার ভাবনা কি! আমাকে তখন পায় কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর

'তুমি ঈশ্বর দেখতে চাও? আমি তোমাকে এখনি দেখিয়ে দিতে পারি।' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'গুণদর্শনই ঈশ্বরদর্শন।'

শুধু গুণ দেখো। যে পরিমাণে গুণ বিকশিত, সেই পরিমাণে ঈশ্বর প্রকাশিত। জল কোথাও ধানের শিষে শিশির বিন্দু, কোথাও গেড়েডোবা, কোথাও সরোবর-দীঘি, কোথাও হ্রদ, কোথাও নদী, কোথাও সমুদ্র। জল দেখো। কোনোখানে প্রদীপ, কোনোখানে মশাল, কোনোখানে বা আবার দাবানল। আগুন দেখো।

যেখানেই গুণ দেখেন, সেখানেই মাথা নোয়ান ঠাকুর। সে বীণকার মহেশ সরকারই হোক বা বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগরই হোক।

কাশীতে এসেছেন। মথুরবাবুকে বললেন, 'মহেশের বীণা শুনবো।'

কোনো একটা এঁদো বিশ্রী গলিতে মহেশের বাসা। সেখানে মথুরবাবুর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ গেলে মথুরবাবুর মান থাকে না। তাই মথুরবাবু বললেন, 'বেশ তো, খবর পাঠাই মহেশকে, আমার বৈঠকখানায়ই সে আসর জমাক।'

মথুরবাবুর নিমন্ত্রণ পেলে মহেশ কৃতার্থ হয়ে যাবে।

কিন্তু ঠাকুর থ বনে গেলেন। বললেন, 'সে কী কথা? মহেশ কেন আসতে যাবে? আমি যাবো তার বাড়ি। তার বাড়ি তো এখন তীর্থ, সেখানে স্বয়ং সরস্বতীর আবির্ভাব। আমি সেখানে গিয়ে আমার প্রণাম

রেখে আসবো। সেখানে তার বাজনাই তো শুনবো না, দেখবো বীণাপাণিকে। সে আসবে না। আমি যাবো। আমিই পিপাসু। আমিই তীর্থঙ্কর।'

তাই সেদিন বললেন মাস্টারমশাইকে, 'আমার বিদ্যাসাগরকে দেখতে বড়ো সাধ হয়। একদিন নিয়ে যাবে তার কাছে?'

কতো গুণ! কতো দয়া!

একটা ঝাঁকামুটে কলেরা হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়, তাকে কোলে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে চিকিৎসার জন্য! বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখে বন্ধ করেছে দুধ খাওয়া। ঘোড়ার কষ্ট দেখে চড়ে না আর ঘোড়ার গাড়ি। মায়ের ইচ্ছা-পুরণ করতে সাঁতরে পার হলো দামোদর। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের অনৈক্য হতেই এক কথায় ছেড়ে দিলো চাকরি, কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের কাজ। আর কতোবড়ো পণ্ডিত, বিদ্যায় কি অগাধ অনুরাগ!

বিদ্যাই তো সব! বিদ্যা থেকেই ভক্তি, দয়া, শ্রদ্ধা, প্রেম। বিদ্যা থেকেই বিনয়, অনহঙ্কার, শরণাগতি। বিদ্যাই ঈশ্বর মন্দিরে শেষ তোরণ।

বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন মাস্টারমশাই। বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে চান।'

'পরমহংস?' বিদ্যাসাগর অবাক মানলেন। 'কেমনতরো পরমহংস? গেরুয়া-টেরুয়া পরে নাকি?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'আজ্ঞে না। সে এক আশ্চর্য পুরুষ। সন্ন্যাসী হয়েও সংসারী, আবার সংসারী হয়েও সন্ন্যাসীর শিরোমণি। লালপেড়ে কাপড় পরেন, গায়ে জামা রাখেন, পায়ে বার্নিস করা চটি জুতো। গাছতলায় ধুলোমাটিতে পড়ে থাকেন না, রাসমণির কালী-বাড়িতে একটি ঘরের মধ্যে বাস করেন, তক্তাপোশে বিছানা পেতে দিব্যি মশারী খাটিয়ে শোন্—'

'তাহলে বৈশিষ্ট্য কি?'

'একেবারে বালকের মতো। ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না, সর্বক্ষণ মা-নামে মাতোয়ারা।'

'নিয়ে এসো একদিন।'

খালের পোল পেরিয়ে শ্যামবাজার হয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটে পড়েছে ঘোড়ার গাড়ি। এবার পড়বে বাদুড়বাগান। এর পরেই বিদ্যার সমুদ্র।

ভাবাবেশ হলো ঠাকুরের। এখন আর অন্যকথা বলো না, শুধু বিদ্যার কথা বলো। যে জ্ঞান ঈশ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যায়, অক্ষয় পুরুষকে জানতে শেখায়, সেই বিদ্যা।

ফটক পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কোনো দোষ হবে না?'

'না, দোষ হবে না।' বললেন মাস্টারমশাই, 'আপনার কিছুতে দোষ নেই। আপনার দরকার নেই বোতামে।'

'নেই!' নিশ্চিন্ত হলেন ঠাকুর।

এই বিদ্যাসাগর! পরনে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতো, গায়ে হাতকাটা ফ্লানেলের জামা। প্রসন্ন প্রশস্ত মুখ, উন্নত ললাট, শুভ্র দাঁত। খর্বদেহ সংহত তেজঃপুঞ্জ।

বিদ্যাসাগরকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'তুমি তো সিদ্ধ গো।

'আমি সিদ্ধ?' থমকে গেলেন বিদ্যাসাগর। 'কৈ, আমি তো সাধন-ভজন করি না, মঠে-মন্দিরে যাই না, ঘুরি না তীর্থে ঘাটে, আমি—আমি সিদ্ধ হলাম কি করে?'

ঠাকুর বললেন, 'সিদ্ধ হতে হলে সাধন-ভাজন করতে হয় না, যেতে হয় না মঠে মন্দিরে।'

'তবে?'

'সিদ্ধ হলে কি হয়? আলু-পটল যখন সিদ্ধ হয় তখন কি হয়?' সহাস্য বয়ানে জিগ্যেস করলেন ঠাকুর, 'বলো কি হয়? নরম হয়। তোমার হৃদয়ও পর-দুঃখে দ্রবীভূত হয়েছে। তুমি নরম হয়েছো। সুতরাং তুমি সিদ্ধ।'

পরও যা পরমও তাই। তুমি পরের দুঃখে কাঁদছো, তার মানে তুমি ঈশ্বরের দুঃখে কাঁদছো। নইলে যে সত্যি পর, তার মধ্যে তুমি তোমার

আপনজনকে দেখছো কি করে ? যে আর্ত সেই তোমার পরমাত্মীয়, তোমার ঈশ্বর। পরোপকারই ঈশ্বর সাধনা।

'কিন্তু জানেন', বললেন বিদ্যাসাগর, 'কলাই বাটা সিদ্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'তুমি কি বাটা ডাল ? তুমি আস্ত ডাল। তুমি একটা গোটা মানুষ। যারা শুধু পণ্ডিত তারাই দরকচাপড়া। যেমন খুব উঁচুতে উঠেও শকুনের ভাগাড়ের দিকে নজর তেমনি শুধু-পণ্ডিতগুলো উঁচুতে উঠেও বিষয়েই আবদ্ধ। কিন্তু তুমি তো শুকনো ডাঙা নও, তুমি সাগর। শুষ্ক পণ্ডিত নও, তুমি বিদ্যার অম্বুনিধি। বিদ্যা থেকেই দয়া, বিদ্যা থেকেই ভক্তি, বিদ্যা থেকেই বৈরাগ্য।'

একঘর লোক শুনছে মুগ্ধ হয়ে !

'তাই', বললেন ঠাকুর, 'আজ বড়ো আনন্দের দিন। আজ সাগরে এসে মিললাম। এতোদিন শুধু খাল-বিল, নদ-নদীই দেখেছি, আজ আমার সমুদ্র দর্শন।'

'সাগরে যখন এসে মিললেন', বললেন বিদ্যাসাগর, 'তখন কিছু লোনা জল নিয়ে যান।'

'লোনা জল কেন ? তুমি ক্ষীর-সমুদ্র।'

আর তুমি ? তুমি অমৃতের পারাবার। গুণী না হলে কি গুণ দেখে ? ভালো না হলে কি ভালো বলে ?

'তোমার মধ্যে দেখছি আমি ঈশ্বরের শ্রী, সমস্ত রূপিণী বিদ্যামূর্তি।'

আসলে মানুষের শুধু দুটো দুঃখ। এক দুঃখের নাম অহঙ্কার, আরেক দুঃখের নাম পরশ্রীকাতরতা।

ঠাকুর বললেন, 'অহঙ্কার যখনই মনে এই জিজ্ঞাসা আনবে তখনই জাগবে দীনতা। অহঙ্কারের উৎখাত হবে।'

যদু মল্লিক বললো, 'তুমি হরি-হরি করতে পারো, আমি কেন টাকা-টাকা করতে পারবো না ? টাকার মধ্যে কি ঈশ্বর নেই ?'

ঠাকুর বললেন, 'বল্ ঈশ্বরের টাকা তোর টাকা নয়। তোকে অবলম্বন

করে ঈশ্বর বিত্তরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তাই এ তোর কৃতিত্ব নয়, এ ঈশ্বরের কৃপা। যখন নিজের সাফল্যে ঔজ্জ্বল্যে তাঁর কৃপা দেখবি, তখন আর কিসের অহঙ্কার?'

তেমনি পরশ্রী মানে পরমের শ্রী। পরমের শ্রীকে দেখে কি কেউ কাতর হয়? এক আকাশ তারা বা এক মাঠ ফুল কি মানুষকে দুঃখিত করে? কখনো না—উল্লসিত করে। গহন পার্বত্য অরণ্যে একটি কলস্বরা নির্ঝরিণী, আবিষ্কার করলে মানুষ করতালি দিয়ে ওঠে। ভোরে-জাগা এক গাছ পাখির কাকলি শুনে কুল-ভাঙা গান জাগে হৃদয়ে। কোথাও তিনি বিত্তের শ্রী, বিদ্যার শ্রী, শক্তির শ্রী, দীপ্তির শ্রী হয়ে বিরাজ করছেন। তাই পরশ্রীতে কাতর না হয়ে আনন্দিত হও। পরশ্রী-কাতর নয় পরশ্রী-আনন্দিত।

'তাই যদু মল্লিকের মধ্যে আমি টাকা দেখি না, বৈভবরূপী বিভুকে দেখি। শ্রী দর্শনই ব্রহ্মদর্শন।'

'কী ব্রহ্ম?' জিগ্যেস করলেন বিদ্যাসাগর।

'ঐটিই মজা।' বললেন ঠাকুর, 'আর সব বস্তু মুখে আনা যায় কিন্তু ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।'

'আর সব বস্তু মুখে বর্ণনা করা যায় কিন্তু ব্রহ্ম অবর্ণনীয়। কোনো রসনার সাধ্য নেই তার স্বাদের ব্যাখ্যা করে। তার সংজ্ঞা দেয় বা তার রূপরীতি জানায়-বোঝায়। সব তন্ত্র-মন্ত্র, শাস্ত্র-দর্শন এঁটো হয়ে গিয়েছে, তার মানে মুখে পড়া হয়েছে, বলা হয়েছে, নির্ণয়-নিরূপণ হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্ম অনুচ্চারিত, অকথিত, অনিরূপিত। ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।'

যে বোঝাবার নয় তাকে বোঝানো। যাকে রসনায় আনবার নয় তাকে বসানো হলো হৃদয়ে।

'কিছু খাবার দিলে কি ইনি খাবেন?' অনুচ্চ স্বরে মাস্টারমশাইকে জিগ্যেস করলেন বিদ্যাসাগর।

শুনতে পেয়েছেন ঠাকুর। সরল খুশিতে বলে উঠলেন: 'দাও না।'

ব্যস্ত হয়ে বিদ্যাসাগর অন্তঃপুরে ঢুকলেন। নিয়ে এলেন একথালা মিষ্টি। বললেন, 'এ খাবার বর্ধমান থেকে এসেছে।'

'যেখান থেকেই আসুক, মধুর সব সময়েই মধুর।' ঠাকুর হাত বাড়িয়ে নিলেন সেই থালা।

বিদ্যাসাগর বললেন, 'তাহলে আপনি বলছেন ঈশ্বর কাউকে বেশী শক্তি কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন ?'

'নিশ্চয়ই'। খেতে খেতে বলছেন ঠাকুর : 'তাঁর যেখানে যেমন খুশি। পিঁপড়েতেও শক্তি আবার হাতিতেও শক্তি। একজন পালিয়ে যায়, আরেকজন হারিয়ে দেয়। নইলে তোমার কাছে আসি কেন ? অন্যের তুলনায় তোমার দয়া বেশী, বিদ্যা বেশী, হৃদয় বেশী—তাই। নইলে তোমার তো আর শিং বেরোয়নি বা লেজ গজায়নি। আকাশের দিকে তাকাই কেন ? না, সেই তো বৃহতের শেষ সীমা।'

ঠাকুর থামলেন। একটু হেসে বললেন, 'এ-সব যা বলছি, কিছুই অজানা নয়। তবে কি জানো ? তোমার খবর নেই। বরুণের ভাণ্ডারে কতো কি রত্ন আছে তা বরুণ রাজাই জানে না।

'অনেক বাবু আছেন যাঁরা বাড়ির চাকর-বাকরেরই নাম জানেন না, বলতে পারেন না বাড়িতে কোথায় কি জিনিস আছে। আজে বাজে জিনিস নয়, এমন কি দামী দামী জিনিস। যার জিনিস নেই সে গরীব নয়, যার জিনিস থেকেও জিনিসের জ্ঞান নেই সে-ই যথার্থ গরীব।'

ঠাকুরের খাওয়া হলো।

ঠাকুর বললেন, 'একবার যাবে রাসমণির বাগান দেখতে ?'

'যাবো বৈ কি।' বিদ্যাসাগর কৃতজ্ঞ-কণ্ঠে বললেন, 'আপনি এলেন আর আমি যাবো না ?'

ঠাকুর ছি ছি করে উঠলেন। বললেন, 'আমার কাছে নয়, আমি অণুর অণু, রেণুর রেণু। যাবে গঙ্গাতীরে রাসমণির বাগান দেখতে।'

'সেকি কথা ?'

'ওহে আমি হচ্ছি জেলে ডিঙি। খাল-বিলেও যেতে পারি, বড়ো নদীতেও যেতে পারি।' বললেন ঠাকুর, 'আর তুমি হচ্ছো জাহাজ। কি জানি, যদি যেতে গিয়ে চড়ায় ঠেকে যাও।'

'না, ঠেকবো কেন? এখন তো ভরা বর্ষা।'

'হ্যাঁ, যদি নবানুরাগের বর্ষা নামে তাহলে আর ভয় নেই। তখন সর্বত্র উত্তাল-জলের উচ্ছলতা। তখন সব চড়া সব অহং-ঢিপি জলে ডোবা। তখন নেই আর মান-অপমান, নেই আর আমি-তুমি। তখন সব একাকার।'

ঠাকুর উঠলেন। বিদ্যাসাগর এগিয়ে দিলেন তাঁকে। প্রণাম করলেন।

ঠাকুর বললেন, 'যদি জানলে ভালোবাসা এসেছে তখনই জানবে ঈশ্বর এসেছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

'শুনেছি দেবেন ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করে।' মথুরবাবুকে বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'তাকে ভারী দেখতে সাধ হয়। তার বাড়িতে নিয়ে যাবে একদিন?'

'নিয়ে যাবো।' এক কথায় রাজি হলেন মথুরবাবু।

'তোমার সঙ্গে তার আলাপ আছে?'

'বাঃ, আমরা যে একসঙ্গে পড়েছি হিন্দু কলেজে। একসঙ্গে মানে এক ক্লাসে।' মথুরবাবু বলেন, 'তার সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা।'

'তবে একদিন নিয়ে চলো সঙ্গে করে।' শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে ঝরে পড়লো ব্যাকুলতা।

'ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার—তুমি সেখানে যাবে কি। কতোবড়ো রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। তার বাবা দ্বারকানাথ ঠাকুরের রাজতুল্য বিত্ত। বলতেই বলে প্রিন্স দ্বারকানাথ। কতো তাদের জাঁকজমক, কতো তাদের বোলবোলা। তোমাকে সেখানে কে পুঁছবে? দ্বারকানাথ নেই কিন্তু তাঁর বড়ো ছেলে দেবেন্দ্রনাথ তাঁরই মতো হাঁকডেকে লোক। জানো, ব্যবসা করে অনেক টাকা লোকসান দেন দ্বারকানাথ, পাহাড়প্রমাণ ঋণ রেখে যান ছেলের ঘাড়ে। দেবেন্দ্রনাথ শেষ ক্রান্তি পর্যন্ত সেই ঋণ শোধ করে দিয়েছে।

'কলেজে পড়া কৃতবিদ্য ব্যক্তি। কতোবড়ো কর্মী, কতো মহৎ

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি স্বদেশের উন্নতির পথে অন্তরায়—এই আন্দোলন চালাচ্ছে ইংরেজ শিক্ষক আর তারই অন্ধস্রোতে গা ভাসিয়েছে উগ্রপন্থী ছাত্রের দল। তারই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। অগ্রণী এই দেবেন্দ্রনাথ। নিজের ধর্মে অনাস্থা, নিজের সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও পশ্চিমকে অনুকরণ করবার লালসার বিরুদ্ধে তার অভিযান। তারই জন্যে রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করলেন আর তার প্রধান ব্যাখ্যাতা দেবেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মধর্ম তো হিন্দুধর্মের বিরোধী বা বিসম্বাদী নয়, আসলে তা হিন্দুধর্মেরই সার, নির্যাস।

'এ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের কতো লেখা কতো বক্তৃতা।'

'আমি অতোশত জানতে চাই না।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'সে ঈশ্বরভক্ত তো?'

'সে ঈশ্বরে শরণাগত! ঈশ্বর বই সে আর কিছু জানে না জীবনে। সে একটি অনির্বাণ ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। সে প্রদীপে শুধু আলোই নয় দাহও আছে। দুঃখ-দুর্দিনের দাহ কিন্তু সত্যের আলো।

'যে এই দীপ জ্বালায় সে আর ঘুমুতে পারে না। সেই দীপই তাকে জাগিয়ে রাখে। জাগিয়ে রাখে সতর্ক প্রহরায়। দুর্যোগের ঝোড়ো হাওয়ায় তা না নিবে যায় অকস্মাৎ, আলস্যে ঔদাসীন্যে না স্তিমিত হয়। আর কোনো ভার ভার নয় যেমন এই দীপরক্ষার ভার। তাতে যোগাও নিষ্ঠার তেল, উস্কে দাও উৎসাহের কাঠি দিয়ে, আর তাকে ঘিরে রাখো তোমার বিশ্বাসের দেয়াল দিয়ে। তাই ঘোর কষ্টের দিনে আত্মীয় গেলো, সমাজ গেলো, বিত্ত গেলো, প্রভুত্ব গেলো, নিন্দায় ছেয়ে গেলো দশদিক, ধনী-মানী বন্ধু-স্বজন, সহায়-সম্বল, সব তাকে ত্যাগ করলো, তবু দীপের অকম্প শিখা নিবতে দিলো না কিছুতেই। সেই শিখাকে বুকে করে লোকালয় ছেড়ে ঘুরতে লাগলো অরণ্যে-পর্বতে। সেই আলোকে দেখতে লাগলো রুদ্রের প্রসন্ন মুখ। যিনি ভয়ের ভয় ভীষণের ভীষণ, তাঁর বজ্রমুষ্টির অন্তরালে খুঁজে নিয়েছে বরাভয়ের অমৃত।'

'রাজার ছেলে ঋষি—এমন মহাপুরুষকে দেখবো না স্বচক্ষে?'

'কিন্তু তোমাকে পাত্তা দিলে তো!'

—সংসারসক্ত বিষয়-মত্ত লোক বিষয় পেয়েও কেন মনে যথার্থ সুখ পায় না? যে জিনিসের উপর আমাদের সবচেয়ে বেশী মমতা, বেশী আকর্ষণ, যার বিনাশ বা বিচ্ছেদের কল্পনাতেও আমাদের দুঃসহ কষ্ট তা থেকেই কেন আমরা সর্বাগ্রেই বঞ্চিত হই? কেনই বা পার্থিব সুখ অনর্থক ও অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়? কেন মনে হয় একটা উৎকৃষ্টতর সুখ কোথাও আছে। নইলে, কেন—কেন তবু আমাদের ভোগস্পৃহা? এই সব সিদ্ধান্ত করতে গেলে মনে হয় ঈশ্বর এমন বিধান করেছেন যে, শুধু তাঁতেই আমাদের আসল সুখ। শুধু তিনিই সমস্ত তৃপ্তির হেতু। যতোক্ষণ আমরা তাঁকে চোখের সামনে রাখি, তাঁর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করি ততোক্ষণই আমাদের যথার্থ আনন্দ।

আরো কী বলছেন শোনো।

—আমরা ক্ষুদ্র জীব হয়ে যে ঈশ্বরকে জানবার অধিকারী হয়েছি এই আমাদের সর্বোত্তম সৌভাগ্য। কিন্তু এই মহত্তম অধিকারের উপযুক্ত হতে হলে আমাদের সর্বভাবে পবিত্র হতে হবে। যেমন ভদ্র সমাজের উপযুক্ত হবার জন্য ভদ্র হতে হয়, সাধুর সঙ্গে বসবাসের জন্য সাধু হতে হয় তেমনি সেই পবিত্র-স্বরূপের সান্নিধ্য পেতে হলে পবিত্র হওয়া চাই। বাহ্যিক সাধুভাব প্রকাশ করতে পারলে সাধুর সঙ্গে কখনো-কখনো বিনয় রক্ষা করা যায় বটে কিন্তু পরমেশ্বরের সকাশে সেরূপ হবার নয়। সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের কাছে বিনয় রক্ষা করতে গেলে মন, বাক্য ও কার্য যুগপৎ পবিত্র রাখা দরকার।

'তবে? এমন সুন্দর যার কথা, এমন গভীর যার ঈশ্বর অনুভব, চলো, তাকে দেখে আসি দু'চোখ ভরে। তাকে দেখে আসাও পুণ্য।'

'যদি তোমাকে ঢুকতে না দেয় বাড়িতে? তুমি কোথাকার কে এক হেঁজিপেঁজি লোক—'মথুরবাবু নিরস্ত করতে চাইলেন।

হাসলেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'যদি ঢুকতে না দেয় ফিরে আসবো। অন্তত দেখে আসবো তো বাড়িটা। তার বাড়িটাই তো তীর্থ।' তারপর বললেন

আশ্বাসের সুরে, 'তা হয় না। পারবে না আমাকে ফিরিয়ে দিতে। যদি শোনে আমি ও ঈশ্বর-ঈশ্বর করি—কাছে ডেকে নেবে হাত বাড়িয়ে, আনন্দের কথা শোনাবে।'

নিয়ে গেলেন মথুরবাবু। একেবারে দেবেন্দ্রনাথের কামরায়।

'চিনতে পারো?'

'আরে, মথুর না? চেহারাটা একটু বদলেছে দেখছি। ভুঁড়ি হয়েছে।' হাসির রেখাটুকু মিলিয়ে যেতেই উৎসুক চোখে জিগ্যেস করলেন দেবেন্দ্রনাথ: 'ইনি কে?'

'ইনি ঈশ্বর-ঈশ্বর করে পাগল। তোমাকে দেখতে এসেছেন।'

কে কাকে দেখে!

তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'দেখি তোমার গা।' মুখভাবে প্রসন্ন বন্ধুতা, সহজ সুরে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আশ্চর্য, পারলেন বলতে। এতোটুকু কুণ্ঠা হলো না। আরো আশ্চর্য দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহার। অনায়াসে তিনি গায়ের জামা তুলে ধরলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন দেবেন্দ্রনাথের গায়ের রং গৌর, তার উপর এক-রাশ সিঁদুর ছড়ানো।

তার মানেই দেবেন্দ্রনাথের দিব্যভাব উপস্থিত। তিনি এসেছেন ঈশ্বর-সান্নিধ্যে। আগুনের সামনে এসেছেন বলেই তাঁর গায়ে এই সতেজ রক্তিমা।

ঠিক লোকের কাছেই এসেছি। পাশে বসে পড়লেন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আমাকে কিছু বলো।'

'আমি কী বলবো!'

'না, বলো। তুমি কতোবড়ো পণ্ডিত। সমস্ত বেদ-উপনিষদ তোমার নখদর্পণে। এ পাণ্ডিত্যও তোমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ। বলো কিছু, শুনি। ঈশ্বরীয় কথার কি কিছু শেষ আছে? যতো বলবে ততো নতুন।'

বলতে লাগলেন দেবেন্দ্রনাথ: 'এই জগৎ যেন একটা বিরাট ঝাড় লণ্ঠন,

আর জীব হচ্ছে এক-একটি ঝাড়ের দীপ। এ জগৎ কে জানতো? ঈশ্বর মানুষ করেছেন তাঁর মহিমা প্রকাশের জন্যে। ঝাড়ের দীপ না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।'

'আরো একটু বলো।'

'ঈশ্বরের মহিমা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। প্রভাতে আমাদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হওয়া মাত্রই তাঁর চক্ষু আমাদের ওপরে স্থাপিত দেখি। আমরা যদি তাঁর জন্যে ব্যাকুল হই, যদি সরল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করি, যদি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবারণ না হয়, তবে অন্তরে-বাইরে দূরে-কাছে সকল স্থানেই তাঁর প্রকাশ দেখতে পাই। যখন নিজেকে পবিত্র করি, ঈশ্বরের কাছে মুক্ত করি হৃদয় দ্বারা, সতৃষ্ণ হয়ে অন্বেষণ করি তাঁকে, তখন গিরিগুহা, উদ্যান-কানন, নির্জন-সজন সকল কিছুই তাঁতে ভরে ওঠে।'

'এবার আপনি কিছু বলুন।' অনুরোধ করলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'তুমি কলির জনক, তোমাকে দেখে আমার খুব আনন্দ।' ভাবময় উজ্জ্বল মুখে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'জনক এদিক-ওদিক দু'দিক রেখে খেয়েছিলো দুধের বাটি। তুমি সংসারে থেকেও ঈশ্বরে মন রেখেছো, তুমিই তো বাহাদুর, তুমিই তো বীরপুরুষ! তাই তো তোমাকে আমার দেখতে আসা।'

'জনক একদিকে নিজের হাতে লাঙল নিয়ে চাষ করছে, আরেক দিকে দেশদেশান্তর থেকে আসা জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছে।'

'আরো একটু বলুন।'

'এক হাতে কাজ করো আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কাজ শেষ হলে দু'হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।'

'যুদ্ধ যখন করতেই হবে, সংসারীদের বলি, কেল্লায় মানে সংসারে থেকেই যুদ্ধ করা সহজ। মাঠে দাঁড়িয়ে, মানে সংসার ছেড়ে এসে যুদ্ধ করার অনেক বিপদ। যদি খেতে না পাও ঈশ্বর-টিশ্বর সব ঘুরে যাবে।

'যা চাও তাও তাই কাছে রয়েছে। অথচ লোকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিসও দেখতে পায় না। একজন

গামছা খুঁজে খুঁজে তারপর দেখে কাঁধেই রয়েছে। আরেকজন, শোনোনি বুঝি, তামাক খাবে বলে অনেক রাত্রে এক প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে গেছে। কিন্তু তারা তখন সব ঘুমিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে দরজা ঠেলাঠেলি করায় একজন বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করলো—কি গো, এতো রাত্রে কি মনে করে? তখন সেই লোক বললো, আরে ভাই, জানো তো তামাকের নেশা আছে, তাই এই টিকেখানা ধরাবো বলে এসেছি। দেশলাই আছে? তখন প্রতিবেশী বললো—বাঃ, তুমি তো বেশ লোক। এতো রাত্রে দোর ঠেলাঠেলি করে আমাদের ঘুম ভাঙালে। তোমার হাতেই তো লণ্ঠন।'

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করলেন, 'আপনাকে আসতে হবে আমাদের উৎসবে।'

'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। দেখছো তো আমার অবস্থা।' বেশবাসের দিকে ইঙ্গিত করলেন: 'কখন কীভাবে তিনি রাখেন কিছু ঠিক নেই।'

'বেশ তো, ধুতি আর উড়ুনি পরে আসবেন। জামা-টামা নাই পরলেন। আপনাকে কেউ কিছু বললে আমার কষ্ট হবে।'

'তা পারবো না। আমি পারবো না বাবু হতে।'

মথুরবাবু আর দেবেন্দ্রনাথ হাসতে লাগলেন।

দেবেন্দ্রনাথ তখন আছেন গঙ্গার উপর নৌকায়, উত্তেজিত ঝড়ের মতো তাঁর নিভৃতকক্ষে ঢুকে পড়লো নরেন। জিগ্যেস করলো, 'আপনি দেখেছেন ঈশ্বরকে?'

'আমি?' অভিভূতের মতো তাকালেন দেবেন্দ্রনাথ।

'দেখলে আপনিই তো দেখবেন। আপনি বর্তমান বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু।' প্রগাঢ়স্বরে বললো নরেন, 'আপনি মহর্ষি।'

'কিন্তু আমি দেখলে তোমার লাভ কি?' বললেন মহর্ষি, 'তোমাকে নিজে দেখতে হবে।'

'কোত্থেকে দেখবো?' বিশাল চোখে তাকিয়ে রইলো নরেন।

'দেখবে, দেখবে—তোমার এমন যোগীচক্ষু, তুমি দেখবে না?'

'যোগীচক্ষু দিয়ে আমি কী করবো ? আমি চর্মচক্ষে দেখতে চাই ঈশ্বর। আর, এক্ষুণি—এক্ষুণি। দেরী করবার আমার সময় নেই। তোমরা কেউ যদি ঈশ্বরকে দেখে থাকো, আমাকে দেখিয়ে দাও। একজন পারলে কেন আরেকজন পারবে না ?'

পারো, কেউ পারো দেখতে ?

আমি পারি।

তুমি পারো, কে তুমি ?

আমি কেউ না, কিছু না। আমি মুখখু গেঁয়ো পুজুরী বামুন। আমি দক্ষিণেশ্বরে থাকি। তুই আয় আমার কাছে। আমি কতোদিন ধরে তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি। তোকে আমি দেখাবো ঈশ্বর।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শিবনাথ শাস্ত্রী

বিদ্যাসাগরের স্কুলে ভর্তি হয়েছে শিবনাথ। ন-দশ বছর বয়স, নাদুস-নুদুস চেহারা। বাপ-মা ডাকে ভোঁদড় বলে।

স্কুলে কী-একটা দুষ্টুমি করেছে শিবনাথ। ধরা পড়ে গিয়েছে। স্বয়ং বিদ্যাসাগরই ধরেছেন, 'এসো আমার ঘরে।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শিবনাথ বিদ্যাসাগরের ঘরে এসে ঢুকলো। কোণে দাঁড় করালেন। একটা পাতলা পেপার কাটার দিয়ে পেটের উপর মারলেন দু'ঘা।

এই শাস্তি ?

না। আরও আছে। শিবনাথের ভুঁড়ি দেখে বিদ্যাসাগরের লোভ হলো। তিনি তাঁর ডান হাতের অঙুল দুটো চিমটের মতো করে শিবনাথের ভুঁড়ির মাংস টেনে ধরলেন। আসলে এটা আদর।

মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাড়িতে থেকে পড়ে শিবনাথ। দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগরের বন্ধু। সেই সুবাদে বিদ্যাসাগর প্রায়ই আসেন দ্বারকানাথের বাড়ি। এসেই শিবনাথের খোঁজ করেন। শিবনাথ কাছে এসে দাঁড়ালেই তার ভুঁড়িতে চিমটি কাটেন।

'পালা! পালা! বিদ্যেসাগর এসেছে।'

শিবনাথের কানে এ খবর পৌঁছোলেই সে হাওয়া হয়ে যেতো।

পিসতুতো ভাই রামযাদব চক্রবর্তীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে শিবনাথ। মা গোলকমণি ছুটে এসে মাঝখানে পড়ে দু'জনের কান ধরে দু'থাবড়া মেরে ঝগড়া ভাঙিয়ে দিলেন। রামযাদব কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করলো: 'মামীমা—মায়ে-পোয়ে পড়ে ওরা আমায় মেরেছে।'

আর যায় কোথা! কী ব্যাপার কিছু সন্ধান না করেই রামযাদবের মা গালাগালি শুরু করলেন। সন্ধ্যার দিকে শিবনাথের বাবা হরানন্দ ভট্চাজ বাড়ি ফিরছেন, গালাগালি শুনে বোনের বাড়ি ঢুকে ব্যাপার কী জেনে নিলেন।

তাড়াতাড়ি শিবনাথকে ভাত বেড়ে দিলো মা। বললো, 'শীগগির খেয়ে চলে যা। ভট্চাজ্যি পাড়ায় যে যাত্রা হবে তাই গিয়ে শোন। সকালবেলায় ফিরিস। ততোক্ষণে কর্তার রাগ পড়ে যাবে।'

'পাজীটা কোথায়?' বাড়ি পৌঁছেই হাঁক দিলেন হরানন্দ।

রান্নাঘরের দরজার দু'কাঠ ধরে পথ আগলে দাঁড়ালেন গোলকমণি। বললেন, 'ঘরে নেই।'

হরানন্দ রান্নাঘরের দিকে এগোলেন না, উঠোনে দাঁড়িয়েই বললেন, 'দা-খানা দাও।'

'কেন, দা কেন?'

'সে কথায় কাজ কী? দাও বলছি।'

গোলকমণি দা বার করে দিলেন। দা নিয়ে চলে গেলেন হরানন্দ।

এ সুযোগে তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে পালালো শিবনাথ। একেবারে সেই যাত্রার আসরে।

'সব সময় ভীড়ের মধ্যে থাকবি।' বলে দিলেন গোলকমণি, 'মুখে-মাথায় কাপড় বেঁধে।'

আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাটলো নির্বিবাদে। শিবনাথের মনে আর ভয় ভাবনা রইলো না। আসরের বাইরে এসে বেড়াতে লাগলো।

কে যেন হঠাৎ পিছন থেকে ঘাড় চেপে ধরলো।

'কে রে?' চমকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে পিছন ফিরে তাকালো শিবনাথ। সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেলো। যমের চেয়েও নিকট, বাবা ধরেছেন।

পিঠে দু'ঘা বসিয়ে দিলেন হরানন্দ। বললেন, 'খবরদার, কাঁদতে পারবিনে।'

অসম্ভব, সেই মার খেয়ে না কাঁদা, কান্না গিলে খাওয়া। তবু প্রাণপণ শক্তিতে চুপ করে রইলো শিবনাথ।

বাড়ি নিয়ে গিয়ে শিবনাথকে দাঁড় করালেন উঠোনে। বললেন, 'দাঁড়িয়ে থাক, নড়িসনে, আমি আসছি।'

দা দিয়ে বাঁশের ছড়ি কেটে রেখেছিলেন তাই খুঁজতে লাগলেন হরানন্দ। গোলকমণি যে সে ছড়ি পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছেন তা আর তাঁর জানা নেই।

'ওরে পাগলা, মার খাবার জন্যে কেন দাঁড়িয়ে আছিস বোকার মতো?' আতঙ্কিত আত্মীয়ের দল সমস্বরে বললো শিবনাথকে।

শিবনাথও অটল। বললো, 'না, বাবা আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকবো। নড়বো না একচুল।'

আধঘণ্টা কেটে গেলো, ছড়ি না পেয়ে অন্য অস্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন হরানন্দ, শিবনাথ ঠায় দাঁড়িয়ে। মারবার সঙ্কল্পে হরানন্দ অটল আর পিতৃ-আজ্ঞা পালন করবে, এই বাধ্যতায় শিবনাথও সমাধিনিষ্ঠ।

অবশেষে একটা চেলাকাঠ নিয়ে উদ্যত হলেন হরানন্দ।

রামযাদবের মা—হরানন্দের দিদি, সেই এলো হন্তদন্ত হয়ে। 'ওরে কী সর্বনাশ, এই কাঠের বাড়ি মারলে ছেলে কি আর বাঁচবে?'

কার কথা কে শোনে?

রামযাদবের মা কাড়তে গেলো কাঠ, হুটোপুটি শুরু হয়ে গেলো। দিদিকে ধাক্কা মারলেন হরানন্দ, তিন-চার হাত দূরে ছিটকে পড়লো।

গোলকমণি দাঁড়িয়ে আছেন চিত্রার্পিতের মতো।

'কী দেখছো এদিকে ? ছেলে মেরে ফেলতে হয়, মেরে ফেলো। আমার চোখের সামনেই মেরে ফেলো।'

'হ্যাঁ, ফেলবোই তো।' হরানন্দের মাথায় খুন চেপেছে। যারা এগিয়ে এসেছিলো নিরস্ত করতে, মার খেয়ে পিছু হঠলো।

আর শিবনাথ ? শিবনাথ মার খেয়ে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

যখন জ্ঞান হলো, দেখলো তার বাবা ও আরও দু'জন লোক তার গায়ে তার্পিন তেল মাখিয়ে দিচ্ছেন। মা বাড়ির কাছের জঙ্গলে পড়ে আছেন।

'বাবারে, তুই কি আছিস ?' পাগলের মতো পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এলেন গোলকমণি।

একটু সুস্থ হবার পর শিবনাথ বললো আপন মনে, 'ঝগড়া করেছিলাম, আমার দোষ হয়েছিলো। তাই বলে লঘু পাপে এই গুরুদণ্ড দেওয়া কি ঠিক হয়েছে ?'

দেখলো, হরানন্দ মাটিতে নাক ঘষে নাকে খত দিচ্ছেন।

যেমন প্রতিজ্ঞায় তেমনি অনুতাপেও ঐকান্তিক।

গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাতে নিষেধ করে জমিদাররা হুকুমনামা জারি করেছেন। যে পাঠাবে তাকে একঘরে করে ছাড়বে।

'কি, এতো বড়ো স্পর্ধা!' হরানন্দ রুখে দাঁড়ালেন: 'আমার ছেলে মেয়ে পড়বে কি পড়বে না তা অন্য লোকে ঠিক করে দেবে ? অসম্ভব।'

'ওটা তো ব্রাহ্মদের স্কুল।' জমিদার তরফ পিঠে হাত বুলুতে চাইলো: 'আর আপনি একজন সনাতনপন্থী হিন্দু, সদাচারী ব্রাহ্মণ।'

'তাতে কী!' নিজের প্রতিজ্ঞায় নিশ্চল হরানন্দ, বললেন: 'তাতে মেয়ে পড়ানো না পড়ানোয় কী এসে যায় ?'

সব মেয়ে চলে গিয়েছে স্কুল ছেড়ে। শুধু দু'জন আছে খুঁটি ধরে। শিবনাথের দুই বোন। আর তৃতীয়জন – বিদ্যালয়ের পণ্ডিত।

শিবনাথ বড়ো হয়েছে, ভবানীপুরে চৌধুরীদের বাড়িতে থেকে কলেজে

পড়ছে। বাবা একখানা সরকারী কাগজ পাঠিয়েছেন, আদেশ করেছেন নিজে গিয়ে স্কুল ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেবের হাতে দিয়ে এসো।

দরিদ্র অবস্থা, বুট জুতো কেনার সঙ্গতি নেই শিবনাথের, চটি পায়েই উড্রো সাহেবের আপিসে এসে উপস্থিত হলো শিবনাথ। কাগজখানা উড্রো সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। উড্রো তা নিলে না। রূঢ় কণ্ঠে জিগ্যেস করলো, 'তুমি আপিস ঘরের বাইরে জুতো ছেড়ে আসনি কেন?'

'কৈ, এ নিয়ম তো জানতাম না।'

শিবনাথ সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

'তুমি জুতো পায়ে ঘরে ঢুকে আমাকে অপমান করেছো।' গম্ভীর হলো উড্রো: 'জুতো ছেড়ে এসো বলছি।'

'খালি পায়ে ঢুকবো?'

'হ্যাঁ, খালি পায়ে।'

'এমন অদ্ভুত কথা তো শুনিনি!' বললো শিবনাথ: 'ঘরের মধ্যে আপনার পায়ে জুতো, আপনার কেরাণীবাবুর পায়ে জুতো, আর আমিই জুতো ছাড়া হয়ে থাকবো? বেশ, আপনারা খালি-পা হোন, আমিও খালি-পা হবো।'

'আমাদের যে বুট জুতো, আর তোমার—'

'আমারটা চটি। বুট হলে আপনার মান থাকতো আর চটি বলেই আপনার মান গেছে, এ আমি মানতে প্রস্তুত নই। বললো শিবনাথ, 'জুতো জুতোই, বুটে-চটিতে কোনও তফাৎ নেই।'

'তুমি জুতো ছাড়বে কিনা বলো।' সাহেব হুমকে উঠলো।

'মাপ করবেন। পারবোনা ছাড়তে।'

'তবে যাও, তোমার চিঠিও নেবো না।'

'এই আপনার টেবিলের ওপর রইলো। নেন নেবেন, না নেন ফেলে দেবেন। আমার কাজ আমি করে গেলাম।' বলে টেবিলের উপর চিঠি রেখে শিবনাথ বেরিয়ে গেলো।

সেই শিবনাথ পৈতে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্ম হলো। কেশব সেনের কাছে দীক্ষা নিলো।

হরানন্দ ছেলেকে তাড়িয়ে দিলেন, ভাড়াটে গুণ্ডা রাখলেন এ-মুখো হলে যেন লাঠি-পেটা করে গ্রামের বার করে দেওয়া হয়।

তবু লুকিয়ে মাঝে মাঝে এসে মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে যায়।

সেদিন মার কাছে বসে মুড়ি খাচ্ছে শিবনাথ।

তাই দেখে একজন স্ত্রীলোক বললো, 'ওমা, সে কী গো? মুড়ি খায়? কথা কয়? তবে কে বলে ও আমাদের মধ্যে নেই?'

পাড়ার ছোটো একটা মেয়ে ছুটে এসে খবর দিলো, লাঠিয়াল আসছে। তাড়াতাড়ি মাকে প্রণাম করে খিড়কির দোর দিয়ে পালিয়ে গেলো শিবনাথ।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ তার ছেলেকে ঠেঙাবার জন্য মাইনে দিয়ে লাঠিয়াল রাখছে—কতোবড়ো স্বধর্মনিষ্ঠ হলে এ সম্ভব, ভাবতে অভিভূত হলো শিবনাথ। ভাবতো, বাবার এই প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা যদি আরও একটু বেশী হয়ে থাকতো তার মধ্যে।

বাবার ছেলে বলেই শিবনাথও বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হলো না তার আদর্শ থেকে। দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা নির্যাতন—কিছুতে না। আঠারো-উনিশ বছর তার মুখদর্শন করেননি, বাক্যালাপ করেননি, তবুও না। শিবনাথও তার নিজের বিশ্বাসে নির্বিচল।

হরানন্দ বিদ্যাসাগরকে বললেন: 'মানুষ যেমন ছেলে যমকে দেয় তেমনি ছেলে কেশবকে দিয়েছি।'

শুনে বিদ্যাসাগর কেঁদে ফেললেন।

পথে একদিন শিবনাথের সঙ্গে দেখা। 'হ্যাঁরে, তোর কেমন করে চলে?' জিগ্যেস্ করলেন বিদ্যাসাগর।

'খুব কষ্টে চলে, শুধু ক'টা স্কলারশিপের টাকা।'

তখন আবার একবার চোখ ভিজে উঠলো বিদ্যাসাগরের। একবার বাপের দুঃখে দুঃখ। আবার ছেলের কষ্টে ক্লেশ।

কিন্তু শিবনাথকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের মহা আনন্দ।

'এই যে, শিবনাথ।' সহাস্যমুখে বললেন ঠাকুর, 'তুমি ভক্ত, তোমাকে দেখে ভারী আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব—আরেকজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারী খুশি হয়।'

নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম হলে কী হয়, শিবনাথের খুব ভালো লাগে রামকৃষ্ণকে। ধর্ম সাধনার জন্য চূড়ান্ত ক্লেশ করছেন—এতো ক্লেশ আর কেউ করেছেন বলে জানা নেই। তাছাড়া ধর্ম মানেন, সমস্ত মতবাদকেই শ্রদ্ধা করেন, সমস্ত মানুষকেই ভালোবাসেন, বুকে ধরেন। এমন লোক আর দু'টি হয় না।

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিগ্যেস করলেন, 'মশায়, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

'তাঁর ইতি করা যায় না।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'তিনি নিরাকার, আবার সাকার। ভক্তের জন্য সাকার। যারা জ্ঞানী, যারা জগৎকে স্বপ্ন বলে দেখছে, তাদের পক্ষে নিরাকার। ভক্ত জানে আমি একটি জিনিস। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন। এই ধরো না শিবনাথ, শিবনাথের দিকে প্রীতিপূর্ণ চোখে তাকালেন ঠাকুর: 'যতোক্ষণ ও সভায় আসেনি ততোক্ষণ ও নিরাকার—কতো তার নাম আর গুণের কথা রয়েছে। আর যেই সে এসে পড়লো, সাকার হয়ে উঠলো, অমনি সব কথা বন্ধ। তখন তার দর্শনেই সুখ।'

সবাইকে প্রণাম করছেন ঠাকুর। প্রণাম করতে করতে বলছেন, 'জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদীর বিকারবাদীর চরণে প্রণাম, আগেকার ব্রাহ্মজ্ঞানীদের, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।'

এক খৃষ্টান পাদ্রী বন্ধুকে নিয়ে এসেছে শিবনাথ। বললো, 'আমার এই খৃষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন।'

ঠাকুর অমনি প্রণত হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বললেন, 'যীশু খৃষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।'

'যীশুকে যে আপনি প্রণাম করছেন তাঁকে আপনি কী মনে করেন?' পাদ্রী প্রশ্ন করলো।

'ঈশ্বরের অবতার মনে করি।'

'যেমন আপনাদের কৃষ্ণ, রাম, তেমনি?'

'হ্যাঁ, তেমনি! ভগবানের অবতার অসংখ্য। যীশুও এক অবতার।'

'অবতার বলতে আপনি কী বোঝেন?'

'কী বুঝি? শুনেছি কোনো কোনো জায়গায় সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়, ধরবার ছোঁবার মতো হয়। তেমনি অন্তত সমুদ্রের মতো অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, কোনোও বিশেষ কারণে কোনোও এক বিশেষ স্থানে ঐশী শক্তি জমাট বেঁধে মূর্তি ধারণ করলো ধরবার ছোঁবার মতো হলো, সেইটেই ভগবানের অবতার।'

ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে গেলো পাদ্রী। ধর্মের সার্বভৌমিকতা শিবনাথও উপলব্ধি করলো।

'শিবনাথকে দেখলে আমার আনন্দ হয়।' বলছিলেন ঠাকুর, 'যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে। আর যাকে অনেকে গোণে মানে তাতে নিশ্চয়ই ঈশ্বর শক্তি প্রকাশিত।'

শিবনাথকে দেখবার জন্য অস্থির হয়েছেন ঠাকুর। ব্রাহ্ম পাড়ার মধ্যে বাড়ি, চলো, দেখে আসি ভক্তকে। দ্বারপ্রান্তে এসে শুনলেন শিবনাথ বাড়িতে নেই।

'কী হবে কেমন করে থাকবো তাকে না দেখে?'

'কেন, শিবনাথকে চান কেন?'

'কেন চাই? যে ঈশ্বর চিন্তা করে তাকে দেখাও যে কতকটা ঈশ্বরকে দেখা।'

সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়েছে শিবনাথ। বিদ্যাসাগরকে একজন এসে জানালো: 'মশাই, পাজীটা সুখের চাকরীটা ছেড়ে দিয়েছে।'

বিদ্যাসাগরও তো চাকরী ছাড়া। তিনি হেসে বললেন, 'কেন বলছো? সে তো আমার মনের মতোই কাজ করছে।'

কতো না জানি কষ্টে আছে শিবনাথ, কষ্টে থেকেও ভগবানে শুধু লগ্ন নয়, মগ্ন হয়ে আছে—ব্যাকুল হয়ে রামকৃষ্ণ চলে এসেছেন।

কিন্তু হরানন্দ, পিতৃদেব কি আসবেন না?

রোগশয্যায় পড়ে বাবাকে চিঠি লিখলো শিবনাথ। আগে আগে চিঠি গেলে ছিঁড়ে ফেলতেন, এবার কেন কে জানে, খুলে ফেললেন চিঠিটা। জীবন সংশয় অসুখ। পায়ের ধুলো চেয়েছে।

দেখা না হোক, চিকিৎসার বন্দোবস্তটা করে দিয়ে আসি। স্ত্রীর গয়না বাঁধা দিয়ে টাকা যোগাড় করে বেরুলেন।

'বাবা এলেন না কেন?' মাকে কাছে পেয়ে আকুল হয়ে জিগ্যেস করলো শিবনাথ।

'কোবরেজ ডাকতে গিয়েছিলেন।'

যথাসময়ে কোবরেজ এলো। কিন্তু বাবা কৈ?

কবিরাজ বললো, 'উনি রাস্তার একটা দোকানে বসে আছেন।'

শিবনাথ ভাবতে লাগলো, বিষয়-সম্পত্তি না থাক, বাবার এই তেজস্বিতা, এই সত্যানুরাগ, এই দৃঢ়চিত্ততা—এই উদার সহৃদয়তার যেন উত্তরাধিকারী হই।

'ঈশ্বরের জন্যে ভক্ত সব ছাড়তে পারে। দেখো বিশ্বনাথকে।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ভক্তিতে দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে আছে। আর জানবে ভক্তই সার কথা, শেষ কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাইকেল

মাইকেল মধুসূদন ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছে। উগ্র সাহেব। খ্রীষ্টান। তারপর, আবার নাকি মদ খায়।

সে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ডাকে নয়, মথুরবাবুর ছেলে দ্বারিকের ডাকে।

মথুরবাবু তখন নেই, বড়ো ছেলে দ্বারিকই বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা

করছে। যা বিষ হয়, তাই বিষয়। মামলা বেধেছে পাশে বারুদ ঘরের সাহেবদের সঙ্গে।

সে মামলায় নতুন ব্যারিষ্টার মধুসূদনকে ডাকো। তাকেই কাগজপত্র বুঝিয়ে দাও। যা ফি চায় তাই দেবো।

দপ্তরখানার পাশে বড়ো ঘরে বসিয়েছে মধুসূদনকে। দ্বারিক নিজেই উদ্যোগী হয়ে দেখাচ্ছে কাগজপত্র। কিন্তু মধুসূদন যেন কেমন উন্মনা। দৃষ্টি যেন দেশান্তরী।

মামলার নথিতে মন না দিলে ব্যারিষ্টারি করবে কি? দ্বারিক বিশ্বাস চঞ্চল হয়ে উঠলো।

হঠাৎ কাগজ থেকে চোখ তুলে মধুসূদন বললো, 'শ্রীরামকৃষ্ণকে একবার দেখতে চাই?'

'ও! এই কথা? এখুনি ডাকছি ঠাকুরকে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে খবর গেলো। নিজের ঘরটিতে চুপ করে বসে আছেন, দপ্তরের আমলা এসে বললো, 'বাবু তলব করেছেন।'

'কেন হে, ব্যাপার কি?'

'মাইকেল মধুসূদনের নাম শুনেছেন?'

'তা আর শুনিনি!'

'সে এসেছে, বাবুদের বড়ো ঘরটায় বসে আছে। আপনাকে একবারটি দেখতে চায়।'

'ওরে বাবা!' ভয়ে আঁতকে উঠলেন রামকৃষ্ণ: 'দুর্দান্ত সাহেব, সর্বক্ষণ হ্যাট্-ম্যাট্-ক্যাট্ বলছে, তার সামনে আমি গিয়ে দাঁড়াবো কি! আমি মুখখু সুখখু মানুষ, এ-বি-সি-ডির ধার ধারি না। কি কথা বলতে কি কথা বলবো তার ঠিক নেই।'

'তা জানি না। বাবুর হুকুম, আমার জানাবার কথা, আমি তাই জানিয়ে দিলাম।'

'ওরে হৃদে, তুই যা।' ভাগনে হৃদয়রামের উদ্দেশ্যে সজোরে হাঁক পাড়লেন ঠাকুর।

হৃদয়রাম অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। বললো, 'সেকি কথা। দেখতে চায় আপনাকে, আর আমি গিয়ে সামনে দাঁড়াবো ?'

বালকস্বভাব ঠাকুর সহাস্য মুখে বললেন, 'ও একই কথা। তুইও এখানকার লোক, আমিও এখানকার লোক। একজন গেলেই হলো।'

মামার কথা শুনে গুটি গুটি গেলো হৃদয়রাম।

দ্বারিক বিশ্বাস তেড়ে এলো : 'তুমি এসেছো কি করতে ? তোমাকে কে চায় ? তোমাকে দিয়ে কি হবে ?'

'মামা যে বললেন—'

'মামাকে পাঠিয়ে দাও।' দ্বারিক গর্জে উঠলো।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো হৃদয়রাম। বললো, 'আমাকে দিয়ে হবে না। আপনাকে যেতে হবে।'

'কি বিপদ! আমি যাবো কি!' ঠাকুর চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। 'আমি কি একটা সাহেবের সঙ্গে কথা কইবার যোগ্য।' আমার কি সেরকম পোশাক-আশাক কিছু আছে, না, কি আমি ইংরিজি জানি ?'

সামনে দেখতে পেলেন নারায়ণ শাস্ত্রীকে। রাজপুত পণ্ডিত, নবদ্বীপে এসেছিলো ন্যায় পড়তে। সাত বছর ন্যায় পড়ে দেশে ফিরে যাবার মুখে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। এসে দেখছে, এতোদিন করেছে কি, পড়েছে কি, মূর্তিমান সিদ্ধান্ত যে এইখানে! সমস্ত তর্কের নিষ্পত্তি সমস্ত জিজ্ঞাসার মীমাংসা! ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিলো নারায়ণ।

নারায়ণকে ডাকলেন ঠাকুর। বললেন, 'একা যেতে ভয় করছে। তুমি সঙ্গে চলো।'

'আমি গিয়ে কি করবো ?' নারায়ণ আপত্তি তুললো।

'তবু তুমি পণ্ডিত মানুষ, দুটো কথা কইতে পারবে। তর্ক তুললে পারবে সামাল দিতে। আমি আকাট, হ্যাঁ-না কিছুই বলতে পারবো না। তুমি সঙ্গে থাকলে তবু খানিকটা বল হবে।'

'চলুন—'

নারায়ণ শাস্ত্রীকে আগে রেখে এগুতে লাগলেন ঠাকুর।

কিন্তু মধুসূদনের কাছে পৌঁছেই বেসুর ধরলো নারায়ণ। সরাসরি জিগ্যেস করে বসলো, 'তুমি ধর্ম ছেড়েছো কেন ?'

প্রথমেই এমন একটা প্রশ্ন করতে হয় ? তাও এমন রুষ্ট স্বরে ? ঠাকুর যেন ফাঁপরে পড়লেন।

কি বলবে ঠিক যেন কিছু বুঝে উঠতে পারছে না মধুসূদন। কাতর চোখে শূন্যে তাকিয়ে রইলো।

নারায়ণ কি তবু নিরস্ত হয় ? একই প্রশ্নবান আবার ছুঁড়ে মারলো : 'কেন ছাড়লে নিজের ধর্ম ? হিন্দু ধর্ম ?'

মধুসূদন নিজের পেটে হাত রাখলো। বললো, 'পেটের জন্যে।'

'পেটের জন্যে বাপ-ঠাকুর্দার ধর্ম ছাড়লে তুমি ?' নারায়ণ শাস্ত্রী বোমার মতো ফেটে পড়লো : 'এই দু'দিনের সংসারে পেটের দায়ে ধর্ম ছাড়া ? কি হতো ধর্মচ্যুত না হলে ? কি হতো ?'

'মরে যেতাম।' বললো মধুসূদন।

'না হয় মরেই যেতে। ধর্মের চেয়ে তুচ্ছ দেহটা বড়ো হলো ?' নারায়ণ হুঙ্কার করে উঠলো। 'যে পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কইবো কি, তার মুখদর্শন করাও পাপ।' বলে নারায়ণ চলে গেলো ঘর ছেড়ে।

ঠাকুর একা পড়লেন। অবরোধের যে প্রাচীর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তা সরে যেতেই পড়লেন একেবারে ফাঁকা মাঠে।

পরিপূর্ণ চোখে মধুসূদন তাকালো ঠাকুরের দিকে। এমন সুন্দর মানুষ তো কই আর দেখিনি। চোখ ভরা করুণা আর ক্ষমা, মুখ ভরা আর্তিহরণ প্রসন্নতা।

বললো, 'আপনিও কি আমাকে ত্যাগ করবেন ?'

ঠাকুর সহাস্যে তাকিয়ে রইলেন। সে হাসির অর্থ—আমি কি কাউকে ত্যাগ করতে পারি ? বললেন, 'অশ্রদ্ধেয় বলে অপাংক্তেয় বলে কেউ কি আছে আমার কাছে ?'

'তাহলে আমাকে কিছু বলুন। কিছু উপদেশ দিন।' মিনতিময় চোখ তুলে মধুসূদন তাকালো ঠাকুরের দিকে।

ঠাকুর কি বলতে যাচ্ছেন, সহসা কে তাঁর মুখ চেপে ধরলো।

একি, তিনি কথা কইতে পারছেন না কেন, কে তাঁর মুখ চেপে ধরলো হঠাৎ ?

আর কে ! স্বয়ং কালী সনাতনী।

'একি, আমাকে দুটো কথা কইতে দিবিনে ?'

না, যে ধর্মদ্রোহী, তার সঙ্গে আবার কি কথা ? তাকে আবার কিসের সান্ত্বনা, কিসের উপদেশ ! প্রত্যাখ্যান করে দাও।

'কিছু বলুন আমাকে।' সস্পৃহ চোখে তাকিয়ে রইলো মধুসূদন।

'আশ্চর্য, আমি তো বলতে চাই, কিন্তু কে যেন আমার মুখ চেপে ধরেছে।' ব্যথায় যেন ছটফট করে উঠলেন ঠাকুর।

মনের মধ্যে ম্লান হয়ে গেলো। আমি এতোই অকিঞ্চন ? শুধু আমারই কি স্থান নেই পদাশ্রয়ে ?

মা, কৃপা কর্। তুই তো সকলের মা। পাপী-তাপী অক্ষম অধম সকলের অঙ্কদায়িনী। তবে কেন তুই বিমুখ হয়ে থাকবি ? কেন তুই ব্যথার স্থানে উপশমের হাত বুলিয়ে দিবিনে ?

ঠাকুরের মুখ থেকে হাতের বাধা সরে গেলো বুঝি।

ঠাকুর উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সাহ্লাদ-সুন্দর মুখে বললেন 'আমাকে কথা কইতে দিচ্ছে না বটে, কিন্তু, দাঁড়াও, তোমাকে গান শোনাই তুমি শান্তি পাবে।'

হৃদয়ের ভালোবাসা বৈরীরীতির ধার ধারে না। ঈশ্বরকে কী পূজা করবো যদি মানুষকে না ভালোবাসতে পারি ? ধর্মদ্রোহীর মন্দিরে জায়গা না হোক, জায়গা হবে হৃদয়ে, যখন সে দ্রোহের মধ্যে দুঃখের প্রদাহ।

মাইকেলের রক্তাক্ত ক্ষতে আরামের প্রলেপ পড়লো। অশ্রুতে ভরে উঠলো দু'নয়ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র

প্রশান্তদীপ্ত সুন্দর সুপুরুষ, মুখশ্রীতে ঈশ্বর বিশ্বাসের কান্তি। কণ্ঠস্বরে যেমন ভক্তির মাধুর্য তেমনি প্রতিভার তেজ। বাংলা ইংরিজি দু'ভাষাতেই চমৎকার বক্তৃতা দেয়। যেমন তার বর্ণচ্ছটা তেমনি বিন্যাসচাতুর্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডানহাত হচ্ছে এই কেশবচন্দ্র। বাকপতি বিবুধেশ্বর। ঈশ্বর-মাতোয়ারা।

রাজপুত পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রীকে রামকৃষ্ণ বললেন, 'লোকটার খুব নাম ডাক শুনছি। তুমি গিয়ে একবার দেখে আসবে?'

নারায়ণ শাস্ত্রী জ্যোতিষ জানতো, দেখে এলো কেশবকে।

'কেমন দেখলে?'

'খাঁটি লোক। জ্ঞানসিদ্ধ।'

দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ধর্মসভায় রামকৃষ্ণ গিয়ে দেখলেন বেদীর উপর অনেক লোক বসেছে, মধ্যিখানে কেশব। একমাত্র কেশবই কাষ্ঠবৎ। রামকৃষ্ণ দেখলেন, যত জন ধ্যান করছে তার মধ্যে কেশবই গভীরগামী। মথুরবাবুকে বললেন, 'শুধুই কেশব ছোকরারই ফাতনা ডুবেছে।'

তখন ভাগ্নে হৃদয়কে নিয়ে গেলেন বেলঘরে, কেশবের সঙ্গে দেখা করতে। কেশব আমার সঙ্গে দেখা করতে আসুক এই ভাব নয়। আমিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যাই কেশবের কাছে। কেশব ঈশ্বরের কথা নয়, বহু লোক তাকে মানে-গোনে, সেই তো তীর্থভূত।

কেশব সশিষ্য পুকুরের বাঁধাঘাটে বসে আছে, হৃদয় কাছে এসে বললো, 'আমার মামা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

কে আপনার মামা?'

'দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। আপনি এখানে হরিনাম করতে এসেছেন জেনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।'

'নাম কী?'

নাম বললো হৃদয়।

'কোথায় তিনি?' ব্যস্ত হয়ে উঠলো কেশব।

'গাড়িতে বসে আছেন।'

'নিয়ে আসুন নামিয়ে।'

হৃদয় তখন নিয়ে এলো রামকৃষ্ণকে। সবাই উদগ্র উৎসুক হয়ে তাকালো। এই রামকৃষ্ণ? সাধারণ পাঁচজনেরই একজন। কিংবা হয়তো তারও চেয়ে নগণ্য।

কেশব কোন্‌জন, ঠিক বুঝতে পেরেছেন রামকৃষ্ণ। কাছে এসে বললেন, 'বাবু, তোমাদের কাছে ঈশ্বরের কথা শুনতে এসেছি! তোমরা নাকি দেখেছো ঈশ্বরকে? সে কেমনতরো দর্শন আমাকে একটু বলবে?'

কে বল্লে সাধারণ-সামান্য? তন্ময়ের মতো তাকিয়ে বললো কেশব, 'আপনি বলুন। যদি কেউ বলবার থাকে তো আপনিই বলবেন।'

'আমি বলবো?' গান ধরলেন রামকৃষ্ণ: 'কে জানে কালী কেমন? ষড়দর্শনে না পায় দরশন —'

গাইতে-গাইতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

আর-সকলে মনে করলো মস্তিষ্কের বিকার, কিংবা মৃগী রোগ আছে হয়তো লোকটার। কিন্তু কেশব বুঝলো রামকৃষ্ণের মুখের এ পবিত্র দিব্য বিভা অলৌকিক দর্শন আর স্পর্শনের সংমিশ্রণ।

হৃদয় প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলো, হরি ওঁ, হরি ওঁ।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলেন রামকৃষ্ণ।

বলতে লাগলেন ঈশ্বরকথা। গিরগিটি কখনো লাল কখনো নীল কখনো সবুজ কখনো হলদে। আবার কখনো কখনো দেখা যাবে একদম রং নেই। ঈশ্বরও তেমনি। কখনো সগুণ কখনো নির্গুন। ভক্ত যে রূপটি ভালোবাসে ভগবান সেই রূপটি ধরে দেখা দেন। পরে আবার রূপের বাইরে চলে যান, প্রত্যক্ষের বাইরে। তখন শুধু জ্যোতি, অনুভূতির সমুদ্র।

দুই-ই সত্য। নিরাকারও সত্য। কবীর বলতো, নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা। তুমি কাকে ছেড়ে কাকে রাখবে।

উপাসনার ঘণ্টা পড়লো। এবার সকলের উঠতে হয়।

কিন্তু উঠতে কারু মন চাইলো না। উপাসনার অর্থই হচ্ছে ভগবানের কাছটিতে বসা, আসন নেওয়া। এ কী সবাই এক ভাগবতী উপস্থিতির কাছে বসে নেই ?

'সাকারই বলো নিরাকারই বলো, তিনি রয়েছেন এই দেহের মধ্যে।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'হরিণের নাভিতে কস্তুরী, তার গন্ধে সারা বন আমোদ হয়ে আছে। কিন্তু হরিণ জানে না কোথায় এই সুগন্ধের উৎস, দিকে দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাকে জানতে না পেরে ঘুরে-ঘুরে মরছে।'

কেশবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার ভাবনা নেই। তোমার লেজ খসেছে।'

ব্যাখ্যা করে দিলেন। ব্যাঙাচির যদ্দিন লেজ থাকে তদ্দিন সে জলেই থাকে, ডাঙায় উঠতে পারে না। কিন্তু লেজ যখন খসে পড়ে তখন সে জলেও থাকতে পারে ডাঙায়ও উঠতে পারে। তেমনি মানুষের যদ্দিন অবিদ্যার লেজ থাকে তদ্দিন সে সংসার জলেই থাকতে পারে, ব্রহ্মভূমিতে উঠতে পারে না। অবিদ্যা খসে পড়লে মানুষ সংসারেও থাকতে পারে, ঈশ্বরেও থাকতে পারে। তুমি তেমনি সংসারেও আছো ঈশ্বরেও আছো।

তবু বুঝি সংশয় যায় না কেশবের। রামকৃষ্ণকে বাজিয়ে দেখবার জন্য চর পাঠিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। দিন-রাত পাহারা দেবে, দেখবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। দেখবে, সত্যি খাঁটি কিনা, না আছে কিছু বুজরুকি।

রামকৃষ্ণ খুশি। হ্যাঁ, বাজিয়ে নাও যাচাই করে নাও। শানের উপর মহাজন যেমন শক্ত হাতে টাকা বাজায়, বেপারী যেমন তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নেয় টুটাফুটা।

ব্রাহ্ম ভক্তরা রামকৃষ্ণকে বললো, 'তুমি কেশববাবুকে ধরো' তাহলে তোমার ভালো হবে।'

'কিন্তু আমি যে সাকার মানি। আমি যে মা বলে ডাকি। মাকে যদি

নিরাকার করি তবে অমন কোলটুকু পাবো কি করে? কি করে দেখবো তবে মায়ের স্নেহভরা নয়ন?'

সেই কেশবের যখন অসুখ করলো রামকৃষ্ণ মায়ের কাছে ডাব-চিনি মানলো। শেষরাতে ঘুম ভেঙে যায়, আর মার কাছে বসে কাঁদেন রামকৃষ্ণ। বলেন, 'আমার কেশবের অসুখ ভালো করে দাও! কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইবো!'

কেশবের বাড়ি এসেছেন রামকৃষ্ণ। সেখানে ধ্যানে হঠাৎ মা-কালীর আবির্ভাব। রামকৃষ্ণ বলছেন, 'মাগো, এখানে তুই আসিস না। এরা তোর রূপ-টুপ মানে না। কেবল নিরাকার করে।'

কিন্তু এমনি আর কতোদিন যাবে।

কলুটোলার বাড়িতে রামকৃষ্ণ যখন প্রথম গিয়েছিলেন, হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে, কেশব তখন টেবিলে কী লিখছিলো, ওঁদের দেখেও দেখলো না। একটা নমস্কার পর্যন্ত করলো না। সহৃদয় রামকৃষ্ণ মেঝের উপর ফরাশে বসলেন। প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পরে কলম ছেড়ে চেয়ার থেকে নেমে বসলো কেশব।

কেশবকে আসতে দেখেই নমস্কার করলেন ঠাকুর।

আর যায় কোথা! কেশবও নমস্কার করলো। ভূমিষ্ঠ নমস্কার।

গিরিশ ঘোষ বলে, 'রাম অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগজ্জয় হয়েছিলো, কৃষ্ণ অবতারে জগজ্জয় হয়েছিলো বংশীধ্বনিতে আর রামকৃষ্ণ অবতারে জগজ্জয় হবে প্রণাম মন্ত্রে!'

নাম আর প্রণাম এই-ই তো পূজার ফুল-জল। সাধন-ভজন।

'দেখো, কেশব কতো পণ্ডিত!' বলছেন ঠাকুর, 'ইংরিজিতে লেকচার দেয়, কতো লোক তাকে মানে। স্বয়ং কুইন ভিক্টোরিয়া তার সঙ্গে বসে কথা কয়েছে। কিন্তু এখানে যখন আসে, শুধু-গায়ে। সাধুদর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আসে। কতোবড়ো ভক্ত। একেবারে অভিমানশূন্য।'

বিদ্যায় কী হবে যদি ভক্তি না থাকে? ভক্তিই পরা-বিদ্যা।

'কেশববাবুর পিতামহ রামকমল সেন ভক্ত ছিলেন।' বললো মাস্টার, 'তুলসীকাননের মধ্যে বসে নাম করতেন। কেশবের বাবা প্যারীমোহনও ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।'

ঠাকুর বললেন, 'বাপ ওরকম না হলে ছেলে অমন হয় না।'

'কেশবের বৈরাগ্য বাল্যকাল থেকেই।' বললো প্রতাপ, 'বাল্যকাল থেকেই তার আমোদ-আহ্লাদে অরুচি।'

শিষ্যদের সঙ্গে এসেছে দক্ষিণেশ্বর।

ঠাকুর বললেন, 'তোমার লেকচার শুনবো।'

চাঁদনিতে বসে লেকচার দিলো কেশব।

তারপর ঘাটে বসে আলাপ শুরু করলো ঠাকুরের সঙ্গে। ঠাকুর বললেন, 'যিনি ভগবান তিনিই একরূপে ভক্ত। আবার আরেকরূপে ভাগবত। বলো, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান—'

কেশব বললো, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। সঙ্গে-সঙ্গে তার শিষ্যরাও বললো সমস্বরে।

'বলো—গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব—' বলে উঠলেন ঠাকুর।

কেশব হাসলো। বললো, 'মশায়, এখুনি এতোদূর নয়। লোকে গোঁড়া বলবে।'

ঠাকুর আবার বললেন, ' 'আমি' ত্যাগ না করলে হবে না।'

'তাহলে মশায়, দলটল থাকে না।' হাসলো কেশব।

'কাঁচা আমি, বজ্জাত আমি ত্যাগ করতে বলছি, কিন্তু পাকা আমি, বালক আমি, দাস আমি, সন্তান আমি ত্যাগ করতে বলছি না।'

'তুমি মা, আমি সন্তান—এর মতো সুন্দর, এর মতো সহজ আর কিছু আছে ?'

'তোমরা যাকে ব্রহ্ম বলো তাঁকেই আমি শক্তি বলি, আদ্যাশক্তি বলি ! যখন বাক্য-মনের অতীত, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় তখন তিনি ব্রহ্ম।' বলছেন ঠাকুর, 'কিন্তু যখন দেখি তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন তখন তিনি শক্তি।'

শক্তিকে মেনেছে কেশব। মেনেছে কালীকে, চিন্ময়ী কালীকে। আগে খোল-করতাল নিয়ে ব্রহ্মনাম করতো, এখন মা নাম ধরেছে। কেশব এখন মা-মা বলে ঈশ্বরের নামকীর্তন করে।

যে দেশে যে রকম মাটি, যে রকম ভাব। কীর্তন-ক্রন্দন না হলে মন সহজে সাড়া দেবে না। আর ঈশ্বরের কাছে আসতে চাওয়া মানেই সরল হয়ে যাওয়া। কেশব সরলতার প্রতিমূর্তি।

'কেশব সেন কী সরল ছিলো!' বলছেন ঠাকুর, 'একদিন কালীবাড়ি গিয়েছিলো। অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বললো, 'হ্যাঁ গা, অতিথি কাঙালদের কখন খাওয়া হবে?'

সেই কেশবের বাড়াবাড়ি অসুখ।

'তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে। শরীরের ভেতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গিয়েছে কিনা তাই।' বললেন ঠাকুর: 'কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢুকলে এমনটি হয়। ঘর তোলপাড় করে ভেঙেচুরে দেয়। তেমনি ভাবহস্তী তোমার দেহ বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে।'

কেশবের মা বললো, 'আমার কেশবের অসুখ যাতে সারে তাই করে দিন—'

ঠাকুর বললেন, 'সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো।'

'আপনি আশীর্বাদ করুন কেশবকে।'

'আমার কী সাধ্য! তিনি আশীর্বাদ করবেন। তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি—'

কেশবের অবস্থা ভালো নয় জেনে তার 'কমল কুটিরে' তাকে দেখতে এসেছেন ঠাকুর। কিন্তু সবাই তাকে বসিয়ে রেখেছে বাইরে, কেশবের কাছে যেতে দিচ্ছে না। কেশব এখন বিশ্রাম করছে।

'ওগো আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।'

'তাঁর অবস্থা এখন অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।' প্রসন্ন এসে বললো, 'আপনারাই মতো মার সঙ্গে কথা কন। মা কী বলেন তাই শুনে হাসেন, কাঁদেন—'

বলো কী! এঁতোদূর! শুধু মাকে মানা নয়, মায়ের সঙ্গে কথা বলা!

ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে ঘরের চারিদিকে তাকালেন। ঘরভর্তি চেয়ার কৌচ আলনা টেবিল। বললেন, 'এখন এসবে আর কী দরকার!' আবার ভাবাবেশ এলো: 'এই যে মা এসেছে! এসো আবার, বেনারসী শাড়ি পরে সেজেগুজে কী দেখাও। হাঙ্গামা করো না। বসো গো, বসো।'

'তোমার মাকে বলো, আমার কেশব ভালো হোক।'

'অসুখ ভালো হোক, ওসব কথা আমি বলতে পারি না।' বললেন ঠাকুর, 'ও ক্ষমতা আমি মার কাছে চাইও না। মাকে শুধু বলি, মা আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি দাও!'

এরপর ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে, কেশবের তিরোভাবের কথা জানানো হলো। ঠাকুরের মনে হলো, একটা অঙ্গ যেন গেলো। এমন কম্প এলো যে, লেপ চাপা দিয়ে পড়ে রইলেন, তিনদিন বেহুঁশ।

মাস্টারকে একদিন বললেন ঠাকুর, 'কেশবের মা এসেছিলো। বাড়ির ছোকরারা হরিনাম করলো। কেশবের মা তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে লাগলো। দেখলাম, শোকে কাতর হয়নি। এখানে এসে একাদশী করলো। মালাটি নিয়ে জপ করে। বেশ ভক্তি!'

'ওরে, আমি উলুবনে মুক্তো ছড়াই না!' নব্য বাংলার মাতব্বর ছেলেদের বলছেন ঠাকুরঃ 'কালে সব বুঝতে পারবি। ওই যে কথায় আছে না—যারে ধ্যানে না পায় মুনি, তাকে ঝাঁটায় নন্দরানী।'

তো শালারা আমাকে লাট করে ফেললি। আমাকে সেই এক বুঝেছিলো কেশব সেন। বলরামকে বলেছিলেন, তোমরা বুঝতে পারছো না, উনি কে। তাই অতো ঘাঁটাঘাঁটি করছো। ওঁকে মখমলে মুড়ে একটি গেলাসকেসের মধ্যে রাখবে, দু'চারটি ফুল দেবে আর দূর থেকে প্রণাম করবে।

'আমরা তো আর কেশব সেন নই যে, তাঁর মতো আপনাকে দেখবো',

কে একজন রাগ করে বললো, 'বেশ, না হয়' কাল থেকে আর আসবো না।'

ঠাকুর হেসে বললেন, 'বা গো সখি, ঠোঁটের আগায় দেখছি বেশ রাগটুকু আছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ও লাটু

বাপ-মা নেই, রাখতুরাম খুড়োর সংসারে মানুষ হচ্ছে। খুড়োও নিসন্তান, তাই সমস্ত স্নেহ এই রাখতুরামের উপর।

রাখতুরাম রাখালি করে।

গরু চরায়। গোঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। দুপুরে গাছের ছায়ায় বসে কখনো-কখনো গান ধরে—মনুয়া রে, সীতারাম ভজন কর লিজিয়ে।

গরীব মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করলো রাখতুরামের খুড়ো।

সেই ঋণ বাড়তে-বাড়তে খুড়োর সমস্ত জমি-জমা গ্রাস করলো। রাখতুরামের হাত ধরে খুড়ো পথে এসে দাঁড়ালো।

'চাচাজী!'

'চল, কলকাতা চল। দেখি কাজ-টাজ যোগাড় করতে পারি কিনা সেখানে কিছু।'

কোথায় ছাপরা জেলার এক মেঠো পাড়া গাঁ আর কোথায় ইটের পর ইট কঠিন কলকাতা।

দেশের লোক কাউকে পাওয়া যায় কিনা এখানে-ওখানে খুঁজতে লাগলো চাচাজী। অনেক ঘোরাঘুরি করে পাওয়া গেল ফুলচাঁদকে। ফুলচাঁদ রাম দত্তের আরদালি। রাম দত্ত মেডিকেল কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষক। সিমলে স্ট্রীটে থাকে।

ফুলচাঁদ বললো, 'ছেলেটাকে আমার কাছে রেখে যা। দেখি বাবুকে বলে-কয়ে রাজি করাতে পারি কিনা।'

'আমার রাখতুরাম খুব ভালো ছেলে।' চাচা অনুনয় করলো ফুলচাঁদকে : 'যা করতে বলবে তাই করবে।'

রাম দত্তকে তাই বললো গিয়ে ফুলচাঁদ।

'কোথায় ছেলেটা ?'

আশ্চর্য, ছেলেটাকে দেখেই রাম দত্তের পছন্দ হয়ে গেলো। চেহারায় কেমন একটা তাজা তেজী ভাব। চোখ দুটো যেমন উজ্জ্বল তেমনি সরলতায় ভরা। সমস্ত শরীরে স্বাস্থ্য যেন শ্রী হয়ে ফুটে আছে।

'কী রে কাজ করতে পারবি ?'

'পারবো।'

কাজ আর কী। বাজার করা, বাড়ির মেয়েদের ফুটফরমাস খাটা আর অফিসে আমার টিফিন নিয়ে যাওয়া। পারবি ?'

বললে যেন গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে আসতে পারে এমনি ভাব করলো রাখতুরাম : 'খুব পারবো।'

'কিন্তু শোন, তোর অতোবড়ো নাম আমি বলতে পারবো না।' গম্ভীর থেকে একটু তরল হলো রাম দত্ত : 'তোকে আমি ছোট্ট করে লালটু বলবো। কী, রাজি ?'

হেসে ঘাড় নোয়ালো রাখতুরাম। খুব রাজি।

লালটু থেকে আরো ছোটো হলো লাটুতে !

'জানেন আপনার চাকর আখড়ায় গিয়ে কুস্তি করে ?' পাড়ার লোকেরা রাম দত্তের কাছে এসে নালিশ করলো।

'বাঃ, কুস্তি করা তো ভালো।'

'ভালো ? কুস্তি করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তো ও একদিন পাড়ায় ডাকাতি করবে।'

'যখন করবে তখন দেখা যাবে।' রাম দত্ত নালিশ উড়িয়ে দিলো।

ডাকাতি না করুক, ছোঁড়াটা জলজ্যান্ত চুরি তো করছে এখন।

'আপনার চাকর লাটু, বাজারের পয়সা চুরি করছে।' পাড়ার লোকেরা জানালো আরেক নালিশ : 'ফর্দ ধরুন। হিসেব মেলান।'

'হ্যাঁ রে, ছোঁড়া,' রামদত্ত হাঁক দিলো : 'বাজার থেকে আজ ক' পয়সা চুরি করেছিস?'

লাটু দাঁড়ালো স্থির হয়ে। সত্যের তেজ ফুটে উঠলো মুখে-চোখে। বললো, 'জানবেন বাবু, হামি নোকর আছে, চোর না আছে।'

রাম দত্ত তাকালো প্রতিবেশীদের দিকে। প্রতিবেশীরা চলে গেলো।

তখনকার মতো সব মিটে গেলো। কিন্তু তারপর দুপুরবেলা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে লাটু কাঁদছে।

'কী হলো? কে কী বললো? মারধোর করেছে নাকি কেউ।'

'না তো।'

'তবু কাঁদছিস কেন? চাচাজীর জন্যে মন কেমন করছে?'

'না, তাও না।'

লাটু তাকালো ফ্যালফ্যাল করে। কেন যে কাঁদছে, কেন যে কান্না পাচ্ছে তা কে বলবে!

রবিবারে রাম দত্ত দাক্ষণেশ্বরে চলেছে, লাটু এসে বললো, 'হামাকে নিয়ে চলুন।'

'সে কী, তুই কোথা যাবি।'

'যার কথা আপুনি বলেন সেই রামকৃষ্ণকে হামি দেখবে।'

এতো যখন আগ্রহ ছেলেটার, কাজেই তখন রাম দত্ত লাটুকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো।

গোলগাল বেঁটেখেটে জোয়ান চেহারার হিন্দুস্থানী চাকর। চাকর বলে ঘরে ঢোকবার সাহস নেই। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো জোড়হাতে।

'ও ছেলেটাকে কোথায় পেলে!' জিগ্যেস করলেন রামকৃষ্ণ, 'ওর যে সাধুর লক্ষণ।'

লাটু আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো। সাধুর লক্ষণ তো কাঁদবার কী হয়েছে! 'কী রে, কী হলো? কাঁদছিস কেন?'

লাটু বললো, 'আমি ইখানকে থাকবো।'

'এখানে থাকবি— তোকে মাইনে দেবে কে?' ঘরের বাইরে চলে এলেন রামকৃষ্ণ।

'হামি মাইনে লেবে না। আপুনার কাজ করবে।'

'আমার কাজ করবি, আমার আবার কী কাজ! যা, বাড়ি যা।' রামকৃষ্ণ বুঝি একটু কঠিন হলেন: 'তুই এখানে থাকলে আমার রামের সংসার দেখবে কে? শোন, রাম তোকে আশ্রয় দিয়েছে, তার কাজ যদি না করবি তো নেমকহারামি হবে। খবরদার, নেমকহারাম হবিনে।'

ফিরে গেলো বটে কিন্তু মন পড়ে রইলো দক্ষিণেশ্বরে।

কিন্তু থেকে-থেকে চলে আসে। কখনো বলে-কয়ে রাম দত্তের দেওয়া ফল-মিষ্টি নিয়ে, কখনো খালি হাতে কাউকে না-জানিয়ে। এক রাজ্যের পথ, আসে উধাও-ধাওয়া হাওয়ার মতোন ছুটতে ছুটতে। আর, এলে শীগগির উঠতে চায় না কাছ ছেড়ে।

রাম দত্তকে ডাকলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'কী মধু পেয়ে ছোঁড়াটা এখানে পড়ে থাকতে চায় বলো তো? আমি তো কিছু বুঝি না।'

রাম দত্তও বোঝে না।

'তোকে ওখানে খেতে দেবে কে? কাপড়চোপড় দেবে কে? দেশে টাকা পাঠাবি কোত্থেকে?' রাম দত্তের স্ত্রী মুখিয়ে এলো।

'হামার কুছু দরকার নেই।' বললো লাটু, 'হামি বিনা তলবে নোকরি করবে ওইখানে।'

রাম দত্ত তখন ওকে ছেড়ে দিলো। বললো, 'যা, যেখানে তোর মন চায়, তুই সেখানেই থাক।'

রামকৃষ্ণের কাছে এসে লাটু বললো, 'হামাকে লেখা-পড়া শিখিয়ে দিন।'

'ভালো লোকের কাছেই এসেছিস!' রামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, 'যা বর্ণপরিচয় নিয়ে আয়।'

লাটু বর্ণপরিচয় নিয়ে এলো।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'বল, ক।'

লাটু বললো, 'কা—'

'ওরে কা নয়, ক। বল্—ক।'

লাটু আবার বললো, 'কা—'

কিছুতেই তার খোট্টাই জিভ সজুত করতে পারছে না। রামকৃষ্ণ যতো বলছেন, 'ক', লাটু ততো বলছে 'কা'।

রামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'শালা, ক-কেই যদি কা বলবি তবে ক-ও আকারকে কী বলবি ? যা শালা, তোর আর পড়ে কাজ নেই।'

যাক, ছুটি মিলে গেলো লাটুর। রামকৃষ্ণও হাঁপ ছাড়লেন।

লাটুকে শিবমন্দিরে ধ্যান করতে পাঠিয়েছেন রামকৃষ্ণ। ঢুকেছে সেই দুপুরবেলা, বিকেল হয়ে এলো লাটুর এখনো বেরোবার নাম নেই। ওরে, কী করছে দেখে আয় তো।

রামলাল গেলো খোঁজ নিতে। ফিরে এসে বললো, 'এক গা ঘেমে আছে। নিথর পাথর।'

'একটা পাখা দে', বললেন, 'তুই এক গেলাস জল নিয়ে আয়।'

পাখা নিয়ে শিবমন্দিরে চললেন রামকৃষ্ণ !

জল নিয়ে গিয়ে রামলাল দেখলো রামকৃষ্ণ লাটুকে হাওয়া করছেন। আর তুলো যেমন হাওয়ায় কাঁপে তেমনি লাটুর শরীর কাঁপছে।

'ওরে, বেলা যে আর নেই। সন্ধে-টন্ধে কখন সাজাবি ?' লাটুর উদ্দেশে স্নিগ্ধস্বরে জিগ্যেস করলেন রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শুনে লাটুর ধ্যান ভাঙলো। এ কী, যেন এতোক্ষণ ধ্যানে ছিলেন, তিনিই এখন বসেছেন। মার মতোন বাতাস করছেন সস্নেহে।

লাটু ব্যস্ত হয়ে উঠতে চাইলো আসন ছেড়ে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আগে একটু সুস্থ হ, তারপরে উঠিস। দেখছিস না, গরমে কেমন ঘেমে গেছিস ?'

'কিন্তু আপুনি এ কী করছেন ?' পাখার দিকে লক্ষ্য করলো লাটু। 'এতে হামার অকল্যাণ হবে।'

রামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, 'তোর কে সেবা করছে ? তোর মধ্যে যে শিব এসেছিলেন তাঁর সেবা করছিলাম। গরমে যে তাঁর কষ্ট হচ্ছিলো। নে, এখন এই এক গেলাস জল খা দিকিনি—'

এই চাকর লাটুই শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ডাক্তার সরকার

মহেন্দ্র সরকার বিরাট ডাক্তার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি। বিজ্ঞানের দিকপাল। সবাই চেনে একবাক্যে। ডাক্তার সরকার না ধন্বন্তরি। সেই লোক কিনা হঠাৎ আবার হোমিওপ্যাথি শুরু করলো। এ কী পাগলামি! না, তা নয়। তা হবে কেন। এ পাগলামি নয়, এ হচ্ছে সত্যসন্ধান। দেখবো এর মধ্যে সত্য আছে কি নেই। আর যদি একবার বুঝি, যে সত্যই সত্য আছে, তাহলে ফিরবো না।'

মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভা হচ্ছে। ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতার বিষয় কী ? বক্তৃতার বিষয় হোমিওপ্যাথি। হ্যানিম্যানের গুণকীর্তন। সহকর্মী অ্যালোপ্যাথের দল তীব্র আপত্তি করলো। ওসব বাজে অবৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া চলবে না।

'বিষয় যে অবৈজ্ঞানিক নয় তাই তো প্রমাণ করবো।' ডাক্তার সরকারও দৃঢ়সঙ্কল্প।

'চুপ করো।' গর্জে উঠলো অ্যালোপ্যাথের দল।

'বক্তব্য শুনবে না, এ কোন্ ধরনের বিজ্ঞান ?' ডাক্তার সরকার বিদ্রূপ করে উঠলেন।

'মুখ চেপে ধরো। ঘাড় ধরে বার করে দাও।'

ডাক্তার সরকার শান্ত স্বরে বললেন, 'গায়ের জোর বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞান সত্যের জোর। ঘাড় ধরে আমাকে বার করে দিলেও আমার সত্যকে

হটানো যাবে না। আমি আমার সত্যকে প্রকাশ করে যাবো। যা বুঝেছি, যা জেনেছি—তা বলতে পেছপা হবো না। শুধু বলে যাবো না, করে যাবো। দেখিয়ে যাবো। অর্থাৎ নিজেও প্রকাশিত হবো।

কিন্তু এ কোন্ প্রকাশিত সত্য? এই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস?

গলায় ক্যান্সার হয়েছে, ডাক্তার সরকারের চিকিৎসাধীনে আছেন। গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজের চিকিৎসায় কোনো ফল হয়নি, ইংরেজ ডাক্তাররাও মাথা নেড়ে ফিরে গিয়েছেন। রোগ অসাধ্য, তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু রুগীটি ভারী মধুর।

গলায় সহনাতীত যন্ত্রণা, তবু সারাক্ষণ কথা কইছেন। কথার সেরা কথা—ঈশ্বরকথা। আর আশ্চর্য, তাই কিনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একমনে বসে শুনছে ডাক্তার! শুনতে ভালো লাগছে?

একেক সময় এমনও মনে হচ্ছে তিনি নিজেই বুঝি রুগী আর যাঁর অসুখ তিনি ভালো করতে এসেছেন তিনিই ডাক্তার!

কি মধুময় কথা!

ভক্তিলাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে আঠা লাগে না। সংসার জল, আর মানুষের মনটি যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখতে যাও, দুধে জলে এক হয়ে যাবে। তাই নির্জন স্থানে দই পাততে হয়। দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মাখন তুলে যদি জলে রাখো, তাহলে জলে মিশবে না, নির্লিপ্ত হয়ে ভাসতে থাকবে।

গিরিশ ঘোষ ধমকে উঠলো 'আপনি যে এখানে তিন-চার ঘণ্টা ধরে রয়েছেন এ কেমন কথা? আর রুগী নেই আপনার? তাদের চিকিৎসা করতে হবে না?'

'আর ডাক্তারি আর রুগী!' ডাক্তার সরকার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: 'যে পরমহংস হয়েছে তার জন্যে আমার সব গেলো।'

মাস্টারমশাইকে বলছে, 'তোমরা জানো না আমার কী ভীষণ লোকসান হচ্ছে! রোজ রোজ দু-তিনটে কল মারা যাচ্ছে। পরদিন নিজেই রুগীদের বাড়ি যাই, ফি নিই না। নিজের থেকে গেলে ফি নেবো কেমন করে?

'ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছিলে?' রামকৃষ্ণ মাস্টারমশাইকে জিগ্যেস করলেন।

'গিয়েছিলাম।'

'অসুখের কথা কী বললো?'

'তাই জানতেই তো গিয়েছিলাম। জিগ্যেস করলাম, আজ ব্যারামের কী ব্যবস্থা হবে? ডাক্তার বললো, ব্যবস্থা আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমাকে আবার যেতে হবে—শুধু এই ব্যবস্থা!

রোজ লোকসান হচ্ছে তবু ডাক্তারের যাওয়া চাই।

তবে কি ডাক্তারের ঈশ্বরে বিশ্বাস হচ্ছে? বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী, বাস্তবপন্থী ডাক্তার—তার কিনা আজগুবিতে বিশ্বাস! যাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, জানা যায় না, সে থাকে কী করে?

না না, ঈশ্বর বলি না, বিজ্ঞান বলি, বিজ্ঞানই বলি। কিন্তু যতোদূর আমার বুদ্ধি ততোদূরই তো বিজ্ঞান। আমার বুদ্ধির বাইরে কি কিছু নেই? তবে বিজ্ঞান সেখানে কোথায়? কারণের পর কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছি কিন্তু সমস্ত কারণের কর্তা কে, এ কে বলবে?

শিবনাথের বন্ধুর স্ত্রীর খুব অসুখ। অবস্থা এমন নয় যে, ভালো ডাক্তার দেখায়। শিবনাথ বিদ্যাসাগরকে ধরলো। বিদ্যাসাগর ধরলো ডাক্তার সরকারকে—যদি বিনা ফিতে গরিবকে দেখে।

ডাক্তার সরকার তখনি দেখতে ছুটলেন। বারে বারে ছুটলেন। কিন্তু শত চেষ্টায়ও বাউটিকে সুস্থ করতে পারলেন না।

বউটি মারা যাবার একদিন আগে, রাত প্রায় দশটা, শিবনাথ হন্তদন্ত হয়ে এসেছে ডাক্তারের কাছে: 'শীগগির নতুন একটা কিছু ওষুধ চাই, বড্ড ছটফট করছে।'

'দিচ্ছি। কিন্তু অষুধের জন্যে শিশি এনেছো?' ডাক্তার সরকার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু আশ্চর্য, শিবনাথ শিশি আনতে ভুলে গিয়েছে। কোনোদিন তার এমন ভুল হয় না, আজ এই সঙ্গিন মুহূর্তেই এমন বিস্মরণ।

ডাক্তার নিজের বাড়িতে খোঁজ করলেন। কিন্তু যেমনটি দরকার পাওয়া গেলো না। শিবনাথ ছুটে বেরিয়ে গেলো। কোনো ডাক্তারখানা থেকে যদি কিনতে পারে। রাত অনেক হলো। তা হোক। শিশি একটা যোগাড় হবে না ?

শিবনাথ যখন শিশি নিয়ে ফিরলো তখন অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ডাক্তার ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'এরি জন্যে মনে হচ্ছে বউটি বাঁচবার নয়। যদি বাঁচবার হতো, তোমার শিশি আনতে ভুল হবে কেন, আর আমার ঘরেই বা একটা শিশিও পাওয়া যায় না কেন ?'

'বাঃ, এই তো এনেছি, যোগাড় করে।'

'যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত দামী সেখানে এতোটা সময় অনর্থক নষ্টই বা হয় কেন ? কোন ওজরে ? শিবনাথ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বাঁচাতে পারলাম না।'

শিবনাথ ম্লান হয়ে গেলো। বললো, 'আপনিও যদি এই কথা বলেন, আমরা যাই কোথায় ?'

ডাক্তার চমকে উঠলেন : 'কেন, কী বললাম আমি ?'

'আপনি ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক।' শিবনাথ ঋজু কণ্ঠে বললো, 'আপনিও যদি ভাগ্য বা নিয়তির ওপর নির্ভর করে থাকেন তাহলে আমাদের উপায় কী ?'

'অনেকদিন ধরে ডাক্তারি করছি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেলো। কিন্তু সর্বদা এই সত্যই উপলব্ধি করছি, আরেকটা শক্তি সমস্ত প্রাণী-জীবনকে চালনা করছে। যতোই ওষুধ দিই, ছুরি-কাঁচি চালাই, আমরা কিছু নয়, অন্ধকারে ঢিল ছুড়ছি মাত্র। যার মৃত্যু নিশ্চিত, কোন ডাক্তার তাকে রক্ষা করে।'

'তাহলে ডাক্তারি ছেড়ে দিন।' শিবনাথ ঝলসে উঠলো : 'সবাইকে বলুন, ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে চুপচাপ্ বসে থাকো।'

'তা কেন ?' ডাক্তার শান্তমুখে বললেন, 'অন্ধকারে আছি বলেই তো বেশী করে হাতড়াতে হবে, বেশী করে আঁকড়াতে হবে। ফলাফল আমাদের হাতে না থাক, তবু আমরা বীর, আমরা লড়াই করে যাবো। সত্য খুঁজতে খুঁজতে ধরে ফেলবো সেই সত্যস্বরূপকে।'

কিন্তু এ নতুন রুগী, রামকৃষ্ণ কী বলেন ? বলেন, 'ডাক্তার, আমার এই অসুখটা ভালো করে দাও। তাঁর নাম গুণগান করতে পাই না।'

শোনো, কী অদ্ভুত কথা। আমাকে ভালো করে দাও—যেন ঈশ্বর-কথা বলতে পারি। যদি একটা দিনেরও আয়ু পাই, তবে সেদিনেও শুধু ঈশ্বরকথা কইবো।

'যতোক্ষণ আমি আমি করছো ততোক্ষণ যন্ত্রণা', বলছেন রামকৃষ্ণ, 'যেই তুমি তুমি করলে, সমস্ত যন্ত্রণা সঙ্গীত হয়ে যাবে। এই দেখো না, গরু যতোক্ষণ হাম্বা হাম্বা বা হাম-হাম করে ততোক্ষণ তার দুঃখ। গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, সমস্তদিন তাকে লাঙল দিতে হয়। পিটুনি সইতে হয় রাখালের হাতে। তারপর তাকে কসাইরা কাটে। চামারে চামড়া নিয়ে জুতো তৈরী করে। অবশেষে নাড়িভুঁড়ি থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির হাতে পড়ে যখন সে তাঁত তুহুঁ তুহুঁ—তুমি তুমি করে তখনই নিস্তার। অর্থাৎ যখন মানুষ বলে আমি নই, আমি কেউ নই, হে ঈশ্বর তুমিই কর্তা তুমিই সমস্ত তখনই তার যন্ত্রণার অবসান।'

ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু ধুনুরির হাতে পড়া চাই।'

আশ্চর্য, ডাক্তারও তবে ধুনুরির হাতে ধরা পড়বার কথা ভাবে !

বর্ষার রাত, তিনটের সময় ঘুম ভেঙে গিয়েছে ডাক্তারের ! ভাবনা ধরেছে, রামকৃষ্ণের ঘরের জানলা বন্ধ আছে কিনা। নাকি খোলা জানলায় নতুন করে ঠাণ্ডা লাগলো ?

ভোর হতেই খোঁজ নিতে চলে এসেছেন ডাক্তার।

নরেনও এসেছে। রামকৃষ্ণ বললেন ডাক্তারকে, 'গান শুনবেন ?'

'না। সেটা তোমার পক্ষে ভালো নয়। তবে যদি ভাব চেপে—'

'না না, আমার আবার ভাব কী !

নরেন গান ধরলো। কিছুক্ষণ শুনেই ঠাকুর অতল ভাব-সমাধিতে ডুবে গেলেন। শরীর নিস্পন্দ, নাকে নিঃশ্বাস নেই, চোখ পাথরের মতো স্থির, নিষ্পলক। যেন একটা জড় কাঠের পুতুল। একবারে বাহ্যশূন্য।

ডাক্তার ঠাকুরের বুকে ষ্টেথিস্কোপ রাখলেন। হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ। নিশ্চল। ষ্টেথিস্কোপ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ডাক্তার।

নরেনের গান চললো : 'এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!'

সত্যি, এ যেন কোনো মানুষেরই মুখ নয়। ঈশ্বরেরই মুখ।

ষ্টেথিস্কোপ গুটিয়ে নিলেন ডাক্তার। মনে স্থির জানলেন ঈশ্বরই মহত্তম বিজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও দুর্গাচরণ নাগ

চলেছে পায়ে হেঁটে। চলেছে তো চলেইছে! কতোদূর থেকে আসছে না-জানি। সমস্ত শরীরে ধুলো। 'দক্ষিণেশ্বর কোথায় বলতে পারেন?' শেষে একজনকে জিগ্যেস করলো।

'সে কি মশাই? দক্ষিণেশ্বর যে আপনি ছাড়িয়ে এসেছেন।'

দুপুর দুটোর সময় মন্দিরে এসে পৌঁছোলো দুর্গাচরণ। সে যখন আট বছরের ছেলে তখন মা মারা যায়। পিসীমা মানুষ করে। রাতে যখন পিসীমা রূপকথার গল্প বলতো তখন জানলা দিয়ে তারা-জ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে দুর্গাচরণ বলতো আমি ওই দেশে যাবো পিসীমা, আমাকে ওখানে নিয়ে চলো।

যদিও তখন ভর-দুপুর, দুর্গাচরণের মনে হলো, এটাই বুঝি তারা-জ্বলা আকাশের ওপারে সেই রূপকথার রাজ্য!

'হ্যাঁ মশাই, এখানে একজন সাধু থাকেন?' একজন দাড়িওয়ালা লোককে জিগ্যেস করলো দুর্গাচরণ।

দাড়িওয়ালা লোক আর কেউ নয়, প্রতাপ হাজরা। তার শুধু পাটোয়ারী বুদ্ধি।

বললো, 'হ্যাঁ, একজন আছেন বটে, কিন্তু আজ তো এখানে নেই।'

'নেই?' বসে পড়লো দুর্গাচরণ : 'কোথায় গিয়েছেন?'

'চন্দননগরে। কবে ফিরবেন ঠিক নেই। তুমি আরেকদিন এসো।'

অবসন্ন পায়ে হৃতসর্বস্বের মতো আবার কলকাতা ফিরে চলা! তারা-জ্বলা আকাশ বুঝি এক ফুঁয়ে অন্ধকার হয়ে গেলো।

'ও মা, ওই দেখো ঘরের ভিতর থেকে হাতছানি দিয়ে কে ডাকছে! আর কে! ওই বুঝি তার মনের মানুষ!

প্রতাপ হাজরাকে উপেক্ষা করে সটান ঘরে ঢুকে পড়লো দুর্গাচরণ। দেখলো, ছোটো তক্তপোশটির উপর পা ছড়িয়ে বসে আছেন রামকৃষ্ণ।

প্রতাপ হাজরা লোককে বেশী ঘেঁষতে দিতে চায় না। পাছে আর কেউ তার বরাদ্দে ভাগ বসায়। কিন্তু ঠাকুর যাকে ডাকেন তাকে আটকায় প্রতাপের সাধ্য কী!

দুর্গাচরণ ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলো।

রামকৃষ্ণ পা সরিয়ে নিলেন।

'তুমি তো ডাক্তার।'

'হ্যাঁ, ক্যাম্বেলে ক'দিন পড়ছিলো দুর্গাচরণ। কলেজ ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথি করছে। বিস্তর নাম ডাক।

'ডাক্তারের ধর্মলাভ হওয়া কঠিন।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'এক ফোঁটা ওষুধেই যদি মন পড়ে থাকে, তাহলে কী করে এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হবে!'

দরকার নেই আমার ধর্মলাভে। দুর্গাচরণ মনে মনে বললো। যে তোমার চরণস্পর্শ লাভ করতে পারলো না কী হবে তার বিরাটের ধারণা নিয়ে!

'শোনো, তুমি সংসারেই থাকবে, গৃহই তোমার পীঠস্থান। কিন্তু কী রকম থাকবে বলো তো?' রামকৃষ্ণ স্মিতমুখে বললেন, 'থাকবে পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকাল মাছ পাঁকের মধ্যে ডুবে আছে কিন্তু গায়ে পাঁকের স্পর্শলেশ নেই! তেমনি সংসারে থাকো কিন্তু তার ময়লা যেন না লাগে।'

তোমার পায়ের স্পর্শটুকুই পেলাম না, কী করে আমার ময়লা কাটবে? অন্তরের নির্জনে বসে নীরবে কাঁদতে লাগলো দুর্গাচরণ।

'আচ্ছা, তুমি তো ডাক্তার, তবে দেখো তো আমার পায়ে কী হয়েছে!' রামকৃষ্ণ পা দু'খানি বাড়িয়ে ধরলেন।

কাছে সরে এলো দুর্গাচরণ। স্পর্শ করা বারণ, তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। কুণ্ঠিতের মতো বললো, 'কই, কোথাও তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!'

রামকৃষ্ণ হাসলেন: 'আহা, ভালো করে দেখো না, কী হয়েছে?'

এতোক্ষণে তবে বুঝলো দুর্গাচরণ। পা দু'খানি চেপে ধরলো মাথা লুটিয়ে দিলো পায়ে। অন্তর্যামী মনের কান্না শুনতে পেয়েছেন। অহঙ্কার অশ্রুতে দ্রবীভূত হলেই পরমপদ লাভের যোগ্যতা আসে।

দুর্গাচরণ ওষুধের বাক্স আর চিকিৎসা-প্রণালী বই ফেলে দিলো গঙ্গায়।

কী করে চলবে তবে?

ভগবান চালাবেন। তাঁর রাজ্যে কিছুই অচল নেই।

বাড়ির লাউগাছটার কাছে গরু বাঁধা। দড়িটা ছোটো, তাই আকণ্ঠ চেষ্টা করেও গাছের নাগাল পাচ্ছে না। গরুটার ক্ষুধার্ত দুই চোখে লোলুপ কাতরতা। ও মা, খাবি, খেতে সাধ গিয়েছে? নে খা, মনের সাধ মিটিয়ে খা। দড়িটা খুলে দিলো দুর্গাচরণ। মুহূর্তে গাছটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

জেলে মাছ বেচতে এসেছে, কই মাগুর সিঙ্গি। কাছেই এই পুকুরের মাছ মশাই, জ্যান্ত, দেখুন লাফাচ্ছে চুপড়িতে। আনন্দে লাফাচ্ছে, না, যন্ত্রণায় ছটফট করছে? সমস্ত মাছ কিনলো দুর্গাচরণ। মুহূর্তমাত্র দেরী না করে মাছগুলি পুকুরে ছেড়ে দিয়ে এলো। জেলে তো থ! দাম আর চুপড়ি যেই ফিরে পেলো অমনি ছুট দিলো ঊর্ধ্বশ্বাসে।

একটা গোখরো সাপ বেরিয়েছে উঠোনে। মারো—মারো, সবাই ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে উঠলো। শুধু দুর্গাচরণ নির্বিচল। বললো, বনের সাপে খায় না,

মনের সাপে খায়। যদি ওর অনিষ্ট ইচ্ছা না করো, ও-ও করবে না কিছু অনিষ্ট। যেমন দেবে তেমনি পাবে।'

নাগরাজ! নাগরাজ! সাপকে ডাকতে লাগলো দুর্গাচরণ।

'আসুন আমার সঙ্গে। জঙ্গলে থাকেন, কেন এই ক্ষুদ্র মানুষের ঘরে পদার্পণ করেছেন? এখানে আপনার মর্যাদা কে বোঝে?'

ঠাকুর গৃহে থাকতে বলেছেন, কী মনোরম গৃহই দিয়েছেন! চারখানা ঘর, তার মধ্যে তিনখানারই ছাদ ফুটো। অঢেল বর্ষা নেমেছে, যে ঘরখানা নিটুট সে ঘরেই সস্ত্রীক থাকে দুর্গাচরণ। হঠাৎ দু'জন অতিথি এসে উপস্থিত। খাওয়ানো না হয় হলো কিন্তু রাত্রে শুতে দিই কোথায়?

স্ত্রী একবার তাকালো স্বামীর দিকে।

দুর্গাচরণ বললো, 'যে ঘরখানা আমাদের তাই ওদেরকে ছেড়ে দেবো। আজ তো আমাদের মহাভাগ্য। অতিথি-নারায়ণের সেবায় আমাদের ঘুম আর আরাম উৎসর্গ করতে পারছি।'

পেটে শূলব্যথা উঠেছে, ঘরে পড়ে আছে দুর্গাচরণ, আট-দশজন অতিথি এসে হাজির। বাজারে বেরোতে হয়, নইলে অতিথি-সৎকার হয় কি করে? এদিকে ব্যথার যে কমতি নেই। ব্যথা নিয়েই বেরিয়ে পড়লো দুর্গাচরণ।

আট-দশজনের বাজার, প্রকাণ্ড বোঝা হয়ে দাঁড়ালো। একটা মুটে ডাকলেই তো হয়। সর্বনাশ? নিজের বোঝা অন্যকে দিয়ে বয়াবো? কখনো না। মুটে না ডেকে নিজেই সে মোট মাথায় তুললো দুর্গাচরণ! কিন্তু কতোদূর যাবে? পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললো, 'খুব তো সংসারাশ্রম করতে বলেছো। অতিথি-নারায়ণের সেবা করতে দিচ্ছো কই?'

ব্যথার উপশম হলে মোট মাথায় নিয়ে ফের চলতে লাগলো দুর্গাচরণ। বাড়ি পৌঁছে তার আবার কান্না: 'আপনাদের কাছে আমি অপরাধী হয়ে রইলাম। আপনাদের সেবার কতো দেরী হয়ে গেলো।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'যে সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ডাকে, ঈশ্বরের সেবা

করে, সেই বীরভক্ত। যে সংসার ত্যাগ করেছে সে ঈশ্বরকে ডাকবে, ঈশ্বরের জন্যে করবে তাতে বাহাত্বরি কী! যে সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ডাকে ঈশ্বরকে ধরে সেই বাহাত্বর সেই বীরপুরুষ।'

ত্বর্গাচরণ সেই বীর।

পাটের কলের ত্বটো সাহেব গ্রামে পাখি মারতে এসেছে। ত্বর্গাচরণ ছুটে গিয়ে তাদের বললো, 'পাখি আপনাদের কী করেছে? ওদের মারবেন না বলছি।'

রুক্ষসূক্ষ্ম পাগলের মতো দেখতে। এর কথা কে গ্রাহ্য করে! একটা সাহেব পাখির দিকে তাক করলো বন্দুক।

খপ করে বন্দুক ধরে ফেললো ত্বর্গাচরণ। কী স্পর্ধা, সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো বন্দুকের গুলী পাখিকে নয়, তোমাকেই বিদ্ধ করবে, দেখো। কিন্তু সাধ্য কি, ত্বর্গাচরণের মুঠোর থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেয়। রোগা লিকলিকে শরীরে এখন শত সিংহের শক্তি। ধস্তাধস্তিতে সাহেব তাকে কিছুতেই টলাতে পারছে না। দ্বিতীয় সাহেবটা এলো প্রথমের সাহায্যে। তবুও নয়। ত্বর্গাচরণ বন্দুক কেড়ে নিয়ে চললো বাড়ির দিকে। বাড়ি এসে জলে হাত ধুয়ে ফেললো। কী ভীষণ প্রাণঘাতী অস্ত্র স্পর্শ করেছি!

নিজের উপরেও তার নিষ্ঠুরতা কম নয়।

জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে বলে নিজে মিষ্টি বা নুন খায় না। ত্বর্গাচরণ কিন্তু পরকে খাওয়ায় সাধ্যমতো। তার বাসার অর্ধেকটায় এক চালের আড়তদার থাকে। তার আড়তে কুঁড়ো জমে থাকে। তাই ত্বর্গাচরণ কুড়িয়ে নিয়ে এসে গঙ্গাজল মাখিয়ে খায়। শুধু আহার আর আস্বাদ নিয়েই যদি থাকবো, তবে কখন ডাকবো ভগবানকে? কুঁড়ো খেয়ে দিব্যি হাল্‌কা আছি।

আর যাই করো পরনিন্দা করো না। শুনোও না পরনিন্দা। আর গুরুনিন্দা শোনা তো মহাপাতক।

অসতর্কে কাউকে হঠাৎ নিন্দা করে ফেলেছে, অমনি আত্মপীড়ন শুরু হয়ে গেলো। আর নিন্দে করবি? রাস্তা থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে এনে ঘা মারতে লাগলো কপালে। বল, আর অবাধ্য হবি? কপাল

ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। সে যেমন পাজী তার তেমনি শাস্তি হওয়া দরকার।

কে একজন রামকৃষ্ণের নিন্দে শুরু করেছে।

'থামুন বলছি, ও-সব মিথ্যে কথা।' দুর্গাচরণ প্রথমটা তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করলো।

নিন্দুকের রসনা আরো লেলিহান হয়ে উঠলো।

'এ বাড়িতে বসে এসব নিন্দাবাদ করতে পারবেন না বলছি।' দুর্গাচরণ হুমকে উঠলো : 'এই কানে শুনতে পারবো না গুরুনিন্দা।'

গালাগালেরও একটা নেশা আছে। নিন্দুক তাই নিরস্ত হলো না।

'বেরোও, বেরোও তুমি এখান থেকে। নইলে মহা বিভ্রাট হবে বলে দিচ্ছি।'

কে কার কথা শোনে। লোকটার মাথায় ভূত চেপেছে। নিন্দার গলা সে আরো উঁচু করলো।

'তবে রে—' নিজের পায়ে তো জুতো নেই, ওই লোকটারই পায়ের জুতো কেড়ে নিয়ে লোকটাকে পিটতে লাগলো দুর্গাচরণ। 'বেরোও, বেরোও আমার সুমুখ থেকে।'

চলে যেতে যেতে লোকটা শাসিয়ে গেলো, 'আচ্ছা, দেখে নেবো তুমি কেমনতরো সাধু। পাবে এর প্রতিফল।'

দুর্গাচরণ ঘন ঘন ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করতে লাগলো। ঠাকুর, কেন, কেন তুমি আমাকে গৃহস্থ হতে বললে ? সন্ন্যাসী হলে তো আমি নিষ্ক্রিয় ও নির্বিচল হতে পারতাম। গৃহস্থ হওয়ার জন্যই তো আমার এই যন্ত্রণা। প্রতিবেশীর নিন্দা শুনতে হয়, করতে হয় ক্রুদ্ধ প্রতিকার। তারপর আবার প্রতীক্ষা করতে হয় দোর্দণ্ড প্রতিফলের।

মুহূর্তে কী ভোজবাজি হয়ে গেলো কে জানে, লোকটা দেখি একাই ফিরে আসছে। লাঠি সোটা নিয়ে নয়, দু'টি হাত জোড় করে। দুর্গাচরণের কাছে বসে দীনবচনে বললো, 'আমাকে ক্ষমা করুন।'

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ ! আনন্দে দুর্গাচরণ লাফিয়ে উঠলো।

'আরে—বসুন বসুন, উঠছেন কেন ? এতোবড়ো একজন গণ্যমান্য লোক আপনি অমনি কি ফিরে যেতে আছে ? তামাক খেয়ে যান।' দুর্গাচরণ তামাক সাজতে বসলো।

ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললো, 'আমাকে তোমার সেবার কাজে লাগাও।'

রামকৃষ্ণ তাকে নানা ফরমাশ খাটাতে লাগলেন। ওরে, হাওয়া কর, পা টিপে দে, তামাক সাজ, গামছা আর বটুয়া নিয়ে আয়, গাড়ুতে জল ভর, নিয়ে চল ঝাউতলায়।

দুর্গাচরণ এক পায়ে খাড়া।

আমাকে আরও বড়ো কাজে লাগাও। একটা কঠিন কিছু করি। রামকৃষ্ণের তখন অসুখ, তারই শয্যায় দুর্গাচরণ তাঁর গা ঘেঁষে বসেছে। মতলব, ঠাকুরের ব্যাধি নিজের শরীরে আকর্ষণ করে নেবে।

ঠাকুর জানেন, সে ক্ষমতা আছে দুর্গাচরণের ! তাই তাকে তিনি বারে-বারে নানা কাজের ছুতোয় দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। অসুখ ভালো করবার জন্য যিনি কালীর কাছে, তাঁর মার কাছে পর্যন্ত প্রার্থনা করতে চান না, তিনি সেই ব্যাধি ভক্তদেহে সঞ্চারিত করবেন, এ অসম্ভব।

তবু দুর্গাচরণের আপ্রাণ চেষ্টা।

দেওয়া কাজ পলকে শেষ করে আবার ঠাকুরের গা ঘেঁষে বসেছে। সান্নিধ্যে ঘণতর হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ তখন বললেন, 'দুর্গাচরণ, আমার জন্যে আমলকী আনতে পারো—টাটকা আমলকী ?'

সেটা শ্রাবণ মাস, আমলকীর সময় নয়। কিন্তু ঠাকুর যখন চেয়েছেন তখন সন্দেহ কী, অকাল ফলোদয় হবে। দুর্গাচরণ বেরিয়ে পড়লো আমলকীর খোঁজে। বিশল্যকরণীর খোঁজে। বিশল্যকরণীর খোঁজে মহাবলী মহাবীর।

স্নান নেই, আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিশ্রাম নেই ; তিনদিন পরে, কোত্থেকে কে জানে, আমলকী নিয়ে এলো দুর্গাচরণ।

আমলকী পেয়ে ঠাকুরের সে কী আনন্দ !

ঈশ্বরের কৃপাশক্তিতেই জীবনে ফলবে এ আমলকী। ঘটবে অকাল ফলোদয়।

তাই ঈশ্বরকে ধরে থাকো। নিরন্তর ঈশ্বরকথা বলো। আর সব কথার ইতি আছে। ঈশ্বরকথার ইতি নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

নদীতীরে বসে এক সাধু সাধন করছে। হঠাৎ চোখ পড়ল জলের দিকে। দেখলো একটা বৃশ্চিক জলে পড়েছে। পারে আসবার জন্য চেষ্টা করছে, কিন্তু স্রোত ঠেলে এগুতে পারছে না। আশ্রয়চ্যুত অসহায়ের মতো হাবুডুবু খাচ্ছে। স্থলের জীব পড়েছে জলের অগাধে। সাধুর মায়া হলো। ভাবলো, আহা, ওকে বাঁচাই, আশ্রয় দিই ওকে।

হাতে করে জল থেকে তুললো তাকে ! তোলা মাত্রই বৃশ্চিক তাকে দংশন করলো। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলো না।

চক্ষের নিমিষে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সাধু বিছেটাকে ছুঁড়ে দিলো জলে। কি অকৃতজ্ঞ ! দয়াপরবশ হয়ে আশ্রয় দেবার জন্য তুললাম জল থেকে, আর আমাকেই কিনা কামড়ালো ! দীনমনা আর কাকে বলে !

আবার দৃষ্টি পড়লো জলের দিকে। দেখলো, জল থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য বৃশ্চিক প্রাণপণে চেষ্টা করছে। কিন্তু তরঙ্গসঙ্কুল নদীর সঙ্গে পেরে ওঠে তার সাধ্য কি।

সাধুর আবার দয়া হলো। আবার হাত বাড়িয়ে তুললো বিছেটাকে।

ক্রূরাত্মা বৃশ্চিক আবার দংশন করলো সাধুকে। অসহ্য ! যেন একটা তপ্ত লোহার শলা হাতের মধ্যে কে গুঁজে দিলো। চক্ষের পলকে বিছেকে

আবার জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিলো সাধু। বিছের আবার জলে পড়ে প্রাণসংশয় হলো।

তখন সাধু ভাবলো, এ আমি কি করছি? বৃশ্চিক আমার চেয়ে বড়ো সাধু। সে-ই স্থিরব্রত, স্বধর্মনিষ্ঠ। সে বারে বারে তার ধর্ম পালন করছে। উপকারীর করতলকেও সে রেহাই দিচ্ছে না। আর আমি কি করছি? আমি বারে বারে আমার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছি। আমি সাধু, সর্বজীবে দয়া করাই আমার সাধুতা। উপকৃতই হই বা অপকৃতই হই—সর্বাবস্থায় দয়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকাই আমার কর্তব্য। কেন আমি বৃশ্চিককে বারে বারে জলে ছুঁড়ে দিচ্ছি? আগুন কি তার উত্তাপ বা ঔজ্জ্বল্য ত্যাগ করে? জল কি ত্যাগ করে শৈত্য বা তারল্য? আমি যদি দয়া বিসর্জন দিই তবে আমি কিসের সাধু?

জল থেকে সাধু আবার তুললো বৃশ্চিককে। যেমন-কে-তেমন বৃশ্চিক আবার দংশন করলো। এবার আর সাধু তাকে ফেললো না ছুঁড়ে। যন্ত্রণায় হাত ছিন্ন হয়ে গেলেও নির্বিচল রইলো। ধীরে ধীরে তাকে নামিয়ে দিল মাটিতে। নিরাশ্রয়কে দিলো তার নিরাপদ বসতি। বিপদ-বদ্ধকে অবাধগমন।

দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডল হরণ করবেন ঠিক করেছেন। হরণ করতে কি আর পারবেন? তাই ভেবেছেন ভিক্ষা চেয়ে নেবেন।

পাণ্ডবদের প্রিয়সাধন করতে তৎপর হয়েছেন ইন্দ্র। অর্জুন যে তাঁর প্রিয়তম।

ইন্দ্রের সঙ্কল্প জানতে পেরেছেন সূর্যদেব। ইন্দ্রের নাম যদি সহস্র-লোচন, সূর্যের নাম সহস্ররশ্মি।

সত্যপরায়ণ মহাবীর কর্ণের কাছে উপস্থিত হলেন দিবাকর।

'আমার হিতকথা শোনো।' বিভাবসু বলতে লাগলেন স্নিগ্ধস্বরে, 'তোমার স্বভাবের কথা জানতে পেরেছে সুররাজ।'

'আমার স্বভাবের কথা?' কর্ণ চমকে উঠলো।

'হ্যাঁ, তুমি কারু কাছে কিছু প্রার্থনা করো না অথচ তোমার কাছে যে যা চায় তাই বিলিয়ে দাও অকাতরে।'

প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে হাসতে লাগলো কর্ণ।

'তোমার এই স্বভাবের কথা জানতে পেরে ইন্দ্র তোমার থেকে তোমার কবচকুণ্ডল চেয়ে নিতে আসবে। খরবদার, তুমি কিছুতেই দেবে না। তোমার পরাভব ও অর্জুনের জয়ই তার কাম্য। শুধু পরাভব কেন, কবচকুণ্ডল থেকে বিচ্যুত হলে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ধনরত্ন ও অন্যান্য পার্থিব সম্পদ দিয়ে পুরন্দরকে নিবারিত করবে।'

'ব্রাহ্মণবেশে আপনি কে?' কর্ণ প্রশ্ন করলো।

'আমি মরীচিমালী সূর্য। তোমার পরম সুহৃদ। আমার কথা শোনো। আমার কথা রাখলে তোমার শ্রেয়োলাভ হবে।'

কর্ণ প্রণত হলো। বললো, 'আমি যদি আপনার প্রীতিভাজন তবে কেন আপনি আমাকে আমার ব্রত থেকে পরাঙ্মুখ করতে চান? কেন আমি আমার স্বধর্ম থেকে স্খলিত হবো? দেবরাজ ইন্দ্র যদি পাণ্ডবদের হিতকামনায় কবচকুণ্ডল ভিক্ষে করেন আমি তাঁকে তা দিয়ে দেবো।'

মূর্খ, না উন্মত্ত! সূর্য ধিক্কার দিয়ে উঠলেন: 'কবচকুণ্ডল আছে বলেই তুমি যুদ্ধে অবধ্য। ও দিয়ে ফেললে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।'

'হোক মৃত্যু।' কর্ণ বললো গম্ভীর স্বরে, 'অকীর্তিকর জীবনের চেয়ে যশস্কর মৃত্যুই শ্রেয়। মৃত্যুর ভয়ে আমার ত্রিভুবনসঞ্চারিণী কীর্তিকে ম্লান হতে দেবো না।'

সূর্য বিদ্রূপ করে উঠলেন, 'মৃত ব্যক্তির আবার কীর্তি কি! সে কি করে জানতে আসছে তার কীর্তির কথা। একমাত্র জীবিতাবস্থায়ই কীর্তি উপভোগ্য। সুতরাং যাতে বেঁচে থেকে কীর্তি আস্বাদ করতে পারো তার উপায় দেখো। শত্রুনিপাত করে যুদ্ধবিজয়ই পরম কীর্তি। শোনো, সন্নিহিত হলেন দিবাকর, 'হয় অকর্ণ নয় অনর্জুন, এই তো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ কথা। কেন অকারণে প্রাণ দান করবে। তুমি যদি কবচকুণ্ডল সম্পন্ন থাকো দেবরাজ ইন্দ্রের শত সাহায্য পেলেও স্পর্ধিত অর্জুন তোমাকে পরাস্ত

করতে পারবে না। আমার উপদেশ শোনো। রমণীয় মধুর বাক্যে ইন্দ্রকে তৃপ্ত করে বিদায় দিয়ে দিও। কদাচ কুণ্ডলকবচ খুলো না গা থেকে। খুললেই মৃত্যু।'

বিচলিত হলো না কর্ণ। বললো, 'মৃত্যুর চেয়েও বেশি ভয় করি মিথ্যাকে। যখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যাচক কখনো প্রত্যাখ্যাত হবে না আমার কাছে, তখন সে সত্য আমি জীবনপণে পালন করবো। অর্জুনের কথা ভেবে কেন আপনি এমন উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। আমি দ্রোণাচার্য ও জামদগ্ন্যর থেকে যে অস্ত্র পেয়েছি অর্জুনকে পরাস্ত করতে তাই যথেষ্ট।'

মোটেই নিরুদ্বেগ হতে পারলেন না ভাস্কর। বললেন, 'কিন্তু কবচকুণ্ডল থাকলেই সে-সব অস্ত্র কার্যকরী হবে। একমাত্র কবচকুণ্ডলেই শত্রুঘাতিনী অমোঘ শক্তি নিহিত। তাই তো তা হরণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন দেবরাজ।'

তবু কর্ণের এতোটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। বললো, 'ভগবন, শরীর অচিরস্থায়ী। শরীরের সঙ্গে সহজাত যে কবচকুণ্ডল তাও ক্ষণভঙ্গুর। আমি যদি ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্যের বিনিময়ে চিরস্থায়িনী কীর্তি লাভ করতে পারি সে সুযোগ আমি ছাড়ি কেন? আমার ব্রত ভঙ্গ করতে আদেশ করবেন না। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যদি আমার জীবন প্রার্থনা করেন, তাও আমি তাঁকে দিয়ে দেবো অকাতরে। আমার সত্য থেকে আমার সঙ্কল্প থেকে আমি ভ্রষ্ট হবো না কিছুতেই।'

এই হচ্ছে স্বধর্মে নিয়ত স্থিত থাকা। সূর্য চন্দ্র টলুক, আমি টলছিনে। এই বসলাম আমার আসনে, শরীর শুষে যাক, কঙ্কালীকৃত হোক, তবু আমার সাধনফল উদ্ধার না করে উঠবো না। এই বেরুলাম যাত্রায়, মৃত্যুদুঃখবন্ধুর দুর্গম পথে, অমৃতকে আবিষ্কার না করে থামবো না।

সেই দুর্বার যাত্রীই বিবেকানন্দ।

প্রথমে চলে এলো কাশী। এখানেই এসেছিলেন বুদ্ধদেব, এখানেই এসেছিলেন শঙ্করাচার্য। কতো ধর্মপ্রচার করে গিয়েছেন। এখানকার স্পর্শ না নিয়ে গেলে যাত্রা শুদ্ধ হবে না।

একদিন ফিরছে দুর্গাবাড়ি থেকে, কতকগুলি বাঁদর জোট বেঁধে বিবেকানন্দকে তাড়া করলো। ভয় পেয়ে ছুটতে লাগলো স্বামীজী। ভাবলো। পলায়নেই বুঝি মুক্তি।

কে সহসা হুঙ্কার করে উঠলো : 'থামো, পালিয়ো না। রুখে দাঁড়াও ওদের সামনে।'

বিবেকানন্দ তাকিয়ে দেখলো কে একজন সন্ন্যাসী তাকে উপদেশ দিচ্ছে। সাহসে ভর করে রুখে দাঁড়ালো বিবেকানন্দ। বানর দলের মুখোমুখি হলো। আর যায় কোথা! উদ্ধত-উদ্যত ভঙ্গি দেখে বানরের দল চম্পট দিলো।

পরবর্তীকালে ন্যুইয়র্কে এক সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে স্বামীজী বলেছিলো : 'দাঁড়াও জীবনের মুখোমুখি। অজ্ঞানের সম্মুখীন হও। অবিদ্যার সম্মুখীন হও। দাঁড়াও বুক ফুলিয়ে, পালিয়ে যেও না। যেও না পাশ কাটিয়ে।'

কাশী থেকে অযোধ্যা হয়ে আগ্রায় এসেছে বিবেকানন্দ। আগ্রা থেকে বৃন্দাবন। সমস্ত রাস্তা পায়ে হেঁটে এসেছে। পকেটে একটা কানাকড়ি পর্যন্ত নেই। পথে যা ভিক্ষে জুটেছে তাই খেয়েছে। সব দিন জোটেওনি। ঘুমিয়েছে এখানে-সেখানে, কখনো বা খোলা মাঠে, উদার-উদ্‌ঘাটিত তারকা-আকীর্ণ আকাশের নীচে।

কোথায় চলেছি কে জানে! শুধু এইটুকু জানি ফিরে যাওয়া নেই। নেই থেমে পড়া।

গাছতলায় বসে কে একটা লোক তামাক খাচ্ছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। লোকটার মুখে প্রগাঢ় তৃপ্তির শান্তি। শ্রমবিমোচনের আরাম।

খানিকক্ষণ তার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো স্বামীজী। আহা, এক ছিলিম যদি তামাক পেতাম এ সময়। কতো দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছি, পায়ের দড়ি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছে। কলকেতে যদি দিতে পারতাম একটা সুখটান, পথশ্রম ধুয়ে মুছে যেতো। চাঙ্গা হয়ে উঠতাম মুহূর্তে।

'ভাই, তোমার কলকেটা একটু দেবে? একটা টান দিই—'

ত্রস্ত-লজ্জিত হলো লোকটা। কুণ্ঠিত হয়ে বললো, 'মহারাজ, আমি ভাঙ্গি, আমি মেথর—'

প্রসারিত হাত গুটিয়ে নিলো স্বামীজী। মেথরের উচ্ছিষ্ট কলকে কি করে মুখে দেয়! আরামের মুখে ছাই দিয়ে ফিরে চললো। এগিয়ে চললো। শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে আরো কতো পথ চলতে হবে তার ঠিক কি।

খানিকটা এগিয়ে এসে থেমে পড়লো বিবেকানন্দ। একি, আমি সন্ন্যাসী না? আমি না সমস্ত সংসারশৃঙ্খল ছিন্ন করেছি? আমার না সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শনের কথা? তবে কেন মেথর জেনে ওর কলকেতে আমি মুখ দিতে পারলাম না? আজও আমার জাতের গর্ব—আভিজাত্যের মোহ! ওই মেথর কি ব্রহ্মের প্রতিভাস নয়? ও কি নয় আমার প্রভুর প্রতিভূ। ওকে অবজ্ঞা করে এ আমি কোথায় চলেছি, কোন্ মানবপ্রেমের তীর্থসত্রে?

ফিরলো বিবেকানন্দ। দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে এলো সেই মেথরের কাছে! বললো, 'শীগগির আমাকে এক ছিলিম তামাক সেজে দাও।'

'মহারাজ, আমি যে মেথর—'

'কে বললো? তুমি নারায়ণ। দাও, শীগগির দাও। ধোঁয়ার অন্যে আমার আকণ্ঠ শুকিয়ে গেছে।'

কোনো আপত্তিতেই ঠেকানো গেলো না। অগত্যা ভরাট করে তামাক সেজে দিলো। পূর্ণ তৃপ্তিতে তাই টানতে লাগলো স্বামীজী।

রসকে মেথর ছিলো দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির ঝাড়ুদার। তার সঙ্গে পঞ্চবটীর কাছে একদিন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। কোমরের গামছাখানা খুলে গলায় জড়িয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলো।

ঠাকুর জিগ্যেস করলেন, 'কিরে রসিক, ভালো আছিস তো?'

করজোড়ে রসিক বললো, 'আমাদের আবার ভালো থাকা! আমরা মেথর, হীন জাত, হীন কর্ম করি—'

ঠাকুর ফোঁস করে উঠলেন; 'হীন কর্ম? কর্ম কি কখনো হীন হয়? স্বয়ং নারায়ণ ঝাড়ুদার সেজে তোর দুই হাত দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের দরবার ঝাঁট দিচ্ছেন—বল্, নারায়ণ কি হীন জাত্?'

সে-সব কথা কি বিবেকানন্দ ভুলে গিয়েছে ?

ঠাকুর পরীক্ষা করে দেখছেন। পরীক্ষা করে দেখছেন পূর্ব সংস্কার দূরীভূত হয়েছে কিনা, জাতিবর্ণের পরপারে চলে গিয়েছে কিনা।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বিবেকানন্দ।

আলোয়ারে পণ্ডিত শম্ভুনাথের বাড়িতে আছে বিবেকানন্দ। এক ভক্ত মুসলমান এসে হাজির। স্বামীজীর দর্শন চাই।

আমিও জ্ঞানী, তুমিও জ্ঞানী—লেগে যাবে তর্ক, লেগে যাবে ঠোকাঠুকি, যেন ইঁটে-ইঁটে সঙ্ঘর্ষ। কিন্তু আমিও ভক্ত, তুমিও ভক্ত, কোনো বিবাদ নেই, বিরোধ নেই। আমিও একতাল কাদা, তুমিও একতাল কাদা। কাদায়-কাদায় সমন্বয়।

মৌলভী সাহেবের শুধু দর্শনে সুখ নেই, তার ইচ্ছে স্বামীজীকে সে খাওয়ায় নিজের হাতে।

প্রস্তাব করতেও ভয় করে। পণ্ডিতজী অন্তত তেড়েফুঁড়ে উঠবেন। বাড়ির বার করে দেন কিনা তারই বা ঠিক কি।

তবু উপায় নেই, অন্তরের ব্যাকুলতার কথা বলতেই হবে খুলে। যার আশ্রয়ে স্বামীজী আছেন তাকেই বলতে হয়।

'আমার বড়ো সাধ,' হাতজোড় করে আতঙ্কজড়িত কণ্ঠে বললো মৌলভী, 'স্বামীজীকে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভিক্ষে দিই।'

জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকালো একবার শম্ভুনাথ। সেই চাহনিতে করাল কটাক্ষ ঝলসে উঠলো কিনা কে জানে।

'নতুন হাঁড়ি-বাসন কিনে আনবো বাজার থেকে। বামুন দিয়ে রান্না করাবো।'

প্রতিপক্ষের তবু যেন কোনো চাঞ্চল্য নেই। মৌলভীর মনে হলো আরো কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে হয়তো। বিনয় বিগলিত স্বরে বললো, 'আমার রসুই ঘরে রান্না করবো না। বৈঠকখানা ঘরের সব জিনিসপত্র সরিয়ে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নেবো। সেইখানে বামুন দিয়ে নতুন উনুন পাতিয়ে

রান্নার আয়োজন হবে। আহা, স্বামীজী খাবেন, আর আমি দূরে দাঁড়িয়ে—অনেক দূরে দাঁড়িয়ে—তাই দেখবো।'

'কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে না। বিবেকানন্দ বললো প্রসন্ন মুখে: 'খাবো আপনার বাড়ি। কিন্তু কবে? দেখবেন যেন দেরি করে ফেলবেন না—'

'না না, কাল—কালই সব আয়োজন করবো। আনন্দসাগরে ভাসতে-ভাসতে বললো মৌলভী সাহেব।

'আপনি যা সব ব্যবস্থা করছেন,' শম্ভুনাথ পণ্ডিত বললো, 'আমার নিজেরই খেতে সাধ হচ্ছে।

'ঠাকুর বলেন, ভক্ত হচ্ছে এক খেয়ার জল। যতোক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানবিচার ততোক্ষণ পর্যন্ত আলের বাঁক, আর ঘুরপথ। কিন্তু বন্যায় যখন মাঠ ভেসে যায় তখন কে আর আলের সন্ধান করে! তখন জল কেটে সোজা বেরিয়ে পড়ো। ভক্তি-ভালোবাসা চলে এলে তখন আবার ভেদবুদ্ধি কি, ভাগ-বণ্টন কি, জাত-বেজাত কি, সব জলে জলময়, সব একজোট, একাকৃতি।

কিন্তু কে কাকে খাওয়ায়? খাদ্যই বা কি, খাদকই বা কে!

ঠাকুর যখন নরেনকে ছুঁয়ে দিয়েছিলেন আর যখন তার চোখের সমুখ থেকে জড়জঞ্জালের পর্দা উঠে গেলো তখন সে দেখেছিলো মর্তের ধূলিকণা থেকে আকাশের নক্ষত্রকণা পর্যন্ত সমস্তই ঈশ্বর। রাত্রে বাড়িতে ফিরে এসে খেতে বসেছে, তন্ময় হয়ে দেখছে ঈশ্বর থালা-বাটি ভাত ডালের মধ্যে বসে আছেন।

নিস্পন্দ হয়ে আছে দেখে মা বললেন, ও কি হাত গুটিয়ে কেন?

যন্ত্রচালিতের মতো খেতে শুরু করলো নরেন। কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করলো, যে খাচ্ছে যাকে খাচ্ছে আর যিনি খাওয়াচ্ছেন সবই সেই ঈশ্বর।

কারু কাছ থেকে ভিক্ষা চাইবো না—বৃন্দাবনে এসে সঙ্কল্প করলো বিবেকানন্দ। বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি—নিজের গোঁয়ে চলে যাবো পথ কেটে। থামবো না, দাঁড়াবো না কারু দুয়ার ধরে।

একে নিদারুণ ক্ষুধা, তার উপর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ধরধরধার বৃষ্টি।

তবু পথ কেটে চলেছে স্বামীজী। হাতে দণ্ড আর কমণ্ডলু। আর বুকের মধ্যে রামকৃষ্ণের অমিয়মূর্তি। হে পরমরমণীয় রাম, হে ত্রৈলোক্যাকর্ষী কৃষ্ণ, ক্ষুধারূপেও যে তুমি, শ্রান্তিরূপেও যে তুমি, অপ্রাপ্তি-অলব্ধিও যে তুমি, দেহপাত হবার আগে তাই আস্বাদন করতে দাও।

'মহারাজ, শুনছেন—'পিছন থেকে কে একজন ডাকলো।

ফিরেও তাকালো না বিবেকানন্দ। সামনে চললো সমানে।

'শুনছেন—'

পিছন ফিরে তাকাবার সময় নেই। পিছনেই মায়া, অবিদ্যা, সংসারবল্লী। সর্ববন্ধন উপেক্ষা করে এগিয়ে চলাই বীরত্ব। কিন্তু পা চলছে না যে। ক্ষুধায় সমস্ত শরীর ঝিমিয়ে আসছে! শুধু ক্ষুধায় নয়, পর্যটনে। শুনিনা, লোকটা কি বলে! কোনো বিপদে পড়েছে বোধহয়! বিপন্ন প্রার্থীর মতোই কাতর কাকুতি। হয়তো সেবা চায়।

প্রভু রক্ষা করো! যখন পিছন ফিরে তাকাবো না বলেছি তখন সন্তানের প্রতিজ্ঞার মান রাখো। প্রার্থনার প্রলুব্ধ করো না। কে বলে পা চলছে না? করুণ মিনতির স্বর যে ক্রমশই এগিয়ে আসছে। বিবেকানন্দ ছুটতে লাগলো।

'শুনছেন—' পশ্চাদ্বর্তী যে মিনতির স্বর, সেও ছুটতে লাগলো।

কি সর্বনাশ, স্বামীজী যতো ছোটে তার চেয়েও জোরে ছোটে সেই পশ্চাদগামী কাকুতি।

প্রায় এক মাইল ছোটবার পর পিছনের লোকটি ধরে ফেললো স্বামীজীকে। পরাস্ত করলো, এগিয়ে এসে দাঁড়ালো সামনে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো, 'মহারাজ আপনার জন্যে খাবার এনেছি।'

স্বামীজীর তো চক্ষুস্থির!

গামছা দিয়ে বাঁধা প্রকাণ্ড খাবারের চ্যাঙাড়ি। নানারকম ভোজ্য-দ্রব্যে বোঝাই।

এ খাবার কে পাঠালো এ আর জিগ্যেস করলো না বিবেকান্দ। তার জানতে বাকি নেই। সে কেঁদে ফেললো।

গাজীপুরে আছে। কলকাতা থেকে খবর এল বলরাম বোস আর নেই। খবর শুনে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো স্বামীজী।

'সেকি, আপনি না সন্ন্যাসী?' কে একজন জিজ্ঞেস করলো।

শোকাবেগ প্রশমিত করে বিবেকানন্দ বললো, 'সন্ন্যাসী বলে কাঁদতে পাবো না?'

'উচিত নয়। হৃদয়কে কঠিন করতে না পারলে সন্ন্যাসী কিসের!'

'যে সন্ন্যাস হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করে সে সন্ন্যাসে ধিক।' জ্বলে উঠলো স্বামীজী : 'বলরাম আমার গুরুভাই। আমরা এক গুরুর চরণতলে বসে পাঠ নিয়েছি। এক বৃক্ষ আমাদের ফল দিয়েছে ছায়া দিয়েছে—' একটু স্তব্ধ হলো বিবেকানন্দ, পরে ফের বললো, 'শুধু বলরামের জন্যে কেন, জগজ্জনের জন্যে আমাকে কাঁদতে হবে। অগণিত জনগণকে যদি আমার আত্মজন বলে অনুভব না করতে পারি, তাদের ব্যথায় ব্যথিত হতে না পারি তবে কিসের ছাই আমার সন্ন্যাসী হওয়া! তুমি কি মনে করো সন্ন্যাসী হয়েছি বলে আমি বিমুখ-বিরস হয়ে থাকবো? নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত? অসম্ভব। অবিশ্যি অভিভূত হবো না সংকল্পভ্রষ্ট হবো না কিন্তু পরের দুঃখে থাকবো উদাসীন হয়ে, দ্রবীভূত হবো না, আমার এ ব্রত নয়। যেখানে পারি তুলে দিয়ে যাবো কাঁটা, যেখানে পারি মুছে দিয়ে যাব অশ্রু—'

এর ক'দিন পরে আবার খবর এলো, স্বামীজী তখন আলমোড়ায়, বোন মারা গিয়েছে। শোকে আবার ভেঙে পড়লো স্বামীজী।

কিন্তু তার তো আত্মবিস্মৃত হবার কথা নয়। সুতরাং পুনরায় রওনা হও। শোক থেকে অশোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, দুর্গম থেকে দুঃসাধ্যে সেই দুর্লভ অথচ দুষ্পরিহরের সন্ধানে।

বাড়ির লোক কি করে আলমোড়ার ঠিকানা পেলো? সুতরাং পদক্ষেপ দ্রুত করো, চলে যাও আরো নির্জনে, গহনে গভীরে, হিমালয়ে প্রস্তর-অরণ্য আশ্রয় করো, সেখানে গিয়ে জাগাও প্রসুপ্তকে, গুহাহিতকে, তোমার অন্তর্নিহিতকে।

কিন্তু বোনের কথাটাও একেবারে ভুলে থাকলে চলবে না! সে

আত্মহত্যা করেছে। সমাজের অনুশাসনে নিগৃহীত নারীত্বের সে একটি মৌন প্রতীক। তারই মধ্য দিয়ে দুর্গত নারীসমাজ প্রতীকার চাইছে তার কাছে। জগজ্জনের যদি দুঃখ বিমোচন করতে না পারি তবে কিসের আমার সন্ন্যাস, আমার সর্বত্যাগ, আমার প্রব্রজ্যা ? সেই সঙ্কল্প আবার মনে পড়লো বিবেকানন্দের। কিন্তু দাঁড়াও, আগে উদ্ধার করে আনি সঞ্জীবনী, সেই আরোগ্য-আয়ুষ্যের মহৌষধ।

গাড়োয়ালের দিকে যাত্রা করলো বিবেকানন্দ। সঙ্গে সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ আর বৈকুণ্ঠ। কর্ণপ্রয়াগে এসে অখণ্ডানন্দ অসুখে পড়লো। স্বামীজীও তার সঙ্গ নিলো। শোক গেলো, এবার বাধা এলো রোগের মূর্তি ধরে। আসুক! বাধাকে উল্লঙ্ঘন করতে না পারবো তো বুকের মধ্যে রামকৃষ্ণ কেন ?

চটীতে বিশ্রাম করি আর ক'দিন। রোগ আপনিই অদৃশ্য হবে।

তাই হলো। সাতদিন পরে আবার যাত্রা রুদ্রপ্রয়াগের দিকে।

এবার রুদ্র দেখা দিলো প্রলয়ঙ্কর জ্বর হয়ে। বিবেকানন্দ আর অখণ্ডানন্দ দু'জনেই ঘায়েল হলো। শয্যা বলতে তো ভূমি, সেই মাটি থেকে ওঠে তাদের সাধ্য কি!

ঠাকুর, আর কি তুমি এগুতে দেবে না? স্পর্শ করতে দেবে না কি সে মহামৌনকে ?

কোথা থেকে কে জানে, গাড়োয়াল জেলার সদর আমিন এসে হাজির! একি, সাধুরা যে মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে? এদের কেউ কি দেখবার নেই? তোলবার নেই?

না, নিশ্চয়ই আছে। তোমাকে তো ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমিনের কাছে কি কবিরাজি ওষুধ ছিলো তাই খেতে দিলো সাধুদের। মন্ত্রবৎ কাজ করলো। উঠে বসলো দু'জনে।

কিন্তু শরীরের এ অবস্থায় পর্বতপর্যটন অসম্ভব। সুতরাং ডাণ্ডি যোগাড় করে দিচ্ছি, শ্রীনগর চলে যাও। সেখানে গিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা ও বিশ্রামে শরীরকে শক্তসমর্থ করো।

যাবো তো, কিন্তু খাবো কি! অসুস্থ দেহ নিয়েই ভিক্ষা করতে হলো পথে-পথে। শুধু চিকিৎসা বিশ্রামেই তো চলবে না, পথ্য চাই। যিনি পথ দিয়েছেন তিনিই কি পথ্য জোগাবেন না?

শ্রীনগরে মাসখানেক থেকে আবার তারা চললো টিহরির দিকে।

'গঙ্গাতীরে আমাকে একটি সাধনার স্থান তৈরী করে দিতে পারেন?' টিহিরিরাজের দেওয়ান রঘুনাথ ভটচাজ্যিকে একদিন জিগ্যেস করলো বিবেকানন্দ।

'পারি।' দেওয়ান রঘুনাথ বললো, 'গণেশ প্রয়াগে চলে যান। গঙ্গা আর ভিলাঙ্গন নদীর সঙ্গমে। সেখানে আপনার জন্যে, নির্জনে, একটি কুটির নির্মাণ করে রেখেছি।'

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো স্বামীজী। মহামৌন এবার বুঝি খুলে দেবে রুদ্ধ দ্বার।

গণেশ প্রয়াগ যাবার সব ঠিকঠাক, অখণ্ডানন্দের আবার অসুখ হয়ে পড়লো। এবার শুধু জ্বর নয়, জ্বরের সঙ্গে ব্রঙ্কাইটিস।

উপায়? ডাক্তার বললো, শীগগির পাহাড় থেকে নেমে যাও নীচে। অন্তত দেরাদুনে।

সমস্ত সংকল্প ভেস্তে গেলো। ঠাকুর, এ তোমার কী বিধান-বাসনা! যখন মনে করি যাবো এবার নীরব গভীরের অতল রাজ্যে, তখনই একটা-না-একটা বাধা এসে উপস্থিত হয়। গুরুভাইদের তুমিই তো আমার হাতে জিম্মা করে দিয়েছো। তাদের অসুখের সময় তাদেরই বা ফেলি কেমন করে?

'আমার গুরুভাই অসুস্থ। তাকে কেউ কি তোমরা একটু থাকবার মতো জায়গা দেবে? খাবার মতো একটু পথ্য?' দ্বারে-দ্বারে প্রার্থনা করতে লাগলো স্বামীজী।

কেউ প্রতিধ্বনিও করে না।

অনেক ঘোরাঘুরির পর পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ নামে এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের দরজা খোলা পেলো! ব্রাহ্মণ ভার নিলো সেবাশুশ্রূষার।

'ভালো হয়ে এলাহাবাদ চলে যাস।' অখণ্ডানন্দকে এই পরামর্শ দিয়ে অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে বিবেকানন্দ চলে গেলো হৃষীকেশ।

এবার বসে পড়তে হয় সাধনায়। দুর্জয় তপশ্চর্যায়। আয়, কোনো গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ি, নয়তো দুষ্প্রবেশ্য অরণ্যে।

কিন্তু মনোরথ তোমার, রথের রশ্মি ঈশ্বরের হাতে। নির্বাচিত মুহূর্তে স্বামীজীর অসুখ করে গেলো। প্রচণ্ড জ্বরের সঙ্গে ঘোরতর প্রলাপ শুরু হলো।

দেখতে-দেখতে সঙিন হয়ে দাঁড়ালো অবস্থা। সংজ্ঞা লোপ পেয়ে গেলো, নাড়ীও প্রায় ছাড়ো-ছাড়ো। গুরুভাইয়েরা দশদিকে অন্ধকার দেখলো। কি করবে, কোথায় যাবে, কোথায় পাবে রোগের উপশম! মাটির উপরে একটা কম্বল, তাতেই শুয়ে স্বামীজী ছটফট করছে। একটু নরম বিছানা পর্যন্ত যোগাড় করতে পারছে না! কোন্ ডাক্তারই বা আসবে বিনা পয়সায় রুগী দেখতে। ডাক্তার এলেও ওষুধ কেনবার পয়সা আসবে কোত্থেকে? চরম অসহায়ের মতো গুরুভাইয়েরা কাঁদতে বসলো। ঠাকুর, তুমিই অগতির গতি, তুমিই অনাথের নাথ। তুমি নির্বান্ধবের বন্ধু, তুমি নিষ্কিঞ্চনের সর্বস্ব।

কে একটা পাহাড়ী লোক চলে এলো কুটিরে। আমি ওষুধ দিচ্ছি। কি একটা পাহাড়ী গাছের শিকড় বেটে তার সঙ্গে খানিকটা মধু মিশিয়ে খেতে দিলো স্বামীজীকে। জয় জগৎগুরু জগন্নাথ! স্বামীজী চোখ মেললো। জ্বর নেমে গেলো আস্তে-আস্তে।

সুস্থ হয়ে উঠে বিবেকানন্দ বললো গুরুভাইদের, 'তোমাদের অসুখ হলে আমি দেখবো আর আমার অসুখ হলে তোমরা দেখবে এ এক রকম মায়া। এ মায়াবন্ধন কাটতে হবে নিষ্ঠুর হাতে, এ মায়াই আমার তপশ্চরণের বাধা। আমাকে এবার তোমরা ছেড়ে দাও, আমি এবার সম্পূর্ণ একা, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে চাই। যাতে ঘোরতম দুর্দিনেও ভাবতে পারি—আমার পাশে গুরুভাইরাও কেউ নেই। কেবল আমি আছি আর তিনি আছেন।'

গুরুভাইয়েরা কোলাহল শুরু করলো। আমরা যাবো সঙ্গে।

'আমাকে পিছু ডেকো না। মায়াপাশ ছিন্ন করাই আমার স্বধর্ম। স্বধর্ম থেকে আর ভ্রষ্ট হবো না। সন্ন্যাসীর প্রতি অনুরাগও মায়া।'

একা-একা চলে গেলো বিবেকানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ক'টি ছোটো ছেলে

ছোটো নরেনের আসল নাম নরেন মিত্তির। ইস্কুল থেকে সটান চলে আসে দক্ষিণেশ্বরে। ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। কান্না একবার শুরু হলে কি আর থামতে চায়! ঠাকুর বলেন, 'কান্না কি আর কমেতে হয়!' সব আগুনই নেভে। সব কান্নাই থামে এক সময়। শুধু, ঈশ্বরের জন্য যে আগুন, তা নেভে না। ঈশ্বরের জন্যে যে কান্না তার আর বিরতি নেই।

দক্ষিণেশ্বরে আসে লুকিয়ে লুকিয়ে। আসে বলে অভিভাবকরা শাসন করে, পীড়ন করে। তবু কি যে নেশা কে বলবে, এক নাগাড়ে দু-তিনদিন এসে থেকে যায়। স্কুলের কথা মনেও থাকে না। জীবনের আসল যে জ্ঞান তাই যেন ছড়িয়ে আছে ঠাকুরের চারপাশে। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে আছে পায়ের ধূলোয়। পরা-বিদ্যার পাঠশালা এই দক্ষিণেশ্বর।

যদি আবার না আসে, তার জন্য ছটফট করেন ঠাকুর। এলে গায়ে মাথায় হাত বুলোন। মিনতি করেন 'আসিস এক-একবার। বড়ো শুদ্ধ আত্মা তোর। তোর মধ্যে মন্দের গন্ধ নেই এতোটুকু।'

সেদিন বললেন, 'আচ্ছা, তোর শরীর দেখি। খোল দেখি জামা।'

জামা খুলে ফেললো ছোটো নরেন।

খুশি হলেন ঠাকুর। বললেন, 'বা, বেশ বুকের আয়তন। তবে হবে। তবে মাঝে মাঝে আসিস। একেবারে ভুলে যাসনে।'

যেন ঠাকুরের যতো দায়!

দায় না দয়া, কে বলবে! মমতার স্পর্শে চোখ ছলছল করে ওঠে ছোটো নরেনের। একদিন ঠাকুর তাকে জিগ্যেস করলেন, 'তুই কী ভালোবাসিস?'

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ছোটো নরেন। তোমাকে ছাড়া আর কী আছে ভালোবাসার।

'কী ভালোবাসিস ? জ্ঞান না ভক্তি ?'

ছোট নরেন তার কি জানে ? তবু বললো, 'শুধু ভক্তি।'

'কিন্তু না জানলে কাকে ভক্তি করবি ? মাস্টারকে যদি না জানিস, ভক্তি করবি কাকে ?' মাস্টার মশায়ের দিকে তাকালেন, 'তবে ছোটো নরেন যেহেতু শুদ্ধাত্মা, আর যেকালে ও বলেছে শুদ্ধা ভক্তি চাই, তাহলে নিশ্চয়ই এর একটা মানে আছে।'

তুমি কে, জানি না! সাধ্যিও নেই। তবু তোমার দিকেই মন ছুটে চলেছে। না জেনে না চিনেই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

তোমার এমনি মজা! জানার আগেই টানা। দেখিনি, শুনিনি, তবু মন বলে এমন আর দু'টি নেই। কেউ শিখিয়ে দিলো না! তবু নিজেকে বিকিয়ে দিলাম।

কপালে ছোটো একটি আব আছে নরেনের। পঞ্চবটীতে বেড়াতে বেড়াতে ঠাকুর বলছেন, 'তুই আবটা কাটা না। ও তো গলায় নয় মাথায়—ওতে আর কি হবে!'

সমাধির পর উঠে দাঁড়িয়ে ঠাকুর যখন টলতে থাকেন তখন ছোটো নরেন এসে তাঁকে ধরে। ছোটো নরেনের শুদ্ধ-শীতল দেহ, ঠাকুর সে স্পর্শ সইতে পারেন সহজে। কিন্তু সেদিন হলো কি, সমাধির পর ছোটো নরেন ধরতে যেতেই ঠাকুর যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

কি হলো ? বিমর্ষ হয়ে গেলো ছোটো নরেন। তবে কি কোনো দোষ করেছি ? মনে কি আমার মলিনের স্পর্শ লেগেছে ? নইলে আর্তনাদ করলেন কেন ঠাকুর ?

ঠাকুর বললেন, 'তোর শরীরে ঘা।'

বাঁচা গেলো। ক'দিন আগে শরীরে একটা অস্ত্রোপচার হয়েছে তারই ঘা, শুকোয়নি। সেই কলুষসংসর্গ দুর্বিষহ ঠাকুরের কাছে।

তবু যাক। মনের ঘা নয়। মনের ঘা কিছুতেই শুকোতে চায় না শুকোলেও দাগ যায় না কিছুতেই।

দক্ষিণেশ্বরে আসে বলে নারাণকেও তার বাড়ির লোকেরা প্রহার করে। বামুনদের ছেলে। স্কুলে পড়ে, কিন্তু পালিয়ে-পালিয়ে চলে আসে দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর তাকে গাড়ি ভাড়ার পয়সা দিয়ে দেন।

ছোটো খাটটির উপর পাশে বসিয়ে মিষ্টি খাওয়ান, জল খাওয়ান। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেন।

সেদিন কানের কাছে মুখ এনে স্নেহ ঢেলে জিগ্যেস করলেন, 'কালও খুব মেরেছে?'

নারাণ মাথা হেঁট করে রইলো।

'এক কাজ কর। একটা চামড়ার জামা তৈরী কর। মারলে আর বেশী লাগবে না।'

সেদিন কীর্তন শুনছেন ঠাকুর, কোত্থেকে নারাণ এসে কাছে দাঁড়ালো। তাকে দেখে চটে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'তুই আবার কেন এসেছিস? অতো মেরেছে তোকে সেদিন তোর বাড়ির লোক, আবার এসেছিস? তোর শিক্ষে হবে না?'

চরম শিক্ষা নেবো তোমার পদচ্ছায়ে। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? কোথায় তবে আর যাবো? যার তুমি আছো তার আবার ভয় কি। প্রহারই তো তোমার উপহার।

ঠাকুরের ঘরের দিকে গেলো নারাণ। নিজের বাড়ির দিকে নয় কিন্তু মোটেই সে গেলো না।

মমতায় প্রাণ গলে গেলো ঠাকুরের। বাবুরামকে বললেন, 'যা তো, ওকে কিছু খেতে দে।'

কতোক্ষণ পরে নিজেই চললেন খাওয়াতে। আশ্চর্য, কীর্তনে মন বসলো না। কোথায় হরিসরোবরে ডুবে যাবেন, তা নয়, চললেন কোথাকার একটা ছেলেকে খাওয়াতে।

মাস্টারকে বলছেন, 'আহা, ওকে দেখলে যেন বাৎসল্য হয়। এখানে আসে বলে বাড়িতে মারে। ওর হয়ে বলে এমন বুঝি কেউ নেই।'

'আপনিই বোঝাবেন!'

'দেখো, ওর কতো বড়ো সত্তা। কীর্তন ফেলে উঠে গেলাম ওর কাছে। কীর্তনের চেয়েও ওর টানের জোর বেশী। কীর্তন ফেলে উঠে গেছি কোনোদিন এমনটি আর হয়নি।'

'ক্রন্দনই তো শ্রেষ্ঠ কীর্তন।' বললেন মাস্টারমশাই : 'ও মনে মনে কাঁদছে আপনার জন্যে, সেই টানেই তো উঠে পড়লেন।'

'কিন্তু জানো, ওকে যখন জিগ্যেস করলাম, কেমন আছিস? তখন ও বললো, আনন্দে আছি। দুঃখ-কষ্টের কথা মনেও রাখে না।'

অনেকদিন আবার আসছে না নারাণ। বাবুরামকে বলছেন ঠাকুর, 'ওরে, একবার নারাণের বাড়ি যা না। তাকে দেখে আয়। পারিস তো ডেকে আন।'

কিন্তু ওর বাড়িতে যেতে বড়ো ভয়, পাছে ওর বাবা ক্ষেপে ওঠেন, তেড়ে আসেন লাঠি নিয়ে।

'তবে এক কাজ কর। হাতে করে একখানি ইংরেজি বই নিয়ে যা। দেখে-শুনে ওর বাবা খুশি হবেন। কিচ্ছু বলবেন না।'

হঠাৎ একদিন নারাণের মা এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। কার টানে ছেলে এমন ঘরছাড়া তাকে নিজের চোখে দেখে আসতে। কে সে হাত বুলিয়ে সমস্ত মান ভুলিয়ে দেয়! কিসের টানে টলিয়ে দেয় বাধার পাহাড়!

দেখে তো তার চক্ষুস্থির! শুধু স্থির নয় বিমোহিত! ছেলের দোষ কি! তার নিজেরই তো ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না!

কণ্ঠ-ভরা কাকুতি নিয়ে ঠাকুর বললেন, 'মা, আমার নারাণকে বেশী পীড়ন করো না—'

সত্যিই তো, তাঁরই তো নারাণ! মনে হলো ঈশ্বরের ছেলেকে কি বলে তিনি পীড়ন করেন! ছলছল করে উঠলো মায়ের চোখ।

'শোনো', আবার বললেন ঠাকুর, 'ভগবানের দিকে যদি ওর মন যায়, ছমড়ে দিওনা ওর মনটিকে।'

যেন ভিক্ষে করছেন ঠাকুর। যদি ঈশ্বরের দিকে কারু মন যায়, সে মনটি যেন তাঁর প্রাপ্য।

বরানগরের এক তেলির ছেলে গোবিন্দ পাল। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরে ষোলোআনা মন। তাই ঠাকুরের কাছে এসে চুপটি করে বসে থাকে। যখন চারিদিক স্তব্ধ তখন হরিকথা শোনে।

বিষয়ীদের দেখলে বড়ো ভয় পায়। যেমন বেড়াল দেখলে ইঁদুর ভয় পেয়ে থাকে। ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা এসেছে বাগানে বেড়াতে, তাড়াতাড়ি কুঠির ঘরের দরজা বন্ধ করলো। পাছে আবার তাদের সঙ্গে কথা কইতে হয়—এই কুণ্ঠা।

একদিন বললো, 'আমার একটি বন্ধু আছে। নাম গোপাল। গোপাল সেন। তাকে আনবো এখানে ? আপনাকে দেখতে চায়।'

'নিয়ে আয় না। গোবিন্দ এসেছে, গোপাল আসবে, আমার তো মহাভাগ্য।'

আশ্চর্য, এ ছেলের যে ভাবসমাধি হয়! পঞ্চবটী তলায় ভাব হলো একদিন। ভাবে একদিন ঠাকুরের গায়ে হাত দিয়ে গোপাল বললো, 'আমি তবে যাই। আমি আর এ সংসারে থাকতে পারছি না। আপনার তো এখনো অনেক দেরি। সুতরাং আমি একলাই যাই।'

তখন ঠাকুরেরও ভাবাবস্থা। বললেন, 'বলো—আবার আসবে ?'

'আচ্ছা, আবার আসবো।'

কদিন পর গোবিন্দ এসেছে একলাটি। মনমরা। মুখখানি যেন একেবারে ছায়া-ঢাকা।

'কিরে, গোপাল কই ?'

'গোপাল আর নেই। গোপাল চলে গেছে।'

দশ-এগারো বছরের দু'টি ছেলে, পতু আর মণীন্দ্র। কাশীপুরে ঠাকুরের অসুখের সময় দেখা করতে এসেছে। কেউ ডাকেনি, কেউ বলেনি, নিজের থেকে চলে এসেছে প্রাণের টানে। সেবার তারা কি জানে, কাউকে প্রশ্ন তুলতেও দেয় না, বলে, 'আর কিছু না দাও চৌকাঠের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবো দিন-রাত।

পাখা পেয়েছে একদিন। একবার এ হাওয়া করে, আরেকবার ও। ঠাকুরের মাথায় তখন যন্ত্রণা, দিন-রাত হাওয়ার দরকার। কিন্তু ছোট-ছোট হাত, ঠিকমতো নাগাল পায় না। তবু ক্লান্তি নেই, সাধ্যের অতীত করে পাখা চালাচ্ছে।

'আমি যতোক্ষণ পাখা করছি, তুই ততোক্ষণ পা টেপ্।' মণীন্দ্রকে বলছে পতু। আর পতুকে বলছে মণীন্দ্র, 'তারপর তুই পা, আমি পাখা।'

দোলের দিন। বাগানে সবাই খুব হল্লা করছে, রং আর আবীরে হুলুস্থুল! বাড়ির সবাই নেমে গেছে নীচে। রুগীর কাছে শুধু পতু আর

ঠাকুর চোখ চাইলেন। বললেন, 'সেকি রে, তোরা রং খেলতে যাসনি? যা যা, নিচে যা, সব্বাই গেছে—তোরাও যা, আবীর খেল গিয়ে প্রাণ ভরে—'

পতু বললো গম্ভীর হয়ে, 'না মশাই, আমরা যাবো না। আপনি রয়েছেন, আমরা কি আপনাকে ফেলে যেতে পারি!'

ঠাকুর কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'ওরে, এরাই আমার সেই রামলালা, আমাকে সেবা করতে এসেছে। ছেলেমানুষ, তবু আমাকে ফেলে অন্যদিকে ফিরেও তাকালো না!'

বড়ো গরিব দু'টি ছেলে। কিন্তু ভক্তিধনে বিরাট ধনী।

'একজন আমার বড়ো নিন্দে করে।' বলেছেন ঠাকুর, 'কেবল বলে ছোকরাদের ভালোবাসে। কেন বসাবো না শুনি? ছোকরারা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়। দই-পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়, কিন্তু ছোকরারা নতুন হাঁড়ি, দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়।'

ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে কিন্তু আকাশের কিছু করতে পারে না। বালক হচ্ছে সেই নীল-আকাশের টুকরো।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কল্পতরু

ঠাকুরের অসুখ করেছে। গলায় ব্যথা।

কেন হবে না? ছেলেমানুষের মতো বরফ খেতে ভালোবাসেন—কাঁচা বরফ। দক্ষিণেশ্বরে যে যায় সেই বরফ নিয়ে যায়। মহা খুশি ঠাকুর। সরবৎ করে দাও তো ভালো, নয়তো সাদা জলের মধ্যেই বরফ ফেলে খাবেন ঢুক ঢুক করে।

তারপর কুলপি যদি পান তো কথা নেই।

শুধু তাই?

তার উপর আবার হিম লাগানো আছে তো। গিয়েছিলেন পেনেটির উৎসবে, বৃষ্টিতে ভিজে এসেছেন। গলার ব্যথা তাই দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে।

'বৃষ্টিতে এভাবে আপনি ভিজলেন কেন বলুন তো?' ভক্তদের একজন শাসন করে উঠলো।

'তা আমি কি জানি!' বালকের মতো বললেন ঠাকুর: 'সব রামের দোষ।'

রামের মানে, রাম দত্তের। তার দোষ, যেহেতু সে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো। যেহেতু সে বারণ করেনি।

'ও তো ক্যাম্বেলের পাশ-করা ডাক্তার। ও তো আমাকে জোর করে নিষেধ করতে পারতো!' ঠাকুর উলটো তখন নালিশ করলেন, 'ও তো আমাকে বলতে পারতো, বৃষ্টি হতে পারে এখন, মোটেই যাবেন না মশাই।'

গলায় ব্যথার জয়াগায় ডাক্তারি প্রলেপ লাগিয়েছেন। মুখখানা ভার করে আছেন—অপরাধী বালকের মতো।

'সত্যিই তো, রামেরই অন্যায়।'

'নইলে দেখো না, নীচে জল ওপরে জল, রাম আমাকে সমস্তদিন সেখানে নাচিয়ে নিয়ে এলো!'

'যাক গে, এখন থাকুন সাবধান হয়ে। কথা কওয়া বন্ধ করে দিন। লোকে বলে, সমস্তক্ষণ কথা কয়েই আপনার ব্যথা।'

'কথা কইবো না তো বাঁচবো কি নিয়ে! কথাই তো আমার আনন্দ। কথাই তো আমার অমৃত।'

ঈশ্বর ভ্রমর হয়ে গুঞ্জন করছেন। বিহঙ্গ হয়ে কূজন করছেন। বাতাস হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন বেণুবনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কূজন-গুঞ্জন। সেই শ্রবণলোভন বংশীধ্বনি।

ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার বললেন, 'শুধু আমার সঙ্গে কথা কইবেন, আর কারু সঙ্গে নয়।'

'কিন্তু বড্ড কাশি হয়েছে যে।' কাতরমুখে বললেন ঠাকুর।

'কাশি হয়েছে?' ডাক্তার রসিকতা করলেন : 'তা কাশীতে যাওয়া তো ভালো কাজ।'

সবাই হাসলো। ঠাকুরও হাসলেন। বললেন, 'তাতে তো মুক্তি গো। আমি মুক্তি চাই না, আমি ভক্তি চাই।'

মুক্তি তো সোজা, কোনো দায়িত্ব নেই, কোনো ভার বহন নেই। ভক্তিই কঠিন। কণ্টককে কুসুম মনে করাই ভক্তি। আঘাতকে মনে করা ঈশ্বরের আলিঙ্গন।

ভক্তি মানে, ঈশ্বরকে ভালোবাসা। অহেতুক ভালোবাসা। কোনো কারণ নেই তবু খুশিতে ভরে ওঠা। মধুরের শেষ না পাওয়া।

ডাক্তারের সঙ্গেই কথা কন ঠাকুর।

সমস্ত কিছুর মধ্যেই ভগবান জেগে রয়েছেন, ফুটে রয়েছেন, ফলে রয়েছেন সেই কথাটিই বোঝাচ্ছেন সেদিন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, বলছেন ঠাকুর : 'তুমি আমাকে ঈশ্বর বলছো—তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, দেখবে এসো।'

'অর্জুন গেলেন সঙ্গে-সঙ্গে। খানিকদূরে গিয়ে বললেন শ্রীকৃষ্ণ, কি দেখতে পাচ্ছো?

'অর্জুন বললেন, মস্ত একটা গাছ।'

'কী ফলে আছে? প্রশ্ন করলেন শ্রীকৃষ্ণ!'

'অর্জুন বললেন, দেখছি তো বহু কালো জাম থোলো-থোলো হয়ে ঝুলে আছে।'

'শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কাল জাম নয়। দেখো ভালো করে। আর একটু এগিয়ে এসে দেখো।'

'তখন অর্জুন দেখলেন, থোলো-থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে। কৃষ্ণ বললেন, এখন দেখলে? আমার মতো কতো কৃষ্ণ ফলে রয়েছে?'

ডাক্তার বললেন, 'এ-সব বেশ কথা।'

ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ! কেমন কথা?'

'বেশ।'

'তবে একটা থ্যাঙ্ক-ইউ দাও!' হাসতে লাগলেন ঠাকুর।

পরিহাসের স্বচ্ছ জলের উপর ফুটিয়েছেন বর্ণাঢ্য ভাব-পদ্ম। ঈশ্বর-কথার চন্দনে স্নিগ্ধ করেছেন রোগ-যন্ত্রণা।

সকালে একটু ভাতের মণ্ড, ঝোল আর দুধ, সন্ধ্যায় আবার একটু দুধ আর যবের মণ্ড—এই পথ্য করছেন ঠাকুর। তবু এতো নিয়মে থেকেও রোগের কমতি নেই একটুও। বরং বৃদ্ধির মুখে।

'নিশ্চয়ই কুপথ্য করেছেন!' ডাক্তার শাসিয়ে উঠলো।

ডাক্তারের সঙ্গে ঠাকুরের ভাব তখন জমে গিয়েছে—তাই আর 'আপনি' নেই।

ঠাকুর মাথা চুলকে বললেন, 'কই, না তো!'

'আচ্ছা আজ কোন্ কোন্ আনাজ দিয়ে ঝোল রাঁধা হয়েছিলো?' কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন ডাক্তার!

'আলু, কাঁচকলা, বেগুন—' ঠাকুর আবার মাথা চুলকোলেন: 'দু-এক টুকরো ফুলকপিও ছিলো -'

'এ্যাঁ! ফুলকপি? ফুলকপি খেয়েছেন? এই তো আবার অত্যাচার হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ক'টুকরো খেয়েছেন?' ডাক্তার তড়পাতে লাগলো।

'না গো, এক টুকরোও খাইনি।' ঠাকুর বললেন অপরাধীর মতো : তবে ঝোলে ছিলো দেখেছি।'

'দেখেছেন ? তবেই হয়েছে! না খেলে কী হয় ?'

'না খেলে কী হয়!' ঠাকুর অবাক হবার মুখ করলেন।

'কপি না খান, ঝোল তো খেয়েছেন ? ঝোলে তো কপির গুণ ছিলো। তারই জন্যে তো আপনার মার হজমের ব্যাঘাত হয়ে ব্যারামের বৃদ্ধি হয়েছেন।'

'সে কি গো! ঠাকুর প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন : 'কপি খেলাম না, পেটের অসুখও হয়নি, ঝোলে একটু-কি কপির রস ছিলো তাইতেই অসুখ বাড়লো ? এ কিছুতেই মানতে পারবো না।'

'মানতে পারবেন না কেন ?' ডাক্তার বসলেন গ্যাঁট হয়ে : 'আমার বেলায় কী হয়েছিলো শুনুন! হোমিওপ্যাথি করি, ছোটো-একটুকুর শক্তিকে উপেক্ষা করতে পারি না। আপনিই তো বলেছেন, ছোটো-একটুকু বীজে বিরাট বনস্পতি ছোট একটুকু নামে বিরাট বিশ্বঝঙ্কার! সেবার আমার দারুণ সর্দি হলো। সর্দি থেকে ব্রঙ্কাইটিস! কিছুতেই সারে না! কেন যে অসুখটা লেগে থাকছে বুঝে উঠতে পারছি না কিছুতেই। শেষে একদিন দেখি কি—'

ঠাকুর তাকালেন কৌতূহলী হয়ে।

'দেখি, চাকর গরুকে মাষকড়াই খাওয়াচ্ছে। যে গরুটার আমি দুধ খাই সেই গরুটাকে। কি ব্যাপার ? চাকর বললো কোত্থেকে কতগুলো মাষকড়াই জুটেছে, সর্দির ভয়ে কেউ খেতে চাচ্ছে না, তাই ঠেসে-ঠেসে খাওয়াচ্ছে গরুকে। হিসেব করে দেখলাম, যেদিন থেকে মাষকড়াই খাচ্ছে গরু, সেদিন থেকেই আমার সর্দি।'

'তারপর কী করলেন ?'

'গরুর মাষকড়াই খাওয়া বন্ধ করে দিলাম, আর আমার সর্দিও সেরে গেলো।'

সবাই হেসে উঠলো হো-হো করে।

'কিসে কি হয় বলা যায় না।' আবার গল্প জুড়লেন ডাক্তার : 'পাক-পাড়ায় বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিলো—ঘুঙরি কাশি, হুপিংকাফ। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি না। শেষে জানতে পারলাম, গাধা ভিজেছিলো।'

'গাধা ভিজেছিলো কি গো!'

'যে গাধার দুধ মেয়েটি খেতো সেই গাধা ভিজেছিলো বৃষ্টিতে।'

'সেই যে কি বলে গো?' ঠাকুরও রঙ্গ করলেন 'সেই-যে বলে, তেঁতুল-তলা দিয়ে আমার গাড়ি গিয়েছিলো কিনা, সেজন্যেই তো আমার অম্বল হয়েছে!'

পড়লো আবার হাসির রোল।

ডাক্তার বললেন, 'জানেন, একবার এক জাহাজের কাপ্তেনের বড়ো মাথা ধরেছিলো। তখন ডাক্তাররা পরামর্শ করে জাহাজের গায়ে বেলেস্তারা লাগিয়ে দিলো।'

শত চিকিৎসায়ও সারছে না ঠাকুরের অসুখ। শত যন্ত্রণায়ও ঠাকুর ছাড়ছেন না ঈশ্বরকে।

আরামেও রাম, ব্যারামেও রাম। যার ব্যাধি, তারই আরোগ্য। যার তিমিররাত্রি, তারই সুপ্রভাত। যে ঘাতক সেই বলি, সেই খড়্গ, সেই হাড়িকাঠ।

'দুঃখ জানে, শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো—' ছন্দের মতো সুর করে বলে ওঠেন ঠাকুর।

যতোই দুঃখ আসুক, শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাক, তবু হে আমার মন, তুমি আনন্দে থাকো, ঈশ্বরকে ধরে থাকো। যতোই মেঘ আসুক, বিদ্যুৎ জ্বলুক, ঝড় লণ্ডভণ্ড করে দিক, তবু হে আকাশ, তুমি তোমার নীল কান্তিটি অম্লান রেখো। তোমার বজ্রে যেন তোমার বাঁশিটি শুনতে পাই। তোমার 'দাবদাহে' অনুভব করি যেন তোমার শীতল প্রসাদ।

সিন্ধুদেশী ভক্তের নাম হীরানন্দ। বলছেন মাস্টারমশাইকে : 'ওঁর কষ্ট আর দেখতে পাচ্ছি না। কেন উনি অতো কষ্ট সইছেন?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'লোকশিক্ষার জন্যে'।

'কিসের লোকশিক্ষা ?'

'শুধু শেখাতে, দুর্বিষহ দৈহিক কষ্টের মধ্যেও কি করে ঈশ্বরে ডুবে থাকতে হয়। সকল কাঁটা ধন্য করে ফোটাতে হয় গোলাপ! আসলে যাকে আমরা ভোগ বলি তাই হয়তো রোগ। আর যাকে আমরা রোগ বলি তাই হয়তো যোগ!'

'সত্যি, দেখছি সেই ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টকে। কাঁটার মুকুট-পরা ভুবনেশ্বরকে।'

ঠাকুরকে এমন করে ভুগতে দিতে রাজি নয় দুর্গাচরণ।

একদিন তাকে কাছে ডেকে বসালেন ঠাকুর। ভাবাবেশে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'শুনেছো—শোনো, আমার অসুখ আর সারবে না কোনোদিন।'

'কে বললো ?' দুর্গাচরণ রুখে উঠলো।

'আমিই বলছি! শোনা, ডাক্তারেরা হদ্দ হয়ে গেলো। কিছুতেই পারলো না সারাতে। তুমি পারো ?'

'পারি।' লাফিয়ে উঠলো দুর্গাচরণ।

'পারো ?'

'পারি।'

ঠাকুর বুঝতে পারলেন তার মনের কথা। ঠাকুরের ব্যাধি নিজের দেহে টেনে নিতে চায় দুর্গাচরণ।

তাকে পাশ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন ঠাকুর? বললেন, 'জানি, তুমি পারো। কিন্তু থাক, সারিয়ে কাজ নেই।'

পরে বললেন একটু থেমে: 'আমার জন্যে ক'টা আমলকী আনতে পারো ?'

তাও পারে দুর্গাচরণ। লাফিয়ে উঠলো। তখুনি পড়ি-মরি ছুটলো আমলকী আনতে।

'কোথায় পাবে এখন আমলকী?' কে একজন তাকে বাধা দিলো: 'এখন আমলকীর সময় নয়।'

দুর্গাচরণ তা গ্রাহ্য করে না। সময় হয়তো নয়, তাতে আমলকী পেতে বাধা কি। প্রভু যখন চেয়েছেন তখন মাটি ফুঁড়ে পাষাণ ফুঁড়ে আমলকী আসবে। যিনি মূককে বাচাল করেন, পঙ্গুকে করেন গিরিলঙ্ঘী, তিনি অকালফলোদয় ঘটাবেন আশ্চর্য কি? আমার ব্যাকুলতাই নিয়ে আসবে আমার আকাঙ্ক্ষিতকে। অনাবৃষ্টির আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবো আমার দৃষ্টি প্রাখর্যই ডেকে নিয়ে আসবে সেই শ্যামল-শোভন জলধরকে।

তিনদিনের মধ্যেই দুর্গাচরণ নিয়ে এলো আমলকী।

কিন্তু আমলকী খেয়ে তো গলার ঘা সারবে না।

তবে কিসে সারবে?

সারবে, ভবতারিণীর কাছে স্পষ্টাস্পষ্টি প্রার্থনা করে।

নরেন তাই ঠাকুরকে পেড়ে ধরলো। বললো, 'এতো মা-মা করো, তোমার মার কাছে থেকে বর চেয়ে নিয়ে এসো, আমার গলার ঘা সারিয়ে দাও।'

'ওরে, শরীরের জন্যে কিছু চাইতে পারি না। শরীর তো নয়, কাপড়-মোড়া বাঁখারি। শুধু একটা বালিশের খোল।'

'ওসব কথা চাই না শুনতে। তোমার কষ্ট আর আমি যে দেখতে পারি না।'

'ওরে, যে মন একবার মাকে দিয়েছি সেই মন মার পাদপদ্ম থেকে তুলে এনে নিজের দেহের ওপর রাখতে পারি না।'

'রাখো। ওসব ঢের শুনছি।' নরেন প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো: 'তুমি কিচ্ছু খেতে পাচ্ছো না এই নিদারুণ দৃশ্য দেখা অসহ্য হয়ে উঠেছে। তুমি যাও, মার কাছ থেকে রোগমুক্তির বর চেয়ে নাও গে। মার কাছে এতো সঙ্কোচ কি? সন্তানের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এ মা-ই বা কি করে সহ্য করছেন?'

প্রায় ঠেসে-ঠুলে জোর জবরদস্তি করে ঠাকুরকে পাঠালো নরেন। পাঠালো ভবতারিণীর মন্দিরে। বাইরে অপেক্ষা করে রইলো মাতা-পুত্রে কি কথা হয় তা জানবার জন্য।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন ঠাকুর।

'কি, বলেছিলে মাকে ?' নরেন ছুটে এলো উৎসুক হয়ে।

'বলেছিলাম !'

'কি বলেছিলে ?'

'বলেছিলাম, খেতে পাচ্ছি না—মুখ বন্ধ—'

'বলেছিলে ? তাতে মা কী বললেন ?'

'বললেন, তোর এক মুখ বন্ধ হয়েছে তাতে কি হলো। তুই তো শতমুখে খাচ্ছিস।'

মাথা হেঁট করে রইলো নরেন। নরেন যে খাচ্ছে—তাও তো ঠাকুরই খাচ্ছেন।

শুধু তাই কেন ? যেখানে যে প্রাণী আহার করছে আস্বাদ করছে, সব আমি। ধরিত্রীর বুক থেকে রস টেনে নিচ্ছে গাছ, সে তো আমি। মা'র চঞ্চু থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে পক্ষীশাবক, সে তো আমি। আর আমিই তো সেই গহন কাননের মধুসন্ধানী মধুকর।'

'আমি অতো শতটত চাই না।' বলেছিলো বাবুরাম: 'আমি শুধু তোমার এই একখানি মুখ চাই। আমি চাই তুমি এই মুখটিতে খাবে আর আমি তোমার এই মুখটিই দেখবো।'

তোমার অভয়ময় আনন্দময় মুখ। এতো তোমার কষ্ট তবু এতো তোমার করুণা! এতো তোমার ক্লেশ তবু এতো তোমার আশ্বাস।

সমস্ত রোগের মালিন্যের ঊর্ধ্বে একটি আরোগ্যের কনককান্তি। সমস্ত যন্ত্রণার অবশেষে একটি উল্লাস উজ্জ্বল জয়ধ্বনি।

আমাদের চারিদিক আলোকময় করে আছো। যেদিকে তাকাই সেদিকেই তোমার তৃপ্তিভরা চক্ষু দু'টি দেখি—দেখি তোমার রুচির মুখের পবিত্রতা। গাছের ডালে নতুন-জাগা পাতা ক'টি নাচছে, সে যেন তোমার আনন্দ! বাসা-না-ছাড়া পাখিরা কাকলী করছে, সে যেন তোমার সংবাদ। জলটি বয়ে যাচ্ছে কুলকুল করে, সে যেন তুমি ডেকে যাচ্ছো। মেঘ ছেঁড়া-রোদটি এসে গায়ে পড়েছে, সে যেন তুমি এসে ছুঁয়েছো বন্ধুর মতো।

এতো কষ্ট পাচ্ছেন তবু জীবের দুঃখে কাতর। সর্বক্ষণ জীবের মঙ্গল চিন্তা করছেন! তাকে নিমন্ত্রণ করছেন জগতের আনন্দযজ্ঞে।

'আহা, কি চিনিমাখা কথা!' বলছেন শ্যাম বসু।

'যে চিনিটুকু নিতে পারে সেই চতুর।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'সংসারে বালিতে চিনিতে মিশেল হয়ে আছে। পিঁপড়ের মতো থাকো। বালি ত্যাগ করে চিনিটুকু নাও। বালির মধ্যে থেকে যে চিনিটুকু নিতে পারে সেই বাহাদুর।'

তেমনি সংসারে থেকে, সং-টুকু ছেড়ে দিয়ে সারটুকু নাও।

আমার ঘর ভরা। কতো জিনিস, কতো আসবাব। কতো বই খাতা, কতো পোশাক-আসাক। কতো লোকজন, গান-বাজনা। কতো হৈ-চৈ, হাসি-হুল্লোড়। কিন্তু ভরা ঘরে তোমাকে ছাড়া আমি ব্যর্থ। আমি হৃতসর্বস্ব।

ঠাকুর তখন কাশীপুরে গোপাল ঘোষের বাগান বাড়িতে। রোগ ক্রমশ বেড়ে চলেছে আগুনের মতো। যা বিক্ষত তাই বিশুদ্ধ—ক্ষত মুখে ঝরছে শুধু সুধাধারা। ক্ষুব্ধ স্তব্ধতা থেকে ঝরছে শুধু শান্তি। আর্তনাদ থেকে গীতকলকূজন।

শ্রীশ্রীমা সারদামণি এসেছেন ঠাকুরের সেবা করতে। দেবতার পূজার বেদীতে জাগ-প্রদীপটি হয়ে জেগে থাকতে। দুর্যোগের অমানিশাকে মঙ্গল দীপ্তিতে স্নিগ্ধ করতে।

একদিন দুধের বাটি নিয়ে উঠতে গিয়ে সিঁড়িতে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন শ্রীমা। দুধ তো গেলোই, মায়ের পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেলো।

'তাই তো বাবুরাম, এখন কি হবে।' ঠাকুর চিন্তিত স্বরে বললেন, 'যা হয় একটু কিছু খাইয়ে যেতেন, এখন কী উপায় আমার খাওয়ার!'

একেবারে সর্বার্পিতনির্ভর শিশুর মতো। একেবারে সরল শরণাগতি।

মা তখন নথ পরতেন। এরই মধ্যে মাকে নিয়ে ঠাকুরের রসিকতা, নাকের কাছে গোল করে হাত ঘুরিয়ে ঠারে-ঠোরে বলছেন ঠাকুর: 'ও

বাবুরাম, ঐ যে—ওকে তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস ?'

ঠাকুরের কথা শুনে বাবুরাম আর নরেন তো হেসে খুন !

কিছুতেই কিছু হবার নয়। শ্রীমা তখন চললেন তারকেশ্বরে হত্যে দিতে।

একদিন যায়, হু'দিন যায়, পড়েই আছেন। তিনদিনের দিন রাতে একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলেন শ্রীমা। যেন অনেকগুলো সাজানো হাঁড়ির উপর লাঠির ঘা পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ভাব এলো মার মনে। এ সংসারে কে কার ? কার জন্য আমি এখানে হত্যে দিতে বসেছি ? কাকে আমি বাঁচাবো ? কার সাধ্যি তাকে মারে ?

মায়া কাটিয়ে মহান বৈরাগ্য এনে দিলো। অন্ধকার হাতড়াতে-হাতড়াতে মন্দিরের পিছনের কুণ্ড থেকে স্নানজল নিয়ে চোখে-মুখে দিলেন শ্রীমা। পিপাসায় গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিলো। জল খেয়ে প্রাণ কিছু সুস্থ হলো। পরদিনই চলে এলেন।

'কি গো, কিছু হলো ? জিগ্যেস করলেন ঠাকুর।'

মাথা নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীমা।

ঠাকুর হাসিমুখে বললেন, 'কিছুই না। কিছুই না ! ও আমি জানতাম। আমিও এদিকে স্বপ্ন দেখছিলাম, যেন ওষুধ আনতে হাতী গেলো। হাতী মাটি খুঁড়ছে ওষুধের জন্যে, এমন সময় গোপাল এসে স্বপ্ন ভেঙে দিলো !'

মা-কালীর কাছে এসে দাঁড়ালেন শ্রীমা। দেখলেন মা-কালী ঘাড় কাত করে রয়েছেন।

'মা, তুমি কেন অমন করে আছো ?' শুধোলেন সারদামণি।

ঠাকুরের গলায় ঘা দেখিয়ে মা-কালী বললেন, 'ওর ঐটের জন্যে আমারও হয়েছে।'

ঠাকুর বললেন ভক্তদের, 'যা ভোগ আমার ওপর দিয়েই হলো। তোমাদের আর কাউকে কষ্ট ভোগ করতে হবে না। জগতের সকলের জন্যে আমি ভোগ করে গেলাম।'

আমাদের সকল তাপ তুমি হরণ করেছো, সকল পাপ, সকল গ্লানি। সকল অহঙ্কার, সকল অগৌরব। ক্ষমা দিয়ে মুছে দিয়েছো সকল অক্ষমতা। দয়া দিয়ে ধুয়ে দিয়েছো সকল দারিদ্র্য। তোমার পাবন-মন্ত্রে জীবিত করেছো ভগ্ন আর রুগ্নকে, জীর্ণ আর জ্বরাক্লান্তকে, পীড়িত আর অধোগতকে! তোমার স্পর্শে আমাদের তো শুধু উদ্ধার নয়, আমাদের উত্থান।

নরেন আর রাখাল পদসেবা করছে। মাস্টারমশাইও কাছে বসে। নিরঞ্জন, শরৎশশী, বাবুরাম, যোগীন, কালী, লাটু, গোপাল সব আশেপাশে, নীচে-উপরে। রাত দুটো। কারুর চোখে ঘুম নেই। নবমীর চাঁদ উঠেছে, কারুর মনে সুখ নেই। ঠাকুরের অসুখ আরো বেড়েছে। অসহায়ের মতো স্তব্ধ হয়ে আছে সকলে। যেন শত্রুসৈন্য অবরোধ করেছে নগরী—কিন্তু সবাই নিরস্ত্র বলহীন।

'তোমরা কাঁদবে বলে এতো ভোগ করছি।' বলছেন ঠাকুর, 'সবাই যদি বলো, এতো কষ্ট, দেহ যাক, তাহলেই দেহ যায়।'

কেউ কিছু বলছে না।

কিন্তু কেন, কেন এতো ভোগ ? কেন এই দেহ-বিকার ?

'জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে লোকের ভিড় আরো বেড়ে যেতো।' বলছেন ঠাকুর, 'এখন বাইরে প্রকাশ নেই। তাই এখন আগাছারা পালাবে। আর যারা শুদ্ধ ভক্ত তারাই থাকবে এখন আমাকে ঘিরে এই ব্যারাম হয়েছে কেন ? এর মানে ওই। যাদের সকাম ভক্তি তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।'

শুধু কি তাই ?

ভক্তকুলকে বাঁধতে চাইলেন সেবার পুণ্যব্রতে! সেবার মধ্য দিয়ে সমপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হতে।

আমরা সবাই তোমার সেবক। হে পরম সেব্য, তোমাকে সেবা করতে-করতে পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান হবো। তোমার যখন শরণ নিয়েছি, হে মহাজীবন, হে মহামরণ, তোমার সঙ্ঘেরও শরণ নিয়েছি!

শুধু কি তাই ?

আরো একটি অর্থ আছে।

তুমি যে আমাদেরই একজন, আমাদের যে তুমি ভোলোনি, আমাদের যে তুমি ত্যাগ করতে পারো না, এইটুকু বোঝবার জন্যই তোমার এই রোগজ্বালা। তুমি এই ভুবন বিস্তীর্ণ সমস্ত পথ হেঁটে এসে উঠলে এ সংসারে? আমাদের পাশটিতে, আমাদের উত্তপ্ত নৈকট্যে। অন্তরবাসী হয়ে কি করে আবার প্রতিবেশী হতে হয় তারই সহজরূপে। বললে, আমি তোমাদেরই একজন, তোমাদেরই আপনার। চেয়ে দেখো আমার দিকে, রোগে বল নাও, শোকে সাহস নাও, আর মনে নাও ঈশ্বরানন্দমদিরা।

'দুঃখ জানে, শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

'আর, তোমার যদি এই রোগ হতো, তবে, জগজ্জনকে কি করে দিতে তুমি আরোগ্যফল? কি করে তুমি কল্পতরু হতে?

ঈশ্বর অন্তরীক্ষ জুড়ে বৃক্ষের মতো বিরাজ করছেন—এ কথা-শাস্ত্রে বলে। তুমি সে বৃক্ষের চেয়ে নিকটতর, নিবিড়তর! তুমি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসেছো! দিঙ্মণ্ডল ঢেকে মেলেছো তোমার শীতল ছায়া, তোমার আতপচ্ছদ। তুমি কল্পনার নও, তুমি মৃত্তিকার কল্পতরু।

১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি! ঘোরতর অসুখের মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ উঠে বসলেন। বললেন, 'আমার কাপড়-জামা দাও, আমি পরবো সাজবো, যাবো আমি বাগানে বেড়াতে।'

বেলা প্রায় তিনটে। ছুটির দিন বলে গৃহী-ভক্ত জড়ো হয়েছে বাগানে। যদি কোনো সুযোগে ঠাকুরের একবার দর্শন পায়।

গৃহীর টানে চললেন সেই মহাগৃহস্থ। সন্ন্যাসীর শিরোমণি হয়ে গৃহস্থের মধ্যমণি। সন্ন্যাসী সেবকেরা পড়ে রইলো ঘরের মধ্যে, আশেপাশে, ঠাকুর চললেন মুক্ত মাঠে—গৃহস্থদের মাঝখানে।

আমি তোমাদের একজন। আমি তোমাদের ঘরের মানুষ। তোমাদের আত্মার আত্মীয়।

ঠাকুরের লালপেড়ে ধুতি পরনে, গায়ে সবুজ বনাতের জামা। কাপড়ের টুপি দিয়ে কর্ণমূল ঢাকা। লতাপাতা-আঁকা মোজা পায়ে, চটিজুতো পরা।

সন্ন্যাসী সেবকরা সঙ্গ নিলো না। তারা ঘর-দোর বিছানা-বালিশ পরিষ্কার করতে বসলো! ঠাকুর চলে এলেন একা-একা।

চলে এলেন সংসারীদের এলাকায়। একেবারে পাপী-তাপী দুঃস্থ-দুর্গতদের দুয়ারে।

বসতবাড়ি আর ফটক, তারই মাঝখানে পশ্চিমদিকে সমাগত অতিথিরা ভিড় করেছে - গিরিশ ঘোষ, তার ভাই অতুল, রাম দত্ত, অক্ষয় সেন। আরো অনেকে।

ভাবানন্দে বিহ্বল হয়ে তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন ঠাকুর। মৃত্তিকার ঘরে আকাশের দিনমণি।

সবাই হাতজোড় করে রইলো।

গিরিশকে সম্বোধন করে বললেন ঠাকুর, 'তুমি যে এতো সব বলে বেড়াচ্ছো, কি দেখেছো তুমি?'

'আমি আর কী বলতে পারি, প্রভু! হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়লো গিরিশ। করজোড়ে উর্ধ্বমুখে বললো, 'ব্যাস-বাল্মীকি যার ইয়ত্তা করতে পারেনি, সেখানে আমি কি, আমি কতোটুকু!'

বরাভয়ে প্রসারিত হলেন ঠাকুর। উত্তোলিত হাতে সবাইকে আশীর্বাদ করলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।'

চৈতন্যের ঢেউ পড়ে গেলো। দেশ-কাল মুছে গেলো নিমেষে! ঠাকুরের আর ব্যাধি নেই, পঞ্চভূতের ফাঁদ যেন এসেছেন বেরিয়ে। প্রণামের হরির লুঠ পড়ে গেছে। স্পর্শাঞ্জলির অতৃপ্য তর্পণ। সবাই প্রতিজ্ঞা করেছিলো ঠাকুরের অসুখ না সারা পর্যন্ত কেউ ছোঁবে না তাঁকে—কেননা, সকলের স্পর্শ-কলুষেই তো ঠাকুরের এই রোগ—ভুলে গেলো সে-প্রতিজ্ঞা। কেশব সেন বলেছিলেন, ঠাকুরকে রেখে দিতে 'গ্লাস-কেসে'—ভেঙে গেলো সেই 'গ্লাস-কেস'। ঠাকুরও মহানন্দে ডুব দিলেন সেই স্পর্শ-সমুদ্রে। মৃত্যুঞ্জয়ী অভয় দিতে লাগলেন।

রাম দত্ত অঞ্জলি-অঞ্জলি ফুল দিতে লাগলো!

অক্ষয় সেনের হাতে দু'টি জহুরী চাঁপা। চাঁপা দু'টি তাঁর পায়ে দিতেই ঠাকুর তার বুক ছুঁয়ে দিলেন।

অক্ষয় একটা বিপুলতর চেতনার মধ্যে প্রাণ পেলো! সানন্দে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো সবাইকে : 'ওরে, কে কোথা আছিস, এইবেলা চলে আয়। মুঠো-মুঠো অভয় কুড়িয়ে নে, আশ্বাস কুড়িয়ে নে। চৈতন্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কুড়িয়ে নে ভারে-ভারে। জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি বিবেক—এমন দিন আর পাবি না রে! কৃপার পাত্র উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন প্রভু! আয়, নিয়ে যা, দেখে যা অর্জুন যেমন দেখেছিলো বিশ্বরূপ।'

ছুঁলেন নবগোপালকে, অতুলকে, হরমোহনকে। বৈকুণ্ঠ কিশোরী আর আর রামলালকে। হারাণের মহা-ভাগ্য, যেই প্রণাম করতে গিয়েছে, ভাবাবেশ ঠাকুর তার মাথায় পাদপদ্ম স্থাপন করেছেন।

কেউ স্তোত্র পড়ছে, কেউ বা ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে, কেউ আবার ভাসছে চোখের জলে।

ওরে, আর লোক কই, বেলা যে বয়ে গেলো! কোথায় কে আছিস আর্ত-বঞ্চিত অন্ধ-বিভ্রান্ত, আয় ছুটে আয়, কল্পতরুকে দেখে যা, বস এসে তাঁর ছায়ার আশ্রয়ে, তাঁর করুণার নিকেতনে। চতুর্বর্গ ফল নিয়ে যা। জীবনে যা তোর অভীষ্টতম সে পরম-ধন স্পর্শ কর্। লোহার কালো তনু কাঞ্চন করিয়ে নিয়ে যা।

রুটি বেলবার আয়োজন করছে রাঁধুনি বামুন, তাকে হিড়-হিড় করে টেনে আনলো গিরিশ।

'ওরে, কাতর প্রভু অকাতর হয়েছেন কৃপাবিন্দু নিয়ে যা পাত্র ভরে।'

রাঁধুনি-বামুনও কৃপা পেলো।

আর কোথায়! আর কোথায়!

হরিশ আছে। উপেন্দ্র আছে। তারাও এসে পড়েছে ঠিক সময়।

গুপ্তবেশে মহালীলা করে গেলাম। যারা সেদিন কাছে ছিলিনে, ভয় নেই, আমিই এসেছি তোদের কাছটিতে। যারা সেদিন ছুঁতে পারিসনি,

নে আমার এই অন্তর-স্পর্শ। যারা সেদিন দেখিসনি আমাকে, দেখ আজ তোদের মানস-দর্পণে।

আমি কল্পতরু। আমি ক্ষয়হীন করুণার উৎস!

বল কি তোর আকাঙ্ক্ষনীয়? নিজেকে কৃপণ মনে করে ক্ষুদ্র দরিদ্র মন নিয়ে কেন কোণে পড়ে আছিস? চা না, তোর যা ইচ্ছে। অন্তত আকাঙ্ক্ষায় উদার হ, অবারিত হ। নির্ভয়ে বল, কী তোর কামনার ধন? যা চাইবি তাই পাবি। হিসাব করে চাইতে হবে না, প্রাণ ঢেলে, প্রাণ ভরে চা। চা—মুখ ফুটে।

'আমি কিছু চাই না। তোমার ফুল চাই না, ফল চাই না, শাখা চাই না। হে বৃক্ষ, আমি শুধু তোমাকে চাই।'

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

কিশোর রচনা সংগ্রহ

নবম (এক) খণ্ড

তথ্যপঞ্জী
এবং
গ্রন্থ-পরিচয়

নিরঞ্জন চক্রবর্তী
সম্পাদিত

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

নবম (এক) খণ্ড

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ চলছে। অচিন্ত্যকুমারের শিশু ও কিশোর সাহিত্যের পরিধিও বিপুল। বর্তমানে প্রকাশিত নবম (এক) খণ্ডে সেই বিপুল কিশোর সাহিত্যের এক অংশ সংগৃহীত হয়েছে। এই খণ্ডে নিম্নলিখিত বইগুলি স্থান পেয়েছে :

১। ডাকাতের হাতে (কিশোর উপন্যাস)

২। দুই ভাই ঐ

৩। ঘোর প্যাঁচ (রহস্য উপন্যাস)

৪। ঝড়ের যাত্রী (কিশোর উপন্যাস)

৫। সকলের রামকৃষ্ণ (জীবনী-কথা)

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলীর পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির মতো এই খণ্ডটিকে বিপুলাকার করা হয়নি। কিশোরদের উপযোগী করেই এই খণ্ডটি প্রকাশ করা হচ্ছে। সেইজন্য বর্তমানে মুদ্রণশিল্প সঙ্কট এবং কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও এই খণ্ডটির মূল্য বস্তুতপক্ষে অল্পই ধার্য করা হয়েছে, যাতে করে অভিভাবকগণ এই কিশোর-সাহিত্য-সংগ্রহের অপূর্ব সংকলনটি সকল শিশু ও কিশোরদের হাতে তুলে দিতে পারেন। অবশ্য, এই সংগ্রহটি বয়স্কদেরও সমপরিমাণে আনন্দ দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

অচিন্ত্যকুমারের আরো অনেক প্রকাশিত কিশোর-সাহিত্য-গ্রন্থ, গল্প এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিবিধ রচনা রয়েছে, যেগুলো তাঁর পরবর্তী কিশোর-সাহিত্য-সংগ্রহে সংকলিত করা হবে। সেইসকল রচনা ও গল্পসংগ্রহের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখিত হলো :

উঁচু নীচু (উপন্যাস), দেশের ছেলে, যেম সাহেব,
সাপ খেলাবার বাঁশী, আকাশ প্রদীপ, সবুজ নিশান,
স্বনির্বাচিত গল্প, কিশোর সংকলন, ছোটদের গল্প,
মৃগ নেই মৃগয়া (ক্রিকেট রম্য রচনা),
ছোটদের হাসির গল্প ইত্যাদি।

গ্রন্থ-পরিচয়

১। ডাকাতের হাতে ।। কিশোর উপন্যাস ।। (১—১১০ পৃষ্ঠা)

অচিন্ত্যকুমারের কিশোরদের জন্য লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে এইটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রকাশক এম সি. সরকার এণ্ড সন্স, কলকাতা। প্রথম প্রকাশিত হয় আশ্বিন, ১৩৩৯ সালে। তারপর এই বইটি কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয়। শেষ পুনর্মুদ্রিত বইটির প্রকাশক শ্রীপ্রকাশ ভবন, কলকাতা। প্রকাশিত হয়, মহালয়া, ১৩৬৭ সালে। এই পুনর্মুদ্রিত সংস্করণটির পাঠই বর্তমান কিশোর সংগ্রহে গ্রহণ করা হয়েছে।

২। দুই ভাই ।। কিশোর উপন্যাস ।। **(১১১—২০৬ পৃষ্ঠা)**

এই কিশোর-উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫০ সালে। অবশ্য তৎপূর্বে কোনও শিশু-সাহিত্য-পত্রিকায় এইটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রকাশক দেব সাহিত্য কুটির। আর কোনও সংস্করণ হয়নি। উক্ত সংস্করণের পাঠই বর্তমান সংগ্রহে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। ঘোর প্যাঁচ ।। রহস্য উপন্যাস ।। **(২০৭—২৬৫ পৃষ্ঠা)**

এইটি গোয়েন্দা ধরনের একটি রহস্য উপন্যাস। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫১ সালে। প্রকাশক দেব সাহিত্য কুটির। অন্য কোনও সংস্করণ হয়নি। উক্ত সংস্করণের পাঠই বর্তমান সংগ্রহে গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। ঝড়ের যাত্রী ।। কিশোর উপন্যাস ।। **(২৬৭— ৩৫০পৃষ্ঠা)**

এই উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণের সংখ্যাটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ সালে রথযাত্রার দিন। প্রকাশক অনুলেখা প্রকাশন সংস্থার পক্ষে শ্রীসুনীল ঘোষ। উক্ত সংস্করণের পাঠই বর্তমান সংগ্রহে গ্রহণ করা হয়েছে।

৫। সকলের রামকৃষ্ণ ।। জীবনী কথা ।। **(৩৫১—৪৫৬পৃষ্ঠা)**

অচিন্ত্যকুমারের অমর জীবনীগ্রন্থ পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে তৎকালের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের সাক্ষাৎ ঘটে। সেই সকল সাক্ষাতের বিবরণ এই অপূর্ব জীবনী-কথা। এই সাক্ষাৎকারের ঘটনা ব্যতীতও এই গ্রন্থে রয়েছে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা, যেমন তাঁর শেষ জীবনে সেই বিখ্যাত 'কল্পতরু উৎসব'।

এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ সালের ১লা বৈশাখ। প্রকাশিকা শ্রীমতী শুক্লা দে, শ্রী প্রকাশ ভবনের পক্ষে। অন্য কোনও সংস্করণ হয়নি। এই সংগ্রহে উক্ত সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করা হয়েছে।

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলীর পরবর্তী কিশোর রচনা সংগ্রহে তাঁর যাবতীয় শিশু ও কিশোরদের জন্য লিখিত গল্প সংকলিত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আজ ২রা আশ্বিন, অচিন্ত্যকুমারের জন্মদিন। ১৩১০ সালের এইদিনটিতে তার জন্ম (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ খৃঃ)

তাঁর জীবনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের জন্য রচনাবলীর পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি দ্রষ্টব্য।

১৯৭৬ সনের ২৯ জানুয়ারী তিনি ইহজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের বিপুল সাহিত্যসম্ভার তাঁকে বাঙলা-সাহিত্য জগতে চিরজীবিত করে রাখবে। আজ তাঁর জন্মদিনে এবং আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের এই দিনটিতে অচিন্ত্য-কুমারের এই কিশোর সাহিত্য সংগ্রহটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করছি। আজ প্রয়াত প্রিয় সাহিত্যিকের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

এই খণ্ডটি প্রকাশ করতে যাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সর্বশ্রী দুলাল পর্বত, শৈলেন পাল, সমরেশ বসু, বিপুল সেনগুপ্ত, এবং আরও অনেকে। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

২রা আশ্বিন, ১৩৮৬